প্রথম খণ্ড

মাসুদ রানা

স্বর্ণখনি

কাজী আনোয়ার হোসেন

স্বর্ণখনি-১

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

এক

গভীর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে কয়েক মাস আগে এই ধ্বংসযজ্ঞের পরিকল্পনা করা হলেও সর্বনাশের মাত্রা এরচেয়ে বেশি হতে পারত না। প্রয়োজনের সময় প্রতিটি মেশিন বা সিস্টেম এমন গোঁ ধরে বসল যেন ওগুলোর নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি আছে, সুযোগ পেয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে মানুষের ওপর। ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় কাউকে সতর্ক করে দেয়নি, স্বপ্নে বা দুঃস্বপ্নেও কেউ কোন আভাস পায়নি, এমন কি বাস্তব পরিস্থিতিতেও এমন কিছু প্রকাশ পায়নি যে কারও মনে বিপদের সামান্যতম আশঙ্কা জাগবে। অথচ ঘটনাটা ঘটল। বিলাসবহুল ক্রুজ শিপ 'ওয়াটার লিলি'তে আগুন লাগল।

জাহাজের ওয়েডিং চ্যাপেল পুড়ছে। কোন ব্যস্ততা নেই, শিখাগুলো প্রায় অলসভঙ্গিতে ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশন চাটছে। ওয়েডিং চ্যাপেলটা জাহাজের মাঝখানে, বিশাল শপিং ভিলেজ-এর ঠিক সামনে। জাহাজটা এত বড়, আগুনটাকে এখনও ছোট্ট একটা তিলই বলা যায়, তবে এটা যদি কেউ লাগিয়ে থাকে তাহলে তার অন্তত জানা আছে এই তিল দেখতে দেখতে তাল হয়ে উঠবে।

ব্রিজে যে যার নিজের কাজ করছেন অফিসাররা, এখনও জানেন না সর্বনাশের কি বীজ বপন করা হয়েছে। জাহাজের একাধিক অটোমেটিক ফায়ার-ওয়ার্নিং সিস্টেম, এমন কি প্রতিটি সিস্টেমের ব্যাকআপগুলোও, কোথাও কোন সমস্যার সামান্য ইঙ্গিতও দিল না। কনসোল-এ বিশাল ডায়াগ্রাম রয়েছে, তাতে জাহাজে বসানো প্রতিটি ফায়ার-ওয়ার্নিং ইন্ডিকেটর দেখানো হয়েছে–সেটা এইমুহূর্তে এক সাগর সবুজ আলো। চ্যাপেলে আগুন লাগার খবর দেবে নির্দিষ্ট একটা খুদে বালব, সেটাও রঙ বদলে লাল হয়ে উঠতে ব্যর্থ হলো।

ভোর চারটের সময় আরোহীরা সবাই যে যার স্টেটরুমে ঘুমে বিভোর। ঝকঝকে বার ও লাউঞ্জ, রঙচঙে ক্যাসিনো, রহস্যময় আলো-ছায়ায় ঢাকা নাইটক্লাব আর বলরুম খালি পড়ে আছে; তবে ওয়াটার লিলি থেমে নেই, আন্দামান দীপপুঞ্জকে পিছনে ফেলে চব্বিশ নট গতিতে ঢুকে পড়েছে বঙ্গোপসাগরে। সিঙ্গাপুর থেকে রওনা হয়েছে; চট্টগ্রাম, কোলকাতা, মাদ্রাজ ও মুম্বাই ছুঁয়ে পাড়ি দেবে আরব সাগর, লোহিত সাগর পেরিয়ে সুয়েজ খালের ভেতর দিয়ে পড়বে ভূমধ্যসাগরে, তারপর জিব্রালটার প্রণালী গলে বেরিয়ে যাবে আটলান্টিকে, গন্তব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহর। সদ্য তৈরি আনকোরা নতুন জাহাজ, এটাই ওয়াটার লিলির প্রথম যাত্রা। অন্যান্য ক্রুজ শিপ-এর সঙ্গে এই জাহাজের কাঠামো ও আকৃতির কোনই মিল নেই। খোলটা যেন এক পাটি বুট জুতো, মাঝখানে মস্ত একটা চাকতি বসানো। ছয়টা ডেকসহ গোটা সুপারস্ট্রাকচারের আকৃতি পুরোপুরি গোল, বৃত্তের কিনারাগুলো খোলের দু'পাশ

ছাড়িয়ে দেড়শো ফুট বেড়ে আছে, আর পঞ্চাশ ফুট এগিয়ে আছে বো ও স্টার্ন থেকে। তুলনা যদি করতেই হয়, তাহলে স্টারশিপ এন্টারপ্রাইজ আর ওয়াটার লিলির সুপারস্ট্রাকচারের মধ্যে অদ্ভুত একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। না, জাহাজটিতে কোন চিমনি নেই।

লং লেলাং ক্রুজ লাইন্স-এর গর্ব ওয়াটার লিলি নিঃসন্দেহে দুর্লভ সিক্স-স্টার রেটিং পাবে। মালিকপক্ষের ধারণা, জাহাজটার মূল রহস্য প্রকাশ পেলে দুনিয়ার মানুষ বিষম খাবে, চমকে উঠবে, তারপর উল্লাসে ফেটে পড়বে; কিন্তু তার আগেই ওয়াটার লিলির কপালে জুটবে জগৎজোড়া খ্যাতি ও বিপুল জনপ্রিয়তা। কেন এই প্রত্যাশা?

প্রথমেই বলতে হয় ওয়াটার লিলির ভেতরটা কি রকম। লাস ভেগাসের সবচেয়ে দামী হোটেলের হুবহু প্রতিচ্ছবি, ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশন পুরোটাই যেন তুলে এনে বসানো হয়েছে এখানে। প্রথম শুভযাত্রার কথা মিডিয়াতে প্রচার করা হয়নি, তাসত্ত্বেও সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে স্টেটরুম বুক করার নীরব প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সাড়ে সাতশো ফুট লম্বা ও পঞ্চাশ হাজার টন ওজন, ওয়াটার লিলি বহন করছে ষোলোশো বিলাসী আরোহী; তাদের আরাম-আয়েশ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্যে রয়েছে নয়শো অফিসার ও ক্রু।

মেরিন আর্কিটেক্টদের একটা বাহিনী ওয়াটার লিলির পাঁচটা ডাইনিং রুম, তিনটে বার ও লাউঞ্জ এলাকা, ক্যাসিনো, বলরুম, থিয়েটার ও স্টেটরুমগুলোকে অত্যাধুনিক কেতা-কায়দায় ঘটা করে সাজাতে সময়ের হিসেবে নয় মাস আর টাকার হিসেবে দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করেছে। কল্পনায় যত রঙ ধরা দেয়, জাহাজের প্রায় সর্বত্র কাজে লাগানো কাঁচে সে-সব রঙ দেখতে পাওয়া যাবে। ক্রোম, তামা বা পেতল দেয়াল ও সিলিঙে মোচড় খেয়ে বিচিত্র ও বিস্ময়কর নকশার জন্ম দিয়েছে। নামকরা শিল্পী ও মেধাবি ইন্টিরিয়ার ডিজাইনাররা তৈরি করেছে নজর কাড়া সব ফার্নিচার। অভিনব আলোকসজ্জা স্বর্গীয় একটা পরিবেশ তৈরি করেছে; এই স্বর্গ থেকে ডিজাইনার বেশ কয়েকবারই ঘুরে আসার সুযোগ পেয়েছে—স্বপ্নে। বাইরের দিকের প্রম্যানাড ডেকগুলো বাদে, কোথাও হাঁটার কোন প্রয়োজন নেই। জাহাজের ভেতর চারদিকে ছড়িয়ে আছে এস্কালেটার, সচল র‍্যাম্প আর ওয়াকওয়ে। কাঁচ মোড়া এলিভেটর পাওয়া যাবে প্রতি ডেকে কয়েকটা করে।

স্পোর্টস ডেকের বড় আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে একটা ফোর-হোল গলফ কোর্স, অলিম্পিক-সাইজড় সুইমিং পুল, বাস্কেটবল কোর্ট আর বিরাট জিম। শপিং অ্যাভিনিউটা তিন ডেক পর্যন্ত উঁচু, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিশালই বলতে হবে।

ওয়াটার লিলি সমসাময়িক ও প্রাচীন চিত্রকলার ভাসমান একটা মিউজিয়ামও বটে। জ্যাকসন পলক, পল ক্লী, অর্চি রায় ও ডং চো সহ আধুনিক চল্লিশজন শিল্পীর প্রায় চারশো পেইন্টিং জাহাজের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে; প্রাচীন মহারথীদের মধ্যে পিকাসো থেকে শুরু করে লিওনার্দো দো ভিঞ্চির দুর্লভ চিত্রও আছে—নিলামে কিনতে কত কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলতে রাজি নয় মালিকপক্ষ। মেইন ডাইনিং রুমে প্লাটিনাম বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ব্রোঞ্জের

তৈরি পৌরাণিক কাহিনীর বিবস্ত্র সুন্দরীরা। প্রাচীন চিত্রশিল্পের দাম ধরা হয়নি, ওগুলো ছাড়াই এই কালেকশন-এর খরচ পড়েছে আটাত্তর মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

স্টেট রুমগুলো বৃত্তাকার, কোথাও কোন তীক্ষ্ণ কোণ নেই। প্রতিটি সুপরিসর, এবং হুবহু একই রকম দেখতে—ওয়াটার লিলিতে বিশেষ সেলুন বা পেন্টহাউস স্যুইট রাখা হয়নি—ডিজাইনাররা শ্রেণী বিভাজনে সম্মত হননি। ফার্নিচার ও ঘর সাজানোর সমস্ত উপকরণ যেন কোন সায়ান্স ফিকশন মুভি থেকে তুলে আনা হয়েছে। বিছানা ঘোরে, উঁচু-নিচু করানো যায়; গদি অস্বাভাবিক ঋজু, কিন্তু নরম। মাথার ওপর আলোর আয়োজন দৃশ্যমান নয়। যারা প্রথম বা দ্বিতীয় হানিমুনে এসেছে তাদের জন্যে সিলিঙে সাঁটা হয়েছে বিশাল আয়না। বাথরুমে আছে বিল্ট-ইন কয়েকটা চেম্বার, ওগুলো থেকে কুয়াশা, জলোচ্ছ্বাস, বৃষ্টি কিংবা ঝর্না বেরিয়ে আসবে রাশি রাশি সদ্য ফোটা তাজা ফুল ও বিচিত্র বর্ণ পাতাবাহারের জঙ্গলে। ওয়াটার লিলিতে ভ্রমণ করা, কোন সন্দেহ নেই, অপূর্ব একটা অভিজ্ঞতাই বটে।

ডিনারের পর তরুণ দম্পতিরা বলরুমে বেশ কিছুক্ষণ জনপ্রিয় মিউজিকের তালে তালে নেচেছে, কিছুটা সময় ব্যয় করেছে নাইটক্লাবে ফ্লোর শো দেখে কিংবা ক্যাসিনোয় জুয়া খেলে; শিশু সন্তান সহ পরিবারগুলো থিয়েটারে নাটক দেখেছে, কিংবা গ্যালারিতে বসে সার্কাস পার্টির অনুষ্ঠান উপভোগ করেছে। রাত তিনটের দিকে সবগুলো ডেক আর লাউঞ্জ খালি হয়ে গেল। আজ রাতের মত যারা বিছানায় উঠল তাদের কারও চিন্তার মধ্যে এটা ছিল না যে প্রাচীন মৃত্যুদূত আজরাইল ওয়াটার লিলির ওপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে।

নিজের কেবিনে বিশ্রাম নিতে যাবার আগে আপার ডেকগুলোয় একবার করে টু মেরে এলেন ক্যাপটেন রিচার্ড গলপিন। ক্রুজ শিপের ক্যাপটেন হিসেবে বয়েস একটু বেশিই বলা যায়, আর পাঁচদিন পর পঁয়ষট্টিতম জন্মদিন পালন করবেন ভদ্রলোক। এটাই তাঁর শেষ সমুদ্রযাত্রা, নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরতি পথ ধরে সিঙ্গাপুরে পৌঁছানোর পর অবসর নেবেন, স্ত্রীকে নিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাবেন ব্যক্তিগত ইয়টে—কখনও আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে, কখনও প্যাসিফিক।

সবশেষে ব্রিজে ফিরে এলেন ক্যাপটেন গলপিন, শুনলেন সব কিছু স্বাভাবিক; নিজের কেবিনে ঢুকে প্রার্থনা করলেন, তারপর ক্লান্ত শরীর নিয়ে বিছানায় শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোর, চারটে বেজে দশ মিনিট। তরুণ সেকেন্ড অফিসার নিক গোয়েন রুটিন ট্যুরে বেরিয়েছে। একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। ধোঁয়ার? কিছু পুড়ছে? দ্রুত হেঁটে শপিং ভিলেজে চলে এলো গোয়েন, বাতাস শুঁকে মনে হলো শপিং মল-এর এক প্রান্তে গন্ধটা বেশি, বিশেষ করে যেদিকটায় বাটিক আর গিফট শপের দোকানগুলো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। কোন অ্যালার্ম না বাজায় হতভম্ব, ঝাঁঝাল গন্ধ অনুসরণ করে ওয়েডিং চ্যাপেলের সামনে চলে এলো সে। অপরদিকের গরম আঁচ অনুভব করতে পারল সে, টান দিয়ে খুলে ফেলল দরজা।

চ্যাপেলের ভেতরটা দাউ-দাউ আগুনে ভরাট হয়ে আছে। প্রচণ্ড আঁচ লাগায়

পিছন দিকে ছিটকে ডেকে পড়ে গেল হতভম্ব গোয়েন। নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে রেডিও কমিউনিকেটরের সাহায্যে ব্রিজে দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ পাঠাল সে। 'ক্যাপটেন গলপিনের ঘুম ভাঙাতে হবে। চ্যাপেলে আগুন লেগেছে। অ্যালার্ম বাজান। ড্যামেজ-কন্ট্রোল কমপিউটরকে প্রোগাম দিন, আর ফায়ার-কন্ট্রোল সিস্টেম এনগেইজ করুন।'

ফার্স্ট অফিসার এরিক বার্কম্যান-এর মাথা আপনা-আপনি ফায়ার-সিস্টেম কনসোল-এর দিকে ঘুরে গেল। সবগুলো আলো সবুজ দেখলেন তিনি। 'নিক, তুমি নিশ্চিত? এখানে তো কোন আভাসই পাচ্ছি না!'

'আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন!' মাউথপীসে চিৎকার করছে গোয়েন। 'গোটা চ্যাপেল পুড়ছে। আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। আরও শুনুন! কোথাও মারাত্মক কোন ত্রুটি আছে। ফায়ার-ইক্সটিঙগুইশার সিস্টেম কোন কাজই করছে না। তাছাড়া, কোন হিট-অ্যালার্মও নেই।'

বার্কম্যান হতচকিত। পানিতে ভাসে এমন যে-কোন জলযানের চেয়ে অনেক উন্নত মানের ফায়ার-অ্যালার্ম ও ফায়ার-কন্ট্রোল সিস্টেম রয়েছে ওয়াটার লিলিতে। ওগুলো কাজ না করলে আর কোন বিকল্পও নেই। কনসোল কোথাও কোন ত্রুটি বা বিপদের আভাস দিচ্ছে না, সেদিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসে স্তম্ভিত বার্কম্যান অমূল্য কয়েকটা মুহূর্ত নষ্ট করলেন। ব্রিজে জুনিয়ার অফিসার জন হফম্যান রয়েছে, তার দিকে ফিরলেন তিনি। 'নিক বলছে চ্যাপেলে আগুন লেগেছে। অথচ ফায়ার-কন্ট্রোল কনসোলে কিছু দেখছি না। যাও, চেক করে এসো।'

ওদিকে নিক গোয়েন যেন জঙ্গলে লাগা বড় একটা আগুন একার চেষ্টায় ভেজা একটা চট দিয়ে নেভাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। কোথাও আগুন লাগলে অটোমেটিক স্প্রিঙ্কলগুলো সেই আগুনে নিজে থেকেই পাউডার অথবা ফোম স্প্রে করবে, অন্তত করার কথা, কিন্তু এখানে সে-সব কিছু ঘটছে না। একটা ফায়ার ইক্সটিঙগুইশার দিয়ে একা সে কিছুই করতে পারছে না। ক্রুরা দল বেঁধে এসে চেষ্টা না করলে এই আগুন নেভানো অসম্ভব। ওয়াটার ভালভ খুলে দিতে হবে, কাজে লাগাতে হবে হোসপাইপ। কিন্তু কি দেখল গোয়েন? জুনিয়ার অফিসার হফম্যান অলস পায়ে শপিং অ্যাভিনিউ ধরে হেঁটে আসছে।

আগুনের বিস্তার ও মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেল হফম্যান, সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজকে জানাল, 'ফার্স্ট অফিসার, ফর গডস সেক! দিস ইজ ইমার্জেন্সি! পোর্টেবল্ ইক্সটিঙগুইশার দিয়ে কিছুই হবে না। ক্রুদের ডাকুন, সার! এনগেইজ ফায়ার-কন্ট্রোল সিস্টেমস!'

ফার্স্ট অফিসার বার্কম্যান এখনও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছেন না। 'সিস্টেম ইজ অন।' বোতামে চাপ দিয়ে বললেন তিনি।

'কিন্তু এখানে তো কিছুই ঘটছে না!' গোয়েন চেঁচিয়ে উঠল। 'কিছু একটা করুন, সার! এ আগুন আমরা নিজেদের চেষ্টায় নেভাতে পারব না!'

অগত্যা বাধ্য হয়ে ফায়ার-ক্রু অফিসারকে রিপোর্ট করল বার্কম্যান, ঘুম ভাঙাল ক্যাপটেনেরও।

রিপোর্ট পেয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে কাপড় পরছেন ক্যাপটেন গলপিন। তিনি এমন কোন বিপদ আশঙ্কা করছেন না যাতে আড়াই হাজার প্যাসেঞ্জার ও ক্রুকে জাহাজ ত্যাগ করে লাইফ বোটে চড়ার নির্দেশ দিতে হবে, তাসত্ত্বেও সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে রাখার কথাই বলেছেন ফার্স্ট অফিসারকে। ব্রিজে ছুটে এসে প্রথমেই চোখ রাখলেন ফায়ার-কন্ট্রোল কনসোলে। এখনও ওটা সবুজ আলোর সমষ্টি। কোথাও যদি আগুন লেগে থাকে, সফিস্টিকেটেড কোন সিস্টেমই সেটাকে চিহ্নিত করতে পারছে না, তাই সেটাকে নিভিয়ে ফেলার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাও করতে পারছে না।

'এ তো অসম্ভব!' গোয়েন আর হফম্যানের সঙ্গে কথা বলার পর মন্তব্য করলেন ক্যাপটেন, তারপর আবার ফোন তুলে এঞ্জিন রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

অ্যাসিসট্যান্ট চীফ এঞ্জিনিয়ার ডক হুবার্ট জবাব দিল। 'এঞ্জিন রুম। হুবার্ট।'

'ক্যাপটেন। তোমাদের ফায়ার-কন্ট্রোল ডিটেকশন সিস্টেম চেক করে বলো, জাহাজের কোথাও আগুন লেগেছে?'

দশ সেকেন্ড পর হুবার্ট জবাব দিল। 'না, স্যার। বোর্ডের সব আলো সবুজ দেখছি।'

'স্ট্যান্ড বাই, ফায়ার-কন্ট্রোল সিস্টেম ম্যানুয়ালি চালু করতে হতে পারে।'

এই সময় ব্রিজে খবর এল পোর্ট প্রম্যানাড ডেকে ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ফোন তুলে নিক গোয়েনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ক্যাপটেন। 'ক্যাপটেন। হুবার্টকে নিয়ে চ্যাপেল থেকে বেরিয়ে এসো। স্টীল ফায়ার ডোর বন্ধ করে চ্যাপেল সীল করে দিচ্ছি আমি।'

'যা করার তাড়াতাড়ি, সার! আমার ভয় হচ্ছে আগুন না অ্যাভিনিউয়ে ছড়িয়ে পড়ে।'

বোতামে চাপ দিলেন ক্যাপটেন, চ্যাপেল এরিয়ার চারপাশে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা ফায়ার ডোর বেরিয়ে এসে গোটা এলাকা সীল করে দেবে। অ্যাকটিভেশন আলো জ্বলে উঠতে না দেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তারপর গোয়েনকে আবার ফোন করলেন। 'ফায়ার ডোর বন্ধ হয়েছে?'

'না, সার। কোন নড়াচড়া নেই।'

তারপরই হুবার্টের গলা ভেসে এল ব্রিজে। 'সার, ম্যানুয়াল ফায়ার-ডোর কন্ট্রোল সিস্টেমও কোন কাজ করছে না!'

'এ অসম্ভব!' দু'মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলেন ক্যাপটেন। 'আমি আসছি, নিজে দেখব কি ঘটছে।'

ফার্স্ট অফিসার আর কোন দিন ক্যাপটেনকে দেখেনি। গলপিন ব্রিজ এলিভেটরে ঢুকলেন, নেমে এলেন এ ডেকে; ওয়েডিং চ্যাপেলের দিকে এগোলেন ক্রুরা যেদিকে আগুনের সঙ্গে লড়ছে তার উল্টোদিক দিয়ে। কিছু না ভেবেই, বিপদের বিশালত্ব সম্পর্কে অসচেতন, অল্টার-এর পিছনের দরজাটা টান দিয়ে খুলে ফেললেন। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে অগ্নিশিখার প্রচণ্ড একটা ঝড় তাঁকে গ্রাস করল। প্রায় চোখের পলকে সেদ্ধ হয়ে গেল তাঁর ফুসফুস, শরীরটা পরিণত

হলো জ্বলন্ত মশালে। পিছু হটলেন, যেন আগুনের একটা কুণ্ড। ডেকে পড়ে গেলেন, তবে মারা গেছেন তার আগেই। ক্যাপটেন গলপিন জানলেন না যে তাঁর জাহাজটাও ধ্বংস হতে যাচ্ছে।

একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল তৃষার। এরকম বাজে স্বপ্ন প্রায়ই দেখে সে–কুৎসিত কোন পশু কিংবা ঝাঁক-ঝাঁক পোকা তাড়া করছে।

বিছানায় উঠে বসার পর বাতাসে সামান্য ধোঁয়ার গন্ধ পেল। নাইট-ড্রেসের ওপর কাঁধে একটা চাদর জড়াল, তারপর সংলগ্ন স্টেট রুমের দিকে এগোল।

পাশের স্যুইটে তৃষার বাবা ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন। নোবেল প্রাইজের জন্যে মনোনয়ন পাওয়া এই মেকানিক্যাল জিনিয়াস ওয়াটার লিলিতে ভ্রমণ করছেন, কারণ এই জাহাজটার বিশেষ ধরনের নতুন এঞ্জিনের ডিজাইন তিনিই ডেভলপ্ করেছেন। তিনি দেখতে চান প্রথম যাত্রায় ওগুলো কেমন কাজ করে। নিজের আবিস্কৃত নতুন সৃষ্টি নিয়ে ভদ্রলোক এতই ব্যস্ত থাকেন এঞ্জিন রুমে যে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করার পর বাবার সঙ্গে তৃষার প্রায় বলতে গেলে দেখাই হয়নি। গতরাতেই প্রথম দু'জন একসঙ্গে বসে ডিনার খাবার সময় পেয়েছে ওরা। সিরাজুল ইসলাম অবশেষে সন্তুষ্ট, তাঁর ম্যাগনেটিক জেট প্রপালশান এঞ্জিনগুলো কোন সমস্যা ছাড়াই চমৎকার কাজ করছে।

বাবার কাঁধে হাত-রেখে মৃদু ঝাঁকাল তৃষা। 'বাবা, ওঠো।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় উঠে বসে ডক্টর সিরাজুল ইসলাম জানতে চাইলেন, 'কি ব্যাপার? তুই কি অসুস্থ?'

'বাবা, ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি। মেঝেও গরম লাগছে।'

'বলিস কি!' বিছানা থেকে নেমে পড়লেন ইসলাম সাহেব। 'চল্ তো দেখি।'

জাহাজের আগুন কিভাবে নেভাতে হয় তার ট্রেনিং নেয়া আছে ওদের, কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি এমনই, যেন পিছমোড়া করে বাঁধা হাত নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে সবাইকে। গোটা ফায়ার-কন্ট্রোল প্রোগ্রাম কোন কাজ করছে না। কমপিউটর, ফায়ার-ডোর, স্প্রিঙ্কল–সব বিকল। এমনকি ভালভ ক্যাপগুলো ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ায় হোসগুলো জোড়া লাগানো যাচ্ছে না, হাত দিয়ে ঘোরানো সম্ভব নয়। এঞ্জিন রুম থেকে রেঞ্জ আনার জন্যে লোক পাঠাল গোয়েন। অসহায় ক্রুরা তাকিয়ে দেখছে আর আগুনকে পথ ছেড়ে দিয়ে পিছু হটছে। পনেরো মিনিটের মধ্যে এ ডেককে গিলে ফেলল লাল শিখা। স্টার ও পোর্ট সাইডের লাইফবোট পানিতে নামানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে একদল ক্রু। আগুনের দ্রুতগতি, ভয়াল রূপ দেখে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাল তারা।

অথচ এখনও কোন অ্যালার্ম বাজছে না।

ক্যাপটেন রিচার্ড গলপিন নিখোঁজ, এ-খবর রটে যাবার পরও ফার্স্ট অফিসার বার্কম্যান মেনে নিতে রাজি নন যে তিনি মারা গেছেন বা মারাত্মক কোন বিপদে পড়েছেন। আধুনিক আর সব ক্রুজ শিপ-এর মত ওয়াটার লিলিকেও ফায়ারপ্রুফ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, কাজেই তিনি ধরে নিচ্ছেন আগুনটাকে ঠিকই তাঁরা

নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবেন। নিজের কাঁধে দায়িত্ব নিতে উৎসাহী নন, ফলে ক্যাপটেনের খোঁজে আবার লোক পাঠালেন তিনি। এভাবে আসলে অমূল্য সময় নষ্ট হয়ে গেল অনেক।

বার্কম্যান চার্ট রুমে ঢুকে বড় একটা চার্টে চিহ্নিত করা কোর্স লাইন পরীক্ষা করলেন। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের সাহায্যে বিশ মিনিট আগে ফোর্থ অফিসার নিশ্চিত হয়েছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পিছনে ফেলে আসার পর বঙ্গোপসাগরের এমন এক জায়গায় রয়েছে ওয়াটার লিলি যেখান থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি ল্যান্ডফল হলো সেইন্ট মার্টিন দ্বীপ, একশো বিশ মাইল দক্ষিণ-পুবে। ব্রিজে ফিরে এসে উইং-এ বেরুলেন বার্কম্যান। হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাতাসের গতিও বাড়ছে। বো-র দিকে অবিচ্ছিন্ন মিছিলের মত ছুটে আসা ঢেউ একেকটা পাঁচ ফুট উঁচু। ঘুরে পিছন দিকে তাকালেন তিনি। জাহাজের মাঝখানটা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে, আগুনের কমলা শিখা লাইফবোটগুলোকে গিলে ফেলছে। সমস্ত ফায়ার-কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যর্থ হলো কেন? ওয়াটার লিলি দুনিয়ার অন্যতম নিরাপদ জাহাজগুলোর একটা। চিন্তাই করা যায় না যে এর শেষ গতি হবে সমুদ্রের তলায়। যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে অবশেষে ফায়ার-অ্যালার্ম সিস্টেম অন করলেন তিনি। কিন্তু এরই মধ্যে জাহাজের ক্যাসিনোয় দাউ-দাউ আগুন ধরে গেছে।

জাহাজ জুড়ে বেল বেজে উঠল, শোনা গেল সাইরেনের তীব্র ওঁয়া-ওঁয়া। ঘুম ভেঙে গেল ষোলোশো আরোহীর। সবাই বিরক্ত। বিরক্তির জায়গা দ্রুত দখল করে নিল ভয়। ভোর চারটে পঁচিশ মিনিটে ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম! স্পীকার সিস্টেম থেকে নির্দেশ এল লাইফবোট স্টেশনে যাবার আগে সবাই লাইফ ভেস্ট পরে নিন।

কিন্তু একটু পরই যে-সব প্যাসেঞ্জার বোট ডেকে বেরিয়ে এল, নিজেদের সামনে আগুনের পাঁচিল ছাড়া কিছুই তারা দেখতে পেল না। আতংক ছড়ানোর সেই শুরু।

মেয়েকে পথ দেখিয়ে কাছাকাছি একটা এলিভেটরে নিয়ে এলেন সিরাজুল ইসলাম, সেটা দিয়ে উঠে এল সুপারস্ট্রাকচারের আপার সেকশন-এর অবজারভেশন ডেকে, এখান থেকে জাহাজের প্রায় পুরোটা দেখতে পাওয়া যাবে। সাততলা নিচে জাহাজের মাঝখানে আগুনের বিস্তার তাঁর সবচেয়ে খারাপ ধারণাটাই সত্যি করে তুলল। দুই ডেকের ডেভিট-এ লাইফবোট থাকে, দুটোতেই পৌঁছে গেছে আগুন। স্টার্নে দাঁড়িয়ে উন্মত্ত ব্যস্ততার সঙ্গে সাগরে লাইফ রাফট্ ফেলছে ক্রুরা—ওগুলো পানিতে পড়ার পর নিজে থেকেই বাতাসে ফুলে উঠছে। ক্রুরা একেবারেই সচেতন নয় যে জাহাজ এখনও ছুটছে, ফলে খালি রাফট্ বা ভেলাগুলো জাহাজের অনেক পিছনে পড়ে থাকবে, কারও কোন কাজে আসবে না। এ-সব দেখে মুখ থেকে রক্ত নেমে গেল, মেয়ের দিকে ফিরে সিরাজুল ইসলাম বললেন, 'বি ডেকের খোলা কাফেতে চলে যা। আমার জন্যে অপেক্ষা করবি।'

নাইট-ড্রেসের ওপর শুধু চাদর জড়িয়ে রেখেছে, তৃষা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি?'

'আমাকে স্টেট রুম থেকে কাগজগুলো আনতে হবে। তুই যা, কয়েক

মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।'

কিন্তু প্রতিটি এলিভেটর জ্যাম হয়ে গেছে, নিচের ডেকের লোকেরা সবগুলো দখল করে নিয়েছে। সিঁড়িতেও একই অবস্থা, জনস্রোতের বিরুদ্ধে ধস্তাধস্তি করে নামতে হলো ওদেরকে। সারা জীবন সুষ্ঠু নিয়ম ধরে জীবন কাটিয়েছে যারা, আজ হঠাৎ মৃত্যুভয় তাদেরকে হিংস্র দাঙ্গাবাজে পরিণত করছে। অথচ বেশিরভাগই তারা অন্ধের মত ছুটছে, জানে না কোথায় যাচ্ছে বা কোথায় গেলে প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। অনেককেই পাগলের মত বিলাপ করতে দেখা গেল।

মানসিকভাবে অসাড় ও অবশ, ফার্স্ট অফিসার বার্কম্যান এখনও মেডে কল প্রচার করছেন না। চীফ রেডিও অফিসার তিনবার রেডিও রুম থেকে ছুটে এসে জানতে চেয়েছেন মেডে কল প্রচার করবেন কিনা, আশপাশের জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন কিনা। কিন্তু বার্কম্যান কোন জবাব দেননি।

আর কয়েক মিনিট পর অনেক বেশি দেরি হয়ে যাবে। রেডিও রুম থেকে আগুনের পাঁচিল আর মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে।

বি ডেকের খোলা কাফেতে কোন রকমে পৌঁছে তৃষা দেখল চারদিকে গিজ গিজ করছে মানুষ। সবাই হতভম্ব, বিহ্বল ও আতংকিত। ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ায় ছেলে-বুড়ো সবাই খক খক করে কাশছে।

জাহাজ এখনও চব্বিশ নট স্পীডে ছুটছে।

নেহাতই ভাগ্য বলতে হবে যে স্টেট রুমে থাকা অবস্থায় কোন প্যাসেঞ্জার মারা যায়নি; করিডর, সিঁড়ি আর এলিভেটরে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই সবাই তারা বেরিয়ে আসতে পেরেছে। অফিসার আর ক্রুরা আশ্চর্য সাহস দেখিয়ে তাদের সবাইকে স্টার্ন ডেকে জড়ো করতে পেরেছে। এখানে আপাতত আগুন তাদের নাগাল পাবে না।

ভিড় ঠেলে অবশেষে রেইলের কাছে পৌঁছাতে পারল তৃষা, বজ্রমুষ্ঠিতে ওটা ধরে ঝুলে থাকল। প্রপেলারের তৈরি আলোড়িত ফেনার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। এখনও ভোরের আলো ফোটেনি, তবে জাহাজের ফ্লাড লাইটের আলোয় দুশো গজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল—এটা নিশ্চয়ই বঙ্গোপসাগর। তার মানে হয়তো মাতৃভূমির জলসীমার ভেতরই রয়েছে সে! এ কি তাহলে মায়ের ডাক, জঠরে ফিরিয়ে নিতে চায়?

আচ্ছা, জাহাজ থামছে না কেন?

এক খ্রিস্টান মহিলা যীশুকে স্মরণ করছে। 'হে প্রভু, আমাদেরকে পুড়িয়ে মেরো না!' কেউ তাকে বাধা দেয়ার সময়ই পেল না, রেইলিং টপকে লাফ দিল সাগরে। অনেকেই হায় হায় করে উঠে নিচে তাকাল। কয়েকবার হাবুডুবু খেয়ে অন্ধকার সাগরে হারিয়ে গেল মাথাটা।

বাবার কথা ভেবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে তৃষা। খুঁজতে যাবে কিনা ভাবছে, এই সময় ফিরে এলেন সিরাজুল ইসলাম, হাতে একটা বাদামী লেদার কেস। এক হাতে পেঁচিয়ে তাঁকে কাছে টেনে নিল মেয়ে। 'কি করব আমরা?' ভয়ে, উদ্বেগে গলা ভেঙে গেল। 'কোথায় যাব?'

'পানিতে,' বললেন বিজ্ঞানী বাবা। 'যতক্ষণ পারা যায় ওখানেই বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।' স্নেহ ও মায়া ভরা দৃষ্টিতে মেয়ের চোখে চোখ রাখলেন সিরাজুল ইসলাম। স্ত্রী ছিলেন রূপসী, মেয়ে মাকেও ছাড়িয়ে সারা দুনিয়ার সুন্দরী শ্রেষ্ঠাদের সারিতে দাঁড়াতে পারবে। আজ হঠাৎ করে তিনি উপলব্ধি করলেন, স্ত্রী মারা যাবার পর মেয়ের প্রতি যে মনোযোগ দেয়া উচিত ছিল তা তিনি দিতে পারেননি বিজ্ঞান সাধনায় অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকার কারণে। তবে রূপের সঙ্গে মেধা থাকায় মেয়ে নিজের জীবনটাকে গড়ে নিতে পেরেছে, সেজন্যে তিনি সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ। 'অন্তত এই ভেবে আমরা সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করতে পারি যে এটা আমাদের পানি, একটু গরমই বলা চলে, কাজেই সাঁতরাতে ভালই লাগবে।' মেয়ের অ্যাথলেটিক কাঠামোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে হাসলেন।

'তবে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করব, তাই না?' বাবার রসিকতায় সাহসে বুক বাঁধল তৃষা। 'আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্যে নিশ্চয়ই কোনও জাহাজ ছুটে আসবে?'

ব্রিজে দাঁড়িয়ে লং লেলাং ক্রুজ লাইন্স-এর গর্ব ওয়াটার লিলিকে পুড়তে দেখছেন ফার্স্ট অফিসার এরিক বার্কম্যান। তাঁর মাথা কাজ করছে না, তিনি এখন একটা জড়-পদার্থ বললেই চলে। কামানের গোলার মত ছুটে এসে ব্রিজে ঢুকল সেকেন্ড অফিসার গোয়েন। অটল মূর্তি বার্কম্যানকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে। 'আপনি জাহাজ থামানোর নির্দেশ দেননি কেন?'

উত্তর বেরুল যেন একটা রোবটের গলা থেকে। 'সেটা ক্যাপটেনের দায়িত্ব।'

'তিনি কোথায়?'

'কতবার বলব। তিনি কোথায় আমি জানি না। ব্রিজ থেকে বেরুবার পর তাঁর আর কোন খবর নেই।'

'তাহলে ধরে নিচ্ছি আগুনে পুড়ে মারা গেছেন তিনি।' গোয়েন বুঝতে পারছে সিদ্ধান্ত দেয়ার মত মানসিক অবস্থা ফার্স্ট অফিসারের নেই। টেলিফোনের রিসিভার তুলে চীফ এঞ্জিনিয়ারকে চাইল সে। 'চীফ, আমি গোয়েন। ক্যাপটেন নিখোঁজ, সম্ভবত মারা গেছেন। আগুন আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। সবগুলো এঞ্জিন বন্ধ করে তোমার লোকদের নিয়ে ওপরে উঠে এসো। মাঝখান দিয়ে উঠতে পারবে না, বো বা স্টার্ন দিয়ে চেষ্টা করো।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ফার্স্ট অফিসারের দিকে ফিরল গোয়েন। 'মেডে কল-এর কোন রেসপন্স পাওয়া গেছে?'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল বার্কম্যান। 'মেডে?'

'হায় যীশু! তাহলে তো সত্যিই দেরি হয়ে গেছে! এতক্ষণে রেডিও রুম পুড়ে ছাই!' আবার রিসিভার তুলে রেডিও রুমের নম্বরে ডায়াল করল গোয়েন, কিন্তু যান্ত্রিক শব্দজট ছাড়া কোন সাড়া পেল না। দেয়ালে মাথা ঠুকল সে। 'এত লোক···দু'হাজারের বেশি, হয় ডুবে মরবে নয়তো পুড়ে—উদ্ধার পাবার কোন সুযোগ পর্যন্ত নেই।' কাঁদছে সে। 'ওদের সঙ্গী হওয়া ছাড়া আমাদেরও কিছু করার নেই।'

দুই

বারো মাইল উত্তরে কালো দীঘির মত গভীর একজোড়া মায়া ভরা চোখ উজ্জ্বল হতে শুরু করা পূব আকাশ থেকে ঘুরে গেল দক্ষিণ আকাশে ফুটে ওঠা লাল আভার দিকে। চিন্তামগ্ন, চোখ জোড়ার অধিকারী সুপুরুষ তরুণটি 'নুমা'-র ওশানাগ্র্যাফিক সার্ভে ভেসেল সী রবিন-এর ব্রিজ উইং থেকে পাইলটহাউসে ঢুকল, ব্রিজ কাউন্টারে পড়ে থাকা একজোড়া বিনকিউলার তুলে নিয়ে আবার ফিরে এল উইং-এ।

ভোরের সামুদ্রিক বাতাস বেশ আরামদায়ক, না গরম না ঠাণ্ডা। ওর পরনে নীল ডেনিম শর্টস আর বহু বর্ণের ফুল ছাপা হাওয়াইয়ান শার্ট, পায়ে স্যান্ডেল। ডীপ ওয়াটার রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করার সময় সাধারণত এ-ধরনের কাপড়ই পরে মাসুদ রানা, বিশেষ করে এলাকাটা যদি হয় বঙ্গোপসাগরের মত গ্রীষ্মপ্রধান।

বিশ্বব্যাংকের অনুদান ও নুমার কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশের জলসীমার ভেতর তেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নতুন করে যাচাই করা হচ্ছে, এখানে অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে নুমার রিসার্চ শিপ সী রবিনের উপস্থিতির এটাই কারণ।

লাল আভার দিকে মিনিট তিনেক তাকিয়ে থাকার পর পাইলটহাউসে ফিরে এসে রেডিও রুমে মাথা গলাল রানা। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে ঘুম-ঘুম চোখ তুলে রেডিও অপারেটর বলল, 'লেটেস্ট স্যাটেলাইট ওয়েদার ফোরকাস্ট রিপোর্ট হলো–ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল গতি নিয়ে ঝড় আসছে, সঙ্গে থাকবে তুমুল বৃষ্টি, ঢেউ পাবেন দশ ফুটী।'

'তুমি কোন ডিসট্রেস সিগন্যাল পেয়েছ?'

রানার উদ্বিগ্ন গলা শুনে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রেডিও অপারেটরের। 'না তো!'

'দক্ষিণে বড় কোন জাহাজে আগুন লেগেছে বলে মনে হচ্ছে। চেষ্টা করে দেখো তো ওটার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো কিনা।' ডিউটিতে রয়েছে অফিসার ডাফ টিমোথি, তার কাঁধে হাত রাখল রানা। 'ডাফ, আমি চাই জাহাজ দক্ষিণে ঘুরিয়ে ফুল স্পীড তোলো তুমি। ক্যাপটেন শেফার্ডকে জাগাও, বলো আমি তাঁকে পাইলটহাউসে ডাকছি।'

রানা এই প্রজেক্টের ডিরেক্টর, তাই পদের বিচারে ক্যাপটেনের চেয়ে ওর ওজন অনেক বেশি, তবে তারপরও জাহাজ পরিচালনার দায়িত্ব তারই। একটু পরই ব্যস্তসমস্ত হয়ে ক্যাপটেন ফ্রান্সিস শেফার্ড শুধু একজোড়া শর্টস পরে পাইলটহাউসে উঠে এলেন। 'কি ব্যাপার? কোন্ জাহাজে আগুন লাগল?' মুখের সামনে হাত রেখে হাই তুলছেন। রানার বাড়ানো হাত থেকে বিনকিউলার নিয়ে ব্রিজ উইং-এ বেরিয়ে এলেন, ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালেন দক্ষিণ দিকে। 'ঠিক ধরেছেন, মিস্টার রানা। দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমি বলি–ওটা একটা

ক্রুজ শিপ। খুব বড়।'

'আশ্চর্য! কোনও মেডে পাঠায়নি!' রানা স্বস্তিবোধ করল, ক্যাপটেন আজ মদ বা অন্য কোন ড্রাগ নেননি।

'তারমানে রেডিও কাজ করছে না।' চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে রানার দিকে ফিরলেন শেফার্ড। 'জাহাজ ঘোরাবার নির্দেশ দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, মিস্টার রানা।' ব্রিজে ফিরে এসে ফোনের রিসিভার তুললেন। 'চীফ এঞ্জিনিয়ার ফ্রাঙ্ক গার্ডনারকে জাগাও। আমি ফুল স্পীড চাই।' অপরপ্রান্তের কথা শোনার জন্যে থামলেন একবার। 'কেন? আমরা বিপদে পড়া একটা জাহাজের দিকে যাচ্ছি, আবার কেন!'

খবর ছড়িয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সার্ভে শিপে ক্রু আর বিজ্ঞানীদের ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল, খবরের সঙ্গে কার কি কাজ ও দায়িত্ব তা-ও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। জাহাজের দুটো পঁয়ত্রিশ ফুটী হাইড্রোগ্র্যাফিক সার্ভে লঞ্চ পানিতে নামানোর জন্যে তৈরি রাখা হলো। দুটো টেলিস্কোপিক ডেক ক্রেইন-এর সঙ্গে স্লিং জোড়া লাগানোর কাজ চলছে, ওগুলোর সাহায্যে পানিতে সাবমারসিবল আর সার্ভে ইকুইপমেন্ট নামানো হয়। জাহাজের প্রতিটি মই আর রশি কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা হয়েছে, প্রয়োজন দেখা দিলেই জাহাজের কিনারা থেকে নিচে ফেলে দেয়া হবে।

জাহাজের ডাক্তাররা মেরিন বিজ্ঞানীদের সাহায্য নিয়ে আহত ও অসুস্থ লোকজনকে হাসপাতালে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুতি নিল। মেস রুমটাকে বানানো হলো হাসপাতালের বর্ধিত অংশ। গ্যালির কুকরা ভ্যাট-এ চড়িয়ে দিল সুপ। বোতলে পানি ভরা হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে প্রচুর কফি। প্রত্যেকে যে যার অতিরিক্ত কাপড় এনে এক জায়গায় জড়ো করছে, যাদেরকে উদ্ধার করা হবে তাদের লাগতে পারে ভেবে। মাত্র দুশো ত্রিশ ফুট লম্বা আর পঞ্চাশ ফুট চওড়া, কাজেই সী রবিন দু'হাজার প্যাসেঞ্জার গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে না। ধারণ ক্ষমতার বেশি লোক উঠলে জাহাজ উল্টে যাবে। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে সার্ভিসিং-এর জন্যে হেলিকপ্টারটাকে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়েছে: ওটা থাকলে আহত লোকজনকে দ্রুত কোন হাসপাতালে পাঠানো হয়তো সম্ভব হত।

পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরা ক্যাপটেন শেফার্ড ডেকে পায়চারি করছেন, সেই সঙ্গে যখন যেটা মনে পড়ছে নির্দেশ দিচ্ছেন ক্রুদের। এলাকার অন্যান্য জাহাজকে খবর দেয়ার নির্দেশ পেয়ে সেটা পালন করেছে রেডিও অপারেটর, কিন্তু এখনও কোন আশাব্যঞ্জক সাড়া পাচ্ছে না সে। কাছাকাছি বলতে একশো মাইল দূরে দুটো জাহাজ আছে। একটা ফ্লাইং কার্পেট, ভারতীয় কন্টেইনার শিপ। ফ্লাইং কার্পেটের ক্যাপটেন জানিয়েছেন ফুলস্পীডে রওনা হয়েছেন তিনি। দ্বিতীয়টা উত্তর কোরিয়ান মিসাইল ক্রুজার। সেটাও বঙ্গোপসাগরে ঢুকে পড়েছে। তবে অকুস্থলে পৌঁছাতে এখনও তেষট্টি মাইল পাড়ি দিতে হবে ওটাকে।

পনেরো মিনিট পর সী রবিনের ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা ক্রু, অফিসার ও বিজ্ঞানীদের চোখের সামনে যে অবিশ্বাস্য নাটক উন্মোচিত হতে শুরু করল তা দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হয়ে উপায় থাকল না কারও। এক সময় যেটা ছিল হাসি-

আনন্দে ভরপুর বিলাসবহুল ভাসমান রাজপ্রাসাদ, এখন সেটা প্রকাণ্ড এক জ্বলন্ত চিতা।

বাতাস তীব্র হয়ে উঠছে, সাগর হয়ে উঠছে রুদ্র, আড়াআড়িভাবে ভেসে আসা ওয়াটার লিলিকে দেখে হতভম্ব রানা ও ক্যাপটেন শেফার্ড ভেবে পাচ্ছেন না সার্ভে শিপ সী রবিন এই করুণ বিপদে কতটুকু সাহায্য করতে পারবে। 'হায় যীশু! বোটে কেউ চড়তেই পারেনি!' বিড়বিড় করলেন ক্যাপটেন।

'পানিতে নামানোর সময় পাওয়া যায়নি, তার আগেই পুড়ে গেছে,' আন্দাজ করল রানা।

ওয়াটার লিলির স্টার্নের দিকে বিনকিউলার তাক করলেন ক্যাপটেন শেফার্ড। 'লোয়ার ডেক থেকে লোকজন টপাটপ লাফ দিচ্ছে। কিন্তু ওপরের ডেকে ওরা সবাই যেন জমে পাথর হয়ে গেছে!'

'ওপরের ডেক নয় কি দশতলা উঁচু,' বলল রানা। 'ওখান থেকে নিচের পানি এক মাইল দূরে মনে হবে।'

রেইলিঙের ওপর ঝুঁকে ক্রুদের নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন শেফার্ড, 'বোট ছাড়ো। লোকজন অন্ধকার সাগরে ভেসে যাবার আগে তুলে নাও।'

আফটারডেকে বেরিয়ে আসতে পারায় পুড়ে মরার ভয় আপাতত কেটে গেছে, আরোহীরা আগের চেয়ে শান্ত এখন, অন্তত একটা উদ্ধারকারী জাহাজ দেখতে পেয়ে বাঁচার স্বপ্নও দেখছে তারা। ইতিমধ্যে বুলহর্নের মাধ্যমে সী রবিন ও ওয়াটার লিলি পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে–একদিক থেকে রানা কথা বলছে, আরেক দিক থেকে নিক গোয়েন। সিদ্ধান্ত হয়েছে, ছোট ছেলেমেয়ে আছে এরকম পরিবারগুলোকে ক্রেইন ও ক্রেডলের সাহায্যে সবার আগে সী রবিনে নিয়ে আসা হবে। সী রবিন-এর বোটগুলো অবশ্য এরই মধ্যে পানি থেকে বহু লোককে তুলে নিয়েছে। তবে স্রোতের টানে বেশ কিছু লোক ভেসেও গেছে, বেশিরভাগই অবশ্য লাশ–পানিতে লাফিয়ে পড়ার সময় আহত হয়ে মারা গেছে।

ভয়ে তৃষার দু'সারি দাঁত বাড়ি খাচ্ছে। 'নুমা' লেখা সার্ভে শিপটা এত কাছে মনে হচ্ছে, অথচ কত দূরে। সামনে এখনও দশজন লোক রয়েছে, তারা মই বেয়ে নেমে গেলে ওদের পালা। মেয়ের একটা হাত শক্ত করে ধরে আছেন ডক্টর সিরাজুল ইসলাম, শৃংখলা বজায় রেখে বাঁচার সুযোগ নিতে চান, হুড়োহুড়ি করে অন্যায় সুযোগ নিতে রাজি নন। কিন্তু পিছন থেকে জনস্রোতের ধাক্কায় বেসামাল হয়ে পড়ছেন তিনি। আগুনের আঁচ আর ধোঁয়াও কম ভোগাচ্ছে না। অকস্মাৎ প্রকাণ্ডদেহী এক লালচুলো লোক ভিড়ের ভেতর হাত বাড়িয়ে দিয়ে সিরাজুল ইসলামের লেদার ব্যাগটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়লেও এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক ব্যাগটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রাখলেন, যেন প্রাণ থাকতে ওটা ছাড়তে রাজি নন।

আতংকে নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে, বাবার সঙ্গে অচেনা এক লোককে ধস্তাধস্তি করতে দেখছে তৃষা। জাহাজের কালো এক অফিসার, ইউনিফর্মে এতটুকু দাগ বা ভাঁজ নেই, চোখে-মুখে নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে ঘটনাটা দেখছে। পাথর কেটে

তৈরি করা নিষ্প্রাণ একটা অবয়ব। তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল তৃষা। 'কিছু একটা করুন! ওভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আমার বাবাকে সাহায্য করুন!'

তৃষার কথা যেন শুনতেই পায়নি, বা শুনতে পেলেও গ্রাহ্য করছে না, এগিয়ে এসে লালচুলো শ্বেতাঙ্গকে সাহায্য করল নিগ্রো অফিসার।

দু'জনের সঙ্গে একা পেরে উঠলেন না সিরাজুল ইসলাম, ভারসাম্য হারিয়ে রেইলিঙের ওপর শিরদাঁড়া দিয়ে পড়লেন, তারপর ডিগবাজি খেয়ে নেমে গেলেন জাহাজ থেকে। ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত, শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রো দু'জনেই মুহূর্তের জন্যে হকচকিয়ে গেল, তারপর দ্রুত মিলিয়ে গেল জনস্রোতের ভেতর। আতংকে আর্তনাদ করে উঠে রেইলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে নিচে তাকাল তৃষা, দেখল ঝপাৎ করে সাগরে পড়ে ডুবে গেলেন সিরাজুল ইসলাম।

তৃষার মনে হলো এক ঘণ্টা ধরে তাকিয়ে আছে, আসলে মাত্র বিশ সেকেন্ড পর পানির ওপর ভেসে উঠল সিরাজুল ইসলামের মাথা। এত ওপর থেকে পতনের ফলে তাঁর শরীর থেকে লাইফ ভেস্ট খুলে বেরিয়ে গেছে। তৃষার মনে হলো, বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাঁর মুখ বারবার ডুবে যাচ্ছে পানিতে, ঘাড়টা যেন নড়বড় করছে।

হঠাৎ, আগাম কোন আভাস ছাড়াই, গলার চারধারে কার যেন শক্ত হাতের চাপ অনুভব করল তৃষা। মৃত্যুভয়ে উন্মাদিনী, পিছন দিকে পা ছুঁড়ছে, সেই সঙ্গে হাত দিয়ে গলা ছাড়াবার চেষ্টা করছে সে। একটা শক্ত লাথি শত্রুর উরুসন্ধিতে লাগতে গলা পেঁচিয়ে ধরা আঙুলগুলোয় ঢিল পড়ল। বন করে ঘুরতেই আবার সেই কালো অফিসারকে দেখতে পেল তৃষা।

স্পর্শকাতর জায়গায় ব্যথা পেয়েছে, তাই এক পাশে সরে গিয়ে তার লালচুলো সহকারীকে তৃষার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ করে দিল নিগ্রো। কিন্তু তার আগেই লাইফ ভেস্টের কলার এক হাতে চেপে ধরে লাফ দিল তৃষা, রেইলিং টপকে জাহাজ থেকে বেরিয়ে গেল। লালচুলো স্যাঁৎ করে হাত বাড়িয়েও আধ ইঞ্চির জন্যে তাকে ধরতে পারল না।

বুদ্বুদের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পানির তলায় নেমে এল তৃষা, পানির ওপর মাথা তুলে দেখল দুই জাহাজের মাঝখানে রয়েছে সে, হাঁপাতে হাঁপাতে চারদিকে চোখ বুলাতে বাবাকে দেখতে পেল প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে। লাইফ ভেস্ট ওকে ভেসে থাকতে সাহায্য করছে, সাঁতরে সেদিকে এগোচ্ছে, চিৎকার করে ডাকল, 'আব্বু!'

বাবার নাগাল পেয়ে তাঁর কাঁধ আঁকড়ে ধরল তৃষা, ঝাঁকি দিয়ে আবার চিৎকার করল, 'আব্বু!'

সিরাজুল ইসলাম এখনও জ্ঞান হারাননি। কাঁপতে কাঁপতে তাঁর চোখের পাতা খুলল একটু। মুখ বিকৃত হয়ে আছে, যেন অসহ্য ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। 'তৃষা, লক্ষ্মী মা আমার, নিজেকে বাঁচাও,' থেমে থেমে বললেন তিনি। 'আমি পারব না।'

'বললেই হলো! আমি তোমাকে ধরে আছি। এখনি একটা বোট এসে তুলে নেবে আমাদের।'

বাদামী লেদার ব্যাগটা এখনও শক্ত করে ধরে আছেন, মেয়ের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিলেন সিরাজুল ইসলাম। 'পানিতে পড়ার সময় ব্যাগটার বাড়ি খেয়েছি

পিছনে। কিছু করার নেই রে, মা–আমার শিরদাঁড়া বোধহয় ভেঙে গেছে।'

'না…কি…অসম্ভব!'

'তুই থাম। আমি ঠিক বলছি। আমার শরীরে কোন সাড় নেই, অবশ হয়ে গেছে; আমি সাঁতরাতে পারছি না।'

গায়ে এসে ধাক্কা মারল একটা লাশ। সেটাকে এক হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল তৃষা। 'তুমি যাই বলো, আমি তোমাকে ছাড়ছি না…'

সিরাজুল ইসলাম হাসতে চেষ্টা করে বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। কিন্তু ব্যাগটা তো আগে ধর।' মেয়ের হাতে এবার জোর করে ব্যাগটা ধরিয়ে দিলেন তিনি। 'শোন। এটাকে যত্ন করে, নিরাপদে রাখা চাই। কি বলছি বুঝতে পারছিস? নির্দিষ্ট, যথার্থ সময় পর্যন্ত…'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

'সময় হলে পারবি–,' শব্দগুলো কোন রকমে শোনা গেল। হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে গেল শরীরটা, সিরাজুল ইসলাম মারা গেলেন।

বাবাকে ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে তৃষা আর কাঁদছে।

তিন

প্রথম ত্রিশ মিনিটে পানি থেকে পাঁচশোর কিছু বেশি লোককে সী রবিনের বোটে তুলে নেয়া হয়েছে। আরও দুশো লোক সী রবিন থেকে ফেলা ভেলায় চড়েছে। উদ্ধারকারীরা শুধু জীবিত মানুষদের সাহায্য করছে। বোটে তোলার পর কাউকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলে আবার পানিতে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে তাকে, তার জায়গায় তোলা হচ্ছে এখনও যারা বেঁচে আছে তাদের কাউকে।

বোটগুলো জাহাজের পিছন দিকে এসে খালি হচ্ছে। যাদের শক্তি আছে তারা মই বেয়ে উঠছে সী রবিনে। যারা ক্লান্ত ও অসুস্থ তাদেরকে ক্রেইন আর স্লিং-এর সাহায্যে তোলা হচ্ছে। প্রতিটি বোট খালি হওয়া মাত্র আবার ফিরে যাচ্ছে পানি থেকে মানুষ তুলে আনতে। তারপরও সময়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারা যাচ্ছে না। যত লোককে বোটে তোলা সম্ভব হচ্ছে তারচেয়ে অনেক বেশি লোক ওয়াটার লিলি থেকে লাফ দিচ্ছে পানিতে।

রেসকিউ অপারেশন রানা পরিচালনা করছে, ওকে সাহায্য করছেন ক্যাপটেন শেফার্ড। একসময় ও লক্ষ করল, এখনও হাজারখানেক লোককে উদ্ধার করা বাকি, অথচ সী রবিন-এর অবস্থা দাঁড়িয়েছে ডুবু ডুবু। ছুটে পাইলটহাউসে চলে এল ও, টিমোথিকে জিজ্ঞেস করল, 'কি অবস্থা?'

কমপিউটর থেকে থমথমে মুখ তুলে মাথা নাড়ল টিমোথি। 'খারাপ, সার। জাহাজ আর তিন ফুট নিচু হলে সাবমেরিন হয়ে যাবে।'

'কিন্তু এখনও এক হাজার লোককে উদ্ধার করা বাকি।'

কথা না বলে টিমোথি শুধু মাথা নাড়ল।

'কেন, জাহাজ হালকা করলে?' রানা নাছোড়বান্দা। 'নোঙর আর চেইন কেটে ফেলে দাও। সাবমারসিবলগুলোও ভাসিয়ে দাও, পরে তুলে নেয়া যাবে। দশ পাউন্ডের বেশি ওজন এমন প্রতিটি ইকুইপমেন্ট ফেলে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ হালকা করার কাজ শুরু হয়ে গেল। পনেরো মিনিটের মধ্যে পানির ওপর ছয় ইঞ্চি উঠল সী রবিন। এরপর প্রতিটি বোটকে রানার নির্দেশে পৌঁছে দেয়া হলো–সামর্থ্য অনুসারে পানি থেকে লোক তোলো, কিন্তু জাহাজ আর কাউকে নেবে না।

ওয়াটার লিলির সেকেন্ড অফিসার নিক গোয়েনের সঙ্গে আবার বুলহর্নের মাধ্যমে কথা বলল রানা। গোয়েনই প্রথমে জানতে চাইল, 'আপনারা আর কত লোককে নিতে পারবেন?'

'আপনারা বাকি আছেন কতজন?'

'এই ধরুন চারশো। প্যাসেঞ্জাররা পালাবার পর এরা বেশিরভাগই ক্রু।'

'নামিয়ে দিন ওদের,' বলল রানা। 'আর কেউ নেই তো?'

'আছে। ক্রুদের অর্ধেক রয়ে গেছে বো-তে।'

'সংখ্যাটা বলতে পারেন?'

'আরও সাড়ে চারশো।' গোয়েন এক মুহূর্ত পর জানতে চাইল, 'আপনার নামটা জানতে পারি, সার?'

'মাসুদ রানা, নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর। আপনি?'

'নিক গোয়েন, সেকেন্ড অফিসার।'

'আপনার ক্যাপটেন কোথায়?'

'তিনি নিখোঁজ,' জবাব দিল গোয়েন। 'ধারণা করা হচ্ছে মারা গেছেন।'

'ঠিক আছে, আপনার জন্যে গরম কফি নিয়ে অপেক্ষা করছি আমরা–,' চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেয়ে ঝট করে ঘুরল রানা, বুলহর্ন ছেড়ে দিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে লাইনে আটকানো ক্রেডল থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল ছোট্ট এক মেয়েকে, তুলে দিল বাড়ানো জিনা ক্যারল-এর হাতে। ক্যারল সী রবিনের তিন মেরিন বায়োলজিস্টের একজন। মা ও বাবাও পরবর্তী দুই ক্রেডলে চড়ে জাহাজে উঠলেন, নিজেদের বাচ্চাকে নিয়ে গাইডের সঙ্গে নিচে চলে গেলেন তাঁরা। এক মুহূর্ত পর দেখা গেল লোকজনকে পানি থেকে ওঅর্ক ডেকে তুলছে রানা, এতই ক্লান্ত যে নিজেরা তারা রেসকিউ বোটে উঠতে পারছে না। 'ঘুরে ক্রুজ শিপের পোর্ট সাইডে চলে যাও,' বোটের হেলমস্‌ম্যানকে নির্দেশ দিল ও। 'চেষ্টা করে দেখো স্রোতে ভেসে যাওয়া লোকজনকে তুলতে পারো কিনা।'

কচি গলার তীক্ষ্ণ চিৎকারটা যেন ওর দু'পায়ের মাঝখান থেকে ভেসে এল। রেইলের দিকে ছুটে এসে নিচে তাকাল রানা। আট বছরের একটা ছেলে, জাহাজের গায়ে লেগে থাকা একটা রশি ধরে ঝুলছে। যেভাবেই হোক জাহাজে ওঠার পর কিনারা থেকে পড়ে গেছে, ব্যস্ত ছুটোছুটি আর চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে ব্যাপারটা কেউ খেয়াল করেনি। একটা ঢেউ এসে ছেলেটাকে ওপর দিকে তুলল, নাগালের মধ্যে পেয়ে তাকে ধরে ডেকে নিয়ে এল রানা। জানা গেল মা-বাবা ও এক বোনের সঙ্গে জাহাজে ওঠার সময় পড়ে যায় সে, কিন্তু ঘটনাটা কারও চোখে

পড়েনি। একেও রানার কাছ থেকে চেয়ে নিল জিনা, ছেলেটার হাত ধরে বলল, 'চলো, তোমার মা-বাবাকে খুঁজে বের করি।'

ঠিক সেই মুহূর্তে নীল সবুজ পানিতে কালো চকচকে সিল্কের মত কিছু একটা চোখের কোণে ধরা পড়ল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার পরও জিনিসটা ঠিক চিনতে পারছে না রানা। তারপর একটা হাত দেখা গেল, যেন স্লো-মোশনে পানিতে আছাড় খাচ্ছে। ডেক ধরে বিশ ফুট ছুটে এল রানা ভাল করে দেখার জন্যে, ধারণা করছে কালো চকচকে সিল্ক আসলে কোন মেয়ের চুল। পানির ওপর মাথাটা সামান্য একটু তুলল–হ্যাঁ, একটা মেয়েই; তার আচ্ছন্ন কালো চোখ দেখতে পেল রানা। এই মুহূর্তে অপ্রাসঙ্গিক, তবু ওর মনে হলো এত সুন্দর চোখ খুব কমই দেখা যায়, এবং এই চোখ কোথায় যেন আগেও দেখেছে।

'তোলো ওকে!' হাত তুলে রেসকিউ বোটের হেলম্‌স্‌ম্যানকে বলল রানা। কিন্তু বোট ঘুরে এরইমধ্যে ওয়াটার লিলির স্টার্ন অর্ধেকটা পার হয়ে গেছে, ওর কথা হেলম্‌স্‌ম্যান শুনতেই পেল না। 'আমার দিকে সাঁতরান!' মেয়েটার উদ্দেশে চিৎকার করল, তারপর খেয়াল করল এদিকে তাকালেও ওকে সে দেখতে পাচ্ছে না।

মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে রেইলিঙের ওপর উঠে দাঁড়াল রানা, ভারসাম্য ঠিক করতে এক মুহূর্ত সময় নিল, তারপর ডাইভ দিল সাগরে। তখনি পানির ওপর মাথা না তুলে ডুব সাঁতার দিয়ে এগোল ও। বিশ ফুট এভাবে সাঁতরে মেয়েটার পাশে মাথা তুলল, পানিতে ডুবে থাকা মেয়েটার মুখ উঁচু করার সময় দেখল বুকের সঙ্গে এক হাত দিয়ে একটা লেদার ব্যাগ চেপে ধরে আছে সে।

'পাগল নাকি!' প্রায় ধমকে উঠল রানা। 'ছেড়ে দিন ওটা!'

'না!' মেয়েটার গলায় জেদের সুর রানাকে অবাক করে দিল। 'এটা ছাড়া যাবে না!'

রানা খুশি যে মেয়েটা মারা যাচ্ছে না, তাই ব্যাপারটা নিয়ে কোন তর্ক করল না; তার শরীরে সেঁটে বসা নাইট ড্রেস-এর একটা প্রান্ত ধরে টেনে নিয়ে এল সী রবিনের পাশে। কয়েক জোড়া হাত ওপরে উঠতে সাহায্য করল মেয়েটাকে। রানা উঠল রশির মই বেয়ে। ইতিমধ্যে সী রবিনের এক মেয়ে বিজ্ঞানী কম্বল জড়িয়ে দিয়েছে মেয়েটার গায়ে। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নিচে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে, পিছন থেকে রানা জানতে চাইল, 'ব্রিফকেসটায় কি এমন আছে যে ওটাকে রক্ষা করতে গিয়ে ডুবে মরার ঝুঁকি নিচ্ছিলেন?'

ক্লান্ত চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। 'এতে আছে আমার বাবার সারা জীবনের সাধনার ফল।'

লেদার ব্যাগটার দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাল রানা। 'আপনার বাবাকে উদ্ধার করা হয়েছে কি না জানেন?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল তৃষা, ঘাড় ফিরিয়ে বিষণ্ন দৃষ্টিতে সাগর আর ঢেউগুলোর দিকে তাকাল। ওদিকে অনেক লাশকেই ভাসতে দেখা যাচ্ছে। 'বাবাকে ওখানে ফেলে আসতে হয়েছে,' বিড়বিড় করে বলল সে। তারপর ঘুরে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নেমে গেল।

*

রানার নির্দেশ মত স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া লোকজনকে তোলা হচ্ছে বোটগুলোয়, তাদের মধ্যে শুধু অসুস্থদের সী রবিনের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে, বাকি সবাই থেকে যাচ্ছে বোটেই।

সী রবিনের এঞ্জিন রুম, সায়ান্টিফিক স্টোর রুম, মেস রুম থেকে শুরু করে পাইলটহাউস, চার্ট রুম, রেডিও রুম পর্যন্ত আশ্রিত লোকজনে ভরাট হয়ে গেছে। প্রতিটি প্যাসেজওয়ে ভর্তি। ক্যাপটেন শেফার্ডের কেবিনে আশ্রয় নিয়েছে পাঁচটা পরিবার।

ওয়াটার লিলি থেকে সবার শেষে সী রবিনে এল নিক গোয়েন। তার পোড়া হাতের দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'আমার দুর্ভাগ্য যে সাহসী একজন লোকের সঙ্গে হ্যান্ডশেইক করতে পারছি না।'

'দুঃখটা আপনার চেয়ে আমারই বরং বেশি,' জবাবে বলল গোয়েন। 'কারণ, সাহস যদি কেউ দেখিয়ে থাকে তো সে আমি নই, বরং আপনি। এতগুলো মানুষ কেউ বাঁচত না ঠিক সময়মত আপনি যদি আগুনটা লক্ষ্য করে ছুটে না আসতেন।' সাগরের দিকে তাকাল সে 'দুঃখ এই যে এখনও বো-র দিকে কত লোক ডুবছে জানি না...'

'ওদিকে বোট পাঠানো হয়েছে, যারা বেঁচে আছে তাদের সবাইকে উদ্ধার করা হবে।' তাকে আশ্বস্ত করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল রানা, তারপর ব্রিজ উইং-এ দাঁড়ানো ক্যাপটেন শেফার্ডের উদ্দেশে গলা চড়িয়ে বলল, 'এদিকে আর কেউ নেই, মিস্টার শেফার্ড। আমাদের এখন বো-র দিকে যাওয়া দরকার।'

ব্রিজে ফিরে এসে হেলম্‌স্‌ম্যান টিমোথিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন শেফার্ড। দুটো জাহাজ স্রোতের টানে ভাসছে; ওয়াটার লিলির এঞ্জিন অনেক আগেই থেমে গেছে, সী রবিনের চালু এঞ্জিনগুলোকে অলস বসিয়ে রাখা হয়েছে। ক্যাপটেনের নির্দেশ পেয়ে দিক বদলের জন্যে হেলম্‌স্‌ম্যান টিমোথি এতক্ষণে ওগুলোকে কাজে লাগাল। থ্রাস্টার কন্ট্রোল কনসোল অপারেট করার সময় যথেষ্ট মনোযোগী থাকল সে, কিন্তু আকস্মিক একটা জোরালো দমকা বাতাস এসে তার সমস্ত হিসাব ও আন্দাজ গোলমাল করে দিল। বাতাসের সঙ্গে ঢেউও উঠল স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু হয়ে, ওয়াটার লিলির স্টার্ন অকস্মাৎ প্রায় লাফ দিয়ে ছুটে এসে আঘাত করতে উদ্যত হলো সী রবিনের বো-তে। সাধ্যমত সব রকম চেষ্টা চালিয়ে টিমোথি যখন অবধারিত সংঘর্ষ এড়াতে পেরেছে বলে ধারণা করল ঠিক তখনই আরেকটা দমকা বাতাস—সী রবিনের বো-তে গুঁতো মারল ওয়াটার লিলির স্টার্ন।

প্রচণ্ড ঝাঁকি। সেই সঙ্গে সী রবিনের জনসমুদ্র থেকে একযোগে রোমহর্ষক আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

ধাক্কাটা মারাত্মক হবার সম্ভাবনা কম, তারপরও কনসোলের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়ে টিমোথিকে নিচে পাঠালেন ক্যাপটেন শেফার্ড ক্ষতির পরিমাণ দেখে আসার জন্যে।

রিপোর্ট এল দু'জায়গা থেকে। চীফ এঞ্জিনিয়ার ফ্রাঙ্ক গার্ডনার এঞ্জিন রুম

থেকে জানালেন, তাঁর ধারণা সামনের দিকে জাহাজের কাঠামোয় কোথাও ক্ষতি হয়েছে, সম্ভবত কোন একটা স্টোর রুমে। এঞ্জিন রুমে পানি ঢুকছে, মেইন পাম্প চালু করে পানি সরাবার কাজও তিনি শুরু করে দিয়েছেন।

পাইলটহাউসে ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে টিমোথি রিপোর্ট করল, 'বেশ কয়েকটা প্লেট ভেঙে গেছে, তুবড়ে যাওয়ায় ফাটলও সৃষ্টি হয়েছে। পানি ঢোকার গতি খুব বেশি, পাম্প তারচেয়েও দ্রুত বের করে দিচ্ছে কিন্তু ফাটল আরও চওড়া হলে পরিস্থিতি সামাল দেয়া যাবে না। ঢেউ আট ফুট উঁচু হলে আমাদের কোন আশা নেই।'

'ড্যামেজ-কন্ট্রোল ক্রুদের কাজে লাগিয়ে দাও খোলে,' নির্দেশ দিলেন শেফার্ড। 'ক্ষতিগ্রস্ত প্লেট যতটা পারা যায় মেরামত করতে বলো। খারাপ বা ভাল, পরিস্থিতির যে-কোন পরিবর্তন সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করবে আমাকে।'

'ইয়েস, সার।' টিমোথি আবার বেরিয়ে গেল ব্রিজ থেকে।

কমপিউটরে চোখ, ক্যাপটেন শেফার্ড রানাকে বললেন, 'ঝড়টা আঘাত করবে আর দু'ঘণ্টা পর।' বাইরের আলোকিত আকাশে তাকালেন; ঘন কালো মেঘের স্তর খুব বেশি হলে দশ মাইল দূরে। 'সী রবিনকে ভাসিয়ে রাখার কোন উপায় আমার অন্তত জানা নেই।'

শার্টের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল রানা। 'লোকজন যা তোলা হয়েছে, আমার হিসেবে একশো বিশ টন অতিরিক্ত বোঝা বহন করছে সী রবিন,' বলল ও। 'বাঁচার উপায় আমাদের একটাই–যতক্ষণ দরকার ভেসে থেকে অন্য কোন জাহাজে মানুষগুলোকে তুলে দেয়া।' একটু থেমে জানতে চাইল, 'আমাদের, মানে বাংলাদেশের কোন পোর্টে পৌঁছানো সম্ভব নয়?'

গম্ভীর, মাথা নাড়লেন শেফার্ড। 'এরকম ডুবুডুবু অবস্থায় এক মাইলও এগোতে পারব না, তার আগেই জাহাজ ডুবে যাবে।'

'ভারতীয় কন্টেইনার শিপ আর উত্তর কোরিয়ার মিসাইল ফ্রিগেট-এর খবর কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রেডার রিপোর্ট বলছে ফ্লাইং কার্পেট আর মাত্র দশ মাইল দূরে। উত্তর কোরিয়ার ফ্রিগেট ফুলস্পীডে আসছে, তবে এখনও ত্রিশ মাইল পেরুতে হবে ওটাকে।'

'ওদেরকে আরও তাড়াতাড়ি আসতে বলুন,' ভারী গলায় বলল রানা। 'ঝড়টা যদি ওদের আগে পৌঁছায়, ওরা এসে উদ্ধার করার মত কাউকে নাও পেতে পারে।'

চার

ওয়াটার লিলির ভেতরটা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে–বাল্কহেড কাত হয়ে পড়ছে আরেক বাল্কহেডে, ডেক ধসে পড়ছে আরেক ডেকে। আগুন লাগানোর দু'ঘণ্টারও কম

সময়ের মধ্যে জাহাজটার বিলাসবহুল ও উঁচুমানের শিল্প সমৃদ্ধ ভেতরটা নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ভেতরের সুপারস্ট্রাকচার নারকীয় অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিল। শপিং অ্যাভিনিউ-এর সারি সারি দোকান, আটাত্তর মিলিয়ন ডলার মূল্যের আর্ট কালেকশন, প্রশস্ত ক্যাসিনো, সুদৃশ্য ডাইনিং রুম আর লাউঞ্জ, বিলাসবহুল স্টেট রুম, স্পোর্টস ফ্যাসিলিটিজ, সবই ধূমায়িত ছাইয়ে পরিণত হয়েছে। সী রবিনের খোলা ডেকে যারা ভিড় করেছে তাদের কারও চোখে যেন পলক পড়ছে না, এমন কি কাজের লোকেরাও কাজ ফেলে অবাক বিস্ময় এবং শোক মেশানো অনুভূতি নিয়ে তাকিয়ে আছে ওয়াটার লিলির দিকে। ক্যাপটেন শেফার্ড অত্যন্ত সাবধানে তাঁর জাহাজকে ওয়াটার লিলির বো-র দিকে সরিয়ে আনছেন।

ওয়াটার লিলির আগুন বৃত্তাকার সুপারস্ট্রাকচার গিলে ফেলেছে। জাহাজের মাঝখানে এমন আর কিছু অবশিষ্ট নেই যাতে আগুন ধরা বাকি। হঠাৎ জাহাজের গভীরে কোথাও বিস্ফোরণ ঘটল, সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল নতুন কিছু শিখা। ওয়াটার লিলি নির্যাতিত একটা পশুর মত কাঁপছে। অথচ এখনও যেন ডুবে যেতে রাজি নয় সে, ঢেউ-এর তলা থেকে প্রতিবার ঠিকই উঠে আসছে। একটু পরই শূন্য একটা ইস্পাতের খোলে পরিণত হবে ওটা। আগুন নেভার পরও যদি ভেসে থাকে, কোন শিপইয়ার্ডে টেনে নিয়ে গিয়ে ভাঙা হবে ওটাকে।

বিষণ্ণ, সর্বনাশা আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে রানা; ওর পাশে এসে দাঁড়াল ওয়াটার লিলির সেকেন্ড অফিসার নিক গোয়েন। তার মুখে কোন কথা নেই, তাকিয়ে আছে সী রবিনের পিছু নেয়া এক ঝাঁক বোটের দিকে–প্রতিটি ওয়াটার লিলির প্যাসেঞ্জারে ঠাসা।

'আপনার হাতের কি অবস্থা?' জানতে চাইল রানা।

সাদা ব্যান্ডিজের ওপর চোখ রেখে গোয়েন বলল, 'বাথরুমে যাবার কথা ভাবলেই ভয় লাগছে।'

মৃদু একটু হাসল রানা।

চোখ ছল ছল করছে, ওয়াটার লিলির দিকে তাকাতে নিজেকে বাধ্য করল গোয়েন। 'এরকম একটা ঘটনা···উচিত হলো না, একদমই উচিত হলো না।' আবেগে শুধু গলা নয়, তার শরীরও কাঁপছে।

'আপনার কি ধারণা? কিভাবে ঘটল?'

ভাসমান অগ্নিকুণ্ড থেকে চোখ সারিয়ে এনে রানার দিকে তাকাল গোয়েন। 'আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে এটা কোন দুর্ঘটনা নয়।'

'বলতে চাইছেন কোন টেরোরিস্টদের কাজ?' রানার গলায় অবিশ্বাস।

'আমার মনে অন্তত কোন সন্দেহ নেই। দুর্ঘটনা হলে আগুনটা এত দ্রুত ছড়াল কিভাবে? কোন অটোমেটেড্ ফায়ার-ওয়ার্নিং বা ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম কাজ করেনি কেন? তারপর যখন ম্যানুয়ালি এনগেজ করা হলো, তখনও ওগুলো কাজ করল না।'

ছোট্ট করে শিস দিল রানা।

'আমাকে যেটা বিস্মিত করেছে, আপনাদের ক্যাপটেন ডিসট্রেস সিগন্যাল পাঠাতে ব্যর্থ হলেন কেন। আমরা এগিয়ে আসি আকাশের গায়ে লাল আভা

দেখে। রেডিও সিগন্যালও পাঠাই, কিন্তু আপনারা জবাব দেননি।'

'এরজন্যে দায়ী আমাদের ফার্স্ট অফিসার এরিক বার্কম্যান। সিদ্ধান্ত নিতে একের পর এক ব্যর্থ হন তিনি। আমি যখন ডিসট্রেস সিগন্যাল পাঠাবার নির্দেশ দিই তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে–রেডিও রুম ততক্ষণে পুড়ে ছাই।'

ওয়াটার লিলির উঁচু বো-র দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'ওখানে বেশ কিছু লোকজন দেখা যাচ্ছে।'

ক্রুজ শিপের ফোরডেক থেকে হাত নেড়ে সী রবিনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে বহু মানুষ। চোখ ছোট করে সেদিকে তাকিয়ে গোয়েন চলল, 'বেশিরভাগই ক্রু, প্যাসেঞ্জার খুব কম। আগুনটা উল্টোদিকে যাচ্ছে, ধরে নিতে পারি আরও কিছুক্ষণ নিরাপদে ওখানে থাকতে পারবে ওরা।'

পাইলটহাউস থেকে বেরিয়ে এসে ক্যাপটেন শেফার্ড বললেন, 'সত্যি উপায় নেই, থাকলে ওদেরকেও আমরা সী রবিনে তুলে নিতাম।'

কান্না চেপে মাথা নিচু করল গোয়েন। 'আমি জানি।'

'তবে, মিস্টার শেফার্ড,' বলল রানা, 'ঝড় আসার আগে আমরা একটা কাজ করতে পারি। সী রবিনকে ঘুরিয়ে এমন একটা পয়েন্টে দাঁড় করান, টানা বাতাস যেন ওদেরকে না লাগে। সী রবিন নিজেও স্রোতের দিকে মুখ করে থাকবে, ঢেউগলো যাতে স্টার্নে আঘাত করে, ফলে বো-র ফাটল দিয়ে খুব বেশি পানি ঢোকার ভয়টাও থাকবে না।'

'সত্যি চমৎকার একটা পরামর্শ।' মাথা ঝাঁকালেন শেফার্ড। 'ভাবছি আমাদের বোটগুলোকে স্টার্নের সঙ্গে বেঁধে রাখি। যদি দেখি ঝড় ওগুলোকে ডুবিয়ে দিতে চাইছে, প্যাসেঞ্জারদের জাহাজে তুলে নিতে পারব। তারপর? তারপর যা থাকে কপালে!'

সূর্য আগেই আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়েছে, সমস্ত নীলও ঢাকা পড়ে গেছে ঘন কালো দ্রুতগতি মেঘে; ঝড় শুরু হলো তুমুল বর্ষণের সঙ্গে, দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে না গেলেও ওয়াটার লিলির উঁচু বো সী রবিনের খোলা ডেক থেকে অস্পষ্ট আর ঝাপসা দেখাচ্ছে। ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে নেভা তো দূরের কথা, ক্রুজ শিপের আগুন আরও যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

সী রবিনের অবস্থা ভাল নয়, তীব্র বাতাস আর বিশাল আকারের ঢেউ ডোবাবার আগে জাহাজটাকে নিয়ে যেন খেলছে।

'ওয়াটার লিলিতে যারা রয়েছে তাদের কারও কাছে রেডিও নেই?' গোয়েনকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'অফিসার সবার কাছে একটা করে পোর্টেবল রেডিও থাকে।'

'ফ্রিকোয়েন্সী?'

'টোয়েনটি-টু।'

রেডিওটা মুখের কাছাকাছি ধরে ওয়াটার লিলির যে-কোন অফিসারকে ডাকছে রানা। তিনবারের বার সাড়া পাওয়া গেল।

'শুনতে পাচ্ছি, সী রবিন। তবে অস্পষ্ট।'

চোখে একটু অবিশ্বাস ও বিস্ময়, গোয়েনের দিকে তাকাল রানা। 'ইনি একজন মহিলা।'

'গলার আওয়াজটা মনে হচ্ছে আমাদের চীফ পারসার লিয়া লিমন-এর,' বলল গোয়েন।

'আমি কি লিয়া লিমনের সঙ্গে কথা বলছি?' মাউথপীসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। আপনি আমার নাম জানলেন কিভাবে?'

'আপনার সেকেন্ড অফিসার আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

'নিক গোয়েন? আল্লাহ মেহেরবান! আমি তো ধরে নিয়েছিলাম উনি মারা গেছেন।'

সী রবিনের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল রানা। সাড়ে চারশো কেন, দশজন লোককেও নেয়া যাবে না। কাজেই ওয়াটার লিলির বো থেকে কেউ যেন লাফিয়ে না পড়ে। হ্যাঁ, সী রবিনের বোটগুলোও লোকে ভর্তি হয়ে আছে। তবে হতাশ হবারও কিছু নেই, কারণ ভারতীয় কন্টেইনার শিপ ফ্লাইং কার্পেট আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এক পর্যায়ে রানার নাম জানতে চাইল লিয়া লিমন। তারপর বলল, 'দিলেন দুঃসংবাদ, অথচ শুনে মনে হলো সুসংবাদ–যদি দেখা হয় জানতে চাইব এই আর্ট আপনি শিখলেন কোত্থেকে।'

বৃষ্টি পড়ছে নিশ্ছিদ্র দেয়ালের মত, তাসত্ত্বেও ওয়াটার লিলি এখনও পুড়ছে। জাহাজটার পাশগুলো টকটকে লাল হয়ে আছে, দাউ দাউ আগুনকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল বিশাল মেঘ আকৃতির বাষ্প।

রানার পরামর্শ অনুসারে নির্দিষ্ট একটা পজিশনে আনা হয়েছে সী রবিনকে, এখানে ঝড় ঠেকানোর উপযোগী একটা আড়াল হিসেবে কাজ করবে ওটা, ওয়াটার লিলির বোতে আশ্রয় নেয়া লোকজন যাতে ধকলটা সামলে উঠতে পারে।

রানার চোখে বিনকিউলার, ওর দিকে ফিরে ক্যাপটেন শেফার্ড জানতে চাইলেন, 'উত্তর কোরিয়ান ফ্রিগেটের কোন আভাস পাচ্ছেন?'

'বৃষ্টির জন্যে বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না। তবে রেডার-এ দেখছি কন্টেইনার শিপ এক হাজার গজের মধ্যে চলে এসেছে।' একটা রুমাল বের করে গলা আর ভুরুর ঘাম মুছল রানা।

ফ্লাইং কার্পেটের ক্যাপটেন নিখিল শ্রীবাস্তব ব্রিজ কাউন্টারে পা তুলে দিয়ে রেডার-এর দিকে তাকিয়ে আছেন। এমনিতে হাসিখুশি মানুষ, কিন্তু ডিসট্রেস কল পাবার পর গম্ভীর ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, ভাবছেন না জানি কি মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হতে হয়।

'ওই!' ফার্স্ট অফিসার সানি ওবরয় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, ব্রিজ উইন্ডশীল্ড-এর দিকে হাত তুলে স্টারবোর্ড বো-র সামনেটা দেখাচ্ছে। বৃষ্টির দেয়ালে মুহূর্তের জন্যে ফাটল সৃষ্টি হলো, তার ভেতর ক্ষণিকের জন্যে দেখা গেল ধোঁয়া ও বাষ্পে মোড়া জ্বলন্ত ক্রুজ শিপ।

শিউরে উঠলেন ক্যাপটেন শ্রীবাস্তব। 'ক্ষতির পরিমাণ কল্পনা করতেও ভয় পাচ্ছি।'

'সার, আমি তো কোন আমেরিকান সার্ভে শিপ দেখছি না।'

'বোট রেডি রাখো,' নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন শ্রীবাস্তব। ঝড়ের তীব্রতা বাড়তে শুরু করেছে, ঢেউ ক্রমশ উঁচু হচ্ছে আরও, তবে ফ্লাইং কার্পেট এত বড় জাহাজ যে সে যেন কিছু টেরই পাচ্ছে না। জ্বলন্ত ওয়াটার লিলিকে ঘিরে চক্কর দেয়ার সময় সবুজ হরফে লেখা নামটা দেখতে পেলেন তিনি–সী রবিন। বঙ্গোপসাগরে আসা-যাওয়ার পথে নুমার এই সার্ভে ভেসেলকে আগেও দেখেছেন, এবার দেখে আঁতকে ওঠার সেটাই কারণ। সাগরে একটা মনোহর সাদা রাজহাঁস ওটা। কিন্তু এই মুহূর্তে একটা ঝড়ো কাক যেন, ডুবে যাচ্ছে। 'হে ভগবান! ওটা তো ডুবল বলে!'

রেডিও অপারেটর রেডিও রুম থেকে উঁকি দিল। 'সার, মার্কিন জাহাজ থেকে কেউ যোগাযোগ করছেন।'

'স্পীকারে সংযোগ দাও।'

'কন্টেইনার শিপের ক্যাপটেন ও ক্রুদের অভিনন্দন,' অ্যামপ্লিফায়ার থেকে ভেসে এল পরিশীলিত কণ্ঠস্বর। 'আপনাদের দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।'

'ক্যাপটেন নিখিল শ্রীবাস্তব বলছি। কার সঙ্গে কথা হচ্ছে, সার্ভে শিপের ক্যাপটেন?'

'না, ক্যাপটেন ফ্রান্সিস শেফার্ড এঞ্জিন রুমে গেছেন জাহাজে কি হারে পানি ঢুকছে দেখার জন্যে।' নিজের পরিচয় দিয়ে সী রবিনের বিপদ আর ওয়াটার লিলির বো-তে আটকা পড়া লোকজনের অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা দিল রানা।

শ্রীবাস্তব জানতে চাইলেন, 'কতজনকে উদ্ধার করেছেন আপনারা?'

'প্রায় উনিশশো,' জানাল রানা। 'আরও একশো আছে বোটগুলোয়।'

'ভগবান!' আঁতকে উঠলেন শ্রীবাস্তব। 'আমরা বোট পাঠাচ্ছি, ওদেরকে পাঠাতে শুরু করুন। জাহাজ হালকা হতে শুরু করলে ওয়াটার লিলির বো-তে আটকা লোকজনকে আপনারা উদ্ধার করবেন।'

'বিশ্বাস করুন, মিস্টার শ্রীবাস্তব, আপনারা নির্ভেজাল আশীর্বাদ হয়ে হাজির হয়েছেন...'

'তবে এই উদ্ধার কাজের বিনিময়ে আমরা একটা ফি নেব,' শ্রীবাস্তব বললেন। 'স্যালভিজ অপারেশন-এর আন্তর্জাতিক রেট অনুসারে।'

মনে মনে একটা ধাক্কা খেলেও নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিল রানা। ফি দিতে হবে ওয়াটার লিলির কোম্পানিকে, কাজেই এ নিয়ে ওর মাথা না ঘামালেও চলে। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, সেটা আপনাদের ব্যাপার,' বলল ও। 'তবে আমরা এই কাজটা এমনিই করছি, কিছু পাবার আশায় নয়।'

সী রবিনের একটা স্টোর রুমের ডেকে বসে রয়েছে তৃষা, ভাঁজ করা হাঁটু দুটোর মাঝখানে চিবুক ঠেকে আছে। তার এখনকার অনুভূতি নিজের কাছেই অপরিচিত, সম্পূর্ণ নতুন; যেন একটা কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর রয়েছে সে, সময় এখানে

ধরাছোঁয়ার বাইরে। ছোট্ট কমপার্টমেন্টের ভেতর আশ্রিতদের সংখ্যা এত বেশি যে শুধু মেয়েরা বসতে পেরেছে, পুরুষরা সবাই দাঁড়িয়ে। মাথায় হাত রেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেও ওর প্রতি কারও কোন মনোযোগ নেই। বাবার মৃত্যু শোক ও বেদনার ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়ছে তার গোটা অস্তিত্বে।

ঘটনাটা কেন ঘটল? লালচুলো লোকটা কে, কেনইবা সে বাবার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিল? আর নিগ্রো অফিসারটা? শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডাকে বাধা না দিয়ে তাকে বরং সাহায্য করল কেন? তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাবার কাছ থেকে লেদার কেসটা কেড়ে নেয়া। হাঁটু থেকে মুখ তুলে ব্যাগটার দিকে তাকাল সে। এখনও ওটা নিজের বুকের সঙ্গে চেপে রেখেছে। লেদারের গায়ে লবণের দাগ পড়েছে। ভাবল, কি এমন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে এটার ভেতর যার জন্যে বাবাকে প্রাণ হারাতে হলো?

ক্লান্তির সঙ্গে যুদ্ধ করছে তৃষা, যুদ্ধ করছে ঘুমের সঙ্গে; মনে ভয়, ঘুমিয়ে পড়লে বা একটু অসতর্ক হলে লালচুলো গুণ্ডাটা এসে লেদার ব্যাগটা ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু মানুষের গায়ের গরম ভেজা শরীরে আরাম এনে দিচ্ছে, এত লোকের ভিড় মনে জাগিয়ে তুলছে নিরাপত্তার ভাব, একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল তৃষা।

ঘুম ভাঙল হঠাৎ, এখনও ডেকে বসে, পিঠ ঠেকে আছে একটা লকারে–কিন্তু কি আশ্চর্য, স্টোর রুম খালি! কামরা ভর্তি লোক কে জানে কখন চলে গেছে। রয়েছে মাত্র একটা মেয়ে। তৃষা তাকে চিনতে পারল। এই মেয়েটা নিজের পরিচয় দিয়েছিল, মেরিন বায়োলজিস্ট। ঝুঁকে তৃষার কপাল থেকে আঙুলের নরম ছোঁয়া দিয়ে চুল সরাচ্ছে, তৃষা যেন ছোট্ট এক খুকি। মেয়েটার চোখ-মুখে রাজ্যের ক্লান্তি, কিন্তু তারপরও সহানুভূতি জানিয়ে হাসল 'এবার তো যেতে হয়,' নরম সুরে বলল সে। 'একটা ভারতীয় কন্টেইনার শিপ এসেছে, সবাইকে আমরা ওটায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই আমার। বিশেষ করে যে ভদ্রলোক আমাকে পানি থেকে তুলে বাঁচালেন...'

'জানি না কার কথা বলছেন আপনি,' মৃদু হেসে বলল মেয়েটা, কপাল থেকে সোনালি চুল সরাল।

তার নীল চোখে চোখ রেখে তৃষা জানতে চাইল, 'আমি কি এই জাহাজে থাকতে পারি না?'

'দুঃখিত, ভাই, তা সম্ভব নয়। জাহাজে পানি ঢুকছে, ঝড় থামার আগেই হয়তো ডুবে যাবে।' তৃষাকে ধরে দাঁড়াতে সাহায্য করল মেরিন বায়োলজিস্ট। 'তাড়াতাড়ি করুন, তা না হলে কিন্তু বোট মিস করবেন।' স্টোর রুম ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে, প্যাসেজ থেকে আরও লোকজনকে ওপরের ডেকে তুলতে হবে তার, সেখান থেকেই ভারতীয় জাহাজ ফ্লাইং কার্পেটের পাঠানো বোটে উঠবে সবাই।

সারা শরীরে ব্যথা, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে তৃষার। ধীর পায়ে, সাবধানে এগোচ্ছে। দরজার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় দীর্ঘদেহী এক লোক তাকে

দাঁড় করাল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল তৃষা, মুখ তুলে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠে পিছিয়ে এল এক পা। এ সেই লালচুলো লোকটা, ক্রুজ শিপ ওয়াটার লিলিতে বাবার সঙ্গে যে ধস্তাধস্তি করেছিল। চৌকাঠ পেরিয়ে স্টোর রুমে ঢুকল সে, তারপর ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিল কবাট।

'কি চান আপনি?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল তৃষা।

'তোমার বাবার ব্রিফকেসটা,' লোকটা শান্ত, গলার সুর ঠাণ্ডা ও ভারী। 'দিলে তোমার কোন ক্ষতিই হবে না। না দিলে আমি তোমাকে খুন করতে বাধ্য হব।'

লোকটার চোখে নিষ্ঠুরতা দেখতে পাচ্ছে তৃষা। আচরণে আরও কি যেন একটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সেটা ধরেও ফেলল তৃষা। লেদার ব্যাগটা পেলেও লোকটা তাকে খুন করবে। 'বাবার কাগজ-পত্র? ওগুলোর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?'

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'আমি ভাড়াটে লোক। আমার কাজ ওই ব্যাগ আর ব্যাগের ভেতরের জিনিসগুলো ডেলিভারি দেয়া। ব্যস।'

'ডেলিভারি···কাকে?'

'এত প্রশ্ন করবে না!' লোকটা ধৈর্য হারাচ্ছে।

'আপনি সত্যি আমাকে খুন করবেন?' জিজ্ঞেস করল তৃষা, আসলে সময় নিচ্ছে। ভাবছে ঘরে কেউ ঢুকলে সাহায্য চাইতে পারবে। 'কিভাবে? গুলি করবেন?'

'পিস্তল বা ছুরি, এ-সব আমি ব্যবহার করি না।' প্রকাণ্ড ও লোমশ হাত দুটো তুলে দেখাল লালচুলো আততায়ী, দাঁত বের করে হাসল। 'আমার জন্যে এ-দুটোই যথেষ্ট।'

আতংকে নীল, পিছু হটছে তৃষা। এগোবার সময় দাঁত বের করে রাখল লোকটা। তার গোঁফ জোড়াও লালচে। চোখে পশুসুলভ হিংস্র উল্লাস, জানে অসহায় শিকারকে কোণঠাসা করে ফেলেছে।

তৃষার আতংক যত বাড়ছে ততই বাড়ছে বাঁচার আকুলতা। হৃৎপিণ্ড যেন হাতুড়ির বাড়ি মারছে পাঁজরে। ফোঁস-ফোঁস শব্দে হাঁপাচ্ছে সে। শরীরের নিচের অংশ এত দুর্বল যে অসাড় লাগছে, পা দুটো ঠক-ঠক করে কাঁপতে শুরু করল। লম্বা কালো চুল মুখ প্রায় ঢেকে ফেলেছে। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল।

লোকটা হাত বাড়াল। তার হাত যেন বাঘের থাবা। সেই থাবার স্পর্শ পেতেই এমন তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল তৃষা যে ইস্পাতের বাল্কহেড সহ হোল্ড কমপার্টমেন্টে আওয়াজটা ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল। শরীর মোচড় দিয়ে নিজেকে লোকটার হাত থেকে ছাড়াল সে, ঘুরে পালাবার পথ খুঁজছে। লোকটার হাসিতে এতটুকু শব্দ নেই, তার শান্ত অথচ হিংস্র ভাব দেখে মনে হলো তৃষাকে নিয়ে খেলছে, আঘাতের পর আঘাত করে ধীরে ধীরে মারবে বলে ইচ্ছে করে ছেড়ে দিয়েছে। ঘটলও তাই। তৃষার গলায় হাত দিয়ে একটু চাপ দিল লোকটা, একটা চড় কষল, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে আরেক চড় মারল, তারপর আবার তাকে সরে যাবারও সুযোগ করে দিল।

লোকটার কৌশল আর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তৃষার ইচ্ছে হলো বাঁচার আশা

ছেড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। শরীরটা থরথর করে কাঁপতে লাগল, কামরার এক কোণে ঢলে পড়ল সে।

লোকটা আবার এগিয়ে আসছে। তৃষার কিছুই করার নেই। এমন কি চিৎকার করার সাহস ও শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে সে। লোকটা আসছে। তৃষা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে।

লোকটা ঝুঁকল। অনায়াস ভঙ্গিতে দু'হাতে ধরে তুলল তৃষাকে। ঠাণ্ডা, রক্তপিপাসু দৃষ্টিতে এখন চকচক করছে লোভ। যেন স্লো মোশন-এ তৃষার ঠোঁটে মুখ নামাল সে। বন্ধ চোখ বিস্ফোরিত হয়ে খুলে গেল, সেই সঙ্গে চেঁচাবার জন্যে মুখ খুলল তৃষা–চিৎকার নয়, তার বদলে ফোঁপানোর আওয়াজ বেরুল শুধু।

তৃষাকে ডেকে নামিয়ে দিয়ে আবার পিছু হটল লোকটা। দাঁত বের করা হাসিটা যেন তার ট্রেড মার্ক। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' বলল সে, 'যত খুশি চিৎকার করতে পারো। বাইরে তুমুল ঝড়, কেউ তোমার চিৎকার শুনতে পাবে না। এরকম মজা লোটার সময় মেয়েরা চিৎকার করলে আরও ভাল লাগে আমার। তোমার ওই সুন্দর চোখে ভয় দেখে আমার উত্তেজনা হচ্ছে।'

আবার এগিয়ে এসে তৃষাকে দু'হাত দিয়ে ধরে বুকে তুলে নিল লোকটা। ভাবটা এমন, তৃষা যেন তুলোর পুতুল। বাঙ্কহেডে থাকয়ে ফেলে তাকে চেপে ধরল, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাত দিয়ে আদর করার ছলে আঘাত করছে।

ফুঁপিয়ে উঠে তৃষা শুধু বলতে পারল, 'প্লীজ, আমাকে বরং মেরে ফেলুন!'

লোকটার প্রকাণ্ড হাত তৃষার গলাটা চেপে ধরল। 'ঠিক আছে, তবে তাই হোক,' বলল সে, 'মৃত্যু হবে দ্রুত এবং যন্ত্রণাবিহীন।'

'না! প্লীজ, না!' ধস্তাধস্তি শুরু করল তৃষা। কিন্তু বৃথাই। এ লোকের শরীরে পাঁচজন মানুষের শক্তি, তৃষা তার সঙ্গে পারবে কিভাবে।

হঠাৎ একটা গলা শোনা গেল। 'এ তো দেখছি কুত্তারও অধম!'

লালচুলো খুনী তৃষার গলা ছেড়ে শিকারী বিড়ালের মত ক্ষিপ্র বেগে ঘুরল। ছায়ায় ঢাকা একটা মূর্তি সদ্য খোলা দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে, একটা হাত কবাটের কিনারায়, পিছনের প্যাসেজওয়েতে আলো থাকায় মুখটা দেখা যাচ্ছে না। ঝট করে মার্শাল আর্ট-এর একটা পজিশন নিল খুনী, শূন্যে বাঁকা হলো হাত দুটো, একটা পা চালাল আগন্তুককে লক্ষ্য করে।

তৃষার চিৎকার শুনতে পেয়ে শুধু ঠেলে রাখা দরজার কবাট ফাঁক করে ওখানেই এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ছিল রানা পরিস্থিতিটা বোঝার জন্যে। বিপদের গুরুত্ব বুঝতে দেরি হয়নি ওর। বুঝতে পারে অন্য কারও সাহায্য চাওয়ার সময় নেই। দেখামাত্র পরিষ্কার হয়ে গেছে, এ লোক শুধু জাতখুনী নয়, খুন করে মজা পায়। রানা এ-ও ভাবল, অসহায় একটা মেয়েকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে চাওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই বড় কোন কারণ আছে। জানে আক্রমণ আসবে, নিজেকে সেজন্যে তৈরি রাখল।

চোখ ধাঁধানো একটা ঘূর্ণির মত মোচড় খেয়ে প্যাসেজওয়েতে বেরিয়ে এল রানা, অনুভব করল এইমাত্র যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেই জায়গার ওপর দিয়ে ছুটে গেল শত্রুর বিদ্যুৎগতি পা। আঘাতটা লাগলে ওর খুলি নির্ঘাত গুঁড়িয়ে যেত।

টার্গেট মিস করায় লাথিটা লাগল চৌকাঠে, লোকটার গোড়ালির হাড় ভাঙার শব্দটা সবাই ওরা শুনতে পেল।

অন্য কোন লোক হলে যন্ত্রণায় ছটফট করত। কিন্তু এই লোক সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া। শরীরটা ইস্পাত-কঠিন পেশির সমষ্টিই শুধু নয়, যে-কোন ব্যথাকে অগ্রাহ্য করার ট্রেনিংও তার নেয়া আছে। প্যাসেজওয়ে-এর এদিকওদিক তাকিয়ে প্রথমে সে নিশ্চিত হয়ে নিল যে আশপাশে প্রতিপক্ষকে সাহায্য করার মত কেউ নেই। তারপর এগোল সে, হাত ও পা মার্শাল আর্ট-এর পরিচিত ভঙ্গিতে, একটা বিশেষ ছন্দে নড়াচড়া করছে। শিকারকে লক্ষ্য করে লাফটা দিল অকস্মাৎ, হাত দুটো যেন কুড়াল হানছে বাতাসে।

রানা দাঁড়িয়ে আছে যেন ভয়ে পাথর, এই অভিনয়ে স্থির থাকল একেবারে শেষ মাইক্রোসেকেন্ড পর্যন্ত। তারপরই খসে পড়ল মেঝেতে, নিজেকে শত্রুর দিকে গড়িয়ে দিয়েছে। শত্রুর গতিই তার জন্যে কাল হলো। ভারসাম্য হারিয়ে রানাকে ছাড়িয়ে, ওর ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে সে। খুলির একটা গুঁতো দিয়ে তার গতি আরও বাড়িয়ে দেবার সুযোগটা রানা হাতছাড়া করল না। প্যাসেজওয়ে পার হয়ে উল্টোদিকের বাল্কহেডে ভারী বস্তার মত পড়ল সে, সেখান থেকে খসে ডেকে। চোখের পলকে কুঁড় ওপর চড়াও হলো রানা। শরীরের প্রতি পাউন্ড শক্তি ব্যবহার করে ডেকের সঙ্গে লোকটাকে চেপে ধরে রাখল, একটা হাঁটু গাড়ল অরক্ষিত পিঠে, হাতের সিধে পিঠ দিয়ে কষে চড় মারল দু'কানে বারবার।

লোকটার কানের পর্দা ফেটে গেল, যেন মাথার একদিক থেকে আরেক দিক পর্যন্ত সাইকেলের একটা স্পোক ঢোকানো হয়েছে। খুনীর গলা থেকে ঘর্ঘর ঘর্ঘর করে রোমহর্ষক আওয়াজ বেরুচ্ছে। হড়হড় করে বমিও করল। কিন্তু তারপরই এক ধাক্কায় রানাকে ছুঁড়ে দিল বন্ধ একটা দরজার গায়ে। লোকটার শক্তির আভাস পেয়ে রানাও স্তম্ভিত। উপলব্ধি করল, এ লোক ব্যথা পায় না, কিংবা পেলেও অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা রাখে। প্রায় শুয়ে আছে, এই অবস্থা থেকে দুই পা একসঙ্গে চালাল–লোকটার উরুসন্ধিতে নয়, মারল গোড়ালির ভাঙা হাড়টায়।

এবার কোন রোমহর্ষক শব্দ নয়, পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসা দু'সারি দাঁতের মাঝখান থেকে হিসহিস করে বাতাস বেরুল; রানার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে খেঁকাচ্ছে যেন, টকটকে লাল হয়ে ওঠা চোখে খুনের নেশা চকচক করছে। এবার সত্যিকার অর্থে ব্যথা পেয়েছে সে। তবে এখনও সে-ই আক্রমণকারী, নিজেকে দাঁড় করাতে পারল, আহত পা টেনেটেনে রানার দিকে এগোচ্ছে। কৌশল বদলে পরবর্তী হামলার জন্যে নিজেকে সে তৈরি করছে।

হঠাৎ খুনী লোকটার পিছনে দোরগোড়ায় দেখা গেল তৃষাকে। লেদার ব্যাগটা এমন ভঙ্গিতে ধরে আছে, ওটা যেন তার বুক থেকে গজিয়েছে। রানার দিকে লালচুলো আততায়ীর গভীর মনোযোগ, পিছনে মেয়েটার উপস্থিতি সে টেরই পেল না।

'দৌড়ান!' মেয়েটার নিরাপত্তার কথাই আগে ভাবছে রানা। 'দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে ডেকে পালান!'

লোকটাকে ইতস্তত করতে দেখা গেল, ভাবছে রানা হয়তো সেই প্রাচীন

কৌশল খাটিয়ে তাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছে। তবে সত্যিকার প্রফেশনাল সে, নিজের ভিক্টিমকে খুঁটিয়ে দেখে। রানার চোখের মণিকে ক্ষীণ একটু নড়তে দেখে বন করে ঘুরল। তবে ইতিমধ্যে সিঁড়ি লক্ষ্য করে দৌড়াতে শুরু করেছে তৃষা, ওই সিঁড়ি তাকে খোলা ওঅর্ক ডেকে পৌঁছে দেবে। আসল টার্গেট হাতছাড়া করতে রাজি নয়, লালচুলো তার পিছু নিল–খানিকটা দৌড়াচ্ছে, খানিকটা খোঁড়াচ্ছে, গোড়ালির ভাঙা হাড় থেকে ছড়িয়ে পড়া ব্যথা হজম করছে নীরবে।

ঠিক এটাই আশা করছিল রানা।

এবার ওর হামলা করার পালা। দৌড় দিল, তারপর লাফ। নামল লোকটার চওড়া পিঠে। এ হলো ফুটবল খেলায় প্রচলিত নিষ্ঠুর একটা ট্যাকল্, দুটো শরীরের শক্তি কাজে লাগিয়ে পিছন থেকে রানারকে ফেলে দেয়া; লোকটার গায়ে নিজের সবটুকু ওজন তো চাপালই রানা, সেই সঙ্গে তার মুখ আর মাথা ঠুকে দিল ডেকে।

ইস্পাতের ডেকে মোটা কার্পেট ফেলা, তাসত্ত্বেও শব্দটা শুনে মনে হলো লোকটার খুলি ফেটে গেছে। রানা অনুভব করল ওর শরীরের নিচে অসাড় ও নিস্তেজ হয়ে গেল লোকটা। ভেঙে যদি না-ও থাকে, রানার ধারণা খুলিটা ফেটেছে তো অবশ্যই। কয়েক সেকেন্ড লোকটার গায়ে শুয়ে থাকল ও, হাঁপাচ্ছে। দম ফিরে পেয়ে উঠতে যাবে এই সময় খেয়াল করল আততায়ীর মাথা ও ঘাড় অস্বাভাবিক একটা পজিশনে মোচড় খেয়ে রয়েছে, চোখ দুটো খোলা অথচ সেখানে কোন দৃষ্টি নেই।

গলার পাশে হাত দিয়ে রানা কোন পালস্ পেল না। আততায়ী মারা গেছে। পতনের সময় তার মাথাটা নিশ্চয়ই বাঁকা হয়ে ছিল, ফলে ডেকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়টা মটকে গেছে। একটু সরে এসে একটা বন্ধ দরজার গায়ে হেলান দিল রানা, কামরাটার ভেতর ব্যাটারি রাখা হয়।

পরিস্থিতি কি থেকে কি দাঁড়াল ভাবছে রানা। কি ঘটছে সে সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই নেই। শুধু জানে, যে-মেয়েটাকে পানি থেকে উদ্ধার করেছিল সেই মেয়েটাই এক লোকের হাতে খুন হতে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে বাধা দেয় ও। এই মুহূর্তে এখানে বসে একটা লাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই লাশ ওর নিজ হাতে তৈরি। অচেনা একজন লোককে মেরে ফেলেছে সে, জানে না কেন।

তারপর আবার মেয়েটার কথা মনে পড়ল।

দাঁড়াল রানা, লাশটা টপকাল, তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল আউটার ডেকে। ওঅর্ক ডেকে গিজ গিজ করছে লোকজন, সী রবিনের ক্রুদের বেঁধে দেয়া সেফটি রোপ ধরে আছে সবাই। ঝম-ঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে, কারও মুখে কোন অভিযোগ বা প্রতিবাদ নেই। সেফটি রোপ ধরে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সবাই, সাবধানে চড়ছে ফ্লাইং কার্পেটের পাঠানো রেসকিউ বোটে।

লাইন দেয়া লোকজনের সামনে এসে ছুটোছুটি করে মেয়েটাকে খুঁজছে রানা। কিন্তু লাইনের কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। আরও কিছুক্ষণ খুঁজল ও। লেদার কেস সহ মেয়েটা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। যে বোটগুলো লোকজনকে নিয়ে ফ্লাইং কার্পেটের উদ্দেশে এইমাত্র রওনা হয়েছে সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে

নিশ্চিত হলো, মেয়েটা এখনও সী রবিন ত্যাগ করেনি। তাহলে সে গেল কোথায়?

মেয়েটাকে রানার খুঁজে বের করতে হবে। তা না হলে ক্যাপটেন শেফার্ডকে লাশটা সম্পর্কে কি ব্যাখ্যা দেবে ও? তাছাড়া, কি ঘটছে তা-ও তো জানতে হবে ওকে, তাই না?

পাঁচ

এক সময় মনে হলো সী রবিন বিপদটা কাটিয়ে উঠতে যাচ্ছে। বেলা সাড়ে তিনটের দিকে দেখা গেল একশো দশজন বাদে ওয়াটার লিলির বাকি সব প্যাসেঞ্জারকে ভারতীয় কন্টেইনার শিপ ফ্লাইং কার্পেটে পাঠিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে। যারা রয়ে গেছে তাদের মধ্যে দশজন গুরুতর আহত, নাড়াচাড়া করা যাবে না; বাকি সবাই ওয়াটার লিলির ক্রু। লোকজন নেমে যাওয়ায় সী রবিন পানির নিচে থেকে পাঁচ ফুট ওপরে উঠে এসেছে। ক্রুরা হাল প্লেট মেরামতের কাজ প্রায় শেষ করে আনায় পানিও আগের চেয়ে অনেক কম ঢুকছে জাহাজে।

উত্তর কোরিয়ান গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট পৌঁছেই বোট নামিয়ে ফেরি অপারেশন শুরু করে দিল। প্রকৃতিকে ধন্যবাদ যে ঝড়টা যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি বিনা নোটিশে চলেও গেছে। সাগরে ঢেউ আছে, তবে আকারে সেগুলো বিশাল নয়।

ওয়াটার লিলির ক্রুদের মধ্যে সবার শেষে বিদায় নিল নিক গোয়েন, ফ্লাইং কার্পেটের বোটে ওঠার আগে সী রবিনের ক্রু আর বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাতে ভুলল না সে।

গোয়েন চলে যাবার পর ক্যাপটেন শেফার্ডকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'এখন?'

'প্রথম কাজ সাবমারসিবলগুলো তুলে আনা, তা না হলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আমার গর্দান নেবেন,' বললেন ক্যাপটেন। 'তারপর সিঙ্গাপুরের কোর্স ধরব, কারণ জাহাজ মেরামতের জন্যে ভাল শিপইয়ার্ড ও ড্রাই-ডক কাছাকাছি ওখানেই পাব।'

'সী হর্সকে খুঁজে না পেলে খুব একটা ক্ষতি নেই, বহু বছর ধরে সার্ভিস দিয়েছে। কিন্তু ব্লু নেভিগেটর একদম নতুন আর অত্যাধুনিক, তৈরি করতে খরচ পড়েছে বারো মিলিয়ন ডলার। ওটাকে পেতেই হবে।'

'না পাবার কোন কারণ নেই। ওটার বীকন সিগন্যাল পরিষ্কারই পাচ্ছি আমরা।'

'গুড।'

'ভেবে কিছু বের করতে পারলেন,' জিজ্ঞেস করলেন শেফার্ড, 'লাশটার কথা কর্তৃপক্ষকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?'

'যতটুকু জানি বলব।'

'মেয়েটাকে সাক্ষী হিসেবে পেলে ভাল হত।'

'জাহাজ ছেড়ে চলে যাবার সময় আমি তাকে দেখতে পাইনি, এ স্রেফ হতে পারে না।'

'আসলে, মিস্টার রানা, আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে,' বললেন ক্যাপটেন, ঠোঁটে খানিকটা শয়তানি হাসি।

তাঁর দিকে দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। 'সমাধান হয়ে গেছে?'

'আমি পরিচ্ছন্ন, সুশৃংখল জাহাজ চালাতে পছন্দ করি,' ব্যাখ্যা করলেন শেফার্ড। 'কাজটা আমার নিজেকেই করতে হয়েছে। আপনার বন্ধুকে জাহাজ থেকে পানিতে ফেলে দিয়েছি। ওয়াটার লিলির দুর্ভাগা লোকজনের সঙ্গে ভেসে গেছে সে। আমি যতটুকু বুঝি, বিষয়টার সমাপ্তি ঘটেছে।'

'স্কিপার,' বলল রানা, চোখে কি যেন একটা ঝিক্ করে উঠল, 'লোকে আপনার সম্পর্কে কে কি বলল সে-সব আমি গ্রাহ্য করি না। আমি জানি আপনি ঠিক আছেন।'

এই সময় রেডিও রুম থেকে বেরিয়ে এসে অপারেটর খবর দিল, উত্তর কোরিয়ান মিসাইল ফ্রিগেট মেসেজ পাঠিয়েছে সী রবিন যদি সরে যায় ওরা তাহলে পানি থেকে লাশ তুলবে, টাগ বোট না আসা পর্যন্ত ক্রুজ শিপ ওয়াটার লিলির সঙ্গেও থাকতে পারবে।

শেফার্ড বললেন, 'উত্তর কোরিয়ান ক্যাপটেন লিউ ফেংকে বলো আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।'

এক মিনিট পর রেডিও অপারেটর ফিরে এসে বলল, 'ক্যাপটেন লিউ ফেং ধন্যবাদ জানিয়ে আশা প্রকাশ করেছেন, সী রবিন তাঁর সামনে যেন শান্ত সাগর পায়।'

রানা মন্তব্য করল, 'ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম একটা গাইডেড- মিসাইল ফ্রিগেট পাঁচশো সিভিলিয়ান প্যাসেঞ্জারকে আশ্রয় দিল।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা,' বললেন শেফার্ড। 'আপনি কিন্তু একবারও এ প্রশ্ন তুললেন না যে মিসাইলগুলো কোথায় ডেলিভারি দেয়ার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।'

'প্রশ্ন তোলার দরকার কি।' হাসল রানা। 'কমপিউটর অন করলেই স্যাটেলাইট ফটো দেখে বলে দেয়া যায় কোথায় যাচ্ছিল ফ্রিগেটটা।'

'স্যাটেলাইট ফটো দেখেছি আমি। ফ্রিগেটের কোর্স দেখে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে ওটা বাংলাদেশেই আসছিল।'

ব্যাপারটা চেপে যেতে চাইল রানা। 'এটা আসলে আমার বা আপনার কোন বিষয় নয়।'

'তা নয়,' বলে পোড়া, নিঃশেষিতপ্রায় জলদানবটার দিকে তাকালেন শেফার্ড।

ঝম-ঝম বৃষ্টি আগুন নেভাতে তেমন কোন কাজে আসেনি। এখনও কমলা ও লাল রঙের শিখা দেখা যাচ্ছে, ধোঁয়া আর বাষ্প ঘিরে রেখেছে পোড়া কাঠামোকে। 'প্রতি বছর কত জাহাজেই তো আগুন লাগছে,' বললেন ক্যাপটেন, 'কিন্তু ওয়াটার

লিলির এই আগুনের সঙ্গে তুলনা করার মত কোন ঘটনা ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।'

'সেকেন্ড অফিসার গোয়েনের মতে ফায়ার-ওয়ার্নিং আর কন্ট্রোল সিস্টেম কাজ না করায় আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।'

'কেউ বিশ্বাসঘাতকা করেছে? স্যাবটাজ?'

'একসঙ্গে সব কিছু বিকল হয়ে পড়লে যুক্তির বিচারে সেটাকে দুর্ঘটনা বলা যায় না।'

'ক্যাপটেন,' রেডিও অপারেটর আবার বাধা দিল, 'ফ্লাইং কার্পেটের ক্যাপটেন নিখিল শ্রীবাস্তব আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

'স্পীকার অন করো।'

'শুরু করুন, সার।'

'ক্যাপটেন শেফার্ড বলছি।'

'আমি এখানে নিখিল শ্রীবাস্তব। আপনারা যদি সিঙ্গাপুরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, ফ্লাইং কার্পেট আপনাদের পথ-প্রদর্শক বা সঙ্গী হতে রাজি আছে।'

রানার দিকে তাকালেন শেফার্ড। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল রানা। সী রবিনের যে অবস্থা, মাঝসাগরে ডুবে যাবার পরিস্থিতি দেখা দেয়া অসম্ভব নয়। সঙ্গে ফ্লাইং কার্পেট থাকলে ভালই হবে।

'ধন্যবাদ, মিস্টার শ্রীবাস্তব,' বললেন শেফার্ড। 'সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ফ্লাইং কার্পেটকে সঙ্গী হিসেবে পেলে আমরা খুশিই হব।'

'এর জন্যে আমাদেরকে ধন্যবাদ না দিলেও চলে,' বললেন শ্রীবাস্তব। 'ক্রুজ শিপ ওয়াটার লিলি লং লেলাং কোম্পানির জাহাজ, আর ওই জাহাজ কোম্পানির শাখা অফিস আছে সিঙ্গাপুরে। ওদের আঠারোশো প্যাসেঞ্জারকে নিরাপদে উদ্ধার করে ও পৌঁছে দিয়ে ন্যায্য ফি নিতে ওখানে আমাদেরকে এমনিতেও যেতে হবে।'

'তবু ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, প্লিজ!' বললেন শেফার্ড।

'আপনারা রওনা হলেই আমরা পিছু নেব,' জানালেন শ্রীবাস্তব।

ওয়াটার লিলির কাছে প্রথমে পৌঁছাল গ্লোবাল মেরিন অফশোর কোম্পানির টাগ বোট 'গ্রীন ড্রাগন'। একশো উনিশ ফুট লম্বা, আটান্ন ফুট চওড়া—দুনিয়ার সবচেয়ে বড় টাগগুলোর একটা। জোড়া ডিজেল এঞ্জিনের মোট শক্তি নয় হাজার আটশো হর্সপাওয়ার। কাছাকাছি কুয়ালালামপুরে থাকায় অন্য কোন টাগের আগে গ্রীন ড্রাগনই অকুস্থলে প্রথমে পৌঁছাতে পারল।

পৌঁছাবার পর দশ ঘণ্টা লাগল ওয়াটার লিলির বো-তে লোহার শিকল পরাতে। আটটা ছোট বোটে করে আশিজন ক্রু রওনা হলো ওয়াটার লিলির দিকে, প্রত্যেকের পরনে ফায়ার-প্রুফ বিশেষ সুট। অক্লান্ত পরিশ্রমের পর কাজটায় সফল হলো তারা। ওয়াটার লিলির বো-র দিকে সবটুকুতে আগুন লাগেনি, লাগলে শিকল দিয়ে বাঁধতে আরও ভুগতে হত।

প্রকাণ্ড জলদানবকে নিয়ে ঘণ্টায় দুই নট গতিতে রওনা হলো গ্রীন ড্রাগন। বেশিরভাগ আগুনই নিভে গেছে ওয়াটার লিলির। শুধু দোমড়ানো-মোচড়ানো

সুপারস্ট্রাকচারের কয়েক জায়গায় এখনও কিছু শিখা নাচানাচি করছে। চাঁদ নেই, গোটা আকাশ মেঘে ঢাকা পড়ে আছে। রাতটা এতই কালো যে বলা সম্ভব নয় সাগর ঠিক কোথায় শেষ হওয়ার পর শুরু হয়েছে আকাশ।

টাগের বিরাট সার্চলাইট ওয়াটার লিলির দিকে তাক করা, আলোকিত করে রেখেছে বো আর বিধ্বস্ত ফরওয়ার্ড সুপারস্ট্রাকচার। পালা করে নজর রাখছে ক্রুরা, নিশ্চিত হবার প্রয়োজন আছে পোড়া জাহাজটা যাতে প্ল্যান অনুসারে পিছু পিছু আসে। মাঝরাতের পর শুরু হলো কুক-এর পাহারা দেয়ার পালা। একটা ফোল্ডিং ডেক চেয়ার নিয়ে এল সে, গ্যালিতে কাজ না থাকলে এটায় বসে গায়ে রোদ লাগায়। বেশ গরম পড়েছে, তাই কফি খাওয়া চলে না, তার বদলে মক্কা কোলা খাচ্ছে সে। ক্যানগুলো রয়েছে বরফ ভর্তি একটা বালতিতে। হাতে সফট ড্রিঙ্ক, একটা সিগারেট ধরিয়ে টাগের পিছু পিছু আসা প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকাল।

দু'ঘণ্টা পর। চোখ ঢুলু ঢুলু, দশ নম্বর সিগারেট আর তিন নম্বর মক্কা কোলার সাহায্য নিয়ে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করছে কুক। ওয়াটার লিলি যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে। হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া করল কুক, মাথাটাও একদিকে কাত হয়ে গেল। ভারী, ভরাট, গমগমে একটা আওয়াজ। যেন বহুদূর দিগন্তের কোথাও বজ্রপাত হচ্ছে। একটা নয়, পর পর কয়েকটা, দশ-পনেরো সেকেন্ড বিরতি দিয়ে। নিছক কল্পনা হিসেবে উড়িয়ে দেবে, এই সময় লক্ষ করল কি যেন একটা বদলে গেছে। ব্যাপারটা ধরতে মাত্র তিন সেকেন্ড লাগল তার। ওয়াটার লিলি আগের চেয়ে আরও একটু ডুবে গেছে পানিতে।

সার্চলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে জাহাজটার ফরওয়ার্ড অ্যামিডশিপ থেকে প্রকাণ্ড স্তম্ভের আকার নিয়ে ধোঁয়া উঠছে। কুক সেদিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ আঁতকে উঠল সে, আতংকে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ দুটো।

ওয়াটার লিলি ডুবে যাচ্ছে! শুধু ডুবছে না, জাহাজটা ভেঙেও যাচ্ছে।

চিৎকার করতে করতে ব্রিজের দিকে ছুটল কুক। 'হায়, ঈশ্বর! জাহাজটা ডুবে যাচ্ছে!'

টাগ বোট 'গ্রীন ড্রাগনে'র ক্যাপটেন টিম বাটার হৈ-চৈ শুনে নিজের কেবিন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন। কুককে কোন প্রশ্ন করলেন না, একবার চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলেন যদি এই মুহূর্তে টো কেইবল্ না কাটেন তাহলে ওয়াটার লিলির সঙ্গে গ্রীন ড্রাগনও ক্রুসহ সাগরের বিশ হাজার ফুট তলায় নেমে যাবে। ইতিমধ্যে ফার্স্ট অফিসার ডিক পটার ব্রিজে পৌঁছেছে, তাকে নিয়ে দৈত্যাকার উইঞ্চ-এর দিকে ছুটলেন তিনি।

উন্মত্ত ব্যস্ততার সঙ্গে ব্রেক রিলিজ করলেন ওঁরা, মোটা কেইবল্ ছাড়ছেন, প্যাঁচমুক্ত হয়ে অতলে তলিয়ে যেতে দেখছেন ওটাকে, প্রায় সরল রেখার আকৃতি থেকে বদলে নিচের দিকে খাড়া একটা রেখায় রূপান্তরিত হচ্ছে, যেহেতু ক্রুজ শিপ ওয়াটার লিলির বো ডুবতে শুরু করেছে পানিতে। উইঞ্চ ড্রামে জড়ানো বিশাল কেইবল্ এত দ্রুত খুলছে যে একসময় দৃশ্যটা ঝাপসা হয়ে গেল। ফার্স্ট অফিসার পটার আর ক্যাপটেন বাটার শুধু আশা করতে পারেন যে সবশেষে

কেইবল্‌টা যখন প্যাঁচ মুক্ত হবে, ওটার শেষ প্রান্ত যেন কানেক্টর থেকে ছিঁড়ে যায়। তা না হলে গ্রীন ড্রাগনের স্টার্নই টাগ বোটকে টেনে নিচে নামিয়ে নিয়ে যাবে।

দগ্ধ এবং নিহত ক্রুজ শিপ অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে সাগরে ডুব দিচ্ছে। এরই মধ্যে পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেছে ওটার সারফেস। পনেরো ডিগ্রি কোণ তৈরি করে ডুবছে জাহাজের কঙ্কালটা। কালচে, তোবড়ানো খোলের ভেতর থেকে ধাতব গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে আসছে আগুনে নিপীড়িত বাল্কহেড মোচড় খেয়ে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করায়। স্টার্ন মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে পানির ওপর থাকল, তারপর সেটাও বো-র পিছু নিয়ে ডুব দিল কালো সাগরে, ওপরে রেখে গেল রাশি রাশি উথলানো বুদ্বুদ।

রীল-এর চারধারে মাত্র এক সারি কেইবল্ পেঁচিয়ে আছে। হঠাৎ সেটা টান টান ও স্থির হতেই গ্রীন ড্রাগনের স্টার্ন অকস্মাৎ ডেবে গেল নিচের দিকে, এক ঝাঁকিতে পানির ওপর শূন্যে তুলে ফেলল বো। টাগ বোটের প্রতিটি ক্রু পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছে, তাকিয়ে আছে স্থির ড্রামের দিকে, কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে মৃত্যুর চোয়াল বন্ধ হলো বলে। তারপর শেষবারের মত মাত্র এক পাক ঘুরল ড্রামটা, কেইবলের পুরোটা দৈর্ঘ্য হ্যাঁচকা টানে সাগরের অতল তলে নেমে গেল।

টান থেকে মুক্তি পেয়ে টাগের বো ঝপাৎ করে খসে পড়ল পানিতে, শান্ত হবার আগে সামনে-পিছনে দুলল কিছুক্ষণ। মৃত্যুর ছোঁয়া থেকে একটুর জন্যে রেহাই পাওয়া ক্রুরা এখনও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অবশেষে নিস্তব্ধতা ভেঙে ফার্স্ট অফিসার বলল, 'অবিশ্বাস্য! চোখের পলকে এভাবে একটা জাহাজ ডুবে যাবে? এটা হয় কখনও? অথচ এইমাত্র ঠিক তাই হলো!'

'মনে হলো যেন জাহাজটার পুরোটা তলা খসে পড়েছে,' মন্তব্য করলেন ক্যাপটেন বাটার।

'ওই কেইবলের দাম এক মিলিয়ন পাউন্ড। কোম্পানি-ডিরেক্টররা খুশি হবেন না।'

'আমাদের করার কিছুই ছিল না। ঠিক যেন চোখের পলকে ঘটে গেল ব্যাপারটা।' থেমে একটা হাত তুলে চুপ করার ইঙ্গিত করলেন ক্যাপটেন। 'শোনো!' তাঁর গলা তীক্ষ্ণ।

সবাই তাকিয়ে আছে ঠিক যেখানে ডুবে গেছে ওয়াটার লিলি। রাতের অন্ধকার চিরে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কে যেন চিৎকার করছে। 'হেলপ মি! বাঁচান আমাকে!'

ক্যাপটেন বাটার প্রথমে ভাবলেন চরম উত্তেজনার মুহূর্তে তাঁর কোন ক্রু টাগ থেকে পানিতে পড়ে গেছে। কিন্তু একটু পরই জানা গেল, কোন ক্রু নিখোঁজ নয়। চিৎকারটা আবার শোনা গেল, এবার আগের চেয়ে অস্পষ্ট ও দুর্বল।

'ওদিকে কেউ আছে!' বলল কুক, আওয়াজটার দিকে হাত তুলে দেখাল।

ফার্স্ট অফিসার পটার ছুটে সার্চলাইটের পিছনে চলে এসে ঘোরাল ওটাকে, পানিতে খেলাচ্ছে আলোটাকে। সাগরও কালো, তাই কালো চকচকে মুখটা বলতে

গেলে ভাগ্যগুণেই দেখতে পাওয়া গেল। স্টার্ন থেকে একশো ফুট দূরেও নয়, কাজেই আশা করা যায় পটারের চিৎকার শুনতে পাবে সে। 'আপনি সাঁতরে বোটের কাছে আসতে পারবেন?'

কোন জবাব পাওয়া গেল না, তবে লোকটা যে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তা-ও মনে হলো না। বেশ শক্তি খাটিয়েই হাত ও পা ছুঁড়ছে সে, দ্রুত সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে বোটের দিকে।

'ওকে একটা লাইন ছুঁড়ে দাও দেখি,' একজন ক্রুকে নির্দেশ দিল পটার। 'হাঙর নাগাল পাবার আগেই টেনে তোলো।'

কিনারা থেকে একটা রশি ফেলা হলো নিচে। লোকটা ধরল সেটা। ক্রুরা রশি টেনে স্টার্নে তুলে আনল তাকে।

'লোকটা আদিবাসী,' বলল পটার, সে নিজে একজন অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসী।

'কোঁকড়ানো চুল কিন্তু তা বলে না,' দ্বিমত পোষণ করলেন ক্যাপটেন বাটার। 'আমার মনে হচ্ছে আফ্রিকান।'

'পরনে ওটা কোন জাহাজী অফিসারের ইউনিফর্ম।'

দুর্ভাগ্য ও বিপজ্জনক ঘটনাপ্রবাহের এই শেষ পর্যায়ে কোন সারভাইভারকে দেখতে পাবেন বলে আশা করেননি ক্যাপটেন বাটার, লোকটার দিকে চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন তিনি। 'আমরা কি জানতে পারি কোত্থেকে এলেন আপনি?'

আগন্তুকের মুখে বিশাল এক হাসি ফুটল। 'আমি তো মনে করি এটা সবার কাছেই পরিষ্কার। আমি হলাম, বরং বলতে হয় ছিলাম, ওয়াটার লিলির প্যাসেঞ্জার রিলেশান্স অফিসার।'

'সমস্ত প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে নেয়ার পরও আপনি কিভাবে ওখানে থেকে গেলেন?' জানতে চাইল পটার। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে লোকটা কোথাও এতটুকু আহত হয়নি, অথচ এটা তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। শুধু ইউনিফর্মটা ভিজে, এছাড়া আর কোন তিক্ত অভিজ্ঞতায় তাকে ভুগতে হয়নি।

'প্যাসেঞ্জারদের রিসার্চ ভেসেলে পাঠাতে সাহায্য করার সময় পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পাই আমি, জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সবাই নিশ্চয় ধরে নিয়েছিল আমি মারা গেছি, তা না হলে ওখানে আমাকে একা ফেলে রেখে চলে যেত না। জ্ঞান ফেরার পর দেখি আমাদের জাহাজকে আপনারা টো করে নিয়ে যাচ্ছেন।'

'তারমানে আপনি বারো থেকে পনেরো ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলেন!' ক্যাপটেন বাটার বিস্মিত।

'নিশ্চয়ই তাই।'

'খুবই অবিশ্বাস্য লাগছে যে আপনি পুড়ে মারা যাননি।'

'রাখে ঈশ্বর মারে কে।' আবার বিশাল এক হাসি দিল নিগ্রো অফিসার। 'ভাগ্যক্রমে এমন একটা কম্প্যানিয়নওয়েতে পড়েছিলাম, যেটায় আগুন লাগেনি।'

'আপনার কথায় মার্কিনি সুর।'

'আমি ক্যালিফোর্নিয়ার লোক।'

'আপনার নাম?' জিজ্ঞেস করল পটার।

'ডেভিস মুরেল।'

'ঠিক আছে, মিস্টার মুরেল,' বললেন ক্যাপটেন বাটার। 'আপনি বরং ভেজা ইউনিফর্মটা খুলে ফেলুন। আপনার আর আমার ফার্স্ট অফিসারের গড়ন একই রকম, সে আপনাকে কিছু শুকনো কাপড়চোপড় ধার দিতে পারবে। কাপড় পাল্টে গ্যালিতে চলে যাবেন। জানা কথা ক্ষুৎ-পিপাসায় আপনি কাতর হয়ে পড়েছেন। কুককে বলে দিচ্ছি, সে আপনাকে প্রথমে শ্যাম্পেন দেবে, তারপর খেতে ডাকবে।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে; ধন্যবাদ, ক্যাপটেন...'

'টিম বাটার।'

'সত্যি কথা বলতে কি, মিস্টার বাটার, পিপাসায় আমার ছাতি ফেটে যেতে চাইছে।'

ডেভিস মুরেলকে বোটের কুক নিচে নিয়ে যাবার পর ফার্স্ট অফিস্যার একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত না? কী ভয়ংকর একটা আগুন জ্বলছিল ওখানে, অথচ লোকটার একটু আঙুল বা ভুরুর খানিকটা লোম, কিছুই পোড়েনি!'

চোখে সংশয়, হাত দিয়ে চিবুক ঘষছেন ক্যাপটেন। 'হ্যাঁ, অদ্ভুতই।' একটু জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন। 'তবে ও আমাদের কোন ব্যাপার নয়। আমাকে এখন অপ্রীতিকর একটা দায়িত্ব পালন করতে হবে–কোম্পানি ডিরেক্টরদের জানাতে হবে টো তো হারিয়েইছি, সঙ্গে মিলিয়ন পাউন্ডের কেইবল্‌ও গেছে।'

রাগে ফার্স্ট অফিসারের মুখ থেকে গালি বেরিয়ে পড়ল। 'কাজটা ডাইনী ভাল করেনি।'

'কোন্ কাজটা?' ক্যাপটেন অবাক। 'কার কথা বলছ?'

'এই দেখলাম পানির ওপর উঁচু হয়ে ভাসছে, পরমুহূর্তে নেমে গেল সাগরের তলায়। এভাবে আমাদেরকে ফাঁকি দেয়া উচিত হয়নি ওয়াটার লিলির। ব্যাপারটাকে আমি স্বাভাবিক বলেও মেনে নিতে পারছি না।'

'আমি একমত,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন ক্যাপটেন। 'তবে তখনও আমাদের কিছু করার ছিল না, এখনও নেই।'

'বীমা কোম্পানি ব্যাপারটা সহজে মেনে নিতে চাইবে না। এমন কিছু নেই যে ইনভেস্টিগেট করা যাবে।'

ক্যাপটেন ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন। 'প্রমাণ না পাওয়া গেলে এই ব্যাপারটাও সাগরের অমীমাংসিত অনেক রহস্যের একটা হয়ে থাকবে।' হেঁটে এসে সার্চলাইট নিভিয়ে দিলেন তিনি।

টাগ বোট গ্রীন ড্রাগন সিঙ্গাপুরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপটেন বাটার ওয়াটার লিলির যে জাহাজী অফিসারকে সাগর থেকে উদ্ধার করেছিল সে নিখোঁজ হয়ে গেল। ডকসাইড ইমিগ্রেশন অফিসাররা চ্যালেঞ্জের সুরে জানাল, গ্যাঙওয়ে ধরে জাহাজ ত্যাগ করেনি সে, তা করতে দেখলে তাকে তারা ওয়াটার লিলিতে আগুন লাগার কারণ জানার জন্যে থামাত। ক্যাপটেন সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন, জাহাজ হারবারে ঢোকার সময় ডেভিস মুরেল পানিতে লাফিয়ে পড়ে পালিয়েছে।

ক্যাপটেন বাটার বীমা তদন্তকারীদের কাছে রিপোর্ট পাঠাবার পর তাদের কাছ থেকে জানতে পারলেন ডেভিস মুরেল নামে কোন লোক ওয়াটার লিলিতে অফিসার বা অন্য কোন পদে চাকরি করেনি।

ছয়

ফ্লাইং কার্পেট একপাশে অপেক্ষা করছে, সী রবিনের ক্রুরা ভেসে যাওয়া সাবমারসিবলের সিগন্যাল বীকন অনুসরণ করে ওগুলোকে তুলে নিচ্ছে জাহাজে। সবগুলো উদ্ধার করার পর ক্যাপটেন শেফার্ড মেসেজ পাঠালেন ক্যাপটেন শ্রীবাস্তবকে, তারপরই দুটো জাহাজ একযোগে সিঙ্গাপুর অভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

সাবমারসিবল তোলার কাজ শেষ করার পর সাংঘাতিক ক্লান্ত রানা, তবু ওকে এই মুহূর্তে নিজের কেবিন পরিষ্কার করতে হচ্ছে, কারণ ওয়াটার লিলি থেকে উদ্ধার পাওয়া পঞ্চাশজন প্যাসেঞ্জার পাঁচ থেকে সাত ঘণ্টা কাটিয়ে গেছে ছোট্ট এই জায়গাটায়। গোটা জাহাজ পরিষ্কার করার অপারেশন চলছে, কাজেই নিজের কাজ নিজে করা ছাড়া উপায় নেই। দু'ঘণ্টা পরিশ্রম করে কেবিনটাকে বাসযোগ্য করা সম্ভব হলো। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা পানিতে বিশ মিনিট গোসল করল ও। তারপর স্লিপিং গাউন পরে নিজের বিছানায় শুলো। ঘুমে চোখ বুজে আসছে, এই সময় হঠাৎ ঝট করে বিছানায় উঠে বসল ও। বাবার লেদার ব্যাগ হাতে সেই মেয়েটার চিন্তা একেবারে যেন লাফ দিয়ে ঢুকে পড়েছে ওর মনে। ব্যাপারটা নিয়ে যতই ভাবছে, ওর চোখকে ফাঁকি দিয়ে মেয়েটার সী রবিন ত্যাগ করা ততই অবিশ্বাস্য লাগছে। তারপর ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

মেয়েটা যায়নি। এখনও সে সী রবিনেরই কোথাও লুকিয়ে আছে।

ক্লান্তি ও ঘুম, দুটোকেই অগ্রাহ্য করে বিছানা থেকে নেমে কাপড় পরল রানা। পাঁচ মিনিট পর প্ল্যাটফর্ম ডেকের স্টার্ন প্রান্ত থেকে তল্লাশী শুরু করল। জেনারেটার রুম, উইঞ্চ রুম, প্রপালশান মোটর রুম আর সায়ান্টিফিক ইকুইপমেন্ট রুমের প্রতিটি কোণ, অন্ধকার ঘুপচি, যেখানে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে, তন্নতন্ন করে খুঁজল। কাজটায় প্রচুর সময় লাগল, কারণ রসদ আর ইকুইপমেন্টগুলো রাখা হয়েছে প্রচুর জায়গা ফাঁকা রেখে।

রিপেয়ার পার্টস স্টোর রুমটাও রানা বাদ দিল না। এমন একটা জিনিস, চোখে পড়ার কথা নয়–পড়ল, এই জায়গায় বেমানান বলে। একটা নয়, অনেকগুলো লুব্রিকেটিং অয়েল-এর গ্যালন ক্যান একটা ওঅর্ক বেঞ্চে সাজানো রয়েছে। প্রথম দর্শনে বেমানান লাগল না। তবে রানা জানে ওগুলো থাকার কথা একটা কাঠের স্টোরেজ ক্রেইট-এ। ওঅর্ক বেঞ্চের দিকে নয়, ও ক্রেইটটার দিকে এগোল–পা টিপে।

ঢাকনিটা তুলল রানা।

একে তো চরম ক্লান্ত, তার ওপর শোকে কাতর, একেবারে মড়ার মত

ঘুমাচ্ছে তৃষা ইসলাম। লেদার ব্যাগটা ক্রেইটের এক পাশে পড়ে রয়েছে, সেটার ওপর তৃষার একটা হাত দেখল রানা। হাসল ও, বাল্কহেড হ্যাঙ্গার থেকে ক্লিপবোর্ড নামিয়ে টান দিয়ে একটা কাগজ ছিঁড়ল, তারপর তাতে লিখল: 'ঘুম ভাঙার পর আমার কেবিনে চলে আসুন, কৃতার্থ বোধ করব। ডেক লেভেল দুই, আট নম্বর। মাসুদ রানা।' কি যেন ভাবল, তারপর আরও একটা লাইন যোগ করল: 'খানাপিনার ব্যবস্থা থাকবে।'

কাগজটা তৃষার বুকের ওপর ছেড়ে দিল রানা, ক্রেইটের ঢাকনি নিঃশব্দে বন্ধ করে বেরিয়ে এল পার্টস রুম থেকে।

সন্ধে সাতটার খানিক পর রানার কেবিনের দরজায় নক করল তৃষা। দরজা খুলে রানা দেখল মাথা নিচু, চোখে-মুখে অপরাধী-অপরাধী ভাব, প্যাসেজওয়েতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, লেদার কেসের হাতলটা এখনও শক্ত মুঠোর ভেতর। তার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এল রানা। 'খিদেতে আপনার জান বেরিয়ে যাচ্ছে,' বলে হাসল, বোঝাতে চাইছে ও রাগ করেনি বা বিরক্তও হয়নি।

'আপনিই কি মাসুদ রানা?' হাতটা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ছাড়িয়ে নিল তৃষা।

'হ্যাঁ। আর আপনি?'

'তৃষা ইসলাম। আপনাকে বিব্রত করার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত...'

'কখন কে বিব্রত হলো!' রানা যেন আকাশ থেকে পড়ল। ইঙ্গিতে একটা ডেস্ক দেখাল, সেখানে একটা প্লেটে কয়েকটা স্যান্ডউইচ আর এক গ্লাস দুধ রয়েছে। 'ডিনারের বিরাট আয়োজন নয়, অবশ্যই; সবাই সব কিছু খেয়ে চলে যাবার পর কুক যতটুকু পেরেছে করেছে।' একটা ব্লাউজ আর শর্টস তুলে দেখাল। 'আমাদের একজন বিজ্ঞানী আন্দাজ করেছেন তাঁর আর আপনার সাইজ একই হবে, তাই এগুলো দিয়ে গেছেন। খাওয়ার পর শাওয়ারটা সেরে নিন। আমি আধ ঘণ্টা পর ফিরব। তখন কথা হবে।'

ফিরে এসে রানা দেখল গোসল করে কাপড় পরেছে তৃষা, প্লেট ও গ্লাস দুটোই খালি। তার উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসল ও। 'নিজেকে আবার মানব জাতির একজন বলে মনে হচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসল তৃষা, দুষ্টামি করে ধরা পড়া স্কুল ছাত্রীর মত দেখাচ্ছে তাকে। 'আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন জাহাজ ছেড়ে আমি চলে যাইনি কেন।'

'হ্যাঁ, প্রশ্নটা মনে জেগেছে।'

'যাইনি ভয়ে।'

'কাকে ভয়? সেই লোকটাকে, যে আপনাকে আর আপনার বাবাকে আক্রমণ করেছিল? আপনি শুনে খুশি হবেন, আরও বহু লোকের সঙ্গে সে-ও ডুবে গেছে।'

'লোক আরও একজন ছিল,' থেমে থেমে বলল তৃষা। 'জাহাজেরই একজন অফিসার। যে লোকটা আমাকে খুন করতে যাচ্ছিল, মাথায় লাল চুল, তার সহকারী বলে মনে হয়েছে। ওরা দু'জন আমার বাবার এই কেসটা ছিনিয়ে নিতে

চেষ্টা করে। বাবাকে বোধহয় খুন করতেও চেয়েছিল। ধস্তাধস্তির সময় বাবা জাহাজ থেকে পড়ে যান...'

'চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে?'

'হ্যাঁ।' বাবার মৃত্যুদৃশ্য স্মরণ করতেই চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল তৃষার। তার হাতে নিজের পরিষ্কার রুমালটা গুঁজে দিল রানা। চোখ মোছার পর রুমালটার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আমার ধারণা ছিল না যে এগুলো মানুষ এখনও সঙ্গে রাখে। ভেবেছিলাম সবাই টিস্যু ব্যবহার করে।'

'কিছু অভ্যেস আছে সহজে ছাড়তে পারি না,' বলল রানা। 'তাছাড়া, কে বলতে পারে কখন কার চোখ ভিজে ওঠে।'

ওর দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর হাসল তৃষা। 'ঠিক আপনার মত কোন লোকের সঙ্গে কখনও আমার পরিচয় হয়নি। অদ্ভুত বলব না, তবে যেন অন্য জগতের কেউ। না, ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলাম না। যেন কোন সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে যেমনটি হলে ভাল হয়, আপনি ঠিক তেমনি।'

'কেউ যখন আমাকে ভুল করে আদর্শ পুরুষ বা ওই ধরনের কিছু বলতে চায় তখন বুঝতে পারি আমার কপাল খারাপ, প্রাণ খুলে হাসার বা মন খুলে কথা বলবার সুযোগটাও কেড়ে নিচ্ছে।' হঠাৎ করেই প্রসঙ্গটার ইতি টানল রানা। 'অফিসার লোকটার চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন?'

'হ্যাঁ, পারব। লোকটা কালো–নিগ্রো, সম্ভবত আফ্রিকান-আমেরিকান; কারণ লং লেলাং কোম্পানির মালিকরা তো বেশিরভাগই আমেরিকান, ক্রুরাও প্রায় সবাই তাই।'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত না, জাহাজে আগুন না লাগা পর্যন্ত অপেক্ষা করল তারা, তারপর হামলা চালাল?'

'বাবাকে এবারই প্রথম হয়রানি করা হয়নি,' একটু রেগেই উত্তর দিল তৃষা। 'বাবা আমাকে বলেছিলেন, বারবার তাঁকে হুমকি দেয়া হচ্ছে। এমনকি মেরে ফেলারও চেষ্টা হয়েছে।'

'তা আপনার বাবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কি এমন ছিল যে এভাবে তাঁকে মরতে হলো?'

'আমার বাবা–,' এক মুহূর্ত থামল তৃষা, তারপর বলল, '–ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম উঅজ আ জিনিয়াস! একই সঙ্গে তিনি কেমিক্যাল ও মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার ছিলেন...'

'কি বললেন!' চেয়ার ছেড়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'উনি সেই ডক্টর সিরাজুল ইসলাম? সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানী মহলে যিনি শ্রদ্ধেয় ইনভেনটর হিসেবে পরিচিত?' রানা উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপছেই বলা যায়, তার অবশ্য কারণও আছে। 'কয়েক ধরনের ওয়াটার প্রপালশান এঞ্জিন আবিষ্কার করেছেন, তৈরি করেছেন হাইলি ইফিশান্ট ডিজেল ফুয়েল-এর ফর্মুলা?'

'আপনি এ-সব জানেন?' তৃষা অবাক।

'আপনার বাবা কি ইনিই?' বিস্ময়ের ধাক্কা তো কাটছেই না, রানা এমন কি

ব্যাপারটা এখনও বিশ্বাস করতেও পারছে না। 'বছর তিনেক আগে যিনি নিখোঁজ হয়ে যান…?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল তৃষা, চোখ-মুখ ম্লান হয়ে উঠল। 'হ্যাঁ, তিন বছর আগে বাবাকে পালিয়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সে-কথা আপনি কিভাবে জানলেন?'

'তার আগে কি ঘটেছিল আপনি জানেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ডক্টর ইসলামকে বন্দি করা হয়েছিল…গোপনে বিসিআইকে তিনি একটা মেসেজ পাঠান…আমরা তাঁকে টেক্সাসের ওডেসার কাছে চারশো একর বালিয়াড়ির মাঝখানে এক পাথুরে গুহা থেকে উদ্ধার করি…'

হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিল তৃষা। 'আপনি আমার সব এলোমেলো করে দিচ্ছেন। আমি জানি বাবার সমস্যা হয়েছিল, কিন্তু ঠিক কি ঘটেছিল তা কোনদিনই আমাকে বলেননি। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে…'

রানা প্রথমে অন্যমনস্ক হয়ে উঠল, তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্যে তিন বছর অতীতে ফিরে গেল।

গোটা ব্যাপারটায় এত রহস্য, ধাঁধা আর রোমাঞ্চ আছে যে প্রাচীন রূপকথাকেও যেন হার মানায়। রানা তখন ঢাকায়, হাতে কোন অ্যাসাইনমেন্ট না থাকায় বিসিআই অফিসে বসে প্রতিদিন ডেস্ক ওঅর্ক করছে, অর্থাৎ, ওর ধারণা, স্রেফ মাছি মারছে। হঠাৎ একদিন ডাক পড়ল বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের চেম্বারে। নতুন কোন অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়া যাবে ভেবে উৎফুল্ল হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বসের সামনে গিয়ে হাজির হলো রানা।

'বসো।' ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন রাহাত খান। রানা বসতে ই-মেইলে আসা এবং কমপিউটর প্রিন্টারে প্রিন্ট করা কয়েকটা শিট ধরিয়ে দিলেন ওর হাতে। 'প্রথমে ভাল করে দেখো। এখনি কোন মন্তব্য করার দরকার নেই।'

এক এক করে মোট পঁচিশটা কমপিউটর প্রিন্ট আউটে চোখ বুলাল রানা। জটিল সব অঙ্ক; বিচিত্র সব গ্রাফ, নকশা ও ডায়াগ্রাম, অদ্ভুত আকৃতির সাংকেতিক চিহ্ন; বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন বইয়ের রেফারেন্স ইত্যাদির সমষ্টি পাতাগুলো, যার কোন অর্থই রানা বের করতে পারল না।

কাগজগুলো ফিরিয়ে নিয়ে রাহাত খান বললেন, 'কিছুই বোঝোনি। সেজন্যে লজ্জা পাওয়ারও কোন কারণ নেই। দেশের নামকরা অনেক বিজ্ঞানীকে এগুলো দেখানো হয়েছে। তাঁরাও কেউ কিছু বলতে পারছেন না।'

'এ-সব আমরা পেলাম কোত্থেকে?' রানার কৌতূহল।

উত্তরে রাহাত খান আরও কয়েকটা প্রিন্ট আউট বাড়িয়ে দিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় এজেন্টের দিকে। 'এগুলো পড়ে দেখো।'

শিটগুলো নিয়ে চোখ বুলাল রানা। সহজ ইংরেজিতে কিছু কথা লেখা আছে, বাংলা করলে এরকম দাঁড়ায়:

'এক থেকে পঁচিশ নম্বর পাতায় এমন কয়েকটা যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফর্মুলা লেখা আছে, যেগুলোর পরীক্ষা সফল হলে মানবসভ্যতা এক লাফে কয়েক

হাজার বছর এগিয়ে যাবে। ফর্মুলাগুলো কোড বা সাংকেতিক ভাষায় লেখা, আমার সাহায্য ছাড়া ওই কোড ভাঙতে কমপক্ষে একশো বছর লেগে যাবে। আমি একজন আমেরিকান নাগরিক, তবে জন্মসূত্রে বাঙালী, তাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন মাতৃভূমিকেই দান করে যাচ্ছি। এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, যে-ফর্মুলার কোড ভাঙতে একশো বছর লাগবে তা পেয়ে বর্তমান বাংলাদেশের কি লাভ? এর উত্তরে আমি সংক্ষেপে শুধু এ-কথাই বলতে চাই, রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এত দুর্বল যে এখনই ফর্মুলাগুলোর পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হলে সেটা আশীর্বাদ না হয়ে বরং অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে। ওগুলো কেড়ে নেয়ার জন্যে বহু শক্তিধর রাষ্ট্র বাংলাদেশকে আক্রমণ করতে চাইবে। তবে দু'ভাবে এই একশো বছর সময়সীমা বিশ বছরে কমিয়ে আনা যায়। এক, প্রথমে সতেরো নম্বর পাতার শেষ প্যারাটার কোড ভাঙতে হবে। আমার ধারণা এই কোডটা ভাঙতে বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের দশ বছর লাগবে। এটা ভাঙতে পারলে পঁচিশ পাতার বাকিটুকুর অর্থ বের করতে আর লাগবে মাত্র দশ বছর। আর দুই, আমাকে বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করা।

'হ্যাঁ, আমি এখন বন্দি জীবন কাটাচ্ছি। কে বা কারা আমাকে বন্দি করেছে, এটা জানাও বাংলাদেশের জন্যে একটা বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে, তাই তার বা তাদের পরিচয় এখানে আমি দিচ্ছি না। তবে আমার মুক্ত হওয়াটা বিজ্ঞানের স্বার্থে খুব জরুরী। ফর্মুলাগুলো পরীক্ষা করে দেখা দরকার, নিখুঁত করা দরকার আরও নতুন কিছু আবিষ্কারের ফর্মুলা।

'আমি শুধু জানি টেক্সাসের পশ্চিম অংশে, ওডেসার বালিয়াড়ির মাঝখানে একটা পাথুরে গুহায় আমাকে আটকে রাখা হয়েছে। এটা সম্ভবত একটা র‍্যাঞ্চ–ঘোড়ার আওয়াজ পাই, কাছাকাছি কোথাও এয়ারস্ট্রিপও আছে, আমার গুহার দক্ষিণ দিকে কোথাও। কোবরা ক্লাব বলে মার্সেনারিদের একটা সংগঠন আছে, সেই সংগঠনের সদস্যরা আমাকে পাহারা দেয়। সংখ্যায় ওরা প্রায় বিশজন। প্রত্যেকের পরনে বিশেষ ধরনের ইউনিফর্ম।

'আমি আর মাত্র দশ দিন অপেক্ষা করব। যদি কোন সাহায্য না আসে, অগত্যা একাই চেষ্টা করব পালাতে, তারপর যা থাকে কপালে। শুভেচ্ছা। ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম।'

দীর্ঘ আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হলো, ডক্টর সিরাজুল ইসলাম যেখানে বাংলাদেশের বিপদ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন, সেখানে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলাই উচিত হবে–একদল মার্সেনারিই উদ্ধার করতে যাবে ডক্টর ইসলামকে, তাদেরকে নেতৃত্ব দেবে ছদ্মবেশী রানা; কাউকে বুঝতেই দেয়া হবে না যে এই অপারেশনের সঙ্গে বাংলাদেশ বা কোন বাঙালী জড়িত। পাঁচ দিনের মধ্যেই আমেরিকায় পৌঁছে টেক্সাসের দুর্গম পশ্চিম দিকটা খুব ভালভাবে চেনে এমন একদল মার্সেনারি যোগাড় করে ফেলল রানা, বেশিরভাগই তারা ওর পূর্ব-পরিচিত। মেশিন গান ও রকেট লঞ্চার ফিট করা হেলিকপ্টার গানশিপও চোরাবাজার থেকে ভাড়া করা হলো একজোড়া। দু'হাতে টাকা ছড়াতে কোবরা ক্লাবের বিশজন সদস্য চার হাজার একর জুড়ে বিস্তৃত বালিয়াড়ির মাঝখানে ঠিক কোন্ পাথুরে গুহায় বসবাস করছে তা জানা হয়ে গেল মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই।

এ-ও জানা গেল ঠিক কি ধরনের ইউনিফর্ম তারা পরে আছে। এরপর বাকি থাকে শুধু আক্রমণ। সেটাও শুরু ও শেষ হলো ছক কাটা প্ল্যান ধরে।

গুহার মুখে একটা হেলিকপ্টার নামল। হেলিকপ্টার থেকে নামল কোবরা ক্লাবের ইউনিফর্ম পরা গুণে গুণে বিশজন সদস্য। গুহার প্রহরী কোবরা সদস্যরা হকচকিয়ে গেছে। নতুন দলের লীডার, রানা, নিজের মিথ্যে পরিচয় দিয়ে জানাল–হেডকোয়ার্টার থেকে পালা বদলের নির্দেশ পেয়ে বিজ্ঞানী ডক্টর ইসলাম ও গুহার দায়িত্ব বুঝে নিতে এসেছে তারা। নির্ভেজাল সরীসৃপদের বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই নকল সাপগুলো রানার নেতৃত্বে গুহাটা দখল করে নিল, প্রতিপক্ষ সব ক'জনকে নিরস্ত্র করল, এবং বলাই বাহুল্য যে বিজ্ঞানী ভদ্রলোককেও গুহার ভেতর থেকে মুক্ত করা হলো।

গুহা থেকে ওরা তখনও বেরোয়নি, ব্যাকআপ টীম ওয়াকি-টকির মাধ্যমে রানাকে খবর পাঠাল, সম্ভবত কোবরাদের কেউ বোতামে চাপ দিয়ে অ্যালার্ম বাজিয়ে দিয়েছে, তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে র‍্যাঞ্চ থেকে রওনা হয়েছে তিন ট্রাক ভর্তি রাইফেলধারী 'কাউবয়'।

গুহাটা আসলে একটা গোলকধাঁধার মত, ভেতরে একাধিক অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি আছে, যত সহজে ঢোকা গেল তত সহজে বেরুনো গেল না। বেশি সময় লেগে যাওয়ায় বাইরে বেরিয়ে এসে ওরা দেখল ট্রাক তিনটে কাছাকাছি চলে এসেছে। তবে ভাগ্য ভাল যে রানার ব্যাক আপ টীমও ইতিমধ্যে আরেকটা হেলিকপ্টার নিয়ে পৌঁছে গেছে।

সবচেয়ে গুরুত্ব ডক্টর ইসলামের। রানা তাঁকে প্রথম হেলিকপ্টারে তুলে দিয়ে পাইলটকে এলাকা ত্যাগ করে নির্দিষ্ট একটা পাহাড় চূড়ায় চলে যেতে বলল।

বিজ্ঞানীকে নিয়ে প্রথম হেলিকপ্টার চলে যাবার পর শুরু হলো র‍্যাঞ্চ থেকে আসা মার্সেনারিদের সঙ্গে তুমুল বন্দুকযুদ্ধ। দ্বিতীয় হেলিকপ্টার থেকে রকেট ছুঁড়ে ট্রাকগুলো উড়িয়ে দেয়া হলো। মেশিন গানের ঝাঁক-ঝাঁক বুলেট শুইয়ে দিল সশস্ত্র মার্সেনারিদের। দূরত্ব বেশি হওয়ায় বেশিরভাগই তারা আহত হয়েছে, মারা গেছে অল্পই। ট্রাকে করে আরও মার্সেনারি আসতে দেখা গেল। তবে রকেট লঞ্চার আর মেশিন গান থাকায় সুবিধে করবে কি, গুহার কাছাকাছি তারা ভিড়তেই পারল না। ঘণ্টাখানেক পর তাদেরকে আরও পিছু হটতে বাধ্য করা হলো, তারপর দ্বিতীয় হেলিকপ্টার গানশিপ নিয়ে এলাকা ত্যাগ করল ওরা।

বিস্ময়ের ধাক্কা লাগল নির্দিষ্ট পাহাড় চূড়ায় পাইলটকে দেখে। সে আছে, কিন্তু তার হেলিকপ্টার নেই; না, পরিষ্কার ও সমতল চূড়ার কোথাও ডক্টর সিরাজুল ইসলামকেও দেখা যাচ্ছে না।

পাইলট জানাল, কপ্টার থেকে নেমে একটা ঝোপের দিকে প্রস্রাব করতে গিয়েছিল সে। ফিরে আসতে আরোহী ভদ্রলোক হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিয়ে তাকে কপ্টারে উঠতে নিষেধ করেন। তার করার কিছুই ছিল না, ভদ্রলোক কপ্টার স্টার্ট দিয়ে তাকে ফেলে রেখে চলে গেছেন।

হতভম্ব রানা কাগজটা নিয়ে চোখ বুলাল। তাতে ডক্টর ইসলাম বাংলাতে লিখে রেখে গেছেন:

'মনে হতে পারে আমি অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতকতা করলাম, কিন্তু আসলে তা সত্যি নয়। আমি আমার জন্মভূমিকে, দেশের জনগণকে ভালবাসি, সেজন্যেই চাইছি না আমার বিপদের সঙ্গে বাংলাদেশ কোনভাবে জড়িয়ে পড়ুক। আমাকে এখন বেশ কিছুদিন লুকিয়ে থাকতে হবে। কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারব, আমার জানা আছে। কিছু গোপন এক্সপেরিমেন্টও সারা দরকার, সেজন্যেও কিছুদিন লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে হবে আমাকে।

'ই-মেইলে ঢাকায় পাঠানো মেসেজের সতেরো নম্বর পেইজের শেষ প্যারার কোড ভাঙা অনেক সহজ হয়ে যাবে যদি কোন সাইফার বিশেষজ্ঞ রবি ঠাকুরের সঞ্চয়িতার একটা কবিতার বিশেষ একটা অংশের অক্ষরগুলোকে কী বা চাবি হিসেবে ব্যবহার করেন। কবিতাটির নাম বসুন্ধরা, চাবি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে কবিতাটির এই অংশ থেকে–

"হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর–
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে; দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্রস্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের 'পরে
বিদ্যুতের বেগে; অনায়াস সে মহিমা
হিংসাতীব্র সে আনন্দ, সে দৃপ্ত গরিমা,
ইচ্ছা করে, একবার লভি তার স্বাদ।
ইচ্ছা করে বারবার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে…"

'জননী সম মাতৃভূমিকে দেবার মত অনেক কিছুই আছে আমার ঝুলিতে, তবে সেজন্যে অপেক্ষা করতে হবে, এগোতে হবে সাবধানে পা ফেলে। ইতিমধ্যে যা দিয়েছি, সংকেত ভেঙে তার অর্থ উদ্ধার করার পর যন্ত্রগুলো বানাতে পারলে বাংলাদেশ অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম উন্নত রাষ্ট্রগুলোর সম পর্যায়ে উঠে আসবে, বলতে গেলে এক রকম রাতারাতি।

'যদি কোনদিন পরিবেশ তৈরি হয় তাহলে দেশেই আমি ফিরব। তবে আমার লক্ষ্য শুধু দেশ নয়, আমি চাই গোটা দুনিয়ার সব মানুষ আমার আবিষ্কারের সুফল ভোগ করুক। এটাই অনেকে চাইছে না বলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে এটা ঠিক যে প্রাণ থাকতে আমি আমার আবিষ্কার নিয়ে কাউকে ব্যবসা করতে দেব না। আমাকে উদ্ধার করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ।'

অদ্ভুত শোনালেও সত্যি, গোটা ব্যাপারটার এখানেই সমাপ্তি ঘটে। সেই থেকে ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম সম্পর্কে কোন খবর রানা অন্তত পায়নি। কি ঘটেছে রিপোর্ট পাবার পর গোটা ব্যাপারটা চেপে যাবার নির্দেশ দেন রাহাত খান। যেহেতু ডক্টর ইসলাম লুকিয়ে থাকতে চেয়েছেন তাই তাঁকে খুঁজে বের করতে বা তাঁর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতেও রাজি হননি তিনি।

*

চেয়ার ছেড়ে রানার সামনে দাঁড়াল তৃষা, হাত ধরে একটু ঝাঁকাল। 'এই যে, ভাই, আপনি পৃথিবীতেই আছেন তো?'

বর্তমানে ফিরে আসার পর রানার হাসিটা একটু আড়ষ্ট লাগল। 'আপনার বাবা সম্পর্কে আমার কৌতূহলের সীমা নেই। কাছাকাছি পেয়েও আবার তাঁকে হারালাম–এবার চিরকালের জন্যে। সত্যি খুব দুঃখ হচ্ছে। তাঁর সম্পর্কে বলুন আপনি, প্লীজ।'

মাথা নাড়ল তৃষা। 'দুঃখিত। এক অর্থে বাবা আমার কাছে প্রায় অচেনা একজন মানুষ ছিলেন। আমরা যে যার নিজের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতাম যে অনেক দিন পরপর দেখা হত...'

'আপনি তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে কিছুই জানেন না?' রানার চোখে-মুখে অবিশ্বাস।

হেসে ফেলল তৃষা। রানাকে মুহূর্তের জন্যে ধরে চেয়ারে বসাল। তারপর নিজেও বসল। 'কেন জানব না, বাবার অনেক আবিষ্কার সম্পর্কেই জানি আমি। এই যেমন জানি যে বাবার লেটেস্ট প্রজেক্ট ছিল ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিন ডেভলপ করা। ওটারই একটা সংস্করণ, প্রপালশান ইউনিটস, ব্যবহার করা হয়েছে ক্রুজ শিপ ওয়াটার লিলিতে।'

'তাই!' রানা বিস্মিত। 'ওঁর ডিজাইন করা এঞ্জিনে চলছিল ওয়াটার লিলি?' একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আসছে মনে। 'দেখুন, ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিন বলতে ঠিক কি বোঝায় আমি জানি না। পত্র-পত্রিকা পড়ে যতটুকু বুঝেছি, এই প্রযুক্তি আসতে এখনও ত্রিশ বছর সময় লাগবে। অথচ আপনি বলছেন ওয়াটার লিলিতে ওই বিশেষ ধরনের এঞ্জিনের একটা সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বুঝেছিলেন–ওই প্রযুক্তি আসতে ত্রিশ বছরই লাগার কথা ছিল। তবে বাবা একটা ব্রেকথ্রু ঘটান–একটা বৈপ্লবিক ডিজাইন তৈরি করেন। বাবা প্রথমে সাগরের পানিতে পাওয়া বিদ্যুৎ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করার কৌশল আবিষ্কার করেন, তারপর লিকুইড হিলিয়ামের সাহায্যে অ্যাবসলিউট জিরো টেমপারেচারে রাখা একটা হাইলি ম্যাগনেটিক কোর্ টিউবের ভেতর দিয়ে ওই বিদ্যুৎ চালিয়ে দেন। এ থেকে যে ইলেকট্রিক কারেন্ট তৈরি হয় সেটা এনার্জি ফোর্স-এ রূপান্তর হয়ে প্রপালশান ঘটাবার জন্যে থ্রাস্টার-এর মাধ্যমে পানি পাম্প করায়।'

মনোযোগ দিয়ে শুনছিল রানা, সেজন্যেই তৃষার কথাগুলো উত্তেজনায় আড়ষ্ট করে তুলল ওকে। 'আপনি কি বলতে চাইছেন যে ওঁর এঞ্জিনের একমাত্র আউটসাইড ফুয়েল সী ওয়াটার? ওয়াটার লিলি শুধু সাগরের পানি দিয়ে চালানো হচ্ছিল?'

'স্যালাইন-এর খুব সামান্য ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড রয়েছে। বাবা এনার্জি উৎপাদনের জন্যে ওটাকে এক অবিশ্বাস্য মাত্রায় ইনটেনসিফাই করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।'

'কল্পনা করা সত্যিই খুব কঠিন যে ফুয়েলের অফুরন্ত, সহজপ্রাপ্য একটা উৎস ব্যবহার করে প্রকাণ্ড সব এঞ্জিন চালানো সম্ভব।'

পিতৃগর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তৃষার চেহারা। 'বাবা আমাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন...'

'কিন্তু আপনি না তখন বললেন যে উনি আপনার কাছে প্রায় অচেনা একজন মানুষ ছিলেন?'

'হ্যাঁ, তাই ছিলেন। তবে যখন দেখা হত তখন শুধু কাজের কথাই বলতেন। এত কিছু বলছি, তাহলে এ-ও বলতে হয় যে বাবা কিন্তু আমার ওপর খুশি ছিলেন না তাঁর লাইনে লেখাপড়া না করায়। আসলে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট টার্ম-এ আমি চিন্তা করতে পারি না। অ্যালজেব্রা করে তাক লাগিয়ে দেয়ার ইচ্ছাটাই নিজের ভেতর কখনও দেখতে পাইনি। সমীকরণ আমার কাছে সময়ের অপচয়। ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে বিজনেস-এ মাস্টার্স করেছি, চাকরি করি একটা কনসালট্যান্ট ফার্মে, মারচ্যানডাইজ অ্যানালিস্ট হিসেবে। আমাদের মক্কেল হলো ডিপার্টমেন্ট স্টোর আর ডিসকাউন্ট হাউস।'

কৌতুক বোধ করায় রানার ঠোঁট সামান্য লম্বা হলো। 'সম্পূর্ণ নতুন জাতের এনার্জি তৈরি করার মত উত্তেজক কিছু নয়।'

'তা হয়তো নয়,' বলল তৃষা, মাথাটা এত জোরে নাড়ল যে ঘাড় আর কাঁধে ঘন মেঘের মত স্তূপ হয়ে থাকা কালো চুলে ঝড় উঠল। 'তবে আমি খুব ভাল রোজগার করি।'

'ঠিক কি ধরনের সায়েন্টিফিক ব্রেকথ্রুর মাধ্যমে আপনার বাবা এই ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিন টেকনোলজি নিখুঁত করতে পেরেছিলেন?'

'রিসার্চ আর ডেভলপ করার প্রথম দিকে বাবা একটা রোডব্লকের সামনে পড়েন যখন তাঁর এক্সপেরিমেন্টাল এঞ্জিন প্রত্যাশার চেয়ে বেশি পাওয়ার আর এনার্জি তৈরি করতে পারলেও এক্সট্রিম ফ্রিকশন, অর্থাৎ প্রবল ঘর্ষণজনিত সমস্যার সৃষ্টি করছিল। হাই আরপিএম-এ মাত্র কয়েক ঘণ্টা চলার পর এঞ্জিনগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। বাবা তখন আমাদের পরিবারের একজন শুভানুধ্যায়ী, বাবার বন্ধু কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ার ফিরোজ ফাহিমের সাহায্য নিয়ে নতুন একটা তেল তৈরির সূত্র আবিষ্কার করলেন, যে তেল বাজারে প্রচলিত যে-কোন কমার্শিয়াল অয়েল-এর চেয়ে একশো ভাগ বেশি এফিশিয়্যান্ট। এবার বাবা নতুন একটা পাওয়ার সোর্স পেলেন, যা কিনা অনির্দিষ্ট কাল চলবে, মাপার যোগ্য ক্ষয় ছাড়াই বছরের পর বছর।'

'তারমানে ওই সুপার অয়েল-ই সেই জাদু, আপনার বাবার ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিনকে ড্রইং বোর্ড থেকে বাস্তবে পরিণত করে।'

'হ্যাঁ।' সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল তৃষা। 'পাইলট মডেলের সফল টেস্ট প্রোগ্রামের পর বাবা লং লেলাং ক্রুজ লাইন্স সহ আরও দু'একটা শিপিং কোম্পানিকে তাঁর আবিষ্কৃত এঞ্জিনের ডিজাইন ও নতুন ফুয়েল ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। প্রতিটি চুক্তিতে লেখা আছে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লভ্যাংশ বাবা পাবেন। বাবা মারা গেলে, শর্ত অনুসারে, ভবিষ্যতে যাই লাভ হোক...'

'আপনি পাবেন,' আগেই বলে ফেলল রানা।

'ভুল করলেন,' মাথা নেড়ে বলল তৃষা। 'আমি নই, চুক্তিপত্রে লেখা আছে বাংলাদেশ সরকার পাবে।'

'জাহাজই যখন নেই, লাভের কথা এখন আর ভেবে কি হবে...'

'আপনি বোধহয় মন দিয়ে আমার কথা শুনছেন না,' একটু অভিমানের সুরে বলল তৃষা। 'বললাম না, বাবা বেশ কয়েকটা কোম্পানিকে এঞ্জিনের ডিজাইন আর তেলের ফর্মুলা দিয়ে গেছেন। লং লেলাং কোম্পানি আরও একটা জলযান তৈরি করছে–এটা হবে আন্ডারওয়াটার লাকশারি সাবমেরিন প্যাসেঞ্জার লাইনার। কিন্তু নামটা আমি ভুলে গেছি। ওটা তৈরি হচ্ছে ফ্লোরিডায়, কোম্পানির আরেক শিপইয়ার্ডে।'

'তেলের ফর্মুলাটা ডুপ্লিকেট করা সম্ভব নয়?'

'ফর্মুলা ডুপ্লিকেট করা, হ্যাঁ। কিন্তু প্রসেস, না। এগ্‌জ্যাক্ট প্রডাকশন প্রসেস রিপিট করার কোন উপায় নেই।'

'আমি ধরে নিচ্ছি উনি এ-সব পেটেন্ট করিয়ে নিয়েছেন।'

মাথা নাড়ল তৃষা। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। বাবা এঞ্জিন ডিজাইনের বিভিন্ন অংশের কম করেও বত্রিশটা পেটেন্ট চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর শত্রুরা টাকা খাইয়ে সেগুলোকে আটকে দেয়।'

'আর অয়েল ফর্মুলার?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মাথা নাড়ল তৃষা। 'এই রহস্যটা বাবা কারও কাছে ফাঁস করেননি, এমন কি পেটেন্ট অফিসকেও বিশ্বাস করতে পারেননি–তা সে যে দেশেরই হোক।'

'ডক্টর ইসলাম যদি বাংলাদেশ সরকারের, বিশেষ করে বিসিআই-এর সাহায্য নিতেন তাহলেই বোধহয় সবদিক থেকে ভাল হত।'

'বাবা আসলে সবাই যে পথে হাঁটে সে-পথে হাঁটতে পছন্দ করতেন না। শুধু দেশ উপকৃত হোক, এটা চাননি; চেয়েছেন দুনিয়ার সব মানুষ তাঁর আবিষ্কার থেকে সুযোগ-সুবিধে পাক। আরেকটা কথা...'

'থামলেন কেন, বলুন।'

'বাবা অন্য একটা নতুন বিষয় নিয়ে কাজ করছিলেন। আমাকে বললেন, এই কাজের ফর্মুলা বাংলাদেশকে তিনি আগেই পাঠিয়েছেন। তবে সেটা নিখুঁত কিনা তখনও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। এটার টেস্ট সফল হলে দুনিয়ার চেহারাই নাকি আমূল পাল্টে যাবে।'

'আপনাকে কিছু বলেননি, জিনিসটা কি?'

'না।' মাথা নাড়ল তৃষা। 'এ-ব্যাপারে সাংঘাতিক সতর্ক ছিলেন। বলতেন, আমার না জানাই ভাল।'

'এটা ছিল মেয়ের প্রতি তাঁর ভালবাসা। তাঁর গোপন তথ্য কেড়ে নেয়ার জন্যে যারা বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল, তাদের হাত থেকে আপনাকে তিনি বাঁচাতে চেয়েছেন।'

বিষণ্ন মূর্তি, চোখের দৃষ্টি যেন বহুদূরে, তৃষা বিড়-বিড় করে বলল, 'মা মারা

যাবার পরও বাবা আর আমি খুব কাছাকাছি আসতে পারিনি। এমনিতে একমাত্র সন্তানের প্রতি তাঁর ভালবাসায় কোন খাদ বা কমতি ছিল না, কিন্তু তাঁর কাছে প্রথম গুরুত্ব ছিল কাজ–বিজ্ঞান চর্চা। জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখেছি, সারাক্ষণ নিজের কাজে ডুবে আছেন। আমার ধারণা, ওয়াটার লিলির প্রথম যাত্রায় বাবা আমাকে দাওয়াত দেন দু'জনের দূরত্বটা কমিয়ে আনার ইচ্ছেতেই।'

প্রায় একমিনিট চুপচাপ চিন্তা করল রানা। তারপর চোখ ইশারায় লেদার ব্যাগটা দেখাল। 'এবার ওটা আপনার খোলা উচিত বলে মনে হচ্ছে না?'

দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকল তৃষা, সংশয় ও দ্বিধা গোপন করতে চাইছে। 'খুলতে চাই।' ইতস্তত করছে। 'কিন্তু ভয় করছে।'

'কিসের ভয়?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

চোখ-মুখ একটু লালচে হলো তৃষার; এর জন্যে দায়ী ব্যাগের ভেতর কি পাবে না পাবে এই অনিশ্চয়তা। 'তা জানি না।'

'আপনি যদি ধরে নিয়ে থাকেন আমি একটা মন্দ লোক, আমার উদ্দেশ্য আপনার বাবার মহামূল্যবান কাগজ-পত্র চুরি করা, তাহলে ভুল করবেন। আমি এখানেই বসে থাকি, আপনি ব্যাগটা নিয়ে এক কোণে চলে যান, তারপর ঢাকনি খুলে ভেতরে এমনভাবে উঁকি দেন, আমি যেন কিছুই দেখতে না পাই।'

অকস্মাৎ ব্যাগটা তুলে নিয়ে কোলের ওপর রাখল তৃষা, শব্দ করে কাঁপা কাঁপা নার্ভাস হাসি হেসে বলল, 'জানেন, আমার কোন ধারণাই নেই এটার ভেতর কি আছে। হয়তো নতুন কিছু ডিজাইন আছে, যার মাথামুণ্ডু কিছুই আমরা বুঝব না।'

'তা না বুঝি, দেখতে তো কোন দোষ নেই।'

তারপরও দীর্ঘ এক মুহূর্ত ইতস্তত করতে দেখা গেল তৃষাকে। অবশেষে সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে ব্যাগের ল্যাচ ক্লিক করে ঢাকনিটা তুলল সে। 'এ কি! হায় আল্লাহ, একি কাণ্ড!'

রানার শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। 'কি···ভেতরে কি দেখছেন?'

যেন স্লো-মোশানে, হাতের ব্যাগটা ঘোরাল তৃষা, তারপর কোল থেকে খসে পড়তে দিল 'এ কিভাবে ঘটল আমি জানি না,' ফিসফিস করে বলল সে। 'আমি তো এটা এক মুহূর্তের জন্যেও হাতছাড়া করিনি।'

সামনের দিকে ঝুঁকে লেদার কেসের ভেতরে তাকাল রানা।

ওটা খালি। ভেতরে কিছুই নেই।

সাত

সিঙ্গাপুর দুশো মাইল দূরে থাকতে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হলো আগামী তিনদিন আকাশ পরিষ্কার ও সাগর শান্ত থাকবে। সী রবিনের আর যেহেতু ডুবে যাবার কোন ভয় নেই, নিখিল শ্রীবাস্তব তাঁর কন্টেইনার শিপ ফ্লাইং কার্পেটকে নির্দেশ দিলেন, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্দরে পৌঁছাতে হবে।

অপ্রত্যাশিত দু'হাজার প্যাসেঞ্জার থাকায় ফুড সাপ্লাইয়ের অবস্থা খুবই করুণ হয়ে উঠেছে।

সী রবিন সিঙ্গাপুরের অন্য এক বন্দরে পৌঁছাল আরও প্রায় সাত ঘণ্টা পরে। শিপইয়ার্ডে অপেক্ষা করছিল দেশী-বিদেশী মিডিয়ার একশোরও বেশি রিপোর্টার ও ফটোজার্নালিস্ট। ইতিমধ্যে সারা দুনিয়ায় খবর ছড়িয়ে পড়েছে, সামুদ্রিক উদ্ধার অভিযানের গত কয়েকশো বছরের ইতিহাসে এরকম ঘটনা ঘটেনি যে একটা জাহাজ একাই প্রায় দু'হাজার লোককে তুলে নিয়েছে।

অভিনন্দন, মাল্যদান, শুভেচ্ছাবাণী পাঠ ইত্যাদির পাট শেষ হবার পর ব্রিজ উইং-এ রানার পাশে এসে দাঁড়াল তৃষা। বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। তারপর তৃষাই মুখ খুলল, 'আমার ধারণা এখানেই আমরা বিচ্ছিন্ন হতে যাচ্ছি।'

'আপনি কি আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, প্রথম যে ফ্লাইটের টিকিট পাব সেটাতেই।'

'আমেরিকার কোথায়?'

'নিউ ইয়র্ক।' সাগরের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল তৃষা। 'আপার ওয়েস্ট সাইডে আমার একটা ফ্ল্যাট আছে।'

'আপনি সেখানে একা থাকেন?'

'না।' হাসল তৃষা। 'নিশি নামে একটা বিড়াল আর টক্কা নামে একটা হাউন্ডও থাকে আমার সঙ্গে।'

'নিউ ইয়র্কে আবার কবে যাওয়া হবে জানি না, তবে যদি কোনদিন যাই তো ডিনার খাওয়াবার জন্যে যোগাযোগ করতে পারি।'

হ্যান্ডব্যাগ থেকে ছোট এক টুকরো কাগজ বের করে খসখস করে ফোন নম্বর লিখল তৃষা। 'যোগাযোগ করলে সাংঘাতিক খুশি হব। তবে ডিনার আপনি নন, আমি খাওয়াব। প্রাণ বাঁচিয়েছেন, সেজন্যে নয়–ওই ঋণ শোধ হবে না জানি, তাই চেষ্টা করে লাভ নেই। খাওয়াব আপনার সঙ্গ পাবার লোভে।'

হেসে ফেলে রানা বলল, 'আপনি আমার প্রেমে পড়ে গেছেন, এরকম কোন ভুল সংকেত নিজেকে আমি দিচ্ছি না। তারপরও ধন্যবাদ।'

রানার চোখে তাকিয়ে কি দেখল কে জানে, অকস্মাৎ প্রচুর রক্ত উঠে এল তৃষার মুখে। রেইলিংটা ধরল সে, যেন নিজেকে সামলাবার প্রয়োজন অনুভব করছে। হঠাৎ রানার একটা হাত পড়ল তার কাঁধে। নিজের অজান্তে ওর গায়ে হেলান দিল তৃষা। যখন খেয়াল হলো, নিজেকে সরিয়ে নিল না। পরস্পরের গায়ে গা ঠেকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, সাগর দেখছে চুপচাপ। তারপর বিড়বিড় করল তৃষা, 'চলি।' কয়েক পা এগিয়ে থামল সে, ঘুরল। 'বাবার লেদার কেসটা।'

'হ্যাঁ?' রানার কথায় প্রশ্নের সুর, বুঝতে পারছে না তৃষা কি বলতে চায়।

'ওটা আপনার।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ওঅর্ক ডেকে নেমে গেল তৃষা। গ্যাঙওয়ে ডকে নামাতেই তীরে পা রাখল সে, রিপোর্টারদের ভিড়ে হারিয়ে গেল।

*

সিঙ্গাপুর সরকার একটা ফাইভ স্টার হোটেলে সী রবিনের ক্রু ও বিজ্ঞানীদের সংবর্ধনা দেয়ার আয়োজন করেছে, প্রকাশ্যে গর্ব ও গৌরবের অংশীদার হতে রাজি নয় বলে ক্যাপটেন ফ্রান্সিস শেফার্ড সহ সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে জাহাজে একা রয়ে গেছে রানা।

আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছে শিপইয়ার্ড থেকে কাল সকালে ড্রাই ডকে তোলা হবে সী রবিনকে। শিপইয়ার্ড ফোরম্যান ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখে জানিয়েছে মেরামত করতে খুব বেশি হলে দিন তিনেক সময় লাগবে।

বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায় ও নুমা হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটনে গোটা ব্যাপারটা রিপোর্ট করা হয়েছে আজ সকালে। রানা আশা করছে নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন যে-কোন সময় যোগাযোগ করে নিজের প্রতিক্রিয়া জানাবেন। ওর ধারণা, বস্ নিজে টেলিফোন করবেন না, সম্ভবত পরবর্তী নির্দেশ দেয়ার জন্যে সোহেলকে সিঙ্গাপুরে পাঠাবেন।

এ-সব নিয়েই ভাবছে রানা, হঠাৎ গ্লোবালস্টার স্যাটেলাইট ফোনটা বেজে উঠল, একই সঙ্গে একটা টিভি মনিটরে ফুটে উঠল নুমা চীফের ছবি। রানাকে ফোনের রিসিভার তুলতে হলেও, মিস্টার হ্যামিলটন নুমার কমিউনিকেশন সেন্টার থেকে যোগাযোগ করছেন বলে আড়ালে ফিট করা স্পীকার ও মাইক্রোফোনের মাধ্যমে তিনি রানার কথা শুনতে পাচ্ছেন, রানাকে নিজের কথা শোনাতেও পারছেন কোন ফোন রিসিভার ছাড়াই।

'গোটা আমেরিকা জুড়ে প্রধান খবর এখন শুধু সী রবিন,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'রিপোর্টে লিখেছ জাহাজের বেশ কিছু ক্ষতি হওয়ায় তুমি দুঃখিত। মাই সান, এতগুলো মানুষকে বাঁচাবার বিনিময়ে পুরো জাহাজটাও যদি হারাতে, কারও কিছু বলবার ছিল না। জ্বলন্ত ওয়াটার লিলির স্যাটেলাইট ফটো দেখেছি আমরা। এমন ভয়াবহ আগুন আগে কোন জাহাজে লেগেছে কিনা গবেষণার বিষয়। চারদিক থেকে এত বেশি অভিনন্দন আসছে যে নুমার ফোন লাইনে জ্যাম লেগে গেছে। সবার প্রতি, বিশেষ করে তোমার প্রতি, সবাই আমরা কৃতজ্ঞ। ক্যাপটেন শেফার্ড আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছেন, আগুনের আভাটা ঠিক সময়মত তুমি যদি দেখতে না পেতে, লোকগুলোকে হয়তো বাঁচানো যেত না।'

রানা স্বভাবসুলভ বিনয়ের সঙ্গে জানাল, 'এরমধ্যে ভাগ্যের সহায়তাই সবটুকু, আমার কোন কৃতিত্ব নেই।' প্রসঙ্গটা দ্রুত বদলে ফেলল ও, বলল, 'ভাল কথা, রিপোর্টে নিশ্চয়ই দেখেছেন যে ভেসে থাকার প্রয়োজনে আমাদের বেশিরভাগ ইকুইপমেন্ট সাগরে ফেলে দিতে হয়েছে?'

'সাবমারসিবলগুলোও?' অ্যাডমিরালের গলার স্বরে উদ্বেগ।

'তারমানে রিপোর্টের সবটুকু আপনি পড়েননি,' বলল রানা। 'না, সাবমারসিবলগুলো নয়—ভাসিয়ে দিয়েছিলাম, তবে পরে উদ্ধার করেছি।'

'খুশি হলাম। ওগুলো তোমাদের দরকার হবে।'

'দরকার হবে···কি রকম? আমাদের অর্ধেকেরও বেশি রিসার্চ গিয়ার পানিতে পড়ে রয়েছে, এই অবস্থায় বঙ্গোপসাগরের তলায় তেলের উৎস মুখ খুঁজে বের

করার অপারেশন বাতিল না করে উপায় নেই।'

টিভি স্ক্রীনে হঠাৎ রহস্যময় একটুকরো হাসি হাসতে দেখা গেল অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে। 'রানা, এরপর আমি নই, তোমার সঙ্গে কথা বলবেন আমার এক বন্ধু। আশা করি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর তুমি তাঁর কাছ থেকেই পেয়ে যাবে।'

'আপনার বন্ধু? কে তিনি? আমার পরিচিত কেউ?' রানা বিস্মিত। ক্ষীণ একটু সন্দেহও হচ্ছে।

'হ্যাঁ, তোমার পরিচিত–ঢাকা থেকে,' বললেন হ্যামিলটন। সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রীনের একপাশে সরে গেল তাঁর ছবি, সদ্য তৈরি ফাঁকা জায়গায় দেখা গেল একটা সাদা দেয়াল, দেয়ালের গায়ে ফিট করা আরেকটা স্ক্রীন–টিভির ভেতর আরেক টিভি–সেই স্ক্রীনে দেখা যাচ্ছে বিসিআই ঢাকা হেডকোয়ার্টারে নিজের চেম্বারে বসে আছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, হাতে চুরুট, কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া কোঁচকানো।

'সার।' শব্দটা উচ্চারণ করে রানা শুধু জানাল পুরোপুরি মনোযোগী সে।

'তেলখনি আবিষ্কারের প্রজেক্ট আপাতত বাতিল করা হয়েছে, রানা,' বললেন রাহাত খান। 'আমি চাই ডাইভ দিয়ে ওয়াটার লিলিতে নামো তুমি। এখন তোমার কাজ জাহাজটার যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা সার্ভে করে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা, যাতে জানতে পারো কেন ওটায় আগুন লেগেছিল, হঠাৎ ওভাবে ডুবেই বা গেল কেন।' একটু থামলেন বিসিআই চীফ। 'তুমি জানো তো যে টো করার সময় হঠাৎ প্রায় টুপ করে ডুবে গেছে ওটা?'

'জ্বী, জানি। টাগ আর ওটার কোম্পানি অফিসের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল।'

'ওয়াটার লিলি যেখানে ডুবেছে সেখানে ডুব দেয়ার মত প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট একমাত্র সী রবিনের আছে। আরও যদি কিছু দরকার হয়, নুমা হেডকোয়ার্টার সাপ্লাই দিতে পারবে।' ধীরে ধীরে কথা বলছেন রাহাত খান, রানা যাতে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার বুঝে নিতে পারে। 'আমি মনে করি, আগুনটা ছিল স্যাবটাজ। ওভাবে ডুবে যাওয়াটাও স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারছি না। তোমার রিপোর্ট পড়ার পর আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই যে এর সঙ্গে ডক্টর ইসলামের যুগান্তকারী সব আবিষ্কারের সম্পর্ক আছে। কেউ তাঁর এই আবিষ্কারগুলো কেড়ে নিতে চাইছে। স্যাবটাজটা বলে দিচ্ছে তাকে ছোট করে দেখার উপায় নেই। আগে দেখি ওয়াটার লিলি থেকে কি তথ্য-প্রমাণ যোগাড় করতে পারো তুমি, তারপর সিদ্ধান্ত নেব কিভাবে শায়েস্তা করা যায় তাকে বা তাদেরকে। তুমি কোন প্রশ্ন করতে চাও?'

'জ্বী-না,' বলল রানা। 'আপনি কি চাইছেন বুঝতে পারছি, সার। তবে অ্যাডমিরালের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'গুড লাক, রানা।' স্ক্রীন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন রাহাত খান।

'হ্যাঁ, বলো,' বললেন অ্যাডমিরাল, স্ক্রীনের পুরোটা এখন একা তিনিই দখল করে আছেন।

'মিস্টার হ্যামিলটন, আমাদের বড় ক্রেনটা সাগরে ফেলে দিতে হয়েছে...'

'হয় একটা কেনো, নয়তো ভাড়া করো,' রানার কথা শেষ হবার আগেই সমাধান জানিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল।

'বসকে একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি,' বলল রানা। 'ওয়াটার লিলিতে ঠিক কি পাব বলে আশা করতে পারি আমরা? আমি ফায়ার ইন্সুরেন্স ইনভেস্টিগেটর নই বলেই হয়তো এ-ব্যাপারে নিজেকে অজ্ঞ মনে হচ্ছে। তাই বলছিলাম, এমন একজনকে পেলে ভাল হত মেরিন ডিজাস্টার সম্পর্কে যার অভিজ্ঞতা আছে।'

জর্জ হ্যামিলটন হেসে ফেললেন। 'প্রস্তাবটা ঘুরিয়ে করছ–ববি মুরল্যান্ডকে তোমার দরকার, এই তো?'

'দরকার হলেই বা কি, তাকে পাচ্ছি কোথায়,' বলল রানা। 'যতটুকু জানি, আর্কটিকে কি একটা প্রজেক্টে কাজ করছে সে।'

'বলো করছিল। এই মুহূর্তে সে একটা প্লেনে রয়েছে। প্লেনটা সিঙ্গাপুরে পৌঁছাবে কাল সকালে।'

রানা খুশি। 'ধন্যবাদ, মিস্টার হ্যামিলটন। ওকে সত্যি আমার দরকার।'

উত্তরে অ্যাডমিরাল বললেন, 'বন্ধুকে কথা দিয়েছি তোমাদের নতুন এই অ্যাসাইনমেন্টে নুমা সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করবে, রানা। প্রয়োজনে আমাকেও তুমি ফিল্ডে পেতে পারবে।'

রানা না বলে পারল না, 'আপনার এই আন্তরিকতা আমরা কখনও ভুলব না, মিস্টার হ্যামিলটন।'

'আসলে নুমা তোমাদের কাছ থেকে এত দিন ধরে যে উপকার পেয়েছে তার খানিকটা শোধ করার সুযোগ পেয়ে সত্যি আমি খুশি।'

চাকা লাগানো প্রকাণ্ড একটা সুটকেস নিয়ে পরদিন বেলা এগারোটায় সী রবিনে হাজির হলো ববি মুরল্যান্ড। সে যতটা লম্বা, তার কাঁধ দুটো প্রায় ততটাই চওড়া। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা কাঠামোর ওজন একশো পঁচাত্তর পাউন্ড, পুরোটাই পেশির সমষ্টি। কোঁকড়ানো চুল। মুখের গড়ন এমনই, না হাসলেও মনে হবে হাসছে।

'জাহাজে আমাদের নায়ক শালাটা আছে নাকি?'

তার চিৎকার শুনে পাইলটহাউস থেকে ব্রিজে বেরিয়ে এল রানা। দুই বন্ধু পরস্পরকে আলিঙ্গন করল; মুরল্যান্ড তিন গুণ বেশি শক্তিশালী হলেও, জড়িয়ে ধরার সময় প্রতিবার রানা তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে মজা পায়। কুশল বিনিময়ের পর রানা জানতে চাইল, 'শেষবার খবর পেলাম তুমি নাকি বিয়ে করতে যাচ্ছ। কিন্তু দাওয়াতটা পেলাম না কেন?'

অসহায় ভঙ্গিতে হাত দুটো উঁচু করল মুরল্যান্ড। 'অ্যাডমিরাল আমাকে একটা প্রজেক্ট থেকে সরিয়ে দিলেন, কাজেই আমার প্রেমিকাও আমার জীবন থেকে সরে পড়ল।'

'কেন, এরকম ঘটল কেন?'

'কেউ আমরা নিজেদের পেশা ছাড়তে রাজি নই, এটাই আসল কারণ,' বলল মুরল্যান্ড। 'প্রাচীন চীনা লিপির পাঠোদ্ধার করার একটা কাজ পেল সে, সময়

লাগবে তিন বছর। সুযোগটা ছাড়তে রাজি নয়, কাজেই বেইজিং-এ চলে গেল সে।' হাসছে মুরল্যান্ড।

'এতবড় একটা ধাক্কা খেয়েও তুমি হাসতে পারছ দেখে সত্যি ভাল লাগছে...'

'তুমিই একদিন বলেছিলে আমার হাসি আর কান্নাতে নাকি এত মিল যে দুটোকে আলাদা করে চেনা অসম্ভব। তাহলে কি করে নিশ্চিত হচ্ছ আমি কাঁদছি না?'

'তোমার কান্নাও আমার কাছে খুশির খবর, ববি।' গোটা ব্যাপারটা কৌতুক হলেও রানাকে এই মুহূর্তে গম্ভীর ও সিরিয়াস দেখাচ্ছে। 'কাঁদলে মানুষের মন হালকা হয়, দুঃখটা অনেক কম ভোগায়। এসো, তোমার স্যুইটটা দেখিয়ে দিই।'

'স্যুইট না ছাই!' মুখ বাঁকাল মুরল্যান্ড। 'সী রবিনে আগে যেন আসিনি। কেবিন তো নয়, একেকটা মুরগীর খুপরি।'

আধঘণ্টা পর মুখ-হাত ধুয়ে, কাপড়চোপড় পাল্টে রানার কেবিনে ঢুকল মুরল্যান্ড। দেখল ছোট একটা ডেস্কে বসে ওয়াটার লিলির ডেক প্ল্যান স্টাডি করছে রানা। ডেস্কের এক কোণে ছোট একটা ট্রে রাখল মুরল্যান্ড, আসার পথে গ্যালি থেকে দু'কাপ কফি নিয়ে এসেছে।

'ঠিক কোথায় ডুবেছে ওয়াটার লিলি?'

'কোকো চ্যানেলে। ল্যান্ডফল আর কোকো দ্বীপের মাঝখানে,' বলল রানা। 'ওদিকটায় সাগরের তলায় একটা ট্রেঞ্চ পাওয়া গেছে, এখনও নামকরণ হয়নি। ধরো, আন্দামান ট্রেঞ্চ। ওটার পশ্চিম ঢালে।'

'ট্রেঞ্চটার কথা আমিও শুনেছি।' মুরল্যান্ডের ভুরু উঁচু হলো। 'যথেষ্ট গভীর।'

'আমার হিসাবে, ক্রুজ শিপ উনিশ হাজার ফুট নিচে শুয়ে আছে।'

মুরল্যান্ড চোখ জোড়া ভুরুকে অনুসরণ করল। 'কোন্ সাব ব্যবহার করার কথা ভাবছ?'

'ব্লু নেভিগেটর। এ-ধরনের কাজের জন্যেই ওটা তৈরি।'

মনে মনে বিচলিত হয়ে পড়লেও, চেহারায় সেটা ধরা পড়ল না, মুরল্যান্ড বলল, 'অবশ্যই তুমি জানো যে ওটার স্পেসিফাইড ডেপথ সাড়ে উনিশ হাজার ফুট। তাছাড়া, অতটা গভীরে এখনও ওটাকে টেস্ট করা হয়নি।'

'ওটার ডিজাইনাররা নিজেদের কাজ বোঝে কিনা সেটা পরীক্ষা করার মোক্ষম একটা সুযোগ পাচ্ছি আমরা।'

'এখন আমাকে নিজের কেবিনে ফিরে গিয়ে দুশ্চিন্তা-মুক্ত হবার জন্যে মদ খেতে হবে,' বলল মুরল্যান্ড। 'তা না হলে দুঃস্বপ্ন দেখব–সাগরের তলায় সাবমারসিবল বিস্ফোরণে মারা যাচ্ছি।'

মাঝরাত পর্যন্ত দুই বন্ধু গল্প করল। ওয়াটার লিলির আগুন কিভাবে দেখতে পেল, কিভাবে উদ্ধার করল আরোহীদের, সংক্ষেপে সবই জানাল রানা। ভারতীয় কন্টেইনার শিপ ফ্লাইং কার্পেট আর উত্তর কোরিয়ান মিসাইল বহনকারী ফ্রিগেটের কথাও বলল। সবশেষে বলল তৃষা আর তার বাবা ডক্টর ইসলামের কথা।

রানা থামার পর মুরল্যান্ড মন্তব্য করল, 'ভাল ধকলই গেছে তাহলে।'

'তা গেছে। তবে হাতের কাজটা আরও কঠিন হবে বলে আমার ধারণা, ববি,' বলল রানা। 'তৈরি থেকো, আমাদেরকে হয়তো বড় একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়তে হবে।'

কেবিনের কোণে পড়ে থাকা লেদার ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে মুরল্যান্ড জানতে চাইল, 'ডক্টর ইসলামের যে ব্যাগটার কথা বললে, ওটাই কি সেটা?'

'হ্যাঁ।'

'বলছিল ওটাকে নিয়ে এত কাণ্ড ঘটার পর দেখা গেল ভেতরে কিছু নেই?'

'বুচ ক্য সেডি শহর ছেড়ে চলে যাবার পর ব্যাংক ভল্টের যা দশা হয়, খালি।'

ব্যাগটা তুলে এনে কোলে ফেলে গায়ে হাত বুলাল মুরল্যান্ড। 'পুরানো লাগিজ কেন যেন টানে আমাকে।'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমার চোখে পড়েছে।'

ক্যাচগুলোর প্যাঁচ খুলে ঢাকনিটা তুলল মুরল্যান্ড। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দু'পাঁইট তেল হড় হড় করে গড়িয়ে তার কোলে পড়ল, কোল থেকে ঝরে পড়তে শুরু করল কার্পেটে। হতভম্ব মুরল্যান্ড বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে থাকল, তার ট্রাউজার ভিজিয়ে দিয়ে জুতোয় নামছে তেলের ধারা। তারপর মুখ তুলে রানার দিকে চোখ গরম করে তাকাল। 'এই প্রথম জানলাম যে তুমি প্র্যাকটিক্যাল জোক পছন্দ করো।'

রানার চোখে-মুখে নিখাদ বিস্ময়। 'আরে, না!' লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে ডেস্ক ঘুরে মুরল্যান্ডের পাশে চলে এল ও, ঝুঁকে ব্যাগটার ভেতর তাকাল। 'আমার কথা বিশ্বাস করো। সত্যি বলছি, এ সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না। কালও ব্যাগটা যখন চেক করি খালি ছিল। গত চব্বিশ ঘণ্টায় আমি আর চীফ এঞ্জিনিয়ার ফ্রাঙ্ক গার্ডনার ছাড়া জাহাজে আর কেউ ছিল না। চুপিসারে জাহাজে উঠে কেউ ব্যাগটায় তেল ভরে রেখে যাবে, এ আমাকে বিশ্বাস করতে বলো না। তাতে কার কি লাভ?'

'তাহলে ব্যাগের ভেতর তেলটা এল কোত্থেকে?' মুরল্যান্ডের চেহারা থেকে প্রকৃতি প্রদত্ত হাসি-হাসি ভাবটা উধাও হয়ে গেছে। 'জানা কথা ওই তেল আপনাআপনি ওখানে তৈরি হয়নি।'

'বলছি তো, আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই,' বলল রানা। ওর চোখে এমন এক অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটে উঠেছে, যা আগে কখনও দেখা যায়নি। 'তবে কাজে যখন হাত দিতে যাচ্ছি, এই রহস্যেরও সমাধান হতে হবে, তুমি নিশ্চিত থাকো।'

আট

ডক্টর ইসলামের ব্যাগে কে তেল ভরেছে, এই রহস্যের কথা আপাতত ভুলে গিয়ে রানা ও মুরল্যান্ড সী হর্স-এর ইকুইপমেন্ট আর ইলেকট্রনিক সিস্টেম চেক ও টেস্ট করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। সী হর্স হলো সার্ভে ভেসেল-এর অটোনমাস আন্ডারওয়াটার ভেহিকেল, সংক্ষেপে এইউভি। ওয়াটার লিলির কবরের দিকে যাওয়ার পথে ক্যাপটেন শেফার্ড ও জাহাজের এঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে দীর্ঘ

আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে, সাগরের অতটা গভীরে প্রথমেই মনুষ্যবাহী ব্লু নেভিগেটর না পাঠিয়ে অটোনমাস ভেহিকেল পাঠানোই নিরাপদ।

সাত ফুট উঁচু, ছয় ফুট চওড়া, সাত ফুট লম্বা, সী হর্সের ওজন সাত হাজার পাউন্ডের কিছু কম। ওটার বাইরের আবরণ, ত্বকও বলা যেতে পারে, টাইটেইনিয়ামের পুরু স্তর। দূর থেকে দেখলে বিশাল একটা ডিম বলে মনে হবে, পাশগুলো খোলা, দাঁড়িয়ে আছে স্লেজ রানার-এর ওপর। ভেতরে ভিডিও ও স্টিল ক্যামেরা আছে। আছে কমপিউটর হাউজিং। পানির উষ্ণতা, অক্সিজেনের মাত্রা ও লবণাক্ততা পরিমাপের জন্যে আছে সেনসর। একটা ডিসি মোটর চালায় ওটাকে, শক্তি যোগায় ম্যাঙ্গানিজ অ্যালকালাইন ব্যাটারি সিস্টেম। মাদার শিপে সিগন্যাল পাঠাবার ও সিগন্যাল রিসিভ করার আধুনিক সব সিস্টেম ফিট করা। গায়ে আছে বারো সেট আলোর ব্যবস্থা। সায়ান্স ফিকশন মুভিতে যেমন দেখা যায়, ভেহিকেলের একপাশ থেকে বেরিয়ে আছে একটা জটিল রোবোটিক আর্ম বা ম্যানিপিউলেটর। চারশো পাউন্ড নোঙর তোলার শক্তি রাখে ওই যান্ত্রিক হাত, আবার অনুভব শক্তি এত প্রখর যে চায়ের একটা কাপও তুলতে পারে। অন্যান্য রোবোটিক ভেহিকেল যেমন দেখা যায়, পাইলটহাউসের কন্ট্রোল-এর সঙ্গে কর্ড-এর মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে, সী হর্স সেরকম নয়। এটায় গতি সঞ্চার ও ভিডিও ক্যামেরা অপারেট করা হয় কয়েক হাজার ফুট ওপরে ভেসে থাকা সী রবিনের কমান্ড রুম থেকে সিগন্যাল পাঠিয়ে।

রোবোটিক আর্ম অ্যাডজাস্ট করতে মুরল্যান্ডকে সাহায্য করছে রানা, একজন ক্রু এসে জানাল, 'ক্যাপটেন শেফার্ড আপনাকে খবর দিতে বললেন যে টার্গেট থেকে আর মাত্র তিন মাইল দূরে রয়েছি আমরা।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'ক্যাপটেনকে গিয়ে বলো যে একটু পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করছি আমরা, প্লীজ।'

টুলবক্সে একজোড়া স্ক্রুড্রাইভার ফেলে সিধে হলো মুরল্যান্ড, পিঠ পিছন দিকে বাঁকা করে বলল, 'সী হর্স তৈরি, দোস্ত।'

'চলো ব্রিজে গিয়ে দেখি সাইড স্ক্যান সোনার-এ কেমন দেখাচ্ছে ওয়াটার লিলিকে।'

'চলো।'

পাইলটহাউসের ঠিক সামনেই কমান্ড সেন্টার কমপার্টমেন্ট, ক্যাপটেন শেফার্ড আর নুমার কয়েকজন এঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানী ওভারহেড লাইটিং-এর লালচে-নীল আলোয় দাঁড়িয়ে আছেন। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে লাইটের রেড-ব্লু ওয়েভ ব্যান্ড-এ ইন্সট্রুমেন্টের রীডিং পাঠ করা সহজ, বিশেষ করে কাজটা যদি দীর্ঘ সময় ধরে করতে হয়।

ওঁরা সবাই জড়ো হয়েছেন ক্লেইন কোম্পানির সিস্টেম ফাইভ থাউজেন্ড রেকর্ডার-এ ফিট করা কমপিউটর-নিয়ন্ত্রিত স্ক্রীনের সামনে, অপলক চোখে উন্মোচিত হতে দেখছেন বিশ হাজার ফুট নিচের সাগরের তলা। রঙিন ইমেজ, মসৃণ ঢাল পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে; নেমে গেছে আরও গভীর অতলে। মুরল্যান্ডকে

নিয়ে রানা ঢুকছে দেখে ক্যাপটেন শেফার্ড ইঙ্গিতে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন–ওখানে ডিজিটাল রিডআউট-এ দেখা যাচ্ছে টার্গেটে পৌঁছাতে আরও কতটুকু দূরত্ব পেরোতে হবে। 'আরও মাইলখানেক ওপরে উঠতে হবে,' মন্তব্য করলেন তিনি।

'টাগ কি এই জিপিএস পজিশনই দিয়েছিল?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

মাথা ঝাঁকালেন শেফার্ড। 'টো রোপ ছিঁড়ে যাবার পর লাইনার যেখানে ডুবে যায়।'

কমান্ড সেন্টারে উপস্থিত সবার চোখ স্ক্রীনে আটকে আছে। সী রবিনের অনেক পিছনে রয়েছে একটা কেইবল্, জাহাজটাকে অনুসরণ করছে. সেই কেইবলে ফিট করা সেনসর গভীর সাগরতলের ইমেজ পাঠাচ্ছে স্ক্রীনে। অত নিচে সাগরের ঢাল মরুভূমির মত দেখতে, খয়েরি পলি জমে আছে; এবড়োখেবড়ো আকৃতির কোন পাথর বা পাহাড় দেখা যাচ্ছে না। সবার পেশিতেই টান পড়ছে, কারণ কিছু একটা দেখার আশায় অপেক্ষা করছে ওঁরা।

'পাঁচশো গজ,' বিড়বিড় করে জানালেন শেফার্ড।

সবাই চুপ করে গেল।

'কিছু একটা আসছে,' বললেন শেফার্ড, স্ক্রীনটা তিনিই সবার চেয়ে ভালভাবে দেখতে পাচ্ছেন।

ধীরে ধীরে রেকর্ডারে নিরেট একটা জিনিস আকৃতি পেতে শুরু করল, দেখেই বোঝা গেল মানুষের তৈরি। আউটলাইন অসমান ও ভাঙাচোরা। আকারে খুব ছোট, বিশাল ক্রুজ লাইনারের যে ইমেজ দেখতে পাবে বলে আশা করছে তার সঙ্গে কোনভাবেই মিলছে না।

'হ্যাঁ, ওটাই,' জোর দিয়ে বলল রানা।

শেফার্ড এক গাল হেসে বললেন, 'একবারের চেষ্টাতেই পেয়ে গেছি।'

'কিন্তু ওয়াটার লিলির সাইজের সঙ্গে তো মিলছে না,' প্রতিবাদের সুরে বলল মুরল্যান্ড।

ক্যাপটেন স্ক্রীনের দিকে একটা আঙুল তুললেন। 'ববি ঠিক বলছে। আমরা ওটার মাত্র একটা অংশ দেখতে পাচ্ছি। পরের অংশটা ওই আসছে।'

স্ক্রীনের দিকে চোখ. রানাকে চিন্তিত দেখাল। 'ওয়াটার লিলি ভেঙে গেছে, হয় নামার সময়, কিংবা তলার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে।'

জাহাজের বড় একটা অংশকে সরে এসে স্ক্রীনে জায়গা করে নিতে দেখা গেল, ক্যাপটেন ওটাকে ওয়াটার লিলির স্টার্ন বলে আন্দাজ করলেন। জাহাজের দুই অংশের মাঝখানে আবর্জনার স্তূপ নিয়ে বিশাল একটা মাঠ দেখা যাচ্ছে–আবর্জনা বলতে ছোট-বড় নানা আকারের জিনিস-পত্র, এখন যেগুলোকে আর চেনার উপায় নেই, ছড়িয়ে পড়েছে যেন কোন টর্নেডোর আঘাতে।

একটা নোট প্যাডে জাহাজটার প্রতিটি অংশের স্কেচ এঁকে রাখছে মুরল্যান্ড। 'ভেঙে তিন টুকরো হয়ে গেছে।'

স্কেচগুলোর সঙ্গে সোনার ইমেজ মেলাল রানা। একটার সঙ্গে আরেকটার দূরত্ব প্রায় সিকি মাইল।

শেফার্ড বললেন, 'আগুনে পুড়ে জাহাজের ইন্টারন্যাল স্ট্রাকচার দুর্বল হয়ে পড়াতেই সম্ভবত তলিয়ে যাবার সময় ভেঙে যায়।'

'নতুন কিছু নয়,' সায়ান্টিফিক টীমের একজন বললেন। 'টাইটানিকও ডুবে যাবার সময় ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল।'

'কিন্তু টাইটানিক নেমে গিয়েছিল এক্স্ট্রীম একটা অ্যাঙ্গেল ধরে,' ক্যাপটেন শেপার্ড বললেন। 'টাগ বোটের ক্যাপটেনের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, ওয়াটার লিলিকে যিনি টো করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর কথা হচ্ছে, ক্রুজ শিপ অত্যন্ত দ্রুত ডুবেছে, খুব বেশি হলে মাত্র পনেরো ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে। টাইটানিক ডুবেছিল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে।'

সামনের জানালা দিয়ে সাগরের দিকে তাকাল মুরল্যান্ড। 'সেক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য যুক্তি হলো, ওয়াটার লিলি অক্ষত অবস্থায় ডোবে, ভেঙে টুকরো হয় তলার সঙ্গে সংঘর্ষে। ওটার স্পীড ছিল সম্ভবত ঘণ্টায় ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে।'

একমত হতে না পেরে মাথা নাড়ল রানা। 'তাহলে ভাঙা ছোট টুকরোগুলো–আবর্জনাই বলা চলে–আরও কম জায়গা দখল করত। কিন্তু চারদিকে যতদূর চোখ যায় সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে ওগুলো।'

'তাহলে ডোবার সময় ওটা ভাঙল কি কারণে?' প্রশ্ন করলেন ক্যাপটেন শেফার্ড, বিশেষ কাউকে লক্ষ্য করে নয়।

'আমাদের অপেক্ষা করতে হবে,' বলল রানা। 'দেখা যাক সী হর্স রহস্যটার সমাধান দিতে পারে কিনা।'

হালকা নীল পুব আকাশের গায়ে চোখ-ধাঁধানো কমলা সূর্য উঠছে। ঠিক এই সময় নতুন বসানো একটা ক্রেইনের নিচে ঝুলতে দেখা গেল সী হর্সকে। সাগর আজ শান্তই, কোন ঢেউই তিন ফুটের ওপরে উঠছে না।

সী রবিনের পিছনে দাঁড়িয়ে জাহাজের সেকেন্ড অফিসার সী হর্সকে পানিতে নামানোর অপারেশন পরিচালনা করছে। নীলচে সবুজ বঙ্গোপসাগরে ধীরে ধীরে নামানো হলো এইউভি-কে। ওটাকে ভাসতে দেখে একটা সুইচ অ্যাকটিভেইট করা হলো, সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনিক স্ন্যাপ রিলিজ হতেই লিফটিং কেইবল্ মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এল।

কমান্ড সেন্টারের ভেতর, জয়স্টিকের চারধারে ভিড় করে থাকা এক গাদা নব আর সুইচসহ একটা কনসোল-এর সামনে বসে রয়েছে মুরল্যান্ড। এখানে বসেই সাগরের অতলতলে সী হর্সকে পথ দেখাবে ও। পোনে চার মাইল নিচে এইউভি-কে পরিচালনা করার যোগ্যতা তারই সবচেয়ে বেশি, যেহেতু প্রোবটার কমপিউটর সফটঅয়্যার সে নিজে তৈরি করেছে, ওটা বানাবার সময় প্রজেক্টের চীফ এঞ্জিনিয়ারও ছিল সে-ই।

তার পাশে সামনে কী বোর্ড নিয়ে বসেছে রানা, এই মুহূর্তে এইউভি-র ভেতরে বসানো কমপিউটরকে কয়েকটা নির্দেশ দিচ্ছে। মুরল্যান্ড ভেহিকেলটাকে চালাবে, রানা অপারেট করবে ওটার আলো আর ক্যামেরা। ওদের পিছনে এক পাশে টেবিলে বসে ওয়াটার লিলির কনস্ট্রাকশন প্ল্যান-এ চোখ বুলাচ্ছে জিনা

ক্যারল। ডিজাইনের এই কপিটা জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে ই-মেইলের সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

জিনা ক্যারলকে প্রথমে দেখে বোঝা যাবে না যে সে মেয়ে। প্যান্ট-শার্ট তো পরেই, পরেও ছেলেদের স্টাইলে। হাবভাবে বিন্দুমাত্র জড়তা বা মেয়েসুলভ সংকোচ একেবারেই নেই। চুলও খুব ছোট। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ, বিয়ে করেনি, করবে বলেও মনে হয় না। নিজের কাজের প্রতিই তার সমস্ত নিষ্ঠা, নুমার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেরিন বায়োলজিস্ট সে।

মুখ তুলে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল জিনা। 'জাহাজটা যদি মাটির নিচে ডেবে গিয়ে থাকে, দেখার মত খুব বেশি কিছু সী হর্স পাবে বলে মনে হয় না।'

'সেটা ওখানে পৌঁছানোর পর জানা যাবে।'

প্রোব পানিতে তো নামানো হয়েছে, কিন্তু সাগরের তলায় পৌঁছাতে সময় লাগবে ওটার সাড়ে তিন ঘণ্টা। যে-কোন আন্ডারওয়াটার সার্চ প্রজেক্টে কাজ করতে হলে ধৈর্য ধরতে জানাটা মস্ত গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়। কাজটা আসলে সত্যি খুব একঘেয়ে।

সময়টা ওরা কফি খাবার ফাঁকে গল্প করে পার করে দিল। দশ মিনিট পরপর প্রোব-এর অলটিমিটার থেকে আসা ডিজিটাল নম্বর দেখে দূরত্ব ঘোষণা করছে মুরল্যান্ড।

'সাগরের তলা এখন মাত্র পাঁচশো ফুট নিচে।'

'নিচের সারির লাইটগুলো জ্বালছি,' বলল রানা।

সী হর্সের নামার গতি কমাল মুরল্যান্ড। এই মুহূর্তে ওটার গতি প্রতি সেকেন্ডে দু'ফুট। জাহাজের ধ্বংসাবশেষ একশো গজ বাকি থাকতে প্রোব দাঁড় করিয়ে ফেলল সে।

'গভীরতা?' জানতে চাইলেন শেফার্ড।

'উনিশ হাজার সাতশো ষাট ফুট,' জবাব দিল মুরল্যান্ড। 'দৃষ্টিসীমা খুব ভাল, প্রায় দুশো ফুট পর্যন্ত।'

পানির প্রচণ্ড চাপে সী হর্সের গতি এক নটের সামান্য বেশি।

ক্যাপটেন শেফার্ড কমপিউটর স্ক্রীনে চোখ রেখে সী রবিনকে সারফেসের এমন জায়গায় নিয়ে এসে থামালেন, পোনে চার মাইল গভীরতায় ওয়াটার লিলি এখন সরাসরি ওটার নিচে।

'টার্গেট ডেড অ্যাহেড,' ঘোষণা করল মুরল্যান্ড।

ধীরে ধীরে বিধ্বস্ত জাহাজটার অবশিষ্টাংশ মনিটরে ধরা পড়ছে। রানা বোতামে চাপ দিতেই ওয়াটার লিলির বো সেকশন প্রায় পুরোটাই আলোকিত হয়ে উঠল। 'ক্যামেরা ও টেপ, দুটোই চালু করলাম।'

এখন ওরা দেখতে পাচ্ছে ওয়াটার লিলি পুরোপুরি খাড়া হয়ে বসে নেই, পঁচিশ ডিগ্রি কোণ তৈরি করে বিশ্রাম নিচ্ছে পলির ভেতর–নিচের খোল প্রায় তলা পর্যন্ত বের করে।

খোলটা যেখানে ভেঙেছে সেখান থেকে দশ ফুট দূরে এইউভি-কে স্থির করাল মুরল্যান্ড।

'জুম;' নির্দেশ দিল রানা।

দোমড়ানো, ভাঙাচোরা, এবড়োখেবড়ো অংশটার ওপর ফোকাস করল ক্যামেরার লেন্স।

'হোল্ড ইট!' দ্রুত বলল রানা। 'ইন্টারেস্টিং তো!'

সী রবিনের একজন ক্রু বলল, 'এটা আগুনের কাজ নয়।'

'এই ভাঙচুরটা ভেতর থেকে করা হয়েছে,' বলল রানা। 'তৈরি ফাঁকটার কিনারাগুলো বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে।'

'একটা ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হয়েছিল?' হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়ে প্রশ্ন করলেন শেফার্ড।

মাথা নাড়ল রানা। 'ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিন দাহ্য ফসিল ফুয়েলে চলে না।' মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল ও। 'ববি, খোল বরাবর নিয়ে চলো আমাদের, দেখতে চাই ওয়াটার লিলি মাঝখানে ঠিক কোথায় ভেঙেছে।'

আরও দুশো ফুট এগোবার পর দ্বিতীয় ফাঁকটার সামনে চলে এল সী হর্স, এটার আকার আরও বড়। এটাও ইঙ্গিত দিচ্ছে বিস্ফোরণ ভেতরেই ঘটেছিল, তাতে খোলের স্টীল প্লেট বাইরের দিকে ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে।

'ফাঁকের ভেতর এয়ার-কন্ডিশনিং ইকুইপমেন্টের হাউস ছিল,' বলল জিনা। 'ওখানে এমন কিছু থাকার কথা নয় যাতে এ-ধরনের কোন বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।'

সী হর্সকে ওপরে তুলল মুরল্যান্ড। ওয়াটার লিলির বোট ডেক দেখতে পাচ্ছে ওরা। এখনও কিছু পোড়া লাইফবোট রয়ে গেছে এদিকে, বাকিগুলো ছিটকে পড়েছে কোথাও। জাহাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া খোলের অংশবিশেষের ওপর আলো ও ক্যামেরা তাক করা হলো। মোটা মোটা ভাঙা পাইপ, মোচড়ানো বীম, তোবড়ানো ও ফাটা ডেক প্লেইটিং চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে, এটা যেন পুড়ে নিঃশেষিত একটা অয়েল রিফাইনারি। নব্বুই ডিগ্রি ঘুরে তিনশো গজ এগোবার সময় দেখা গেল এদিকের তলায় ছড়িয়ে আছে সম্ভাব্য সব রকম আবর্জনা, বেশিরভাগই এমন পোড়া পুড়েছে যে চেনার উপায় নেই কোন্‌টা কি। শুধু ছড়ানো-ছিটানো সিরামিক-এর স্তূপগুলো টিকে গেছে।

'স্টার্ন কামিং আপ,' বলল মুরল্যান্ড। আবর্জনা ভর্তি মাঠ পিছিয়ে পড়ল মনিটরে, ডোবা ওয়াটার লিলির শেষ অংশটা এইউভি-র তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

'একবারও ভাবিনি যে এটাকে আবার দেখতে পাব!' বিজ্ঞানীদের একজন, শেলী বারবি, বিড়বিড় করে বলল; এই জ্বলন্ত জাহাজ থেকে ক্রুদের সঙ্গে সে-ও দু'হাজার প্যাসেঞ্জারকে উদ্ধারে সাহায্য করেছে।

'ফরওয়ার্ড সেকশন, ববি,' বলল রানা। 'স্টার্ন যেখানে জাহাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।'

'কামিং অ্যারাউন্ড,' সাড়া দিয়ে বলল মুরল্যান্ড।

'নিচে নেমে পলির পাঁচ ফুট ওপরে রাখো সী হর্সকে,' বলল রানা। 'আমি তলাটা দেখতে চাই।'

মুরল্যান্ডের কমান্ড পেয়ে সী হর্স খাড়া হয়ে থাকা স্টার্নকে ঘিরে এগোল। অত্যন্ত সাবধানে, আবর্জনার ভেতর ও ওপর দিয়ে নিয়ে এসে ওটাকে থামাল যেখানে জাহাজের স্টার্ন সেকশন ভেঙে গেছে। প্রকাণ্ড স্টীল হাল-এ পলি জমেনি। সবার চোখে পরিষ্কার ধরা পড়ল, ভেঙে ও ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন হবার জায়গাগুলো নিচের দিকে গুটিয়ে ও ভাঁজ খেয়ে আছে।

'সন্দেহ নেই, কাজটা এক্সপ্লোসিভ-এর,' মন্তব্য করল রানা।

'তলাটা যেন বিস্ফোরিত হয়ে খসে পড়ে,' বলল মুরল্যান্ড। 'বোধহয় সেজন্যেই প্রায় চোখের পলকে ডুবে যায় ওয়াটার লিলি।'

'এ থেকে প্রমাণিত হয় ওয়াটার লিলিতে আগুনটা কেউ ধরিয়েছিল, ওটা কোন দুর্ঘটনা ছিল না। পোড়া জাহাজ যাতে কেউ পরীক্ষা করতে না পারে, তাই পরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওটাকে ডুবিয়ে দেয়া হয়।'

'আ সাউন্ড থিওরি,' বলল হাইড্রোগ্রাফার মাইকেল কনকর্ড। 'কিন্তু নিরেট প্রমাণ কোথায়? আদালতকে ব্যাপারটা বিশ্বাস করানো যাবে কি দিয়ে?'

রানা চিন্তিত, তাকিয়ে আছে মনিটরের দিকে। 'সী হর্স তার কাজ ভালভাবেই শেষ করল, জানিয়ে দিল ওয়াটার লিলি নিজে থেকে ধ্বংস হয়নি, প্রকৃতির মারেও মরেনি। অপরাধীর পরিচয় ও ঠিকানা জানতে হলে গভীরে ডুব দিতে হবে আমাদের।'

'গভীরে ডুব দিতে হবে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড, তার হাসি দেখে মনে হলো জবাবটাও সে জানে। 'কিভাবে?'

'তুমি আর আমি,' বলল রানা। 'ব্লু নেভিগেটর নিয়ে ওখানে নামছি। প্রমাণ সংগ্রহ করার এটাই একমাত্র উপায়।'

ফোর সিটার সাবমারসিবল ব্লু নেভিগেটরের নার্ভ সেন্টার হলো একটা গোলাকার টাইটেইনিয়াম অ্যালয় বল, ওই বলে পাইলট আর টেকনিশিয়ানরা বসে নিয়ন্ত্রণ করে নিজেদের লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম, বাইরে বসানো লাইটিং, ক্যামেরা ও একজোড়া রোবোটিক আর্ম বা যান্ত্রিক বাহু। বৃত্তাকার নার্ভ সেন্টারের চারধারে রয়েছে টিউব আকৃতির প্রেশার হাউজিং–অসংখ্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, ব্যাটারি আর কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট জায়গা পেয়েছে ওখানে।

এই অভিযানে ব্লু নেভিগেটরে ওরা তিনজন রয়েছে। রানা ও মুরল্যান্ডের সঙ্গে জিনা ক্যারল যোগ দিয়েছে সাগরের গভীরতম তলদেশে মেরিন অরগানিজম স্টাডি করার সুযোগ পাবার আশায়। তাছাড়া, ডিজাইনটা খুঁটিয়ে দেখায় ওয়াটার লিলির কোথায় কি থাকার কথা ওদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে ভাল জানে।

দু'হাজার ফুট গভীরে নেমে আসার পর ওদের মনে হলো পৃথিবীর বাইরে এ সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে চলে এসেছে। ছয় ইঞ্চি লম্বা একটা মাছের গায়ে এত রকমের রঙ, সে-সব রঙের উজ্জ্বলতা এত বেশি, দেখেও যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না। শুঁড়সহ শরীরটা একশো বিশ ফুট লম্বা এমন জলজ প্রাণী যেমন আছে, তেমনি আছে টেনেটুনে এক ইঞ্চি লম্বা খুদে প্রাণ। জেলিফিশগুলো এত স্বচ্ছ, তাদের শরীরের ভেতর দিয়ে বহুদূর দৃষ্টি চলে। কোন কোন জেলিফিশের পেট

সংখ্যায় একশোরও বেশি। আবার একই সঙ্গে কয়েক ধরনের আলো জ্বালে এমন মাছও চোখে পড়ল।

পরবর্তী কয়েক হাজার ফুট নিচে নামার সময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল আর নোট প্যাডে খস খস করে কি সব লিখল জিনা, বিচিত্র প্রাণিজগৎ তাকে উত্তেজিত ও বিস্মিত করে তুলেছে।

'বটম কামিং আপ,' এক সময় ঘোষণা করল রানা, পাইলটের সিটে ও-ই বসে রয়েছে। মনিটরে চোখ রেখে ব্লু নেভিগেটরকে অপারেট করছে ও। তলা থেকে বিশ ফুট ওপরে স্থির হলো ওদের সাব।

'এবার?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

প্রায় চার মাইল ওপরে রয়েছেন ক্যাপটেন শেফার্ড, কমান্ড সেন্টার থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। 'তলায় পৌঁছেছি। দিক নির্দেশনা দরকার।'

'আপনি ওটাকে দু'শো গজ দক্ষিণ-পুবে পাবেন,' স্পীকফোনে ভেসে এল ক্যাপটেনের গলা। 'একশো চল্লিশ ডিগ্রি কোর্স ধরে এগোলে পিছনের অংশে পৌঁছাতে পারবেন, ওটা যেখানে ভেঙে গেছে।'

চোদ্দ মিনিট পর জাহাজের ভেঙে যাওয়া অংশটা জানালা দিয়ে দেখতে পেল ওরা। মনিটরে দেখে আসলে কিছুই বোঝা যায়নি, সামনে থেকে সরাসরি তাকিয়ে আগুনের সর্বনাশা কাণ্ড দেখে আঁতকে উঠতে হলো তিনজনকেই। এমন কোন আকৃতি নেই যেটা চেনা যাচ্ছে। এটা যে এক সময় একটা জাহাজ ছিল সেট বোঝা যাচ্ছে ওয়াটার লিলির খোলের আউটলাইন দেখে।

'কোথায় যাব?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ওয়াটার লিলির ডেক প্ল্যানে আরেকবার চোখ বুলিয়ে এক জায়গায় একট বৃত্ত আঁকল জিনা, তারপর সেটা ধরিয়ে দিল রানার হাতে।

'আমরা ওয়াটার লিলির ভেতর ঢুকছি,' সী রবিনকে মেসেজ পাঠাল রানা।

স্পীকফোন থেকে কোন শব্দ বেরুচ্ছে না।

'অদ্ভুত,' বলল রানা। 'ওঁরা জবাব দিচ্ছেন না।'

মুরল্যান্ড বলল, 'সময় নষ্ট না করে আমরা আমাদের কাজটা শেষ করি আগে। বোঝাই তো যাচ্ছে যে কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্টে ত্রুটি দেখা দিয়েছে।'

তারপরও মিনিট দুয়েক চেষ্টা করল রানা। সারফেস থেকে সী রবিন ওর মেসেজের উত্তর দিচ্ছে না। কাঁধ ঝাঁকাল ও, অক্সিজেন গজ আর লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম চেক করল। তলায় আরও এক ঘণ্টা থাকতে পারবে ওরা। 'ভেতরে ঢুকছি,' সঙ্গীদের বলল ও।

জাহাজটার ভেতর এরই মধ্যে কলোনি বানিয়ে ফেলেছে বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণী। এত গভীরেও প্রচুর চিংড়ি মাছ দেখে জিনি রীতিমত হাঁ হয়ে গেল। একটা মাছের পিছন দিকটা হুবহু যেন একটা ইঁদুর।

পোড়া, বিধ্বস্ত জাহাজের ভেতরটা দেখে ভয় লাগল। সামান্য স্রোত আছে, তবে রানার তাতে ব্লু নেভিগেটরকে সিধে বা স্থির রাখতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। ডেক ও বাল্কহেডের যে-টুকু অবশিষ্ট আছে, অন্ধকার থেকে অস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসছে।

'ফোর্থ ডেকে ওঠো, রানা,' বলল জিনা। 'একটা শপিং মল হয়ে চ্যাপেলে পৌঁছাতে পারবে।'

থ্রাস্টার ব্যবহার করে ব্লু নেভিগেটরকে সাবধানে ওপরে তুলছে রানা। চতুর্থ ডেকে উঠল ওরা ঠিকই, কিন্তু দুজোড়া উজ্জ্বল সার্চলাইটের আলোয় দুর্লজ্ঘ্য বাধা দেখতে পেয়ে থামতে বাধ্য হলো। শত শত মোটা পাইপ গলে গেছে, ছিন্নভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং সহস্র শুঁড়ের মত ঝুলে আছে। চারদিকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে ধ্বংসকাণ্ডের ছবি নিচ্ছে মুরল্যান্ড।

'এটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়,' বিড়বিড় করল সে।

'পাশ কাটাব না, ভেতর দিয়ে ঢুকব,' বলল রানা। কাজটা করেও দেখাল ও। তাড়াহুড়ো না করে সাবধানে পাইপগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে নিল। ওগুলোর সঙ্গে ঘষা খেলো ব্লু নেভিগেটর, সঙ্গে সঙ্গে ঝুর-ঝুর করে ঝরে পড়ল সব, আসলে পুড়ে ভঙ্গুর হয়ে আছে।

খোলা থ্রী-ডেক অ্যাভিনিউয়ের সুসজ্জিত বাটিক শপগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। পোড়া বাল্কহেডগুলো কোন রকমে চেনা যাচ্ছে শুধু।

'এখানে দেখার কিছু নেই,' ম্লান সুরে বলল মুরল্যান্ড।

'চ্যাপেলটা দেখে যাই,' বলল রানা।

'এই জঞ্জালের মধ্যে চিনব কিভাবে?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

জবাব দিল জিনা। 'প্ল্যানের সঙ্গে মিলছে এমন কিছু কিছু জিনিস তো পাচ্ছি। আর ত্রিশ ফুট এগিয়ে থামো তো দেখি।'

তিন মিনিট পর আবার যেখানে থামল ব্লু নেভিগেটর, আশপাশে অসংখ্য স্তূপ হয়ে থাকা ভিজে ছাই ছাড়া আর কিছু দেখার নেই। একটা পাথরের বেদি দেখা গেল, কালো হয়ে গেছে, একমাত্র এটা দেখেই ধারণা করা যায় জায়গাটা জাহাজের চ্যাপেল ছিল। ছাই ও আবর্জনার ভেতর মেকানিক্যাল বাহু ডুবিয়ে খুঁজছে রানা, যদি কিছু পায় এই আশায়। এর জন্যে কয়েকবার জায়গা বদলও করতে হলো। পঁচিশ মিনিট পার হয়ে গেল, কপালে ইন্টারেস্টিং কিছু জুটল না। তারপর রানার চোখে পড়ল তোবড়ানো ও মোচড় খাওয়া ডেকের একটা অংশে অদ্ভুতদর্শন কি যেন একটা পড়ে রয়েছে। জিনিসটা দু'ইঞ্চি লম্বা, দু'ইঞ্চি চওড়া। কি কারণে কে জানে, ওটা পোড়েনি। পোড়েনি মানে, জিনিসটা মসৃণ ও সুডৌল লাগছে। ওটার রঙও ভারি অদ্ভুত বলতে হবে। কালো নয়, নয় ছাই রঙা, বরং বলা যায় হালকা সবুজ।

'সময় শেষ হয়ে আসছে,' সাবধান করে দিল মুরল্যান্ড। 'সারফেসে নিরাপদে পৌঁছাবার মত যথেষ্ট রিজার্ভ অক্সিজেন নেই আমাদের।'

'যা খুঁজছিলাম তা বোধহয় পেয়ে গেছি,' বলল রানা। 'আর পাঁচ মিনিট লাগবে।'

ছাইয়ের ভেতর অর্ধেক ডুবে থাকা অদ্ভুত আকৃতির জিনিসটা যান্ত্রিক বাহুর সাহায্যে ধীরে ধীরে, সাবধানে বের করা হলো। এখন ওটা ওপরে তোলা হচ্ছে, ফেলা হলো আর্টিফ্যাক্ট বাস্কেটে।

'চলো হে, ফিরি এবার!' তাগাদা দিল মুরল্যান্ড।

সাবমারসিবলকে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে নিল রানা, তারপর শপিং অ্যাভিনিউ এরিয়ার দিকে তাক করল।

ওয়াটার লিলির পোড়া কঙ্কাল থেকে বেরিয়ে এসে ওপরে ওঠার সময় আবার মাদারশিপ সী রবিনের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। কোন সাড়া না পাওয়ায় ওর চোখ দুটোয় পলক পড়ছে না। কিছুক্ষণ এটা-সেটা পরীক্ষা করল ও, তারপর বলল, 'কমিউনিকেশন কাজ না করার কোন কারণ দেখছি না আমি। সিস্টেমটার এদিকে অন্তত কোন ত্রুটি নেই। আর ওপরে ওদের ইকুইপমেন্ট এত ভাল যে এ-ধরনের সমস্যা হবার কথা নয়, হলেও মেরামত করা খুব সহজ।'

'কত জায়গায় কত বিচিত্র ঘটনা ঘটছে, এটা হয়তো সেরকম একটা,' কৌতুক করে বলল মুরল্যান্ড।

'আমিও এটাকে সিরিয়াস কোন সমস্যা বলে মনে করছি না,' বলল জিনা।

কথা না বলে একটু পর পরই সী রবিনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে গেল রানা। ইমার্জেন্সির সময় লাগতে পারে ভেবে ব্যাটারি বাঁচানোর জন্যে বাইরের সমস্ত আলো আর সব ক'টা ক্যামেরা বন্ধ করে দিল ও। এরপর পাইলটের আসন মুরল্যান্ডকে ছেড়ে দিয়ে তার সিটে বসে চোখ বুজে বিশ্রাম নিতে চেষ্টা করল।

তিন ঘণ্টা পর গভীর কালো পানি ধীরে ধীরে রঙ বদলে গভীর নীল হয়ে উঠল আবার। ওভারহেড ভিউ পোর্ট দিয়ে সাগরের অশান্ত সারফেস দেখতে পেল ওরা, ঝলমল ও চিক চিক করছে। এরপর এক মিনিটও লাগল না, ব্লু নেভিগেটর সারফেস ভেঙে পানির ওপর মাথা তুলল। দেখে সবাই খুশি হলো ঢেউগুলো আসছে মাত্র দুই কি আড়াই ফুট উঁচু হয়ে। সাবমারসিবলের বেশির ভাগটাই সারফেস থেকে কয়েক ফুট নিচে ডুবে থাকায় ঢেউয়ের ধাক্কায় খুব একটা ঝাঁকি খাচ্ছে না, তেমনি দোলও খাচ্ছে না।

সার্ভে-শিপ সী রবিনের সঙ্গে এখনও কোন যোগাযোগ নেই ওদের। জাহাজটাকে ওরা দেখতে পাচ্ছে না, কারণ ওদের সবগুলো ভিউ পোর্ট পানির নিচে রয়েছে, সাব-এর ক্রুরা শুধু ওপরের দিকটা দেখতে পাচ্ছে। টপ পোর্ট থেকে দিগন্ত বরাবর কিছু দেখার কোন সুযোগ নেই। ডাইভারদের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা, তারা এসে লিফটিং কেইবল্ আটকাবে ব্লু নেভিগেটরে। কিন্তু দশ মিনিট পরও তাদের কাউকে আসতে দেখা গেল না। প্ল্যান মত কিছুই ঘটছে না।

'এটা কেমন কথা?' রানা যতটা না বিরক্ত তারচেয়ে বেশি চিন্তিত। 'কোন যোগাযোগ তো নেইই, ডাইভিং টীমও পাঠাচ্ছে না। সবাই কি একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল?'

'সী রবিন হয়তো ডুবে গেছে,' হাই তোলার সময় কৌতুক করল মুরল্যান্ড।

'এরকম অলক্ষুণে কথা বোলো না তো!' জিনার কণ্ঠে মৃদু তিরস্কার।

তার দিকে ফিরে নিঃশব্দে হাসল রানা। 'চিন্তা কোরো না, এরকম শান্ত সাগরে সী রবিনের ডোবার কোন সম্ভাবনা নেই।'

'ঢেউ যখন আমাদের টপ ছুঁতে পারছে না, হ্যাচ খুলে চারদিকটা দেখি না কেন?'

'ভাল প্রস্তাব,' বলল জিনা। 'পুরুষদের গায়ের গন্ধে শ্বাস কষ্টে ভুগছি আমি।'

'কথাটা তুমি আগে বলবে তো,' নরম, আদরের সুরে বলল মুরল্যান্ড। নতুন একটা কার অডর স্প্রে-র বোতল উঁচু করে দেখাল সে। বোতামে চাপ দিতে ব্লু নেভিগেটরের ভেতরটা কুয়াশার মত ঝাপসা হয়ে গেল। 'নোংরা বাতাস–দূর হ! দূর হ!'

হেসে উঠে সরু টানেলের ভেতর দাঁড়াল রানা, তারপর হ্যাচের ঢাকনিটা ঠেলে খুলে ফেলল। হ্যাচের ওপর মাথা তুলে প্রথমে তাজা বাতাসে বুক ভরে নিল ও, তারপর সার্ভে শিপ সী রবিন ও ডাইভ রিকভারি টীম সহ ছোট বোটগুলোর খোঁজে চারদিকে তাকাল। ওর চোখ ধীরে ধীরে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে গোটা দিগন্ত চষে ফেলল।

যে আবেগ ও অবিশ্বাসের প্রবল ঝড় বয়ে গেল রানার দেহ-মন জুড়ে তার বর্ণনা দেয়া এক কথায় অসম্ভব। স্তম্ভিত বিষয়ে ওর সারা শরীর অবশ হয়ে গেছে।

সাগর খালি। সী রবিন গায়েব। জাহাজটার যেন কোন অস্তিত্বই ছিল না কোন কালে।

নয়

ব্লু নেভিগেটর সাগরের তলায় পৌঁছানোর একটু পরই সী রবিনে এল ওরা। ক্রুরা সবাই যে-যার রুটিন ডিউটি করছে, সায়ান্টিফিক টীম রানা ও মুরল্যান্ডের ইনভেস্টিগেশন মনিটরিং করছে কমান্ড সেন্টারে বসে। হাইজ্যাকিঙের ঘটনাটা এত দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটল যে চোখের সামনে সব দেখেও সী রবিনের কেউ ব্যাপারটা ধরতেই পারল না।

ক্যাপটেন শেফার্ড নিজের চেয়ারে বসে আছেন, হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে তাকিয়ে আছেন মনিটরে; পাশে দাঁড়িয়ে ডাফ টিমোথি রেডার ইকুইপমেন্টে চোখ বুলাবার সময় স্ক্রীনে দেখতে পেল দ্রুতগামী একটা ব্লিপ।

'দক্ষিণ-পুব থেকে আমাদের দিকে কিছু আসছে,' জানাল সে।

মনিটরের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে শেফার্ড বললেন, 'সম্ভবত একটা যুদ্ধজাহাজ। কমার্শিয়াল শিপিং লাইন থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে রয়েছি আমরা।'

'যুদ্ধ জাহাজ? এদিকে?' টিমোথি বিস্মিত।

'প্রথমে বলে নিই, বাপের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্যে বুশ ভায়া যা শুরু করেছেন, তা যারা সমর্থন করে না আমি তাদের দলে,' বললেন শেফার্ড। 'ইরাক আক্রমণ করা স্রেফ গোয়ার্তুমি আর অযৌক্তিক। কে জানে, হয়তো বঙ্গোপসাগরেও যুদ্ধ জাহাজ পাঠাচ্ছে পেন্টাগন। ওদের মতিগতি বোঝা সত্যি কঠিন।'

'তবে, ক্যাপটেন, এটাকে আমার যুদ্ধজাহাজ বলে মনে হচ্ছে না,' বলল টিমোথি। 'স্পীড খুব বেশি, আসছেও সোজা আমাদের দিকে।'

ক্যাপটেনের ভুরু উঁচু হলো। আর কোন কথা না বলে একজোড়া

বিনকিউলার তুলে নিয়ে ব্রিজ উইং-এ বেরিয়ে এলেন। সেভেন-বাই-ফিফটি লেন্স-এর সাহায্যে দূরে উজ্জ্বল কমলা ও সাদা রঙের বোটটাকে আকারে বড় হতে দেখলেন, এ-ও দেখলেন যে ওটা সরাসরি সী রবিনের দিকেই আসছে। মন থেকে সংশয় ও উৎকণ্ঠা দূর হলো। ছুটে আসা বোটটাকে কোন বিপদ বা হুমকি বলে মনে হচ্ছে না।

'কি বুঝছেন, ক্যাপটেন?' টিমোথি অস্বস্তি বোধ করছে।

'একটা অয়েল কোম্পানির ইউটিলিটি ওঅর্ক বোট, বড় মাপের,' জানালেন শেফার্ড। 'বো-র দু'দিকে পানি কি রকম উড়ছে দেখছ? স্পীড সত্যি বেশি। অন্তত ত্রিশ নটের কম নয়।'

'ভাবছি ওটা এল কোত্থেকে? হাজার মাইলের মধ্যে কোন অয়েল রিগ আছে বলে তো মনে হয় না।'

'আমি বরং জানতে চাই, আমাদের কাছে কি কারণে আসছে।'

'খোলে কোন নাম বা কোম্পানির প্রতীক চিহ্ন আছে?'

'আশ্চর্য,' ধীরে ধীরে বললেন ক্যাপটেন শেফার্ড। 'বো-তে লেখা নাম আর কোম্পানির প্রতীক যেখানে থাকার কথা সেই জায়গাগুলো ঢেকে রাখা হয়েছে।'

ব্রিজ উইং-এ এবার রেডিও অপারেটরও বেরিয়ে এল। 'ফোনে অয়েল কোম্পানির স্কিপারকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি, ক্যাপটেন।'

একটা ওয়াটারটাইট বক্স খুলে ব্রিজ উইং স্পীকার-এর সুইচ অন করলেন শেফার্ড। 'নুমা শিপ সী রবিনের ক্যাপটেন শেফার্ড। বলুন।'

'গ্লোবাল অয়েল কোম্পানির বোট সান্তা মারিয়া থেকে ক্যাপটেন নক্স। আপনাদের জাহাজে কোন ডাক্তার আছেন?'

'অবশ্যই। আপনাদের সমস্যাটা কি?'

'গুরুতর জখম এক লোক।'

'পাশে চলে আসুন, আমাদের জাহাজের ডাক্তারকে পাঠাচ্ছি।'

'তারচেয়ে ভাল হয় আমরা যদি রোগীকে আপনাদের জাহাজে তুলে দিই। আমাদের এখানে না আছে মেডিকেল ফ্যাসিলিটি, না আছে সাপ্লাই।'

টিমোথির দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। 'শুনলে?'

'খুবই অদ্ভুত,' মন্তব্য করল টিমোথি।

'আমারও তাই ধারণা,' বললেন শেফার্ড। 'ওঅর্ক বোটে ডাক্তার না থাকাটা মেনে নেয়া যায়, কিন্তু তাই বলে কোন মেডিকেল সাপ্লাইও থাকবে না? ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়।'

কম্প্যানিয়নওয়ের দিকে পা বাড়াল টিমোথি। 'স্ট্রেচার ধরার জন্যে একজন ক্রুকে দাঁড় করিয়ে রাখি।'

সার্ভে শিপ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে এসে থামল ওঅর্ক বোট। কয়েক মিনিট পর পানিতে একটা লঞ্চ নামানো হলো। লঞ্চের সীটগুলোয় শোয়ানো হয়েছে কম্বল ঢাকা আহত লোকটাকে। তার সঙ্গে চারজন লোক রয়েছে। একটু পরই দেখা গেল সী রবিনের খোলের পাশে ঢেউয়ের সঙ্গে উঁচু-নিচু হচ্ছে লঞ্চটা। অপ্রত্যাশিতভাবে লঞ্চের তিনজন লোক লাফ দিয়ে সী রবিনে চলে এল, আহত

লোকটাকে ওঅর্ক ডেকে নিয়ে আসতে সাহায্য করছে, এক রকম ধাক্কা দিয়েই সী রবিনের ক্রুকে সরিয়ে দিল।

অকস্মাৎ লোকগুলো এক ঝটকায় কম্বলগুলো সরিয়ে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল লুকিয়ে রাখা অটোমেটিক উইপন। সেগুলো সী হর্সের ক্রুর দিকে তাক করল তারা। শুয়ে থাকা লোকটা লাফ দিয়ে সিধে হলো, হাতে নিল এক সঙ্গীর বাড়িয়ে ধরা আগ্নেয়াস্ত্র, তারপর স্টারবোর্ড সিঁড়ির দিকে ছুটল, ধাপ বেয়ে ব্রিজে উঠে যাবে।

দেরিতে হলেও ক্যাপটেন শেফার্ড ও হেলম্‌স্‌ম্যান টিমোথি বুঝতে পারল সী রবিনকে হাইজ্যাক করা হচ্ছে। এটা যদি কমার্শিয়াল শিপ বা প্রাইভেট ইয়ট হত, ছুটে গান লকারের কাছে গিয়ে ক্রুদের মধ্যে অস্ত্র বিলি করতেন ক্যাপটেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কোন সার্ভে শিপে আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে পারবে না। অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কিছুই কারও করার নেই।

হাইজ্যাকারদের দেখে বোম্বেটে অর্থাৎ জলদস্যু বলে মনে হচ্ছে না। ব্রিজে যে লোকটা ঢুকল তাকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কর্মকর্তা বললে অবিশ্বাস করা কঠিন। মুখের রঙ গাঢ়, চুলে অকালে পাক ধরেছে। যথেষ্ট লম্বা, কোমরের চেয়ে পেট একটু বড়। গলফ শার্ট আর বারমুডা শর্টস-এ দারুণ স্মার্ট লাগছে তাকে। চেহারায় কর্তৃত্বের ভাবটুকু শুধু যে স্পষ্ট তা নয়, মনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমীহ জাগিয়ে তোলে। অনেকটা যেন সৌজন্য দেখিয়েই সে তার অটোমেটিক রাইফেল ক্যাপটেন বা টিমোথির দিকে তাক করল না, ব্যারেল খাড়া করে রেখেছে।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কেটে গেল। দু'জনের দিকে পালা করে তাকাচ্ছে সে। অবশেষে টিমোথিকে অগ্রাহ্য করে ক্যাপটেন শেফার্ডের দিকে ফিরল। 'ক্যাপটেন শেফার্ড, ধরে নিচ্ছি।'

'কিন্তু তুমি?'

'আমার নামের কোন তাৎপর্য নেই,' লোকটার গলার আওয়াজটা এমন, যেন আগুনে পানি ছিটানোয় ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করে শব্দ হচ্ছে। 'আশা করি আপনি কোন বাধা দেবেন না।'

'জানতে পারি আমার জাহাজে কি করছ তুমি?'

'বলতে পারেন সী রবিনকে আমরা বাজেয়াপ্ত করলাম,' বলল লোকটা। 'কিংবা মনে করুন এটাকে আমরা দখল করে নিয়েছি। তবে নিশ্চিত থাকুন, কাউকে আঘাত করা হবে না।'

ক্যাপটেনের চোখ-মুখে বিস্ময় ও অবিশ্বাসের ভাব এখনও স্পষ্ট। বললেন, 'এই জাহাজ মার্কিন সরকারের সম্পত্তি। পৃথিবীর কারও অধিকার নেই এটাকে দখল করবে।'

'কেন, শোনেননি, জোর যার ইরাক তার?' লোকটা হাসল, তারপর ইঙ্গিতে হাতের অটোমেটিক রাইফেলটা দেখাল। 'এই অস্ত্রই আমাদেরকে অধিকার আর ক্ষমতা এনে দিয়েছে।'

সে ব্রিজে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, ওদিকে তার তিন সঙ্গী সার্ভে শিপের ক্রুদের এক জায়গায় জড়ো করছে। লঞ্চটা ফিরে গিয়ে আরও দশজন সশস্ত্র লোককে

নিয়ে এসেছে, এখন তারা সী রবিনের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

'তোমাদের এই ব্যাপারটা পাগলামিকেও হার মানায়,' মাথাটা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করে বললেন ক্যাপটেন শেফার্ড। 'এটা একটা সার্ভে শিপ। এখানে তোমরা সোনাও পাবে না, ডলারও পাবে না। তাহলে কিসের আশায়...'

কালো লোকটা গম্ভীর। 'সে-সব বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই। বুঝে কোন লাভও হবে না।'

সশস্ত্র একজন হাইজ্যাকারকে আসতে দেখা গেল। 'সার, জাহাজ এখন সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে। ক্রু আর বিজ্ঞানীদের ডাইনিং এরিয়ায় জড়ো করা হয়েছে।'

'এঞ্জিন রুম?'

'আপনার হুকুমের অপেক্ষায়।'

'গুড। তাহলে রওনা হবার প্রস্তুতি নাও। আমি ফুল স্পীড চাই।'

'স্পীড তুলে পালাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই,' এই প্রথম মুখ খুলল টিমোথি। 'সী রবিনের স্পীড দশ নটের বেশি তোলা যায় না।'

হাইজ্যাকার হেসে উঠল। 'দশ নট? আপনি নিজের জাহাজকে অসম্মান করছেন, সার। যেভাবেই হোক আমি জানি, ওয়াটার লিলিকে উদ্ধার করার জন্যে বিশ নট স্পীডে ছুটে গিয়েছিল সী রবিন। তবে বিশ নটও কম স্পীড।' ইঙ্গিতে বো-র দিকটা দেখাল সে। ওদিকে সার্ভে শিপকে টো করার প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে নির্দিষ্ট এক পজিশনে আসার চেষ্টা করছে ওঅর্ক বোট। 'আমরা ছাড়া কেউ যেন শুনতে না পায়,' ফিসফিস করল লোকটা। 'আমাদের উচিত পঁচিশ নট স্পীড তোলা!'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাদের?' জানতে চাইল টিমোথি, আগে কখনও তাকে এত রাগতে দেখেননি শেফার্ড।

'সেটা আপনাদের কোন মাথাব্যথা নয়,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল লোকটা। 'আপনি কথা দিচ্ছেন তো, ক্যাপটেন, আপনি বা আপনার লোকজন আমাদের কোন কাজে বাধা দেবেন না? আমার প্রতিটি নির্দেশ বিনা দ্বিধায় মেনে চলবেন?'

'তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে,' ম্লান সুরে জবাব দিলেন শেফার্ড। 'কিচেন নাইফ ছাড়া আমাদের কাছে আর কিছু নেই।'

ওরা কথা বলছে, তারই মধ্যে টো রোপ জাহাজে তুলে ফরওয়ার্ড বোলার্ড-এর গায়ে আটকে দেয়া হয়েছে। অকস্মাৎ ক্যাপটেন শেফার্ডের চোখে নগ্ন আতংক ফুটে উঠল। 'এই জায়গা ছেড়ে কোথাও আমরা যেতে পারি না! অন্তত এখুনি তো নয়ই!'

হাইজ্যাকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল, তারপর বলল, 'আপনি এরইমধ্যে আমাকে চ্যালেঞ্জ করছেন।'

'ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো,' জরুরী তাগাদার সুরে বলল টিমোথি। 'আমাদের একটা সাবমারসিবল রয়েছে সাগরের তলায়। তাতে দুই ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলা আছেন। ওদেরকে ফেলে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'দুঃখজনক নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল দস্যু লোকটা। 'নিজেদের চেষ্টায়

তীরে পৌঁছাতে হবে ওদেরকে।'

'অসম্ভব। তা তাঁরা পারবেন না। এভাবে ফেলে যাবার অর্থ হবে তাঁদের খুন করা।'

'কেন, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই?'

'ছোট একটা পোর্টেবল রেডিও আর একটা আন্ডারওয়াটার ফোন আছে শুধু,' ব্যাখ্যা করল টিমোথি। 'দু'মাইলের মধ্যে থাকলে তবেই অন্য কোন ভেসেল বা এয়ারক্রাফটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন ওঁরা।'

'গুড লর্ড, ম্যান,' আবেদন জানালেন ক্যাপটেন শেফার্ড। 'সারফেসে ফিরে এসে যখন দেখবেন আমরা চলে গেছি, ওদের মাথায় সত্যি বাজ পড়বে, কারণ এখান থেকে উদ্ধার পাবার কোন আশাই নেই।'

'সেটা আমার কোন সমস্যা নয়।'

নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক পা এগোলেন শেফার্ড, কিন্তু লোকটা দ্রুত রাইফেল তুলে তাঁর বুকে ঠেকাতে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। 'আমার সঙ্গে লাগতে আসাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, ক্যাপটেন।'

প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে কাঁপতে নিগ্রো লোকটার দিকে পিছন ফিরলেন শেফার্ড। শরীরের দু'পাশে ঝুলে থাকা হাতের মুঠো বারবার খুলছেন আর বন্ধ করছেন। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সাগরের যেখানটায় শেষবার দেখেছেন ব্লু নেভিগেটরকে। 'ওঁরা যদি মারা যান, খোদা যেন তোমাদের ভাল করেন,' এমন সুরে বললেন, তা দিয়ে যেন ইস্পাতও কাটা যাবে। 'কারণ অবশ্যই এর বদলা নেয়া হবে।'

'আমার সঙ্গে যদি কেউ লাগতে আসে, তাদের সঙ্গে আপনারা অন্তত থাকবেন না,' হেসে উঠে বলল লোকটা। 'এই, এদেরকে ডাইনিং হলে নিয়ে যাও।'

ব্লু নেভিগেটর পানির ওপর ফিরে আসার অনেক আগেই দিগন্ত পার হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সী রবিন।

নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন নিজের ডেস্কে বসে কাজ করছেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফ অফিসে ঢুকলেন। রেডক্লিফ হাসিখুশি, মিষ্টভাষী ভদ্রলোক; চোখে হর্ন-রিমড্ গ্লাস পরেন। খুক করে কেশে নিজের উপস্থিতি সম্পর্কে অ্যাডমিরালকে সচেতন করতে চাইলেন তিনি, তারপর বললেন, 'দুঃখিত, অ্যাডমিরাল, আমরা সিরিয়াস একটা বিপদে পড়েছি।'

'আবার কি হলো?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল, মুখ না তুলেই। 'কোনও প্রজেক্টে বাজেটের চেয়ে বেশি খরচ পড়ে যাচ্ছে?'

'আরও অনেক বড় দুঃসংবাদ, অ্যাডমিরাল।'

এবার ফাইল থেকে মুখ তুললেন হ্যামিলটন। 'কি?'

'সী রবিন সবাইকে নিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে।'

কোন বিস্ময় দেখা গেল না। চোখে-মুখে কোন প্রশ্ন নেই। বিড়বিড় করে 'নিখোঁজ' শব্দটা পুনরাবৃত্তিও করলেন না। শান্ত হয়ে বসে থাকলেন, রেডক্লিফ

আরও কি বলেন শোনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

'আমাদের রেডিও আর স্যাটেলাইট ফোন ইনকোয়্যারি কোন সাড়াই পাচ্ছে না–' শুরু করলেন রেডক্লিফ।

'কমিউনিকেশন ব্রেকডাউনের একশো একটা কারণ থাকতে পারে,' বাধা দিয়ে বললেন হ্যামিলটন।

'কিন্তু ব্যাকআপ সিস্টেমস?' রেডক্লিফও শান্ত। 'সবগুলো তো আর সাড়া দিতে ব্যর্থ হতে পারে না।'

'শেষ কখন সাড়া পাওয়া গেছে?'

'দশ ঘণ্টা আগে,' বলে নিজেকে শক্ত করলেন রেডক্লিফ, জানেন একটা ঝড় আসছে।

'দশ ঘণ্টা!' এবার ঠিকই বিস্ফোরিত হলেন নুমা ডিরেক্টর। 'অথচ আমার নির্দেশ দেয়া আছে সমস্ত সার্ভে ও রিসার্চ শিপকে দু'ঘণ্টা পর পর আমাদের কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টে স্ট্যাটাস রিপোর্ট পাঠাতে হবে।'

'আপনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছে। সী রবিন শেডিউল ধরে নিয়মিতই রিপোর্ট পাঠিয়েছে।'

'আপনি আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিচ্ছেন!'

'নিজেকে ক্যাপটেন শেফার্ড বলে দু'ঘণ্টা পর পর ওয়াটার লিলির ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট পাঠিয়েছে এক লোক। পরে আমরা জানতে পারি লোকটা ক্যাপটেন শেফার্ড নয়, কারণ ভয়েস সিস্টেম রেকর্ডিং-এ তার ভয়েস প্যাটার্ন মিলছিল না। কেউ একজন নিজেকে ক্যাপটেন শেফার্ড বলে চালাবার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়।'

'কিন্তু এ আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই যে জাহাজটা সবাইকে নিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেছে।'

'কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট আমাকে সতর্ক করার পর ন্যাশন্যাল ওশনোগ্রাফিক অ্যাটমাসফেরিক এজেন্সিতে ফোন করি আমি। ওখানে আমার এক বন্ধু আছে। তাকে অনুরোধ করি সী রবিন যেখানে কাজ করছিল সেই এলাকার স্যাটেলাইট ওয়েদার ফটো যেন খুঁটিয়ে দেখে। ফটো এনলার্জমেন্ট করে কোন লাভ হয়নি। একশো মাইলের মধ্যে কোন জাহাজ নেই।'

'আবহাওয়ার অবস্থা কি রকম?'

'শান্ত সাগর। আকাশ নীল। বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় দশ মাইল।' রেডক্লিফকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

অ্যাডমিরাল চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করলেন। 'কোন কারণ ছাড়া জাহাজটা ডুবে যেতে পারে না। ওটায় এমন কোন রাসায়নিক পদার্থও নেই যে মারাত্মক কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কেন বিস্ফোরিত হবে! অন্য কোন জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ?'

'নিয়মিত শিপিং লেইনগুলোর বাইরে ছিল ওটা। কাছাকাছি অন্য কোন জাহাজ ছিল না।'

'অন্য কোন গলা থেকে আপ-টু-ডেট রিপোর্ট এসেছে,' রেডক্লিফের সামনে

পায়চারি থামিয়ে বললেন হ্যামিলটন, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। 'আপনার কি ধারণা, জর্জ, সী রবিনকে হাইজ্যাক করা হয়েছে?'

'দেখে-শুনে এখন তাই তো মনে হচ্ছে,' বললেন রেডক্লিফ। 'স্যাটেলাইটে বসানো ওয়েদার ক্যামেরা ওই এরিয়ার ছবি তোলার আগেই হাইজ্যাকাররা সী রবিনকে নিয়ে পালিয়ে গেছে।'

'কিন্তু হাইজ্যাক করা হলে কোথায় ওটাকে নিয়ে যাওয়া হবে? দু'ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে কিভাবে ওটা গায়েব হয়? লাস্ট স্ট্যাটাস রিপোর্ট যেখান থেকে পাঠিয়েছে সেখান থেকে ওই সময়ের ভেতর দেড়শো নটিকেল মাইলের বেশি যাওয়া সম্ভব নয়।'

'ভুলটা আমার,' বললেন রেডক্লিফ। 'ক্যামেরা রেঞ্জ বাড়াবার অনুরোধ করা উচিত ছিল। তবে বন্ধুর সঙ্গে আমি কথা বলি ভয়েস প্যাটার্ন মিলছে না এ-কথা জানার আগে। তাছাড়া, তখন হাইজ্যাকিং-এর কথা ভুলেও ভাবিনি।'

চেয়ারে ফিরে এসে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন অ্যাডমিরাল। তারপর হাত নামিয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করলেন। 'আপনি কি জানেন, রানা আর মুরল্যান্ড সী রবিনে ছিল, নাকি ব্লু নেভিগেটরে?'

'আমাদের ক্যাপটেনের শেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে, ব্লু নেভিগেটর নিয়ে সাগরের তলায় নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা।'

'দিস ইজ ম্যাডনেস!' প্রায় গর্জে উঠলেন অ্যাডমিরাল। 'কার এত সাহস, হলো যে বঙ্গোপসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা জাহাজ হাইজ্যাক করবে? অন্তত ওদিকটায় তো কোন যুদ্ধ-পরিস্থিতি নেই, তাই না? আল-কায়েদার কোন তৎপরতার কথা আমি অন্তত শুনিনি। তাহলে এটা কাদের কাজ? তাদের মোটিভ কি?'

'আমিও আপনার মত অন্ধকারে, সার।'

'বিসিআই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকালেন রেডক্লিফ। 'আমি নিজে কথা বলেছি আপনার বন্ধুর সঙ্গে। জেনারেল খান বলেছেন, তিনি তাঁদের নৌ-বাহিনীকে ওই এলাকায় সার্চ করতে অনুরোধ করবেন।'

'এদিক থেকেও যা-যা করার সব করুন,' নির্দেশ দিলেন নুমা চীফ। 'সী রবিন ওদিকেই কোথাও আছে। ওরা ডুবে গেছে, এ আমি মানতে রাজি নই।'

সাগরের খাঁ-খাঁ আদিগন্ত শূন্যতায় সী রবিন হারিয়ে গেছে, এটা মেনে নেয়ার পর রানার পরামর্শ অনুসারে সাবমারসিবলের ছোট্ট পরিসরের ভেতর নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে মনোযোগী হলো ওরা।

চারদিকে কোন ভেলাকে ভাসতে দেখা যায়নি, সাগরের সারফেসে তেলের আস্তরণও পড়েনি। অবশ্য মনে মনে হাল ছাড়তে রাজি হয়নি কেউ, ভেবেছে জরুরী কোন কারণে সী রবিন চলে গেছে, যে-কোন মুহূর্তে ফিরে আসবে আবার।

কিন্তু রাত নামল এবং কেটেও গেল। সূর্য আরও দু'বার উঠল ও ডুবল। না, তারপরও মাদারশিপের কোন দেখা নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সীমাহীন দিগন্তে চোখ

বুলানো চলছে। কোন জাহাজ বা এমনকি উড়ন্ত কোন জেটলাইনারও চোখে পড়ল না। জিপিএস দেখে জানা গেল ভারত মহাসাগরের আরও অনেক গভীর এলাকায় সরে যাচ্ছে ওদের ব্লু নেভিগেটর। সাগরের এত গভীরে উদ্ধার পাবার সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ।

নিজেদের ওরা বোকা বানাচ্ছে না। যদি কোন জাহাজ একেবারে গায়ের কাছে এসে পড়ে শুধু তাহলেই খুদে সাবমারসিবল ব্লু নেভিগেটরের আরও খুদে হ্যাচ দেখতে পাবে। ওদের হোমিং বীকন বিশ মাইল পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে, কিন্তু এটার সিগন্যাল এমনভাবে প্রোগ্রাম করা যে শুধু সী রবিনের কমপিউটরই রিসিভ করতে পারবে। পাশ কাটিয়ে যাওয়া কোন জাহাজ বা প্লেনের এই সিগন্যাল ধরতে পারার কথা নয়। ওদের একমাত্র আশা, যদি কোন রেসকিউ ভেসেল ওদের রেডিওর দু'মাইল রেঞ্জের মধ্যে চলে আসে।

সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন পানি। ভাগ্য ভাল যে খানিক পর পর ছোট আকারের কিছু মেঘ শুধু যেন ওদেরকে সাপ্লাই দেয়ার জন্যেই বৃষ্টি ঝরিয়ে গেল। মেঝেতে বিছানো ছিল একটা প্লাস্টিক কাভার, সেটা তুলে হ্যাচের ওপর মেলা হলো, বৃষ্টির পানি ওখান থেকে গড়িয়ে বোতলে পড়তে লাগল। স্যান্ডউইচ শেষ হয়ে যেতে মাছ ধরা শুরু করল ওরা। ইমার্জেন্সি রিপেয়ারিং-এ কাজে লাগবে, এরকম কিছু টুলস আছে একটা বাক্সে, সেগুলোর সাহায্যে কয়েকটা বড়শি বানাল রানা। পরিত্যক্ত খাদ্যকণা কাজে লাগিয়ে টোপ তৈরি করল জিনা। ফিশিংলাইন হিসেবে ইলেকট্রিক তার যোগান দিল মুরল্যান্ড। একটার ওপর ভরসা নেই, তিনটে লাইন ফেলা হলো পানিতে। একটু পরই সাগর থেকে তিনটে ছোট মাছ উপহার পাওয়া গেল। জিনা দেখে ফ্রিগেট ম্যাকরল বলে সনাক্ত করল। দ্রুত কেটে নতুন টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হলো ওগুলোকে। দশ ঘণ্টার মধ্যে ছোট মাছের ভাল একটা স্টক তৈরি হলো, দক্ষ হাতে কেটে-বেছে পরিষ্কার করে ফেলল জিনা। জাপানি স্টাইলে কাঁচাই খেতে হলো, তেমন স্বাদ পাওয়া না গেলেও পুষ্টির চাহিদা মিটছে বলে কেউ কোন অভিযোগ করল না।

সী রবিনের অবস্থান নিয়ে সীমাহীন জল্পনাকল্পনা শেষে একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে প্রসঙ্গ পাল্টে দর্শন থেকে শুরু করে সামুদ্রিক খাদ্য পর্যন্ত হেন কোন বিষয় নেই যা নিয়ে ওরা আলোচনা করল না।

ওয়াটার লিলির ধ্বংসাবশেষ থেকে যে জিনিসটা উদ্ধার করা হয়েছে, সারফেসে ওঠার খানিক পর বাস্কেট থেকে তুলে একটা প্লাস্টিক ব্যাগে রাখা হয়েছে সেটা। হাতে যেহেতু সময়ের কোন অভাব নেই, জিনিসটার কেমিকেল কমপজিশন নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করল ওরা।

'ভেসে কত দূর এলাম আমরা?' এবার নিয়ে সম্ভবত একশোবার জানতে চাইল জিনা।

'প্রায় বত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পুবে, কাল এই সময়ের পর থেকে,' জবাব দিল রানা।

'এই হিসেবে ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছাতে কয়েক বছর লাগতে পারে, তাই না?'

'কেন, সোজা দক্ষিণে এগোলে দক্ষিণ মেরুতেও তো পৌঁছানো যায়।' হেসে উঠল মুরল্যান্ড।

'ওখানে আমি গেছি,' বলল রানা। 'এক জায়গায় দু'বার যেতে চাই না।'

'তোমার এই আপত্তির কথা বাতাস আর স্রোতকে জানিয়ে দিচ্ছি আমি।'

'মেঝের প্লাস্টিক শিট দিয়ে আমরা কিন্তু অনায়াসে একটা পাল তুলতে পারি,' জিনা প্রস্তাব দিল।

'নব্বুই শতাংশ পানির নিচে, এই সাবমারসিবল বাতাস পেয়ে ছুটবে বলে মনে হয় না।'

'ভাবছি অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আমাদের এই অবস্থার কথা জানেন কিনা,' বিড়-বিড় করল জিনা।

'আমি যতটুকু চিনি তাঁকে,' বলল রানা, 'বাজি ধরে বলতে পারি, এরইমধ্যে সার্চ-অ্যান্ড-রেসকিউ অপারেশন শুরু করে দিয়েছেন।'

চোখ বুজে একটা চীনা রেস্তোরাঁর টেবিলে সাজানো ডিনার কল্পনা করছে মুরল্যান্ড, বলল, 'কেউ যদি বলতে পারে সী রবিন এখন কোথায় তাকে আমি এক বছরের বেতন দিয়ে দেব।'

'এই রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন মানেই হয় না,' বলল রানা। 'আমরা আগে সাগর থেকে উদ্ধার পাই, তার আগে পর্যন্ত কোন ক্লু পাওয়া যাবে না।'

চতুর্থ সকালের আকাশ মেঘে মেঘে ঢাকা দেখল ওরা। তবে রুটিন সেই একই। বৃষ্টি হলে পানি ধরো। প্রয়োজন হলে মাছ মারো। চোখ রাখো দিগন্তে। পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে না, উন্নতিও নেই। পালাবদলে ডিউটি দিচ্ছে, প্রত্যেকে দু'ঘণ্টা করে। সাবমারসিবলের হ্যাচ টাওয়ার পানির সারফেস থেকে মাত্র চার ফুট উঁচু, ফলে যে ডিউটিতে থাকছে তাকে সাধারণত ভিজতে হচ্ছে, কারণ দু'ঘণ্টার মধ্যে বেশ কিছু ঢেউ টপ রিম-এর ওপর আছড়ে পড়ে।

জিনার ডিউটির সময় সাবমারসিবলের এক মাইল দূর দিয়ে একটা এয়ারক্রাফট উড়ে গেল। উন্মত্ত ভঙ্গিতে হাত নেড়েও কোন লাভ হলো না; নিজের ভুল বুঝতে পেরে প্লাস্টিক শিটটা দোলাতে শুরু করল সে, কিন্তু ততক্ষণে প্লেনটা আরও অনেক দূরে চলে গেছে। 'ওটা একটা রেসকিউ প্লেন ছিল,' চেঁচিয়ে উঠল সে, আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। 'প্রায় মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল অথচ দেখতে পেল না!'

'এটা কারও চোখে পড়া খুব কঠিন,' মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বলল রানা।

ওকে সমর্থন করে মাথা ঝাঁকাল মুরল্যান্ড। 'পাঁচশো ফুটের বেশি ওপর থেকে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। আমাদের হ্যাচ টাওয়ার খুবই ছোট, আকাশ থেকে দেখলে গোলাবাড়ির দরজায় একটা মাছির মত।'

'কিংবা স্টেডিয়ামের সবুজ ঘাসে পড়ে থাকা মটরশুঁটির দানা,' বলল রানা।

'তাহলে ওরা আমাদের খুঁজে পাবে কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল জিনা, ধৈর্য ও বিশ্বাসে ফাটল ধরতে শুরু করেছে।

অভয় দিয়ে হাসল রানা, কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, 'ল অভ অ্যাভারেজ। আমাদেরকে খুঁজে পেতে বাধ্য ওরা।'

'তাছাড়া,' মাঝখান থেকে আবারও মন্তব্য করল মুরল্যান্ড, 'আমরা ভাগ্যবান। তাই না, দোস্ত?'

'যত বেশি হওয়া সম্ভব।'

ভেজা ভেজা চোখ দুটো মুছল জিনা, নিজের ব্লাউজ আর শর্টস টেনেটুনে সোজা করল, একটা হাত চালাল চুলে। 'তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। যতটা মনে করেছিলাম ততটা শক্ত আসলে নই আমি।'

পরবর্তী দু'দিন হাসিখুশি ভাবটা ধরে রাখার জন্যে যে যার নিজের সঙ্গে প্রায় যুদ্ধ করল ওরা। ওপর দিয়ে আরও তিনটে প্লেন উড়ে গেল, কিন্তু ওদেরকে দেখতে পেল না। পোর্টেবল রেডিওর সাহায্যে ওদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল রানা, কিন্তু কোন সাড়া পেল না রেঞ্জের বাইরে চলে যাওয়ায়। উদ্ধারকারী দল ওদের খোঁজে সাগর চষে ফেলছে, দু'একটা দল একেবারে কাছে চলে আসছে, অথচ ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না–এটা আরও হতাশ ও অসহায় করে তুলল ওদেরকে। রানার উৎসাহ পাবার মত বিষয় একটাই, প্লেনগুলো দেখে ওগুলোকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজ বলে চেনা গেছে। দেশের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বসে নেই। নিশ্চয়ই তারা নুমা হেডকোয়ার্টার থেকেই দুঃসংবাদটা পেয়েছে।

আজও সারাদিন মেঘলা কাটল। তবে সূর্য পাটে বসতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। পশ্চিমের কমলা আকাশ আর মখমল নীল পুবাকাশে গাঢ় হলো গোধূলি। পাহারায় মুরল্যান্ড, হ্যাচ টাওয়ারের কিনারার ওপর ঝুঁকে রয়েছে। এরকম আড়ষ্ট একটা ভঙ্গিতেও কিছুক্ষণের মধ্যে একটু করে ঘুমিয়ে নেয়ার একটা অভ্যাস গড়ে তুলল সে–ঘুম মানে ঝিমিয়ে নেয়া, এবং প্রায় ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক পনেরো মিনিট পর পর চোখ খুলছে। সন্ধ্যার দিকে বারদশেক দিগন্তে চোখ বুলিয়ে কিছুই দেখতে পেল না, ফলে আবার স্বপ্ন দেখার লোভে ঘুমের জগতে ডুব দিল।

এরপর যখন ঘুম ভাঙল, বুঝতে পারল এর জন্যে দায়ী মিউজিক। প্রথমে ভাবল, সে আসলে হ্যালুসিনেইশানের শিকার। কিনারা থেকে বাইরের দিকে হাত নামিয়ে সাগরের পানি নিল হাতে, চোখ-মুখে ছিটাল বাস্তবে ফেরার আশায়।

কিন্তু মিউজিক তারপরও থামল না।

সুরটাও এখন ধরতে পারছে মুরল্যান্ড। একটা ওয়ালয্–'টেইলস ফ্রম দা ভিয়েনা উডস'। তারপর আলো দেখতে পেল সে। তারা ভরা আকাশে আরও একটা তারা, তবে কোন তারা কি আগুপিছু করে–দক্ষিণ আসমানে এটা যেমন করছে?

রাতের বেলা পানির ওপর দূরত্ব আন্দাজ করা অত্যন্ত কঠিন, তবে মুরল্যান্ড বাজি ধরে বলতে পারে মিউজিক আর আলোটা খুব বেশি হলে চারশো গজ দূরে।

হ্যাচ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল সে, হাতড়ে একটা টর্চ খুঁজে নিল, তারপর আবার উঠল ওপরে। এবার ছোট একটা ভেসেলের অস্পষ্ট আউটলাইন দেখতে পেল সে, চৌকো জানালা দিয়ে ম্লান আলো বেরুচ্ছে। আঙুলের পক্ষে যত দ্রুত সম্ভব, বোতামে ঘন ঘন চাপ দিয়ে টর্চটা জ্বালল আর নেভাল, চিৎকার শুরু করল যেন একটা অসুস্থ ছাগল।

'এদিকে! মাথা খাও! এদিকে!'

'অ্যাই, কি হয়েছে?' নিচে থেকে হাঁক ছাড়ল রানা।

'তুমি তোমার আল্লাহ্‌কে ডাকো, দাদা,' বলল মুরল্যান্ড। 'আমি আমার গডকে স্মরণ করছি। একটা বোট, রানা, একটা বোট!'

রানার কানের কাছে বোমা ফাটাল জিনার গলা, 'ধরো! এই ধরো!' বোট যেন কোন মাছ, বড়শি থেকে ছাড়ানো যায়। তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল, 'ফ্লেয়ার ছোড়ো, ববি!'

তার এই ভুলটা ভেঙে দিল রানা। 'ব্লু নেভিগেটরে কোন ফ্লেয়ার নেই, জিনা। আমরা শুধু দিনের বেলা ডাইভ দিচ্ছিলাম, মনে আছে? উঠে আসছিলাম মাদার শিপের কাছাকাছি।' ও শান্ত, পোর্টেবল রেডিওটা তুলে নিয়ে পাঁচটা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সিতে কল করতে শুরু করল।

কি ঘটছে দেখার জন্যে জিনার মন ছটফট করছে, কিন্তু হ্যাচ টাওয়ারে একজনের বেশি লোকের জায়গা হবে না। হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে হচ্ছে তাকে। রানাকে দেখছে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে, কান পেতে আছে মুরল্যান্ড কি বলে শোনবার জন্যে।

'ওরা আমাদের দেখতে পায়নি,' ছাগলের মত চিৎকার করার ফাঁকে নিস্তেজ গলায় প্রায় গুঙিয়ে উঠল মুরল্যান্ড, হাতের টর্চ এখনও পাগলের মত নাড়ছে। কিন্তু টর্চটা থেকে আলো বলতে গেলে বেরুচ্ছেই না। ব্যাটারি প্রায় নিঃশেষ বলা যায়। 'আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।'

'হ্যালো, হ্যালো, প্লীজ সাড়া দিন,' এক মনে বারবার ডাকছে রানা।

উত্তরে শুধু যান্ত্রিক শব্দজট ভেসে আসছে।

সাবমারসিবলের ভেতর ভেজা কম্বলের মত চেপে বসল হতাশা। মুরল্যান্ড দেখতে পেয়ে জানাল, ভেসেলটার আলো দূর অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। ওটা থেকে কেউ ওদেরকে দেখতে পায়নি। অসহায় একটা ভাব আর কষ্ট নিয়ে দেখছে উত্তর দিকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ভেসেলের আলো। 'এত কাছে, অথচ কত দূরে,' ম্লান সুরে বিড় বিড় করল সে।

অকস্মাৎ সাবমারসিবলের স্পীকার ঘর্ঘর করে উঠল, তারপর বেরিয়ে এল ভারী একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর। 'এই মহা সমুদ্রে কার সঙ্গে আমি কথা বলছি?' ভাষাটা ইংরেজি, একটু বোধহয় ফ্রেঞ্চ বা স্প্যানিশ টান আছে; কেন যেন চেনা চেনা লাগল রানার।

'থামুন!' প্রায় ধমকে উঠল রানা। 'আপনি আমাদের গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেছেন। প্লীজ রিভার্স কোর্স।'

'টিকে থাকুন। ফিরছি আমি।'

'ভেসেলটা ঘুরছে!' আনন্দে হাততালি দিল মুরল্যান্ড। 'ওরা ফিরে আসছে!'

'আমার বো-র কোন্ দিকে আপনি?' মার্জিত কণ্ঠস্বর থেকে প্রশ্ন করা হলো।

'ববি!' হ্যাচের দিকে মুখ তুলে গলা চড়াল রানা। 'উনি একটা পজিশন চাইছেন।'

'বলো, তাঁর পোর্টের দিকে বিশ ডিগ্রিতে আছি আমরা।'

রেডিওতে পজিশনটা জানাল রানা।

এক মিনিট পর মেসেজ এল। 'আপনাকে দেখতে পাচ্ছি এবার–সোজা একশো গজ সামনে ম্লান একটু আভা।' তিন সেকেন্ড বিরতির পর একটা প্রশ্ন। 'চেনাচেনা লাগে কেন? গলাটা?'

'আরে, আমারও তো! তুমি কি ভিনসেন্ট? ভিনসেন্ট গগল?'

এক মুহূর্ত পর উত্তর এল, হতাশ ভাবটা চাপা থাকল না। 'ভিনসেন্ট গগল? এই নামে কাউকে আমি চিনি বলে তো মনে পড়ছে না। সমুদ্রে হারিয়ে গেছেন, আপনি কে? মঁসিয়ে, মিস্টার, নাকি সিনর?'

'জনাব,' বলল রানা। 'আমি মাসুদ রানা।'

'ভেরি স্যাড অ্যান্ড ভেরি ব্যাড!' প্রায় নিস্তেজ কণ্ঠস্বর। 'এই নামেও কাউকে আমি চিনি না!'

বোট মালিক তার ইয়টের গায়ে বসানো এক সারি আলো জ্বালল, তার মধ্যে একটা সার্চলাইট; পানির সারফেসে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে স্থির হলো মুরল্যান্ডের ওপর–হ্যাচ টাওয়ার থেকে এখনও পাগলের মত হাতের নিভু-নিভু টর্চটা নাড়ছে সে।

'ভয় পাবেন না,' আবার সেই যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'আমি আপনাদের ওপর দিয়ে পার হব। থামব আপনাদের ছোট্ট টাওয়ারের মাথায়, ওটা যখন আমার বোটের স্টার্ন-এর সঙ্গে একই পজিশনে আসবে। আমি একটা মই ফেলে দেব, আপনারা উঠে আসবেন।'

বোট মালিকের বক্তব্য রানা ঠিক বুঝতে পারল না। 'আমাদের ওপর দিয়ে পার হবেন?' ভাবল, এ আবার কেমন কথা! 'আমি আপনার কথা শুনতে পাইনি।'

বোট মালিক সাড়া দিল না। এক মুহূর্ত পর মুরল্যান্ড হায়-হায় করে বলে উঠল, 'সর্বনাশ! লোকটা বোধহয় বলল আমাদেরকে চাপা দেবে।'

'তার মানে লোকটা আমাদেরকে ডুবিয়ে মারতে এসেছে!' জিনার গলায় আতংক।

রানাও প্রথমে ভাবল, ওদেরকে খুন করতে চায় এমন কেউ একজন ব্লু নেভিগেটরকে খুঁজে পেয়েছে। এ-ও হয়তো সেই দলেরই লোক যারা তৃষাকে খুন করতে চেষ্টা করেছিল। জিনাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরল ও, বলল, 'তুমিও ভাল করে ধরো, ধাক্কা লাগলে ছিটকে পড়বে না। যদি দেখো সাবমারসিবল ডুবে যাচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি পারো হ্যাচ গলে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। আমি তোমাকে ঠেলব।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল জিনা, তারপর রানা তাকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরতে ওর চওড়া বুকে মুখ গুঁজল সে।

'যখন বুঝবে যে সংঘর্ষ ঘটবেই,' মুরল্যান্ডকে নির্দেশ দিল রানা, 'তখন চিৎকার কোরো। তারপর লাফ দিয়ে সরে যেয়ো।'

আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত লঞ্চ বা ইয়টটা দ্রুত এগিয়ে আসছে, সেটার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে হ্যাচ টাওয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে মুরল্যান্ড এরকম কোন সমুদ্রগামী ইয়ট জীবনে কখনও দেখেনি সে। ধীরে ধীরে তার

চোখের সামনে দুই খোল বিশিষ্ট অদ্ভুত আকৃতির জলযান স্পষ্ট হচ্ছে। চওড়া বো ঢালু, ওপরে উঠে বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে খিলান আকৃতির একটা পিকচার উইন্ডোকে, তারপর পাশ কাটিয়েছে ডিম্বাকৃতি হুইলহাউসকে। জলযানটা ভাসছে প্রকাণ্ড একজোড়া চওড়া স্কী স্টিক-এর ওপর, দুই খোল-এর মাঝখানটা সম্পূর্ণ ফাঁকা।

বোটটা এগিয়ে এসে থামতে এখন সেই ফাঁকা জায়গায় রয়েছে ব্লু নেভিগেটর, তারপরও দু'পাশে পাঁচ ফুট করে জায়গা খালি পড়ে থাকল। বোটটার মেইন সুপারস্ট্রাকচার ধীরে ধীরে মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে এখন, আবার থামল সাবমারসিবল সরাসরি স্টার্ন-এর নিচে চলে আসতে। দু'ফুট সামনে ক্রোম-এর তৈরি মই নেমে আসতে দেখে খপ করে ধরে ফেলল মুরল্যান্ড। এতক্ষণে তার রানাকে রিপোর্ট করার কথা মনে পড়ল।

'চিন্তার কিছু নেই। এটা একটা ক্যাটাম্যার‍্যান। আমরা সরাসরি ওটার স্টার্নের নিচে রয়েছি।' পরমুহূর্তে হ্যাচ টাওয়ার থেকে গায়েব হয়ে গেল সে।

হ্যাচ থেকে বেরিয়ে এল জিনা শ্যাম্পেনের বোতল থেকে ছোটা ছিপির মত, মাথার ওপর ক্যাটাম্যার‍্যান-এর আকার-আকৃতি দেখে বিহ্বল। সে দাঁড়িয়ে আছে বিলাসবহুল রিয়ার ডেকে, মেহগনি কাঠের টেবিল আর কাউচগুলো অবাক হয়ে দেখছে, মনে করতে পারছে না সিঁড়ি বেয়ে কখন বা কিভাবে উঠে এল।

সাবমারসিবল-এর বীকন রিসেট করল রানা, তারপর ক্যাটামার‍্যান-এ ওঠার আগে বন্ধ করে বোল্ট লাগিয়ে দিল হ্যাচে। এক মুহূর্ত ওখানেই শুধু নিজেরা দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। কোন ক্রু বা প্যাসেঞ্জার ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে আসছে না। সাবমারসিবলকে পিছনে ফেলে ইয়টকে সামনের দিকে চালাচ্ছে হেলম্‌স্‌ম্যান। প্রায় দুশো গজ এগোবার পর বোটের স্পীড কমে এল, তারপর শুধু স্রোতের টানে ভেসে চলল। সবাই চোখ তুলে দেখল লোকটাকে, হুইলহাউস থেকে নেমে আসছে।

অত্যন্ত সৌখিন ব্যক্তি, পরনে প্রাচীন ফ্রেঞ্চ বীরযোদ্ধার মত বেশভূষা, সঙ্গে আছে ঢাল-তরোয়াল থেকে শুরু করে শিরস্ত্রাণ পর্যন্ত। শিরস্ত্রাণ থেকে বেরিয়ে এসে মুখের দু'পাশ আর কান ঢেকে রেখেছে লাল সিল্ক কাপড়ের ঝালর। বেশ লম্বা-চওড়া শরীর, দেখেই বোঝা যায় গায়ে প্রচণ্ড শক্তি রাখে। এই যুগে এরকম প্রাচীন যোদ্ধার বেশ শুধু যে বেমানান তাই নয়, হাস্যকরও বটে। তবে রানা হেসে উঠল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। ও ওর বন্ধুকে চেনে, তার এই 'যেমন খুশি সাজি' অভ্যাসটা সম্পর্কে জানা আছে। ও হাসল গগলকে চিনতে পেরে। যতই উদ্ভট পোশাক পরে থাকুক, নাক আর চোখ দেখেই গগলকে চিনে ফেলল ও। 'ওহ্, গড! সত্যি তুমি?'

'হ্যাঁ, দোস্তো, তোমার সেই আদি ও অকৃত্রিম বন্ধু ভিনসেন্ট!' গগল হাসতে গিয়েও হাসল না, তার চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল। 'তোমরা তিনজন? আমি তো ধরে নিয়েছিলাম ছোট্ট ওই ভেলায় কোন রকমে একজন আছ।'

'ভেলা নয়, হে,' বলল রানা, 'ওটা ডীপ ওশান সাবমারসিবল।'

'বলো কি!' গগল হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল। 'ফর গডস্ সেইক!

তোমরা একা কেন, মানে সাবমারসিবল থাকলে আশপাশে মাদার শিপ তো থাকবে–কোথায় সেটা?'

'সে অনেক লম্বা কাহিনী,' বলল রানা। 'আমরা আসলে ডুবে যাওয়া একটা ক্রুজ শিপের খোল ইনভেস্টিগেট করছিলাম।'

'হ্যাঁ, জানি–ওয়াটার লিলি। ভয়ানক একটা ট্রাজিডি। মিরাকলই বলতে হবে যে এত মানুষকে বাঁচানো সম্ভব হলো।'

উদ্ধার কাজে নিজেদের কি ভূমিকা ছিল তা ব্যাখ্যা করতে গেল না রানা, সংক্ষেপে শুধু জানাল কিভাবে ওরা সাগরে হারিয়ে গেছে।

'হোয়াট! বল কি, সারফেসে ওঠার পর নিজেদের জাহাজকে দেখতে পাওনি?' গগল বিশ্বাস করতে পারছে না।

'রানা ঠাট্টা করছে না,' বলল মুরল্যান্ড। 'আমাদের জাহাজ সী রবিন সত্যি গায়েব হয়ে গেছে।'

'আপনি নিশ্চয়ই ববি মুরল্যান্ড, নুমার একজন বিজ্ঞানী, এবং আমার রহস্যময় বন্ধুর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই না?'

হ্যান্ডশেক করার সময় হাসল মুরল্যান্ড। 'আপনি নিশ্চয়ই রানার মুখে আমার কথা শুনেছেন।'

'আমি রানার আরও একজন বন্ধু,' বলে নিজের হাতটাও বাড়িয়ে দিল জিনা। 'জিনা ক্যারল। কিন্তু রানাকে আপনি রহস্যময় বললেন কেন? আমরা তো বরং উল্টোটাই শুনেছি, আপনাকে নাকি প্রায় একটা ভৌতিক চরিত্রই বলা যায়।'

'কেন? কি রকম?' গগলকে রাগানো সহজ নয়, তার চোখ-মুখ থেকে কৌতূহল উপচে পড়ছে।

'আপনিই তো সেই ভদ্রলোক, রানার ঠিক বিপদের সময় অকস্মাৎ আকাশ থেকে পড়েন, ওকে সাহায্য করে প্রায় বিনা নোটিশে অদৃশ্য হয়ে যান; লাখ লাখ ডলার ব্যয় করেন বিলাসিতা আর আরাম-আয়েশে, অথচ রোজগারের উৎস সম্পর্কে কেউ কিচ্ছু জানে না বললেই চলে। জেরুজালেমে আপনাকে অন্ধ সেজে ভিক্ষা করতেও দেখা গেছে, আবার ভারতের কর্নাটকে কোন এক ন্যাংটো সন্ন্যাসীর সঙ্গে একই পোশাক পরে আপনাকে নাচতেও দেখা গেছে...'

'এসব আমি স্বীকার বা অস্বীকার, কোনটাই করব না,' বলল গগল। 'শুধু এটুকু ব্যাখ্যা করব–রানাকে কেন আমি রহস্যময় বলি।'

'এবার সত্যি মনোযোগী না হয়ে পারছি না,' হালকা সুরে বলল রানা।

'আমি কোন প্রশ্নের জবাব দেব না,' শর্ত দিল গগল। 'যতটুকু বলব তাতেই সবাইকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। রানাকে আমার রহস্যময় বলার কারণ হলো, ওর যে যোগ্যতা আর ক্ষমতা, এ-সব থাকলে যা খুশি হতে চাওয়া যায়, যা খুশি হতে পারা যায়–কিন্তু কখনোই কিছু হতে চায়নি ও।' এক মুহূর্ত থেমে আরও একটু বলল, 'যদি কিছু হয়েও থাকে, দুনিয়ার মানুষ সে-সম্পর্কে খুব কমই জানে। ও চিরকাল আড়ালেই থেকে গেল। ও যদি মূর্তিমান একটা রহস্য না হয়, তাহলে দুনিয়ায় আর কোন রহস্য নেই।'

মুরল্যান্ড আর জিনা বোধহয় হাততালি দিতে যাচ্ছিল, তার আগে তাড়াতাড়ি

বলে উঠল রানা, 'এ-সব গল্প-গুজব পরে হবে। নুমা হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে এখুনি জানানো দরকার যে আমাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে। উনিই বিসিআই-কে খবরটা পৌঁছে দেবেন।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' মাথা ঝাঁকাল গগল। 'এসো, হুইলহাউসে উঠি। সী-টু-শোর রেডিও কিংবা স্যাটেলাইট ফোন, যেটা খুশি ব্যবহার করতে পারো। ইচ্ছে হলে এমন কি ই-মেইলও পাঠাতে পারো। পানিতে যত ইয়ট আছে তার মধ্যে আমার অ্যাঞ্জেলিনার কমিউনিকেশন সিস্টেমই সবার সেরা।'

ওদের পিছু নিয়ে হুইলহাউসে উঠছে মুরল্যান্ড আর জিনা, দেখল ওরা দু'জন পরস্পরের কাঁধে একটা করে হাত রেখেছে।

দশ

হুইলহাউসে উঠে এসে রানা জানতে চাইল, 'এবার বলো, তুমি এদিকে কোত্থেকে এলে?'

'আমি তো অ্যাঞ্জেলিনাকে নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছি,' জানাল গগল। 'শেষ বন্দর ছেড়েছি ইন্দোনেশিয়ার জাভা। ভাবলাম বঙ্গোপসাগরে ঢুকে বিশ মিনিট ধ্যান করলে টের পেয়ে যাব তুমি ভাল আছ কিনা। যদি ভাল থাকো তাহলে আর বাংলাদেশের কোন বন্দরে ভিড়ব না, কোর্স বদলে শ্রীলঙ্কার দিকে চলে যাব।'

'ধ্যান করে আপনি টের পেলেন রানার বিপদ?' চোখ বড় বড় করল জিনা।

'টের না পেলে বাংলাদেশের দিকে আমি যাচ্ছিলাম কেন?'

বিলাসবহুল ক্যাটাম্যার‍্যান-এর চারদিকে চোখ বুলাল রানা। 'আমি কোন ক্রু দেখছি না।'

'আমি একাই বেরিয়েছি,' বলে ভুরু কোঁচকাল গগল। 'তুমি যেন মনে হচ্ছে আমার স্বভাব ইত্যাদি সব ভুলে গেছ? আমি তো চিরকাল যা করার একাই করি।'

'কিন্তু তাই বলে এত বড় একটা মোটর বোট নিয়ে?'

গগল হাসল। 'বড় তো কি হয়েছে, অটমেইটেড সিস্টেম আর কমপিউটরের সাহায্যে অ্যাঞ্জেলিনা নিজেই চলতে পারে, বেশিরভাগ সময় চলেও তাই।'

হুইলহাউসের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নুমার সদস্যরা যারপরনাই বিস্মিত। টিনটেড উইন্ডো তিনশো ষাট ডিগ্রি বৃত্ত রচনা করায় সবগুলো দিগন্ত দেখতে কোন অসুবিধে নেই। লেআউটে ঐতিহ্য বলতে কিছুই নেই। প্রচলিত ইন্সট্রুমেন্ট বা গজ, হুইল বা হেল্‌ম্, লিভার বা থ্রটল, কিছুই নেই। সাতটা লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে–এলসিডি–স্ক্রীনের সামনে বড় আকারের এগজিকিউটিভ চেয়ার ফেলা আছে। চেয়ারটার ডান হাতল ধরে আছে একটা কমপিউটর ট্র্যাকবল, বাম বাহুতে ফিট করা একটা জয়স্টিক। প্রতিটি স্ক্রীন ওয়ালনাট কেবিনেটে আটকানো। সাজানোর দিক থেকে স্টারশিপ এন্টারপ্রাইজের চেয়েও অ্যাঞ্জেলিনার হেল্‌ম্ স্টেশন অনেক বেশি চোখ-ধাঁধায়।

হেল্‌ম্‌ চেয়ারটা দেখিয়ে রানাকে বসতে বলল গগল। 'তোমার ডান দিকের প্যানেলে গ্লোবস্টার ফোন। নীল বোতামটা টিপলেই তোমরা সবাই কথা বলতে ও অপরপ্রান্তের কথা শুনতে পাবে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে নুমা হেডকোয়ার্টারের নির্দিষ্ট একটা নম্বর ডায়াল করল রানা। বরাবরের মত প্রথমবার রিঙ বাজার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'হ্যামিলটন।'

'রানা, মিস্টার হ্যামিলটন।'

এক মুহূর্তের জমাট নিস্তব্ধতা। তারপর ধীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'তোমরা সবাই বেঁচেবর্তে আছ?'

'সেদ্ধ খাবারের অভাবে ভুগছি, বাকি সব ঠিক আছে।'

'জিনা? ববি?'

'আমার পাশে দাঁড়িয়ে।'

এয়ারপীস-এর মধ্যে দিয়ে নুমা চীফের স্বস্তির নিঃশ্বাস শুনতে পেল রানা। 'অফিসে আমার সঙ্গে রেডক্লিফ রয়েছেন, আমি স্পীকার অন করছি।'

'মিস্টার রানা!' রেডক্লিফের হর্ষধ্বনি শোনা গেল। 'ভাবতে পারবেন না আপনারা ভাল আছেন জেনে কি আনন্দ হচ্ছে আমাদের। বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়ার নৌ ও বিমান বাহিনী আপনাদের আর.সী রবিনের খোঁজে ভারত মহাসাগর চষে ফেলছে...'

'ভাগ্য নিতান্ত ভাল, হঠাৎ এদিকে চলে আসা একটা ইয়ট আমাদেরকে উদ্ধার করেছে।'

'তোমরা সী রবিন থেকে বলছ না?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন জর্জ হ্যামিলটন।

'বু নেভিগেটর নিয়ে ঘণ্টা কয়েক সাগরের নিচে থাকার পর সারফেসে উঠে দেখি সী রবিন নেই—বাতাসে মিলিয়ে গেছে।'

'তাহলে তোমাদের জানার কথা নয়।'

'কি কথা জানার নয়?'

'আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত নই, তবে দেখে-শুনে মনে হচ্ছে সী রবিনকে হাইজ্যাক করা হয়েছে।'

'এরকম মনে হবার কারণ?'

'গতকাল এই সময় আমাদের সিকিউরিট সিস্টেম ধরতে পারে যে-লোকটা ক্যাপটেন শেফার্ডের নামে স্ট্যাটাস রিপোর্ট পাঠাচ্ছে সে অন্য কেউ, শেফার্ডের সঙ্গে তার ভয়েস প্যাটার্ন মিলছে না। তার আগে পর্যন্ত আমরা কেউ কিছুই সন্দেহ করতে পারিনি।'

'আমরা যখন জাহাজ ছাড়ি তখন সব স্বাভাবিক ছিল,' বলল মুরল্যান্ড।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'হাইজ্যাক করে জাহাজটাকে কোথায় নিয়ে গেছে, কোন ধারণা আছে আপনাদের?'

'না, কোনই ধারণা নেই,' হতাশ গলায় বললেন রেডক্লিফ।

'অত বড় একটা জাহাজ নিশ্চয়ই বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়নি,' বলল জিনা।

'ভিনগ্রহ থেকে কেউ এসে মহাশূন্যেও নিয়ে যায়নি।'

'আমি ভয় পাচ্ছি ওটাকে ইচ্ছে করে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে,' থমথমে গলায় বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। এ-কথা বলতে গিয়েও বললেন না যে সী রবিনের সঙ্গে সমস্ত ক্রু ও বিজ্ঞানীদেরও সলিল সমাধি ঘটেছে বলে তাঁর ধারণা।

'কিন্তু কেন?' প্রশ্ন মুরল্যান্ডের। 'একদল জলদস্যুর কাছে একটা ওশনাগ্র্যাফিক সার্ভেশিপের কি মূল্য থাকতে পারে? জাহাজে কোন গুপ্তধন ছিল না। সী রবিনকে চোরাচালানের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। স্পীড কম; দেখলেই চেনা যাবে। মোটিভ কোথায়?'

'মোটিভ হলো, কেউ জানতে দিতে চাইছে না ওয়াটার লিলিতে আগুনটা লাগানো হয়েছিল,' বলল রানা।

'সাগরের নিচে ওয়াটার লিলি সার্ভে করা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'হ্যাঁ, হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই যে বিস্ফোরণ ঘটিয়েই ওয়াটার লিলির তলা খসিয়ে দেয়া হয়।'

মুরল্যান্ড বলল, 'প্রমাণ গোপন রাখার জন্যে সাগরের বিশ হাজার ফুট তলা আদর্শ জায়গা।'

রেডক্লিফ সায় দিলেন। 'ক্রিমিন্যালরা কল্পনাও করেনি কাছেপিঠে নুমার একটা সার্ভে শিপ থাকবে, সেই শিপের সাবমারসিবল বিশ হাজার ফুট নেমে দেখে আসতে পারবে ওয়াটার লিলিকে।'

অকস্মাৎ স্থির ও অপলক হয়ে গেল জিনার চোখ। 'তাহলে তো এ সম্ভাবনাও স্বীকার করতে হয় যে অপরাধ গোপন করার স্বার্থে সী রবিনের ক্রু আর বিজ্ঞানীদের মেরে ফেলা হয়েছে!'

ইয়টে ও প্রায় বারো হাজার মাইল দূর ওয়াশিংটনে নিস্তব্ধতা নেমে এল। সবাই উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত।

নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা। 'মিস্টার রেডক্লিফ?'

রেডক্লিফ চোখ থেকে নামিয়ে রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছছেন। 'ইয়েস?'

'জলদস্যুরা ইচ্ছে করলেই সী রবিনকে দখল করার পর ডুবিয়ে দিতে পারত, তাই না? কিন্তু আপনি বলছেন, ক্যাপটেন শেফার্ডের গলা নকল করে শেডিউল ধরে রিপোর্ট করেছে ওরা। সী রবিনকে ডুবিয়ে দিয়ে থাকলে এই ঝামেলার মধ্যে তারা যাবে কেন?'

'ডোবানো হয়নি, এ-ও আমরা জানি না।'

'তা জানি না, কিন্তু আমরা সারফেসে ওঠার পর কোন আবর্জনা বা তেল ভাসতে দেখিনি,' বলল রানা। 'আমার ধারণা, ক্রু আর বিজ্ঞানীদের সহ জাহাজটা কোথাও নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, প্ল্যান ভেস্তে যাচ্ছে দেখলে তুরুপের তাস হিসেবে কাজে লাগাবার জন্যে।'

'কিন্তু যখন বুঝতে পারবে তাদের অপরাধ ধরা পড়েনি বা তাদেরকে আটক করার চেষ্টা হচ্ছে না,' বললেন রেডক্লিফ, 'তখন কি হবে? লোকজন সহ সী রবিনকে ডুবিয়ে দিয়ে নিজেদের দুষ্কর্মের প্রমাণ মুছে ফেলবে?'

'সেটা আমরা ঘটতে দিতে পারি না,' প্রতিবাদের সুরে বলল জিনা। 'রানা যা বলছে তা যদি সত্যি হয়, ওদেরকে উদ্ধার করতে চাইলে খুব একটা সময় নেই আমাদের হাতে।'

অ্যাডমিরাল বললেন, 'সমস্যা হলো, কোথায় খুঁজবে?'

'কোথাও তার নামগন্ধ পর্যন্ত নেই?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'নেই।'

'হাইজ্যাকারদের ভেসেল সম্পর্কেও কোন তথ্য নেই?'

'না।'

'আমি জানি কিভাবে দুটো জাহাজকেই খুঁজে পাওয়া যাবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা।

ওয়াশিংটনে হ্যামিলটন ও রেডক্লিফ পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। 'তুমি কোন জলে মাছ ধরছ, হে?'

'আমরা সার্চ গ্রিড-এর পরিধি বাড়াব,' জবাব দিল রানা।

'বুঝলাম না,' বললেন রেডক্লিফ।

'ধরুন স্যাটেলাইট ক্যামেরা সরু একটা জায়গার ওপর ফোকাস করেছিল, সেই জায়গার বাইরে ছিল আমাদের সার্ভেশিপ আর পাইরেট শিপ।'

'একটা সম্ভাবনা,' স্বীকার করলেন হ্যামিলটন।

'আমি ধরে নিচ্ছি,' বলল রানা, 'পরবর্তী অরবিট-এ সার্চ এরিয়া আরও চওড়া করতে বলবেন।'

'বলাও হয়েছে,' জানালেন রেডক্লিফ। 'করাও হয়েছে। কিন্তু দুটো জাহাজের কোনটারই সন্ধান পাওয়া যায়নি।'

'এর মানে হলো সী রবিন কোথায় আমরা তা জানি না,' বলল রানা। 'তবে এখন আমরা জানি কোথায় সে নেই।'

নিখুঁতভাবে ছাঁটা নিজের ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলাচ্ছেন অ্যাডমিরাল, 'আমি জানি কি বলতে চাইছ তুমি, তবে তোমার থিওরি এখানে খাটবে না।'

'অ্যাডমিরালের সঙ্গে আমি একমত,' বললেন রেডক্লিফ। 'সী রবিনের টপ স্পীড পনেরো নটের বেশি নয়, স্যাটেলাইট ক্যামেরার নিয়মিত রেঞ্জের বাইরে চলে যাবার কোন উপায় নেই তার।'

'চীফ এঞ্জিনিয়ার গার্ডনার জ্বলন্ত ওয়াটার লিলির দিকে ছোটার সময় বিশ নট স্পীড তুলেছিলেন,' জানাল রানা। 'স্বীকার করছি একটু কষ্টকল্পনা হয়ে যাচ্ছে, তবে সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দিতে পারছি না–জলদস্যুদের জাহাজের স্পীড বেশি ছিল, সী রবিনকে তারা হয়তো টো করে নিয়ে গেছে।'

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন উৎসাহ বোধ করার মত কিছু পাচ্ছেন না। 'হিসাবটা তাতেও তো মিলছে না। স্যাটেলাইট ক্যামেরার রেঞ্জ বাড়াবার পরও তো সী রবিনের দেখা পাওয়া যায়নি।'

হাতের শেষ তাসটা খেলল এবার রানা। 'ঠিক, কিন্তু আপনারা নজর রাখছিলেন পানির ওপর।'

'পানি ছাড়া আর কিসের ওপর নজর রাখা উচিত ছিল?' বিরক্ত, তবে সেটাকে

নিখুঁতভাবে চেপে রাখছেন অ্যাডমিরাল।

'মিস্টার রানার কথায় যুক্তি আছে,' বললেন রেডক্লিফ, চিন্তিত। 'আমরা মাটিতে ক্যামেরা ফোকাস করার কথা ভাবিনি।'

'জিজ্ঞেস করার জন্যে মাফ চাই।' মুরল্যান্ডের গলা। 'মাটি মানে? ওয়াটার লিলি যেখানে ডুবেছে সেখান থেকে সবচেয়ে কাছের মাটি তো সুমাত্রা, তাই না?'

'না এবং হ্যাঁ, নির্ভর করছে কোন দিকে তাকাচ্ছ তার ওপর।' বলল রানা। 'যদি দক্ষিণ-পুব দিকে তাকাও, সুমাত্রা। উত্তরে তাকালে কোকো আইল্যান্ড। সরাসরি দক্ষিণে তাকালে ল্যান্ডফল আইল্যান্ড। এদিকে তো দ্বীপের ছড়াছড়ি–আন্দামান আর নিকোবরের ভাই-বেরাদার সব।'

'এতসব দ্বীপের মধ্যে কোথায় আমরা খুঁজব সী রবিনকে?'

'কোকো চ্যানেল থেকে বেশিরভাগ দ্বীপই দক্ষিণ দিকে,' বলল রানা। 'আমাদেরকে খুঁজতে হবে দুশো নটিকেল মাইলের বাইরের কোন দ্বীপ।' গগলের দিকে তাকাল ও, চোখ দুটো হঠাৎ একটু উজ্জ্বল হলো।

'তোমার ধারণা ঠিক আছে, রানা,' বলল গগল। 'আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সবগুলোতেই আমি গেছি। তবে সত্যি কথা বলতে কি, কোনটাতেই দেখার তেমন কিছু নেই। আদিবাসীরা বসবাস করে, এখনও তাদেরকে জংলী বর্বরই বলতে হয়, ভারত সরকার তাদের নিয়ে কোনরকম মাথা ঘামায় না। কোন কোন দ্বীপ একদম খালি।'

'এরকম একটা দ্বীপের নাম বলো যেখানে দু'একটা জাহাজ লুকিয়ে রাখা যায়।'

'সেন্টিনেল ওয়ান, টু অ্যান্ড থ্রী,' বলল গগল। 'সবচেয়ে বড় সেন্টিনেল থ্রী, তেরো বর্গ মাইল জুড়ে পাথরের একটা স্তূপ বলতে পারো। পাথর মানে লাভা রক। হ্যাঁ, সেন্টিনেল থ্রীতে একটা আগ্নেয়গিরি আছে। পাহাড়টার নাম ভোলাভালা। এর মানে তোমারই ভাল জানার কথা। তবে শুনেছি বিশ-পঁচিশ বছর পর পর খানিকটা করে ধোঁয়া বেরোয় জ্বালামুখ দিয়ে।'

'একদম খালি?'

'একটা ওয়েদার অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্টেশন থাকলেও, সেটা অটমেইটেড বিজ্ঞানীরা ছ'মাসে একবার এসে চেক ও মেরামত করেন। স্থায়ীভাবে বসবাস করে শুধু ছাগল আর ইঁদুর।'

'হারবার যথেষ্ট বড়, ছোট জাহাজ নোঙর ফেলার জন্যে?'

'হারবার না বলে লেগুন বলাই ভাল,' জানাল গগল। 'একটা কেন, ছোট আকারের দু'তিনটে জাহাজ লুকিয়ে রাখা যাবে যদি কেউ যত্নের সঙ্গে না খোঁজে।'

'গাছপালা? ক্যামাফ্লাজ?'

'সেন্টিনেল থ্রীতে যতই পাথর থাকুক, গাছও আছে প্রচুর,' বলল গগল 'কোথাও কোথাও দুর্ভেদ্য জঙ্গল।'

এবার ফোনে কথা বলছে রানা, 'শুনলেন?'

'হ্যাঁ,' বললেন নুমা চীফ। 'স্যাটেলাইট এরপর যখন বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে যাবে তখন দ্বীপগুলোর দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে বলে দিচ্ছি, বিশেষ

করে সেন্টিনেল থ্রীর ওপর। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব কিভাবে?'

-গগলকে তার কমিউনিকেশন কোড জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল রানা, দেখা গেল আগেই সেটা একটা কাগজে লিখে রেখেছে সে। কাগজটা নিয়ে অ্যাডমিরালকে কোডটা পড়ে শোনাল ও, তারপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল।

'তুমি সত্যি আশীর্বাদ হয়ে এসেছ,' অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করল রানা, তারপরই খোঁজ নিল আরও কতটুকু কি সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। 'এমন কোন সম্ভাবনা কি আছে যে তুমি সেন্টিনেল থ্রীর ওদিক দিয়েই যাবে?'

'না, যাব না, কারণ ওদিকে আমার কোন কাজ নেই,' বলল গগল। 'তবে তবু যেতে বাধ্য আমি।'

'বাধ্য?' রানার চোখের তারায় কৌতুক।

'বাধ্য এই জন্যে যে এই উপকার যখন ফিরিয়ে দেয়ার সুযোগ পাবে তুমি, তখন তোমার মনে পড়বে যতটুকু সাধ্য ছিল ততটুকু আমি করিনি–অর্থাৎ সাধারণত যে দশ বা বিশগুণ প্রতিদান পাই, সেই ভাগে একটু হলেও কম পড়ে যাবে।' সোজা মানে হলো: গগল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পাশে থাকবে রানার।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ইয়টে শিভাস রিগাল-এর কোন বোতল-টোতল নেই, নাকি আছে?'

গলা ভেজাতে বসল ওরা চারজন, তখনই ঠিক কি চায় ব্যাখ্যা করল রানা। হাজার হোক বন্ধু মানুষ গগল, তার এত সুন্দর ইয়টটা ধ্বংস করার ঝুঁকি তো আর নিতে বলতে পারে না।

এগারো

কালচে-সবুজ সাগরের পানি চ্যানেল দিয়ে বড়সড় লেগুনটায় ঢোকার পর হালকা সবুজ হয়ে গেছে। সেন্টিনেল থ্রী আইল্যান্ডের ভলক্যানিক পাহাড়-প্রাচীরের মাঝখানে এই লেগুন সরু চ্যানেল-এর পর বেশ চওড়া, নোঙর ফেলার প্রয়োজনীয় পরিসর সহজেই পাওয়া যেতে পারে। আরও সামনে ভোলাভালা পাহাড় থেকে নেমে আসা চঞ্চল ঝর্না এবড়োখেবড়ো পাথুরে ঢাল বেয়ে লাফাতে লাফাতে নেমে এসে পড়ছে লেগুনে। ঘোড়ার খুর আকৃতির সৈকত, বালি আছে, কোথাও বালির বদলে পাথরের স্তূপ। আর আছে সারি সারি সুপারি আর নারকেল গাছ।

সাগর থেকে জোড়া পাহাড়-প্রাচীরের সরু ফাঁক দিয়ে লেগুনের সামান্য একটু দেখা যায়, প্রাচীর দুটো চ্যানেলের দু'পাশে আকাশ ছুঁয়ে আছে। এ যেন চোখে টেলিস্কোপ তুলে দূরের কোন সরু ফাটল দেখা। প্রবেশপথের উঁচু পশ্চিম দিকটায়, তীরে আছড়ে পড়া ফেনা থেকে তিনশো ফুটেরও বেশি ওপরে, তালগাছের পাতা দিয়ে তৈরি একটা কুঁড়ে বানানো হয়েছে বিপজ্জনকভাবে পাথুরে কিনারার একেবারে কাছে। কুঁড়েটার দৈন্যদশা আসলে কৃত্রিম। তালপাতার ভেতর রয়েছে কংক্রিটের তৈরি কঠিন দেয়াল। ভেতরটা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত, জানালাগুলো

টিনটেড। আরামদায়ক ছোট্ট বাড়িটার ভেতর বসে একজন সিকিউরিটি গার্ড চোখে অত্যন্ত শক্তিশালী বিনকিউলার তুলে বিশাল সাগরের ওপর দৃষ্টি বুলাচ্ছে। বিনকিউলারটা বিরাট, তাই একটা স্ট্যান্ড-এর ওপর বসানো। নরম এগযিকিউটিভ চেয়ারে বসে আছে গার্ড, সামনে কমপিউটর, রেডিও, ভিসিআর ও মনিটর নিয়ে। চেইন স্মোকার, অ্যাশট্রে প্রায় ভরে উঠেছে। দূরে, একদিকের দেয়ালের র‍্যাকে সাজানো, চারটে মিসাইল লঞ্চার আর দুটো অটোমেটিক রাইফেল দেখা যাচ্ছে। লেগুনে ঢুকতে চেষ্টা করলে এই অস্ত্রের সাহায্যে ছোট একটা নৌ-বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে সে।

বয়স ত্রিশ, ভাল স্বাস্থ্য, বলা যায় প্রায় শূন্যদৃষ্টিতে জ্বলজ্বলে সাগরের দিকে তাকিয়ে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি চুলকাচ্ছে লোকটা। গত পাঁচ বছর পৃথিবীর যেখানেই ভাড়াটে সৈন্যের দরকার হয়েছে সেখানেই গেছে সে, অবশেষে যোগ দিয়েছে কোবরা ক্লাবে। নতুন বসদের অধীনেও যুদ্ধ করতে হয় তাকে, তবে এ যুদ্ধ একটু অন্য রকম। তোমার প্রতিপক্ষ সব সময় সৈনিক নয়। অনেক সময় নিরীহ বা বোকা লোকজনকেও খতম করতে হয়। তবে বেতন-ভাতা অসম্ভব ভাল। মাথার ওপর নিরাপত্তার ছাতাটাও সাংঘাতিক মজবুত। যত বড় অন্যায়ই করতে হোক, গায়ে কেউ আঁচড়টিও কাটতে পারবে না।

একটা হাই তুলে সিডি প্লেয়ারে ডিস্ক বদলাল সে। প্লে বাটনে চাপ দিতে যাবে, এই সময় পাহাড়-প্রাচীরের গা থেকে বেরিয়ে আসা ঝুল-পাথরের ঠিক সামনে, তার কুঁড়ের নিচে, কিছু একটা নড়তে দেখল। বিনকিউলার ঘুরিয়ে ফোকাস করল নীল ও সাদা একটা বস্তুর দিকে, পানির ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটে আসছে।

ওটা একটা ইয়ট। এমন অদ্ভুত আকৃতির ইয়ট আগে কখনও দেখেনি সে। ওটার খোলা আপার ডেকে দু'জনকে দেখা যাচ্ছে, একটা মেয়ে আর একটা ছেলে বাথটাবে গলা ডুবিয়ে শুয়ে লম্বা গ্লাস থেকে কিছু পান করছে আর হাসাহাসি করছে। বোটের সবগুলো জানালা টিনটেড। আর কোন ক্রু বা প্যাসেঞ্জারকে সে দেখতে পাচ্ছে না। স্পীড আন্দাজ করল চল্লিশ নট।

রেডিওর দিকে ঘুরে ট্র্যান্সমিটার অন করল সে। 'আমি ভাইপার বলছি। দক্ষিণ দিক থেকে একটা ইয়টকে আসতে দেখছি।'

'দক্ষিণ দিক থেকে?' কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'সম্ভবত ইন্দোনেশিয়া বা নিউজিল্যান্ডের ওদিক থেকে বেড়াতে এসেছে।'

'কত বড় ইয়ট? কোন অস্ত্র দেখতে পাচ্ছো? বা সশস্ত্র লোকজন?'

'প্রায় সত্তর ফুট লম্বা। নাহ্, অস্ত্র-টস্ত্র নেই।'

'কোন রকম হুমকি বলে সন্দেহ হচ্ছে?' রুঢ় কণ্ঠস্বর থেকে প্রশ্ন ভেসে এল।

'কাপড় খুলে বাথটাবে শুয়ে থাকা দু'জন নারী-পুরুষকে কি হুমকি বলা যায়?'

'চ্যানেলের দিকে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে ভেতরে ঢুকবে?'

ছুটে আসা ইয়টের জোড়া বো-র মতিগতি বোঝার চেষ্টা করল সিকিউরিটি গার্ড ভাইপার। 'মনে হচ্ছে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।'

'সারাক্ষণ লাইনে থাকো। সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট

করবে। যদি দেখো চ্যানেলে ঢুকতে যাচ্ছে, কি করতে হবে তুমি জানো।'

ঘাড় ফিরিয়ে একটা মিসাইল লঞ্চারের দিকে তাকাল গার্ড। এত সুন্দর একটা বোটকে ডুবিয়ে দিতে খারাপই লাগবে। চেয়ারে ঘুরে বসে গ্লাস-এর ভেতর দিয়ে বোটটার দিকে আবার তাকাল সে, দেখে খুশি হলো চ্যানেলকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে ইয়ট। ক্রমশ দূরে একটা বিন্দু হয়ে গেল ওটা, অন করা রেডিওতে আবার কথা বলল সে, 'ভাইপার বলছি। ইয়টটা চলে গেছে। তবে দেখে মনে হলো সাউথ মুরালির পশ্চিম দিকের খোলা লেগুনে নোঙর ফেলতে পারে।'

'তাহলে ওটা কোন হুমকি নয়,' ঘর্ঘরে কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'আমারও তাই ধারণা।'

'সন্ধ্যার পর ওটার আলোর দিকে খেয়াল রেখো। নিশ্চিত জানা দরকার ওটা ওখানেই থাকে কিনা।'

'আমার মনে হয় রাত কাটাবার জন্যেই ওখানে থেমেছে। প্যাসেঞ্জার আর ক্রুরা বালিতে আগুন জ্বেলে মুরগী বা হাঁস রোস্ট করে খাবে। বোঝাই যায় ধনী লোকজন, আনন্দ ভ্রমণে বেরিয়েছে।'

'হেলিকপ্টার নিয়ে একবার দেখে আসব তোমার ধারণা সত্যি কিনা।'

জিনা আর মুরল্যান্ড হট্ বাথ-এ নগ্ন হয়ে নামেনি, সে প্রশ্নই ওঠে না। গগলের যোগান দেয়া সুইমসুট পরে আছে ওরা। তবে সেন্টিনেল দ্বীপের পাহাড়-প্রাচীর ঘেঁষে বোট ছোটার সময় লম্বা গ্লাসে করে শ্যাম্পেন খাচ্ছিল ওরা ।

অতটা ভাগ্যবান রানা আর গগলকে বলা চলে না। কোলের ওপর একটা চার্ট নিয়ে হেল্‌ম্ স্টেশনে বসে আছে গগল, একটা চোখ ডেপথ্ সাউন্ডারে, তবে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে জলমগ্ন প্রবাল-প্রাচীরের ওপর, যেগুলো অ্যাঞ্জেলিনার জোড়া খোল চিরে ফেলতে পারে–ধারাল ব্লেড চালালে কার্ডবোর্ড যেভাবে দু'ফাঁক হয়ে যায়।

রানার কাজটা সবচেয়ে বাজে। বালিশ আর তোয়ালের বড়সড় একটা স্তূপের নিচে শুয়ে দরদর করে ঘামছে লোয়ার লাউঞ্জ ডেকে, পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় তালপাতা দিয়ে ঢাকা গার্ডহাউসের ছবি নিচ্ছে ভিডিও ক্যামেরায়।

ইয়ট নোঙর ফেলার পর সবাই ওরা মেইন সেলুনে বসে ভিসিআর-এ রানার তোলা ছবি দেখল। ক্যামেরায় টেলিফটো লেন্স থাকায় গার্ডহাউসের জানালার ভেতর বসে থাকা গার্ডকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে–বিরাট একজোড়া বিনকিউলারে চোখ রেখে সরাসরি অ্যাঞ্জেলিনার দিকেই যেন তাকিয়ে আছে। ভিডিওর সঙ্গে সাউন্ডট্র্যাক সিস্টেম থাকায় এবং গগলের হাইটেক কমিউনিকেশন সিস্টেমের সাহায্যে সেন্টিনেল থ্রী দ্বীপের লেগুনের কোথাও উপস্থিত তার সঙ্গীর সঙ্গে বাক্যবিনিময়ও রেকর্ড করা সম্ভব হয়েছে।

'ওদের আমরা বোকা বানিয়েছি,' নির্দ্বিধায় বলল জিনা।

'বুদ্ধিটা কার দেখতে হবে তো!' রানার দিকে তাকাল গগল, সবার হাতে একটা করে ঠাণ্ডা বিয়ারের ক্যান ধরিয়ে দিচ্ছে।

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা গেছে: অচেনা লোকদের ওরা সহ্য করে না,' বলল রানা।

যেন ওর কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যেই রোটর আর এঞ্জিনের কর্কশ গর্জন শোনা গেল, কারও আর বুঝতে বাকি থাকল না যে সরাসরি অ্যাঞ্জেলিনার ওপর দিয়ে একটা হেলিকপ্টার উড়ে গেল।

'লোকটা বলেওছিল যে হেলিকপ্টার নিয়ে দেখতে আসবে,' বলল রানা। 'বাইরে বেরিয়ে হাত নাড়লে কেমন হয়?'

লাল ও হলুদ রঙ করা হেলিকপ্টার, ফিউজিলাজে লেখা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আর মালিকপক্ষের নাম ডাক্ট টেপ দিয়ে ঢাকা, স্থির হয়ে ভেসে আছে একশো ফুট ওপরের আকাশে, অ্যাঞ্জেলিনার স্টার্ন থেকে সামান্য দূরে। ম্যাগাজিন শার্ট গায়ে দু'জন লোক ঝুঁকে তাকিয়ে আছে ইয়টের দিকে। প্রথমবার অ্যাঞ্জেলিনার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল, দ্বিতীয়বার ফিরে এসে নড়ছে না।

লাউঞ্জ থেকে ফেলা কাউচে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে রানা। ডেক ওভারহ্যাঙ-এর তলায় আংশিক আড়াল নিয়ে কপ্টারটার ছবি নিচ্ছে মুরল্যান্ড শার্ট আর বগলের নিচে লুকানো ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে। জেনি আর গগল জ্যাকুজি বাথটাবের পাশে দাঁড়িয়ে লোক দু'জনের উদ্দেশে হাত নাড়ছে। রানা হাতে ধরা গ্লাসটা উঁচু করে ইঙ্গিতে পাইলটদের আমন্ত্রণ জানাল। মাথায় সাদা পরচুলা আর পাকা দাড়ি-গোঁফ দেখে গগলকে বুড়ো একজন মানুষ বলে মনে না করার কোন কারণ নেই, তার ওপর ইয়টে মেয়েও রয়েছে, লোকগুলোর সন্দেহ দূর হয়ে গেল। সাড়া দিয়ে পাল্টা হাত নাড়ল কপ্টারের পাইলট, অ্যাঞ্জেলিনাকে ঘিরে একটা চক্কর দিয়ে ফিরে যাচ্ছে সেন্টিনেল থ্রীর দিকে–সন্তুষ্ট, ট্যুরিস্টরা তাদের জন্যে কোন হুমকি নয়।

কপ্টারটা আকাশে বিন্দু হয়ে যেতেই সবাই আবার সেলুনে ফিরে এল ওরা। ক্যামেরা থেকে ভিডিও টেপ বের করে ভিসিআর-এ ঢোকাল মুরল্যান্ড। জুম ফোকাস-এ পরিষ্কার দেখা গেল যে-লোকটা কপ্টার চালাচ্ছে তার মাথার চুল সোনালি, একটু দাড়ি আছে শুধু থুতনিতে, তার সঙ্গী ও কো-পাইলট একজন নিগ্রো।

'প্রতিপক্ষদের অন্তত একজোড়া মুখ চেনা গেল,' মন্তব্য করল মুরল্যান্ড।

রিমোটের বোতাম টিপে ভিসিআর বন্ধ করে দিল গগল, ধীরেসুস্থে নকল চুল-দাড়ি খুলছে। 'এরপর কি?' জানতে চাইল সে।

'সন্ধ্যার পরপরই ছোট একটা ভেলা তৈরি করব আমরা, তাতে আলো জ্বালার ব্যবস্থা করব, দূর থেকে দেখে যাতে মনে হয় ওটা একটা বোট,' পরবর্তী প্ল্যান ব্যাখ্যা করছে রানা। 'তারপর পাহাড় প্রাচীরের আড়াল নিয়ে অ্যাঞ্জেলিনাকে নিয়ে ফিরে যাব চ্যানেলের কাছে, তবে পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় বসা গার্ডের দৃষ্টিপথের বাইরে থাকব। বোটটা ধরা পড়বে না, কারণ ভিডিওতে আমরা কোন রেডার ইকুইপমেন্ট দেখিনি।'

'তারপর?' প্রশ্ন করল জিনা, উত্তেজিত।

'তারপর আমি আর ববি পানিতে নামব। সাঁতরে চ্যানেল পেরিয়ে লেগুনে ঢুকে দেখব কোথায় কি আছে। আমাদের ধারণা যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, ওখানে যদি সী রবিনকে ক্যামাফ্লাজ নেটিং-এর ভেতর লুকানো দেখি, চুপিসারে চড়ব

ওটায়, কাবু করব হাইজ্যাকারদের, মুক্ত করব বিজ্ঞানী ও ক্রুদের, তারপর জাহাজ নিয়ে নও দো এগারা।'

'এই তোমার প্ল্যান?' মুরল্যান্ড এমনভাবে চোখ কুঁচকে আছে যেন মরুভূমিতে মরীচিকা দেখছে।

'এই আমার প্ল্যান,' রানার গলা থেকে প্রতিধ্বনি বেরুল।

জিনাকে বজ্রাহত দেখাল। 'তুমি নিশ্চয়ই সিরিয়াস নও! হাইজ্যাকাররা সবাই সশস্ত্র, সংখ্যায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজনের কম হবে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা মাত্র দু'জন লাগতে যাচ্ছ? এ তো স্রেফ মরার শখ!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'এরচেয়ে ভাল কোন প্ল্যান থাকলে দিক কেউ।'

'ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওদের নৌ-বাহিনীর স্পেশাল ফোর্সকে পাঠাতে বললে কেমন হয়?' জিজ্ঞেস করল গগল। 'এদিকের বেশিরভাগ দ্বীপই তো ভারতের, কাজেই...'

'আন্দামান আর নিকোবর, এই মূল দ্বীপ দুটোর ওপর শুধু খেয়াল রাখে ভারতীয়রা,' বলল রানা। 'বাকিগুলোর কোথায় কি ঘটছে, তারা জানে না, জানতে চায়ও না। তাছাড়া, ভারত সরকার আমাদের কথা শুনবে কেন? শোনাতে হলে ওয়াশিংটন থেকে হোয়াইট হাউসকে তৎপর হতে হবে। সে অনেক সময়ের দরকার। আমার ধারণা, হাইজ্যাকাররা এখনও যদি ক্রু ও বিজ্ঞানীদের সহ সী রবিনকে ডুবিয়ে না থাকে, আজ রাতের অন্ধকারে কাজটা করতে পারে। কাজেই সাহায্য পাওয়ার অপেক্ষায় থাকাটা বোকামি হবে বলে মনে করি।'

'নিজেদের জীবন এভাবে বিলিয়ে দেয়া...এ আমি সমর্থন করতে পারি না।' জিনা এখনও বিমূঢ়।

'এর কোন বিকল্প নেই,' বলল রানা। 'সময় আমাদের অনুকূলে নয়।'

'অস্ত্র?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড; এত শান্ত ভাবে, যেন আইসক্রীমের দাম জিজ্ঞেস করছে।

'আত্মরক্ষার জন্যে অ্যাঞ্জেলিনায় একজোড়া অটোমেটিক রাইফেল রাখি আমি,' বলল গগল। 'কিন্তু পানির তলা দিয়ে এক মাইল টেনে নিয়ে যাবার পর ওগুলো বা ওগুলোর অ্যামো কতটুকু কাজ করবে তা আমি বলতে পারব না।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা, 'তবে সঙ্গে অত ভারী জিনিস নিয়ে সাঁতরাতে চাই না। তাছাড়া, অস্ত্র সম্পর্কে মাথা ঘামাব যখন প্রয়োজন হবে।'

'ডাইভ ইকুইপমেন্ট লাগবে তো? আমার কাছে ভরা এয়ার ট্যাংক আছে চারটে, দুটো আছে রেগুলেটার।'

'ইকুইপমেন্ট যত কম হয় ততই ভাল। তীরে পৌঁছানোর পর ডাইভ ইকুইপমেন্ট ঝামেলায় ফেলবে আমাদের। লেগুনে আমরা স্নরকেল নিয়ে ঢুকব। অন্ধকারের ভেতর বিশ ফুট দূর থেকেও কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।'

'দূরত্ব কিন্তু কম নয়,' বলল গগল। 'আমি যেখানে বোট থামাব সেখান থেকে লেগুনের ভেতরটা এক মাইলেরও বেশি হবে।'

'যতই দূর হোক, মাঝরাতের মধ্যে পৌঁছাতে পারব না?' মুরল্যান্ড বিড়বিড় করল।

'আমি তোমাদের সময় দু'ঘণ্টা কমিয়ে দিতে পারি,' বলল গগল।

ঘাড় ফেরাল রানা। 'কিভাবে?'

'আমার কাছে একটা ডাইভ থ্রাস্টার আছে, পানির ওপর দিয়ে ওটা তোমাদেরকে টেনে নিয়ে যাবে।'

'এটা খুব কাজ দেবে, ধন্যবাদ।' কতটুকু কি সাহায্য নিচ্ছে খুঁটিয়ে সব মনের খাতায় লিখে রাখছে রানা। অন্তত ওর এই অদ্ভুত বন্ধুর ব্যাপারে এই হিসাবটা রাখতেই হয়–যে যতটা সাহায্য পাবে, সে তারচেয়ে একটু হলেও বেশি করে প্রতিদান দেবে।

'তোমাদের ঠেকাবার সত্যি কোন উপায় নেই?' মনে হলো জিনা নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। রাগে তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

তার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। হাসছে। 'তুমি সব কথা জানো না, তাই এত ভয় পাচ্ছ। আমরা, আমি আর ববি, বাধ্য হলে এরচেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকি নিয়ে বহু কাজ করেছি। এই কাজটাও না করে উপায় নেই আমাদের। চ্যানেলের মুখে সিকিউরিটি ফ্যাসিলিটি থাকত কি, যদি না কেউ ভেতরে কিছু লুকাতে চায়? জিনিসটা সী রবিন কিনা দেখে আসতে হবে আমাদের।'

'আর যদি তোমার ধারণা ভুল হয়?'

হাসিটা রানার মুখ থেকে যেন দপ্ করে মুছে গেল। 'ভুল হয়ে থাকলে সী রবিনের ওরা সবাই মারা যাবে আমরা ওদের উদ্ধার করতে ব্যর্থ হওয়ায়।'

বারো

সূর্য ডোবার পরপরই কাজ শুরু করে দিল ওরা। নারকেল গাছের বেশ অনেকগুলো কাণ্ড এক করে তিনজন লোকের একটা ভেলা বানাতে সময় লাগল দু'ঘণ্টা, কুড়িয়ে আনা গাছের ডালপালা দিয়ে ভেলাটাকে অ্যাঞ্জেলিনার কাছাকাছি একটা আকৃতি দিতে আরও লাগল ঘণ্টা খানেক। কাঠামোয় ব্যাটারিচালিত এক সারি আলোও ফিট করা হলো। সবশেষে ভেলাটাকে রশি দিয়ে আটকানো হলো ইয়টের একপাশে, সৈকত-এর দিকটায়।

'অনুমতি দিলে বলতে পারি, এঞ্জিন লাগালে আমরা একটা দ্বিতীয় অ্যাঞ্জেলিনা পেয়ে যাব,' বলল গগল। 'গিনিস বুকে নাম ওঠাবার জন্যে এই ভেলা নিয়ে ভারত, আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেয়ার কথাও ভাবা যেতে পারে।'

গগলের এরকম প্রলাপে কান না দেয়ার ভান করে রানা, কারণ জানে উৎসাহ দিলে বা চ্যালেঞ্জ করলে কাজটা করে দেখাতে চাইবে সে, কারও বাধা মানবে না।

'আপাতত এটা যদি পাঁচ মাইল দূরে বসা সিকিউরিটি গার্ডকে ফাঁকি দিতে পারে, তাতেই আমি খুশি।' এক আঁজলা পানি তুলে মুখ আর ঘাড় ভেজাল রানা, গরমে সারা শরীর ঘেমে যাচ্ছে। 'আমরা যখন ভেলার আলো জ্বালব, ঠিক তখনই

ইয়টের আলো নেভাব।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে অ্যাঞ্জেলিনার এঞ্জিন স্টার্ট নিল। বোট ছেড়ে দিয়ে বোতামে চাপ দিয়ে উইঞ্চ চালু করল গগল, পানি থেকে নোঙর তুলে নেবে ওটা। তারপর একই সময়ে ভেলার আলো জ্বলল আর ইয়টের আলো নিভল। জ্বলমগ্ন প্রবাল চূড়াকে পাশ কাটিয়ে এল গগল, একটা চোখ রেখেছে ডেপথ্ সাউন্ডারে।

সেন্টিনেল থ্রী-র দিকে এগোচ্ছে সে রেডার-এর সাহায্যে, সতর্ক চোখে দেখছে পিছনে ফেলে আসা আলোড়িত পানিতে কোন উজ্জ্বলতা বা চকচকে ভাব ফুটছে কিনা। স্পীড দশ নটের বেশি তুলল না, ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল তারাজ্বলা আকাশে চাঁদটা না থাকায়।

জিনাকে সঙ্গে নিয়ে হেল্‌ম্ স্টেশনে ঢুকল রানা। জিনা অপারেশন থেকে নিজের নাম কাটিয়ে গ্যালিতে বসে ওদের জন্যে নাস্তা তৈরি করেছে। ট্রে থেকে নিয়ে সবার হাতে একটা করে প্লেট ধরিয়ে দিল সে, তারপর মুরল্যান্ডের পাশে বসল।

মুরল্যান্ড হেডফোন পরেছে, সিকিউরিটি গার্ড পরামর্শ করার সময় যে কর্কশ গলা রেকর্ড করা হয়েছে সেটা নকল করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখছে।

চার্টে দ্বীপটার চারদিকে পানির গভীরতা উল্লেখ করা আছে, সেদিকে একটা চোখ রেখে পাহাড়-প্রাচীরের চূড়ায় জ্বলা আলোর বিন্দুটা লক্ষ্য করে বোট চালাচ্ছে গগল। 'চ্যানেলের ঠিক সামনে ঝুল-পাথর আছে, ওই পাথরটার নিচে থামব আমি,' বলল সে। 'পাঁচিলে বাড়ি খেয়ে ফেনা তৈরি হচ্ছে, সেই জমা ফেনা আবার আছড়ে পড়ছে পাঁচিলে, কাজেই শান্ত সাগরে না পৌঁছানো পর্যন্ত খুব সাবধানে থাকবে তোমরা।'

একটা জানালা খুলল সে, নিরেট পাথরে সফেন ঢেউ আছড়ে পড়ার গর্জনটা সবাই ওরা শুনতে পেল।

ঝুল-পাথুরে নিচে ও পিছনে পৌঁছে গেছে ওরা, সিকিউরিটি গার্ডের আলোটা এখন ওরা দেখতে পাচ্ছে না। ফেনা একটা রেখা তৈরি করেছে পানিতে, রেখাটার সামনে সাগর একদম শান্ত। স্পীড নেই বললেই চলে, স্রোতের টানে ধীরগতিতে ভেসে চলেছে অ্যাঞ্জেলিনা, এঞ্জিন কোন শব্দ করছে না। রানার দিকে তাকাল গগল, চোখের ভাষায় লেখা রয়েছে, 'আইডিয়াটা ভাল নয়, হে।' তবে মুখে কিছুই বলল না, জানে যা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা থেকে রানাকে বিচ্যুত করা অসম্ভব–যেহেতু সিদ্ধান্তটা যুক্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে।

ডেপথ্ সাউন্ডার রীডিং থেকে জানা গেল অ্যাঞ্জেলিনার জোড়া খোলের তলা থেকে সাগরের মেঝে মাত্র পনেরো ফুট নিচে। তাড়াতাড়ি বোতাম টিপে উইঞ্চ সচল করল গগল, পানিতে নেমে গেল নোঙর।

রানার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল সে। 'আমার সীমা এই পর্যন্ত।'

'কতক্ষণ থাকতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইচ্ছে তো আছে যতক্ষণ না ফেরো অপেক্ষা করব,' বলল গগল। 'কিন্তু তিনঘণ্টা বিশ মিনিট পর ভাটা শুরু হলে তীর থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হবে বোট নিয়ে, তা না হলে পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেয়ে ভেঙে যেতে পারে ওটা।

আবার তীর থেকে দূরে সরে গেলে পাহাড়ের মাথা থেকে গার্ড দেখে ফেলবে। সেক্ষেত্রে দ্বীপটার পিছন দিকে চলে যেতে হবে আমাকে।'

'অন্ধকারে তোমাকে আমরা খুঁজে পাব কিভাবে?'

'বিভিন্ন ধরনের শব্দে মাছেদের কি রকম প্রতিক্রিয়া হয় জানার জন্যে আমার কাছে কিছু যন্ত্রপাতি আছে, তারমধ্যে একটা হলো আন্ডারওয়াটার রেডিও ট্র্যান্সমিটার। দু'ঘণ্টা পর আমি মাইকেল জ্যাকসনের একটা গান বাজাব।'

মুরল্যান্ড অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'আপনি বলতে চাইছেন মাইকেলের গান হাঙররাও পছন্দ করে?'

'জানি না কেন, শুধু হাঙররাই ওর গান পছন্দ করে না।'

ধার পাওয়া ফিন আর মাস্ক পরে নিল মুরল্যান্ড ও রানা। স্টার্ন ল্যাডার নিচে নামিয়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল গগল। 'থ্রাস্টার-এর ব্যাটারি অকারণে খচর কোরো না,' বলল সে। 'চ্যানেলের মুখে অপেক্ষা করলেই ঢেউ এসে ভেতরে নিয়ে যাবে।' এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর ভারী গলায় বলল, 'গুড লাক। যতক্ষণ পারি অপেক্ষা করব আমি।'

উষ্ণ, কালো কালির মত পানিতে সামান্য ছিটা তুলে নামল ওরা, সাঁতরে ইয়টের কাছ থেকে খানিকটা দূরে চলে গেল, রানাকে অনুসরণ করছে মুরল্যান্ড। একশো ফুট আসার পর পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল অ্যাঞ্জেলিনা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। পানির ওপর কব্জি তুলে ফ্লুওরেসেন্ট কাঁটা আর ডিগ্রি মার্কিং দেখল রানা গগলের ধার দেয়া কম্পাসে। মুরল্যান্ডের মাথায় টোকা দিয়ে ইঙ্গিতে দূরের একটা দিক দেখাল। থ্রাস্টার-এর সুইচ যখন অন করা হলো, রানার পা দুটো দু'হাতে জড়িয়ে রেখেছে মুরল্যান্ড। মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলল মোটর, পানির ওপর দিয়ে ঘণ্টায় তিন নট গতিতে ওদেরকে টেনে নিয়ে চলল জেটগুলো।

দিক নির্ণয়ে সাহায্য করছে পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে আছড়ে পড়া সফেন ঢেউ আর কম্পাসটা। প্রতিটি ঢেউ বজ্রপাতের শব্দ তুলে ভাঙছে। অন্ধকারে বোঝার উপায় নেই পাথরের পাঁচিল একশো গজ দূরে নাকি দুশো।

তারপর রানার কানে দু'ধরনের গর্জন আলাদাভাবে ধরা পড়ল, জানিয়ে দিল চ্যানেলের উল্টোদিকেও আঘাত করছে ঢেউ। থ্রাস্টার ঘোরাল ও, এখন দ্বীপের দিকে ছুটছে ওরা, ঢেউ ভাঙার শব্দ ডান ও বাঁ দিক থেকে আসছে–সামনে থেকে নয়। এরপর, গগলের পরামর্শ মত, থ্রাস্টার অফ করে দিল ও, চ্যানেলের ভেতর দিয়ে ওদেরকে বহন করে নিয়ে যাবার কাজটা ছেড়ে দিল একের পর এক ছুটে আসা ঢেউগুলোর ওপর। নিচের দিকে মুখ করে শুধু পড়ে থাকো, পা দুটো দু'পাশে মেলে দাও, শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলুক স্নরকেলের মাধ্যমে। থ্রাস্টারকে ধন্যবাদ, এতটুকু ক্লান্ত হয়নি ওরা। পা ছেড়ে দিয়ে রানার পাশে চলে এসেছে মুরল্যান্ড।

পাহাড়ের মাথায় ওরা কোন গার্ডকে দেখতে পাচ্ছে না। অন্ধকার এত গাঢ় যে পাহাড়ের মাথাই ঠিক মত দেখা যাচ্ছে না। কাজেই ওখানে যদি কেউ থাকেও, নিচের পানিতে সে-ও ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না।

তবে লেগুনের চারধারে হাইজ্যাকাররা গার্ড রাখলে বিপদ হবে, ভাবল রানা।

প্রশ্ন হলো লোকগুলো সিকিউরিটি সম্পর্কে কতটুকু সচেতন আর সাবধান দ্বীপটাকে ঘিরে থাকা পাহাড়-প্রাচীরের ওপর রাতের অন্ধকারে নজর রাখা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। এবড়োখেবড়ো, ধারাল পাথরে হাঁটাহাঁটি করে ঘন জঙ্গলের ওপর চোখ রাখাও তাই। রানা প্রায় নিশ্চিত, পাহারাদার বলতে একজনই, চ্যানেলের প্রবেশপথের মাথায় সে-ই গার্ডটা।

প্রায় পনেরো মিনিট পর-মাথার ওপর উন্মোচিত হলো ঝাঁক ঝাঁক তারা, উঁচু পাহাড়-প্রাচীরের নিচ দিয়ে খোলা লেগুনে ঢুকছে ওরা। সৈকতের দিকে থ্রাস্টার ঘোরাল রানা. মোটর চালু রাখল পায়ের নিচে বালি না পাওয়া পর্যন্ত।

সৈকতে এমন কিছু নেই যা দেখে মনে হতে পারে এই দ্বীপে মানুষ বাস করে, তবে লেগুন কিন্তু খালি নয়। শান্ত পানির ঠিক মাঝখানে দুটো ভেসেল নোঙর ফেলেছে পাশাপাশি। ওগুলোর আকৃতি ও আউট লাইন অন্ধকারে অস্পষ্ট। নিষ্প্রভ আলো আসছে শুধু পোর্টগুলো থেকে। রানা ঠিকই সন্দেহ করেছিল–ক্যামাফ্লাজ নেটিং দিয়ে দুটো জাহাজকেই ঢেকে রাখা হয়েছে। কাছ থেকে না দেখলে বোঝা যাবে না জাহাজ দুটোর একটা সী রবিন কিনা।

'ফেইস মাস্ক খুলে ফেলো,' নিচু গলায় মুরল্যান্ডকে বলল রানা। 'আমাদের লেন্সে লাগলে আলো ঠিকরাবে।'

সৈকতে থ্রাস্টার রেখে বড় আকারের জাহাজটার দিকে সাঁতরাচ্ছে ওরা। ওটা চ্যানেলের দিকে মুখ করে নোঙর ফেলেছে। বো-টা ভারি সুন্দর, ভাবটা যেন পিছন দিকে একটু হেলান দিয়ে আছে–ঠিক সী রবিনের মত। তবে ওদেরকে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ফিন খুলে মুরল্যান্ডের হাতে ধরিয়ে দিল রানা, তারপর নোঙরের চেইন ধরে ওপরে উঠতে শুরু করল। চেইনটা ভেজা ভেজা, তবে মরচে ধরেনি, গায়ে মাটিও জমে নেই। জাহাজের হোয পাইপ বরাবর উঠে থামল রানা, দম নিচ্ছে। পুরো এক মিনিট ঝুলে থাকল ওখানে।

খোলা একটা পোর্টহোল থেকে আলো বেরুচ্ছে। বো-তে ওয়েল্ড করা হরফগুলো কোন রকমে পড়তে পারল রানা।

সী রবিন।

বো গানল-এর ওপরের কিনারা থেকে দশ ফুট নিচে হোয পাইপটা। রশি ও হুক ছাড়া কোনভাবেই ফোরডেকে উঠতে পারবে না ওরা। চেইন ধরে ঝুলতে ঝুলতে খানিকটা নিচে নেমে এসে ফিসফিস করল রানা, 'সী রবিনই।'

আনন্দ চেপে রাখার জন্যে একটা ঢোক গিলল মুরল্যান্ড। 'মই বা গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ছাড়া ওপরে উঠব কিভাবে?'

'তুমি বলো।'

'তুমি থাকতে আমি কোন দুঃখে মাথা ঘামাতে যাই! আমি জানি বিকল্প একটা কিছু তুমি ভেবে রেখেছ।'

'তা রেখেছি।' অন্ধকারে নিঃশব্দে হাসছে রানা।

'দুঃসংবাদটা শোনাও।'

এখন রানা হাসছে না। 'হাইজ্যাকারদের জাহাজটা ছোট,' বলল ও। 'ওটার

স্টার্নে ওঠা বোধহয় কঠিন হবে না। তারপর ওখান থেকে সী রবিনে যাবার ব্যবস্থা করা যাবে।'

জলদস্যুদের জাহাজে কামান বা কোন মেশিন গান দেখা গেল না। একশো পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা একটা ইউটিলিটি ওঅর্ক বোট এটা, স্টার্ন শুধু যে নিচু তা নয়, ওপরে ওঠার পর ডাইভার'স বোর্ডিং ল্যাডার আর ছোট একটা প্ল্যাটফর্মও পেয়ে গেল ওরা।

'মাথায় মারার জন্যে একটা ডাণ্ডা বা রড পেলে খুশি হতাম,' ফিসফিস করল মুরল্যান্ড। 'খালি হাতে নিজেকে ঠিক স্মার্ট লাগছে না।'

'চুপ।'

'আচ্ছা, চুপ।'

স্টার্ন রেইলিং টপকাতে যাচ্ছে রানা, ওর কনুইয়ের ওপর মাংসে মুরল্যান্ডের নখ ডেবে গেল। 'কি হলো?' কনুইয়ের ওপরটা ডলছে ও।

'আফট্ ডেকহাউসের ছায়ায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয় সিগারেট খাচ্ছে,' রানার কানে কানে বলল মুরল্যান্ড।

মাথাটা সাবধানে তুলে ওঅর্ক ডেকের ওপর দিয়ে তাকাল রানা। মুরল্যান্ডের বিস্ময়কর দৃষ্টিশক্তিকে ফাঁকি দেয়া যায়নি। অন্ধকারে কোন রকমে ছায়ামূর্তিটাকে দেখা যাচ্ছে, রেইলিং-এর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু হাত ওঠা-নামার অস্পষ্ট ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় লোকটা সিগারেট খাচ্ছে। তাকে সতর্ক বা উদ্বিগ্ন বলে মনে হলো না। বরং মনে হলো নিজের কোন চিন্তায় মগ্ন।

শিকারী বিড়ালের মত এগোল মুরল্যান্ড। জানে নারকেল গাছের পাতায় বাতাস লাগায় যে শব্দ হচ্ছে তাতে চাপা পড়ে যাবে তার শরীর থেকে ঝরে পড়া পানির আওয়াজ। পিছন থেকে লোকটার গলা চেপে ধরল তার লোহার মত শক্ত হাত। সামান্যই ধস্তাধস্তি হলো। হাইজ্যাকারের অজ্ঞান শরীরটা টেনে স্টার্নের কাছে নিয়ে এল মুরল্যান্ড, লুকিয়ে রাখল বড় একটা উইঞ্চের পিছনে।

লোকটাকে সার্চ করে বড় একটা ফোল্ডিং নাইফ আর একটা পিস্তল পেল রানা, নাকটা ভোঁতা। 'এবার তুমি স্মার্ট হতে পারো।'

'ব্যাটা এখনও নিঃশ্বাস ফেলছে,' বলল মুরল্যান্ড। 'কি করা যায়?'

'বোর্ডিং প্ল্যাটফর্মে ফেলে দিলে কেউ সহজে দেখতে পাবে না,' বুদ্ধি দিল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে লোকটাকে অনায়াসে তুলল মুরল্যান্ড, রেইলিং টপকে প্ল্যাটফর্মে ফেলে দিল। লোকটা গড়াল, তবে পানিতে পড়ল না।

'অন্তত ঘণ্টাখানেক যেন জ্ঞান না ফেরে।'

'ফিরবে না।' অন্ধকারে খোলা ডেকের ওপর চোখ বুলাচ্ছে মুরল্যান্ড। 'সংখ্যায় কত হতে পারে হাইজ্যাকাররা?'

'এ-ধরনের বোটে ক্রু থাকে পনেরোজন,' বলল রানা। 'প্যাসেঞ্জার ধরবে একশোরও বেশি।' মুরল্যান্ডের হাতে ছুরিটা ধরিয়ে দিল ও।

'আমি পিস্তলটা কেন পাব না?' অভিযোগের সুরে জানতে চাইল মুরল্যান্ড, ছুরিটা পরীক্ষা করছে।

'তুমি ফেন্সিং পছন্দ করো।'

'ওই খেলায় তো তলোয়ার ব্যবহার করা হয়।'

'ভান করো তোমার হাতে ওটা তলোয়ারই।'

আর কোন কথা হলো না, কার্গো আর ওঅর্ক ডেক পার হয়ে আফট্ বাল্কহেডের হ্যাচের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। এয়ারকন্ডিশনিং-এর পুরো সুবিধে পাবার জন্যে হ্যাচ ডোর বন্ধ রাখা হয়েছে। ওখান থেকে গ্যাংপ্লাঙ্কের দিকে এগোল ওরা, দুটো জাহাজের মাঝখানে ফেলা। একটা পোর্টের ভেতর আলো জ্বলতে দেখে সাবধানে ভেতরে উঁকি দিল রানা।

বড় একটা মেস রুমে অনেকগুলো লোক বসে তাস পিটছে বা টিভি দেখছে। গুণে দেখা গেল-হাইজ্যাকাররা এখানে বাইশজন। এক কোণে জড়ো করা যে-সব অস্ত্র রয়েছে, একটা বিপ্লব শুরু করার জন্যে যথেষ্ট। কাউকে এতটুকু উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত মনে হচ্ছে না, কেউ এমন কি সতর্কও নয়। বন্দিরা পালিয়ে যেতে পারে, এই ভয়ও করছে বলে মনে হলো না। সবাই হাসিখুশি, নিরুদ্বিগ্ন। এদের হাতে পঞ্চাশজন লোক জিম্মি হয়ে আছে? বিশ্বাস করা কঠিন।

তাহলে কি সী রবিনের ক্রু আর বিজ্ঞানীরা কেউ বেঁচে নেই?

'এদেরকে আমি বোম্বেটে বলব না,' রানার পর মুরল্যান্ডও দেখল লোকগুলোকে, তারপর মন্তব্য করল। 'অন্তত পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে প্রফেশনাল মার্সেনারি বলে মনে হচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা। মার্সেনারিদের নিজেদের জাহাজে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তাটা বাতিল করে দিল ও। ছয় বুলেটের একটা পিস্তল আর একটা ছুরি দিয়ে বাইশজন সশস্ত্র ভাড়াটে সৈনিককে কাবু করা সম্ভব নয়। ওদের প্রথম কাজ নিশ্চিত হওয়া যে সী রবিনের কেউ বেঁচে আছে কিনা।

আবার ডেক ধরে এগোচ্ছে, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রানা। পাশে মুরল্যান্ডও স্থির হয়ে গেল। ফিসফিস করল অন্ধকারে। 'কিছু দেখেছ?'

রঙ করা চওড়া একটা কার্ডবোর্ড দেখাল রানা, সুপারস্ট্রাকচারের গায়ে যেনতেন ভাবে সাঁটিয়ে রাখা হয়েছে। 'চলো দেখি কি লুকাতে চায় ওরা।'

নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে ডাক্ট টেপ খুলল রানা, এই টেপই কার্ডবোর্ডটাকে সুপারস্ট্রাকচারের ধাতব সাইড-এ আটকে রেখেছে। কার্ডবোর্ডের একটা প্রান্ত উঁচু করতেই পোর্টহোল থেকে বেরিয়ে আসা আলোয় দেখা গেল প্রতীক চিহ্নটা–একজোড়া শ্যেন পাখি, পরস্পরের মুখোমুখি ডালে বসে আছে। নিচে লেখা 'ফ্যালকন'। ফ্যালকন মানে বাজপাখি, কিন্তু এই নামে কোন জাহাজ কোম্পানি আছে কিনা রানার জানা নেই। কার্ডবোর্ডটা জায়গা মত বসিয়ে আবার টেপ লাগিয়ে দিল ও।

'কিছু দেখলে?'

'শিকারি বাজপাখি।'

সরু ধাতব গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক পার হয়ে সী রবিনে চলে এল ওরা, আশঙ্কা করছে গাঢ় ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে ওদের শরীর বুলেটে ঝাঁঝরা করে দেবে প্রহরী হাইজ্যাকাররা।

সার্ভে শিপের ডেকে কোন বিপদ ছাড়াই পৌঁছাল, ছায়ার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে। নিজেদের জাহাজ এটা, প্রতি ইঞ্চি চেনা। ওর কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে প্রশ্ন করল মুরল্যান্ড। 'তুমি চাও দু'জন দু'দিকে যাই?'

'না,' ফিসফিস করল রানা। 'একসঙ্গে থাকি। চলো, পাইলটহাউস থেকে সার্চ শুরু করি।'

বাইরের দিকের সিঁড়ি বেয়ে পাইলটহাউসে ওঠা যেত, কিন্তু মেস রুম থেকে হাউজ্যাকারদের কেউ বেরুলে দেখে ফেলবে, এই ভয়ে হ্যাচ গলে একটা কম্প্যানিয়নওয়ে ধরল ওরা, চারটে ডেক হয়ে পাইলটহাউসে পৌঁছাল। ভেতরটা অন্ধকার ও খালি পেল ওরা। কমিউনিকেশন রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা, বাইরে পাহারায় থাকল মুরল্যান্ড।

গ্লোবস্টার ফোন তুলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সেল ফোনের নাম্বার টিপল রানা। যোগাযোগ ঘটতে চলেছে, এই ফাঁকে ডোক্সাডাইভ রিস্টওয়াচের কমলা ডায়ালে চোখ বুলাল। দশটা বেজে দু'মিনিট। ওয়াশিংটনে এখন সকাল ন'টার কিছু বেশি, নুমা চীফ সম্ভবত অফিসের পথে রয়েছেন।

তাঁর সাড়া পেয়ে সী রবিনকে খুঁজে পাবার খবরটা সংক্ষেপে জানাল রানা।

'আমার ক্রু আর সায়ান্টিফিক টীম?' উদ্বিগ্ন অ্যাডমিরালের প্রথম প্রশ্ন, ওরা যেন তাঁর পারিবারিক আপনজন।

'এ-ব্যাপারে এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না,' বলল রানা। 'ভাল কোন খবর হলে সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবেন।'

কমিউনিকেশন রুম থেকে বেরিয়ে এল ও। 'কিছু দেখলে বা শুনলে?'

'না। এটা যেন একটা কবরস্থান।'

'এরকম শব্দ ব্যবহার কোরো না তো!' তিরস্কার করল রানা।

পাইলটহাউস থেকে পরবর্তী ডেকে নেমে এল ওরা। এখানেও সেই একই দৃশ্য। সবগুলো স্টেট রুম আর হসপিটাল মর্গের বডি ট্রে-র মত নিস্তব্ধ। নিজের স্টেট রুমে ঢুকে একটা দেরাজ হাতড়াবার সময় ওয়ালথার পিস্তলটা যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই পেয়ে খুশি হলো রানা, তবে অবাকও কম হলো না। ওটা নিজের বেল্টে গুঁজে রাখল, হাইজ্যাকারের কাছ থেকে পাওয়া পিস্তলটা ধরিয়ে দিল মুরল্যান্ডের হাতে। এরপর একটা পেনলাইট খুঁজে নিয়ে কামরার চারদিকে আলো ফেলল ও। ওর কোন জিনিসই নাড়াচাড়া করা হয়নি। মাত্র একটা জিনিস যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের লেদার ব্যাগটা ক্লজিটের ভেতর রেখে গিয়েছিল, সেটা খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে বিছানার ওপর।

মুরল্যান্ডের কামরাতেও কেউ তেমন কিছু নাড়াচাড়া করেনি।

'লোকগুলোর কোন কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না,' শান্ত গলায় বলল সে। 'মূল্যবান জিনিস-পত্র চুরি করে না, এমন বোম্বেটেদের কথা কেউ কোন কালে শুনেছে?' প্যাসেজওয়ে-তে আলো ফেলল রানা। 'চলো এগোই।'

কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে আরেক ডেকে নেমে এল ওরা। এখানে আরও আটটা স্টেট রুম, মেস রুম, গ্যালি, কনফারেন্স রুম আর লাউঞ্জ রয়েছে। মেস টেবিলে

এঁটো খাবার সহ এখনও পড়ে রয়েছে প্লেটগুলো, খাবার পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। টেবিলে ও কাউচে ছড়িয়ে রয়েছে ম্যাগাজিন, যেন কিছুক্ষণ আগে ফেলে গেছে পাঠকরা। কনফারেন্স রুমের অ্যাশট্রেতে ফিল্টার পর্যন্ত পুড়ে ছাই হওয়া সিগারেট পাওয়া গেল। ঘুরেফিরে দেখার পর একটা সন্দেহই জাগে মনে, জাহাজের সমস্ত লোককে মন্ত্রবলে কেউ যেন বাতাসে মিলিয়ে দিয়েছে।

এঞ্জিন আর জেনারেটিং রুমে নেমে আসার সময় কোথাও কোন সিকিউরিটি গার্ড না দেখে রানা বিশ্বাস করতে শুরু করল সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটাই বোধহয় ঘটে গেছে। বন্দিদের ওপর নজর রাখার জন্যে অবশ্যই পাহারা বসাবে হাইজ্যাকাররা, জাহাজে আদৌ যদি বন্দি করে রাখার মত কেউ থাকে। তারপর, কোথাও এতটুকু আলো নেই। গার্ডরা গাঢ় অন্ধকারে ডিউটি দেবে না।

মনে ক্ষীণ আশা জাগল এঞ্জিনিয়ারিং-ডেক স্টেট রুমগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময়। ওরা দেখল চীফ এঞ্জিনিয়ার-এর অফিসে আলো জ্বলছে।

'অবশেষে,' বিড়বিড় করল মুরল্যান্ড, 'কারও তাহলে আলো দরকার হয়েছে।'

প্যাসেজওয়ে-এর শেষ মাথায় এঞ্জিন আর জেনারেটিং রুমের দরজা। বাল্কহেড বরাবর পরস্পরের উল্টোদিকে পজিশন নিল ওরা, তারপর অত্যন্ত সাবধানে দরজাটার দিকে এগোল। এমন কি দশ ফুট দূরে থেকেও অস্পষ্ট ফিসফিসানি শুনতে পেল ওরা। পলকের জন্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। ইস্পাতের দরজায় কান ঠেকিয়ে শুনতে চেষ্টা করল রানা। উত্তেজিত গলা, হুমকির সুর। আবার মাঝে মধ্যে হাসাহাসির আওয়াজও।

লম্বা ধাতব দরজাটা সিকি ইঞ্চি ফাঁক করল রানা। কোন শব্দ ছাড়াই নড়ল কবাট। গলার আওয়াজ এখন আরও পরিষ্কার। ফাঁকে চোখ রেখে ভেতরে তাকাল ও। লোক সংখ্যা চার। অন্তত আর কাউকে দেখছে না। দু'জন অচেনা। বাকি দু'জন অতি পরিচিত। বুকের ভেতর রানার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। ওরা চারজন অলস গল্পে মশগুল নয়। অচেনা লোক দু'জন বাকি দু'জনকে ভয় দেখাচ্ছে।

'আর খুব বেশি দেরি নেই, হাড়ে হাড়ে টের পাবে ডুবে মরতে কেমন লাগে।'

'আর্কটিকে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, সেই ঘুম আর ভাঙে না,' তার সঙ্গী সহাস্যে বলছে। 'ডুবে মরাটা কিন্তু অত আরামের নয়। মনে হবে তোমাদের মাথার ভেতর গাদা-গাদা পটকা ফাটছে। মাথা থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়তে চাইছে চোখ। কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছে। ফুসফুসগুলোকে মনে হবে নাইট্রিক অ্যাসিডে চোবানো হয়েছে।'

'তুমি নিশ্চয়ই একটা অসুস্থ বাঁদর!' ক্যাপটেন শেফার্ডের উত্তেজিত গলা।

'ভদ্রমহিলাদের সামনে যেভাবে কথা বলছ,' বললেন চীফ এঞ্জিনিয়ার ফ্রাঙ্ক গার্ডনার, 'এ থেকেই বোঝা যায় তোমরা নেহাতই একদল জানোয়ার।'

'এই, কর্ক, কথাটা কি সত্যি–তুই একটা জানোয়ার?'

'গত হপ্তা পর্যন্ত ছিলাম না।'

এরপর দুজন গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

'আমাদের খুন করো,' বললেন শেফার্ড, 'দুনিয়ার সেরা সব ইনভেস্টিগেটিভ ফোর্স ঠিকই তোমাদের খুঁজে বের করবে, অন্তত দুশো বছর করে জেল হবে…'

'চোপ, ব্যাটা হাঁদারাম!' হাইজ্যাকারদের একজন খেঁকিয়ে উঠল। 'একজন লোকের আয়ু কত যে দুশো বছরের জেল দেবে?'

'আমরা কি তোমাদের ডুবিয়ে মারার প্রমাণ রাখব?' জিজ্ঞেস করল যার নাম কর্ক।

'হাজার হাজার জাহাজ লোকজন সহ সমুদ্রে নিখোঁজ হয়ে গেছে, তোমাদের এটাও সেগুলোর তালিকায় স্থান পাবে।'

'প্লীজ!' দরজার ফাঁক দিয়ে রানা দেখতে পাচ্ছে না, তবে চিনতে পারল গলাটা একজন মহিলা বিজ্ঞানীর। 'আমাদের প্রত্যেকের আপনজন আছে বাড়িতে। এরকম ভয়ংকর একটা ঘটনা কেন আপনারা ঘটাবেন? আমরা তো কোন অপরাধ করিনি।'

'দুঃখিত, লেডি,' ঠাণ্ডা সুরে বলল কর্ক। 'যারা আমাদের বেতন দেয় তাদের কাছে তোমাদের এক কানাকড়িও দাম নেই। আমরা হুকুমের চাকর, জানি শুধু নির্দেশ পালন করতে। খারাপ কি ভাল, সে বিচার করার আমরা কেউ নই।'

'তোমরা প্রফেশনাল খুনী!' গর্জে উঠলেন ক্যাপটেন শেপার্ড।

'কথাটা চিৎকার করে বলবার কি দরকার?' কর্ক হাসছে। 'আমরা নিজেরাই তো স্বীকার করছি। সত্যি আমরা ভাড়াটে খুনী।'

কর্কের সঙ্গী বলল, 'আমাদের ক্রুরা আর আধঘণ্টা পর আসবে।' একটু থেমে রানার দৃষ্টিপথের বাইরে তাকাল সে। 'ওরা আসার দু'ঘণ্টা পর তোমরা নুমারা সাগরের গভীর তলায় পৌঁছে যাবে, নিজ গুণে বেঁচে থাকতে পারলে মূল্যবান গবেষণা চালাতে পারবে ওখানে...'

হ্যাচের সরু ফাঁক দিয়ে রানা দেখতে পাচ্ছে হাইজ্যাকারদের হাতে বাগিয়ে ধরা অটোমেটিক উইপন রয়েছে। মুরল্যান্ডের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে সামনে বাড়ল ও। দরজা খুলে দু'জন একসঙ্গে ভেতরে ঢুকল।

হাইজ্যাকাররা তাদের পিছনে নড়াচড়ার শব্দ পেয়েও ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না, ধরে নিয়েছে নিজেদের সঙ্গীরা পৌঁছে গেছে। বন্দিদের ওপর কড়া নজর রেখে কর্ক বলল, 'তোমরা আগেই চলে এসেছ। এত তাড়াহুড়োর কি কারণ?'

'হুকুম পেয়েছি ডানকান প্যাসেজ ছেড়ে দশ ডিগ্রী চ্যানেলের দিকে যেতে হবে,' বলল মুরল্যান্ড, সুর নকল করছে যে হাইজ্যাকারের গলা কর্কশ ঘর্ঘরে।

'খেল খতম!' হেসে উঠল কর্ক। 'সকল নুমা ভাই ও বোনেরা, এবার তোমরা ফাইনাল প্রার্থনা শুরু করতে পারো। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন...'

'বড় বেশি ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে!' দু'হাত দিয়ে তার মাথা ধরে শূন্যে তুলল মুরল্যান্ড, ছুঁড়ে দিল একটা বাল্কহেডে। ওই একই সময়ে দ্বিতীয় লোকটার খুলির মাঝখানে পিস্তলের উল্টোপিঠ দিয়ে আঘাত করল রানা।

পরমুহূর্তে উৎসব। ওরা যেন একটা পার্টি দিচ্ছে। অভাব শুধু বেলুন আর শ্যাম্পেনের।

সী রবিনের ক্রু ও বিজ্ঞানী সবাই ওরা উপস্থিত এখানে। জাহাজের জেনারেটারগুলোকে ঘিরে মেঝেতে বসে রয়েছে সবাই, সেই আগেকার দিনের

ক্রীতদাসদের মত শিকল দিয়ে বাঁধা। একটাই শিকল, প্রত্যেকের পায়ে পরানো আংটার ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে মেইন জেনারেটারের মাউন্টিং-এ জড়িয়ে তালা মেরে দেয়া হয়েছে। এক এক করে মাথা গুণছে রানা, যে-দু'জন চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে বলে ধরে নিয়েছিল তাদেরকে দেখে বাকি সবাই বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে। শেফার্ড, গার্ডনার সহ বিজ্ঞানীদের দেখে মনে হলো তাঁরা যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে রয়েছেন। তারপর তাঁরা সিধে হয়ে দাঁড়াতে শুরু করলেন, আনন্দে-উল্লাসে ফেটে পড়তে যাচ্ছেন।

'কোন শব্দ নয়!' নিজের ঠোঁটে আঙুল রাখল রানা। 'অস্ত্র নিয়ে সবাই ওরা ছুটে আসবে এখুনি।'

'আপনারা কোত্থেকে?' নিচু গলায় জানতে চাইলেন ক্যাপটেন শেফার্ড।

'রানার এক বন্ধুর ইয়ট পৌঁছে দিয়েছে,' জবাব দিল মুরল্যান্ড। 'সে আবার অন্য এক গল্প।' চীফ এঞ্জিনিয়ার গার্ডনারের দিকে তাকাল। 'চেইন কাটার মত কিছু আছে?'

ইঙ্গিতে একটা সাইড কম্পার্টমেন্ট দেখালেন গার্ডনার। 'টুল রুমে ঢুকে দেখবেন বাল্কহেডে একজোড়া কেইবল্ কাটার ঝুলছে।'

'প্রথমে ক্রুদের মুক্ত করো,' মুরল্যান্ডকে বলল রানা। 'হাইজ্যাকাররা চলে আসার আগেই জাহাজ ছেড়ে দিতে চাই আমি।'

ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ফিরে এসে ঝড়ের বেগে শিকল কাটতে শুরু করল মুরল্যান্ড। আউটার ডেকে বেরিয়ে এসে রানা নিশ্চিত হলো, ওদের উপস্থিতি এবং ক্রুদের মুক্তি বাকি হাইজ্যাকারদের কাছে এখনও অজানা ঘটনা। বোম্বেটেদের জাহাজের ডেক এখনও খালি। স্যাটেলাইট টিভি আর তাস নিয়ে মেতে আছে সবাই, আন্দাজ করল রানা; ক্ষুধার্ত হায়েনার মত এই প্রত্যাশায় খুশিতে বাগ্ বাগ্ যে লোকজন সহ সী রবিনকে সাগরে ডুবিয়ে দেয়া হবে।

ফিরে এসে রানা দেখল চীফ গার্ডনার আর তাঁর ক্রুরা এরইমধ্যে মেইন কন্ট্রোল স্টেশনে পৌঁছে গেছে, জাহাজ ছাড়ার প্রস্তুতিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

'এখানেই আপনাদের ছেড়ে যাচ্ছি আমি,' ক্যাপটেন শেফার্ডকে বলল ও।

শেফার্ডকে বোকা বোকা লাগল। এমন কি মুরল্যান্ডও ঘাড় ফিরিয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে।

'চ্যানেলে ঢোকার মুখে, পাহাড়ের মাথায়, একটা গার্ডহাউস আছে,' বলল রানা। 'আমার ধারণা ওখানে যে গার্ডটা আছে তার কাজ শুধু নজর রাখা নয়। তার কাছে এত বেশি ফায়ারপাওয়ার আছে, লেগুন থেকে কোন জাহাজ বেরুবার চেষ্টা করলে অনায়াসে ঠেকিয়ে দিতে পারবে সে।'

'এই ধারণা তোমার হলো কেন?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'যে জানে না সে ভাববে হাইজ্যাকাররা একটা ফুলবাগান পাহারা দিচ্ছে,' বলল রানা। 'দু'জন লোক পাহারা দিচ্ছে পঞ্চাশজন বন্দিকে, বাকি সবাই তাস পিটছে, টিভি দেখছে আর বিয়ার খাচ্ছে। এর কারণ কি? কারণ হলো তারা জানে ক্রুরা সী রবিনের কন্ট্রোল আবার ফিরে পেলেও লেগুন থেকে সাগরে বেরিয়ে যেতে পারবে না। চ্যানেলটা মাঝখানে চারশো ফুট গভীর। সী রবিনকে ওখানে

অনায়াসে নামিয়ে দেয়া যায়, কেউ কোন দিন খুঁজে পাবে না।'

'আজকের রাতটা কালো,' বললেন ক্যাপটেন শেফার্ড, 'গার্ডের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমরা হয়তো সাগরে বেরিয়ে যেতে পারব।'

'না, পারবেন না,' বলল রানা। 'আপনারা রওনা হলেই নিজেদের জাহাজ থেকে হাইজ্যাকাররা জানতে পারবে, সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করবে তারা–সার্চলাইট জ্বেলে, বলাই বাহুল্য। শুধু কি ধাওয়া করবে? রেডিওতে পাহাড়ের মাথায় বসা গার্ডকেও সাবধান করে দেবে। সেজন্যেই ওখানে পৌঁছে হুমকিটা দূর করতে যাচ্ছি আমি।'

'বেশ। তবে তোমার সঙ্গে আমিও যাব।'

মাথা নাড়ল রানা। 'তাহলে জাহাজে লোক ওঠা ঠেকানোর কাজটা কে করবে? ক্রুদের একজন সেনাপতিও দরকার,' শেষ কথাটা সকৌতুকে বলল রানা।

'কিন্তু ওখানে আপনি সময় মত পৌঁছাতে পারবেন কি?' জিজ্ঞেস করলেন চীফ গার্ডনার। 'গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রায় আধমাইল ঢাল বেয়ে উঠতে হবে, তাও অন্ধকারে।'

হাতের ছোট্ট পেনলাইটটা দেখাল রানা। 'এটা আমাকে পথ দেখাবে। তাছাড়া, হাইজ্যাকাররা আসা-যাওয়া করায় পথ একটা তৈরি হয়েই আছে।'

রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেইক করল মুরল্যান্ড। 'গুডলাক, দোস্ত।'

'এদের সবার দায়িত্ব তোমার ওপর,' বলল রানা। 'সাবধানে থেকো।' পরমুহূর্তে চলে গেল ও।

তেরো

হাইজ্যাকারদের অটোমেটিক রাইফেল দুটো সঙ্গেই আছে, গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক থেকে কয়েক ফুট দূরে গানল্-এর পিছনে পজিশন নিয়েছে মুরল্যান্ড। এই গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক সী রবিন আর জলদস্যুদের জাহাজের মাঝখানে সেতু হিসেবে ঝুলে আছে। মুরল্যান্ড ডেকে শুয়ে, হাতের ভাঁজে একটা রাইফেল। পিস্তলের পাশে ডেকে পড়ে রয়েছে দ্বিতীয় রাইফেলটা, তার নাগালের মধ্যে। অতগুলো লোকের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে জিতবে, বোকার মত এরকম কিছু ভাবছে না সে। রওনা হবার পর বোম্বেটেদের কেউ সার্ভে ভেসেলে উঠতে চাইলে তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখাটাই তার উদ্দেশ্য। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কটা ঠেলে পানিতে ফেলে দিতে পারে সে, তবে কোন শব্দ করতে চায় না বলে ফেলছে না। জাহাজ রওনা হলে আপনা থেকেই খসে পড়বে ওটা।

জাহাজের কাঁপুনি অনুভব করল মুরল্যান্ড। বড় জেনারেটরগুলোর সুইচ অন করেছেন চীফ গার্ডনার। ডিজেল ইলেকট্রিক এঞ্জিনগুলোকে ফুল স্পীডে সেট করেছেন। দু'জন ক্রু নোঙর তোলার কাজে ব্যস্ত। উইঞ্চের সাহায্যে দ্রুত উঠে আসছে নোঙরের মোটা চেইন।

এই শুরু হলো মজা! ভাবল মুরল্যান্ড হাইজ্যাকারদের কানে এই নোঙর

তোলার আওয়াজ বজ্রপাতের মত বাজবে। তার ধারণাই সত্যি! মেস রুম থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল তিনজন হাইজ্যাকার কিসের শব্দ হচ্ছে দেখার জন্যে।

নোঙরের চেইন উঠতে দেখল তারা। জানে না নিজেদের সঙ্গী দু'জনকে কাবু করা হয়েছে, তাই চিৎকার করে বলল, 'থামো! থামো! সময়ের আগে চলে যাচ্ছ কেন? তাও ক্রু না নিয়ে?'

মুরল্যান্ড মিথ্যে বলতে অভ্যস্ত নয়, তারপরও বলল, 'কোন ক্রুর দরকার নেই।' সেই কর্কশ ঘর্ঘরে গলা নকল করছে এবারও। 'এ কাজ আমি একাই পারব।'

বোম্বেটেদের জাহাজে ছুটোছুটি, হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। মেস রুম থেকে আরও লোকজন বেরিয়ে আসছে। তারপর অন্য একটা ভারী গলা থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, 'কে তুমি?'

'কর্ক!'

'তুমি কর্ক নও, অসম্ভব! কোথায় সে?'

এঞ্জিনের বিট বাড়ছে, অনুভব করল মুরল্যান্ড। এবার রওনা হবে জাহাজ। আর মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড, গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক পানিতে খসে পড়বে। 'কর্ক বলছে, তোমরা নরকের কীট, ডাস্টবিন থেকে নিয়ে পচা আবর্জনা খাও।'

খিস্তি আর হুংকার যেন বিস্ফোরিত হলো, সেই সঙ্গে হাইজ্যাকারদের একটা দল ছুটে এল গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের দিকে। মাত্র দু'জন উঠতে পারল গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কে, সাবধানে লক্ষ্যস্থির করে দুজনেরই একটা করে হাঁটু গুঁড়িয়ে দিল মুরল্যান্ড। একজন হাইজ্যাকার পিছু হটে ওঅর্ক বোটে পড়ল। দ্বিতীয় লোকটা ঢলে পড়ল ওখানেই, গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের রেইল ধরে অসহ্য ব্যথায় আর্তনাদ করছে। ঠিক এই সময় সী রবিন রওনা হয়ে যাওয়ায় গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের একটা দিক ঢালু হয়ে গেল, তারপর খসে পড়ল পানিতে। সার্ভে শিপ ছুটল চ্যানেল লক্ষ্য করে।

প্রায় চোখের পলকে তৈরি হলো হাইজ্যাকাররাও। সী রবিন একশো গজও এগোয়নি, নোঙর তুলে ধাওয়া শুরু করল ওঅর্ক বোট। এক ঝাঁক বুলেটও ছুটল, গুলির শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল লাভা রক-এ বাড়ি খেয়ে; ওঅর্ক বোটের ব্রিজ উইন্ডশীল্ড লক্ষ করে পাল্টা জবাব দিতে মুরল্যান্ডও দেরি করছে না।

বাঁক ঘুরে চ্যানেলে পড়ার সময় কিছুক্ষণের জন্যে হাইজ্যাকারদের দৃষ্টিপথের আড়ালে পড়ল সার্ভে শিপ। এই সুযোগে এক ছুটে পাইলটহাউসে উঠে এল মুরল্যান্ড।

হেলমে রয়েছেন ক্যাপটেন শেফার্ড। হিসহিস করে বললেন, 'এবার অত সহজে জাহাজ দখল করতে দিচ্ছি না!'

এঞ্জিনগুলোর কাছ থেকে যত বেশি সম্ভব শক্তি আদায় করা হচ্ছে। চ্যানেলের ভেতর দিয়ে ছুটছে জাহাজ। কালো একটা গহ্বরের মত চ্যানেলটা। পাহাড়-প্রাচীরের অস্পষ্ট রেখা ওদের ওপর দু'দিক থেকে ঝুঁকে আছে, কিছু জ্বলজ্বলে তারা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

কিন্তু ওঅর্ক বোটও চ্যানেলে ঢুকতে যাচ্ছে। ওটার স্পীড সী রবিনের দ্বিগুণ। তীরে সারি সারি দাঁড়ানো নারকেল আর সুপারি গাছের গায়ে ওটার আউটলাইন

অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। স্পীডের যে পার্থক্য, সংঘর্ষ ঘটবেই। ওঅর্ক বোট পিছন থেকে ধাক্কা দিলে সী রবিন ডুবে যেতে বাধ্য।

এরকম ঘোর সংকটময় মুহূর্তে সবারই রানার কথা মনে পড়ল। তারপর সবার চোখ উঠে গেল ওপরে। পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় গার্ডহাউসের আলোটা অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। পাইলটহাউসে উপস্থিত সবাই ভাবছে, তারা যখন চ্যানেল থেকে বেরুতে শুরু করবে, রানা কি তার আগে ওই গার্ডহাউসে উঠতে পারবে? একমাত্র মুরল্যান্ডকে আশাবাদী মনে হলো: দ্রুত ধাবমান ওঅর্ক বোট লক্ষ্য করে শেষ গুলিটা ছুঁড়ল সে।

এটাকে পথ বলা যায় না। এক ফুট চওড়া আঁকাবাঁকা একটা রেখা, লেগুন থেকে খাড়া ঢাল বেয়ে চূড়ার দিকে উঠে গেছে। শরীরে যতটুকু কুলায় তত জোরে ছুটছে রানা। লাভা রক-এ ঘন ঘন ফেলতে হওয়ায় প্রথমে পায়ে ব্যথা শুরু হলো, তারপর রক্তক্ষরণ। গগলের কাছ থেকে নেয়া ডাইভ ফিন-এর নিচে শুধু সোয়েট সকস পরেছিল রানা, সেই মোজা একটু পরই ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে।

গুলির শব্দ শুনে ছুটতে ছুটতেই ঘাড় ফিরিয়ে লেগুনের দিকে তাকাল রানা। ও নিশ্চিত, প্রাণ থাকতে হাইজ্যাকারদের সার্ভে শিপে উঠতে দেবে না মুরল্যান্ড। পোর্টের আলো পড়েছে পানিতে, দেখেই বুঝতে পারল সী রবিন রওনা হয়ে গেল। চিৎকার আর প্রতিধ্বনি বলে দিল বোম্বেটেদের ওঅর্ক বোটও সী রবিনের পিছু নিয়েছে।

রানা এখনও গার্ডহাউস থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে। হাঁপিয়ে গেছে, তাই হাঁটছে এখন। আরও কিছু দূর এগোবার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, কারণ জানালা থেকে বেরিয়ে আসা আলোয় একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেয়েছে। গার্ডহাউস থেকে বেরিয়ে পাহাড়-চূড়ার কিনারায় এসে দাঁড়াল গার্ড, নিচের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে দেখছে সী রবিন চ্যানেলের ভেতর দিয়ে ফুল স্পীডে বেরিয়ে যাচ্ছে।

রানা দ্রুত এগোল, গা ঢাকা দেয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করছে না। ছুটে লোকটার পিছনে চলে এল, নিচের ঘটনা এখনও তার চোখ দুটোকে চুম্বকের মত টেনে রেখেছে। গার্ডহাউস থেকে যথেষ্ট আলো বেরুচ্ছে, সেই আলোয় দেখা গেল লোকটার হাতে বড়সড় কোন আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। হয় গুলির শব্দ বাইরে বের করে এনেছে তাকে, কিংবা রেডিওতে মেসেজ পেয়েছে বন্দিরা নিজেদের মুক্ত করে নুমার জাহাজ নিয়ে পালাচ্ছে।

আরও কাছে আসার পর অস্ত্রটা চিনতে পেরে রানার হার্টবিট বেড়ে গেল আরও। ওটা একটা মিসাইল লঞ্চার। গার্ডের পাশে কাঠের একটা লম্বা বাক্সও রয়েছে, সন্দেহ নেই মিসাইল আছে ওটায়। রানা তাকিয়ে আছে, লোকটা মিসাইল লঞ্চার কাঁধে তুলল।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটল রানা। লোকটা যদি মিসাইল ছুঁড়তে পারে, আর সেটা যদি সী রবিনে লাগে, প্রিয় বন্ধু মুরল্যান্ড সহ নুমার পঞ্চাশজন ক্রু ও বিজ্ঞানী মারা যাবেন। শেষ দশ গজ মরিয়া হয়ে ছুটল রানা।

পায়ের ক্ষতগুলো থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, এক সেকেন্ড আগেও তীব্র জ্বালা

অনুভব করছিল, অথচ শেষ দূরত্বটুকু পেরোবার সময় রানা হাঁপাল না, কাতর কোন শব্দ করল না, কোথাও এতটুকু ব্যথাও পাচ্ছে না–শূন্যে লাফ দিল, জানে বোধহয় দেরি হয়ে গেছে, লোকটাকে আঘাত করল ঠিক যখন লঞ্চার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মিসাইল।

রানার মাথায় বিস্ফোরিত হলো লঞ্চারের ফ্ল্যাশ, লোকটার বুকে কাঁধ আর মাথা ঠোকার সময় ওর চুল পুড়ে গেল। দু'জনেই ছিটকে পড়ল মাটিতে। ওদিকে রাতের অন্ধকার চিরে ছুটে চলেছে মিসাইল। শেষ মুহূর্তে রানার ধাক্কা খেয়ে সামান্য একটু নড়ে গিয়েছিল লঞ্চার, সী রবিনের পিছনে ও পঞ্চাশ ফুট ওপরে পাহাড়-প্রাচীরের পাথরে আঘাত করল মিসাইল।

পাথরের বিস্ফোরণ ঘটল। সী রবিনের ডেকেও কিছু পাথর ছিটকে এসে পড়ল, তবে কেউ আহত বা অন্য কোন ক্ষতি হলো না।

হতচকিত, পাঁজরের দুটো হাড় ভেঙে গেছে, মাটিতে গড়ান দিয়ে এক লাফে সিধে হলো গার্ড। প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে বিদ্যুৎগতিতে জুডোর কোপ মারল সে, কাঁধে না পারলেও খুলিতে লাগাতে পারল। খুলি না ভাঙলেও চোখের সামনে আগুনের ফুলকি ছুটোছুটি করতে দেখল রানা, জ্ঞান হারাচ্ছে বুঝতে পেরে নিজেকে শাসাল–কাজ ফেলে এখুনি পালাতে চাও?

পড়ে গিয়েছিল, তারপর যেন বহু যুগ চেষ্টা করার পর হাঁটুর ওপর সিধে হতে পারল। দাঁড়াবার চেষ্টা করাটা ভান। লোকটা এগিয়ে আসছে দেখে প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসিয়ে দিল তার পেটে। কুঁজো হয়ে গেল গার্ড, ফুসফুসের সমস্ত বাতাস সশব্দে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

এবার মিসাইল লঞ্চারটা রানা তুলল। রডের মত করে দু'হাতে ধরে সবেগে ঘোরাল। গার্ডের নিতম্বের হাড় গুঁড়ো হয়ে যাবার শব্দ পেল ও। মাটিতে পড়ে ফুটবলের মত ড্রপ খেলো লোকটা, তারপর পাহাড়ের কিনারা থেকে নেমে গেল নিচে। আকস্মিক পরাজয় এত দ্রুত ঘটল, গলা থেকে কোন চিৎকার পর্যন্ত বেরোয়নি। অনেক নিচে থেকে ভেসে আসা পানির ছলকে ওঠাটাই একমাত্র শব্দ হয়ে বাজল রানার কানে।

মাথা ঠাণ্ডা, দক্ষ হাত, কাঠের বাক্স থেকে একটা মিসাইল নিয়ে লঞ্চারে ঢোকাল রানা, লক্ষ্যস্থির করল সী রবিনের সত্তর গজ পিছনে জলদস্যুদের ওঅর্ক বোটে। ফায়ারিং সিকোয়েন্স জটিল নয় এটার, টার্গেটকে ব্যারেল বরাবর পেয়ে ট্রিগার টেনে দিল ও।

খোলের মাঝখানে আঘাত করল মিসাইল, ওয়াটার লাইনের ঠিক ওপরে। বিস্ফোরণটা তেমন জোরালো বলে মনে হলো না প্রথমে। কয়েক সেকেন্ড পর প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো অগ্নিশিখা, একই সঙ্গে ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল জাহাজটা। হঠাৎ করে গোটা চ্যানেল আলোকিত হয়ে উঠেছে। দু'পাশের খাড়া পাহাড়-প্রাচীরের গা কমলা আর লাল হয়ে উঠল। বিস্ফোরণের ফলে ফুয়েল ট্যাংক ফেটে গেছে, জাহাজের টুকরো দুটো পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেল ধোঁয়া আর আগুনে। তারপর সেই আগুন নিভতেও খুব বেশি সময় লাগল না। ভাঙা ও জ্বলন্ত জাহাজের অংশগুলো ডুবছে।

মিসাইল লঞ্চারটা কিনারা থেকে নিচের পানিতে ফেলে দিল রানা। গার্ডহাউসে ঢুকে কেবিনেট খুলে খুঁজতেই ফার্স্ট-এইড-কিটটা পেয়ে গেল। অ্যান্টিসেপটিক মলমের প্রলেপ লাগাল ক্ষতবিক্ষত পা দুটোয়, তারপর ব্যান্ডেজ বাধল পুরু করে। এবার আর হাঁটতে তেমন অসুবিধে হবে না।

গ্যাসোলিন ভর্তি একটা ক্যান পেয়ে গার্ডহাউসের ভেতর চারদিকে ঢালল রানা। বাইরে বেরিয়ে এসে দেশলাই জ্বেলে কাঠিটা জানালা দিয়ে ভেতরে ফেলল। গার্ডহাউস দপ করে জ্বলে উঠল। পিছন ফিরে একবারও না তাকিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ও।

সৈকতে নেমে এসে রানা দেখল ওর জন্যে জিনা আর মুরল্যান্ড অপেক্ষা করছে। ওদের পিছনে বালির ওপর বো তুলে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে সার্ভে শিপের একটা লঞ্চ, দু'জন ক্রুসহ।

এগিয়ে এসে বন্ধুকে আলিঙ্গন করল মুরল্যান্ড। 'দুর্বল এক মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, তোমাকে বোধহয় কোন আদিবাসী তরুণী দেরি করিয়ে দিচ্ছে।'

বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল রানা। 'নারী সব সময় আমার মত পুরুষের প্রেরণার উৎস, ওদের নিন্দা আমি সহ্য করব না।'

'গার্ড?'

'মিসাইল লঞ্চার সহ চ্যানেলের তলায়।'

'নাইস ওঅর্ক।'

'জাহাজের কোন ক্ষতি হয়নি তো?' জানতে চাইল রানা।

'একটু তুবড়েছে, একটু দাগ পড়েছে, সিরিয়াস কিছু নয়।'

ছুটে এসে রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জিনা। 'এ আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে তুমি সত্যি বেঁচে আছ।'

তার কপালে ভদ্রলোকসুলভ আলতো একটা চুমো দিয়ে লেগুনের চারদিকে তাকাল রানা। 'তুমি জাহাজের লঞ্চে চড়ে এসেছ?'

মাথা ঝাঁকাল জিনা। 'তোমার রহস্যময় বন্ধু সী রবিনের পাশে ইয়ট ভিড়িয়ে আমাকে তুলে দিয়েছে।'

'কোথায় সে?'

কাঁধ ঝাঁকাল জিনা। 'ক্যাপটেন শেফার্ডের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে চলে গেল। বলে গেল, তোমার নাকি আর কোন সাহায্য দরকার হবে না, কাজেই তার বরং বিশ্বভ্রমণটা আবার শুরু করা দরকার।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রানা বলল, 'সত্যি এক অদ্ভুত চরিত্র। ওকে কখনোই আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জানাবার সুযোগ পাইনি।'

'তোমার সম্পর্কেও এই একই কথা বলে সে,' মন্তব্য করল মুরল্যান্ড। 'তবে মন খারাপ করার কিছু নেই। তার সঙ্গে আবার তোমার দেখা হবে।'

'তা হবে।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হয় আমার কোন বিপদের সময়, নয়তো তার। সত্যি কথা বলতে কি, বিপদই আমাদের বন্ধুত্বটা টিকিয়ে রেখেছে।'

সী রবিন বঙ্গোপসাগরে, বাংলাদেশের জলসীমায় ফিরে এসে তেলের উৎসমুখ

অনুসন্ধানের কাজ আবার শুরু করল। নুমার একটা হেলিকপ্টার এসে রানা আর মুরল্যান্ডকে পৌঁছে দিল চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে, ওখান থেকে নুমারই একটা জেট বিমানে চড়ে আমেরিকার উদ্দেশে রওনা হলো ওরা। হেলিকপ্টারে থাকতে বিসিআই চীফ রাহাত খানের সঙ্গে রেডিওতে কথা হয়েছে রানার। বস্ ওকে বলেছেন, 'আগে অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করো, তারপর সনাক্ত করো কে অপরাধী। কেন কি ঘটছে সব আগে জানো। এ-ব্যাপারে নুমা চীফ জর্জ আমাকে কথা দিয়েছে, সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করতে রাজি আছে সে। তার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে আমি তোমার ওয়াশিংটন সফর অনুমোদন করেছি।'

প্লেনে চড়ার ত্রিশ মিনিটের মাথায় নাক ডাকতে শুরু করল মুরল্যান্ড। জানালার ধারে বসেছে, সামনের সিটের নিচে থেকে ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের লেদার ব্যাগটা টেনে বের করল রানা। ক্ল্যাপস্ খুলে ঢাকনিটা সাবধানে তুলল, লোভ হচ্ছে আবার বোধহয় দেখতে পাবে তেলে ভরে আছে। বিদঘুটে একটা আইডিয়া, সকৌতুকে ভাবল।

কেসটায় কোন তেল নেই, ভেতরে শুধু একটা তোয়ালে আর ব্লু নেভিগেটরের ক্যামেরার সাহায্যে তোলা ক্রুজ শিপ ওয়াটার লিলির ভিডিও ক্যাসেটটা রয়েছে। সাবধানে তোয়ালেটার ভাঁজ খুলল রানা, তারপর ওর হাতে চলে এল অদ্ভুতদর্শন হালকা সবুজ রঙের সেই ছোট্ট জিনিসটা—ব্লু নেভিগেটরের রোবোটিক বাহুর সাহায্যে ওয়াটার লিলির পুড়ে ছাই হওয়া চ্যাপেলের ডেক থেকে তুলেছিল। ডান হাতের দু'আঙুলে ধরে বাঁ হাতের তালুতে ওটাকে ওল্টাল ও। এই প্রথম জিনিসটাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পাচ্ছে ও।

জিনিসটার গায়ে মসৃণ, চকচকে একটা ভাব আছে। যে-কোন জিনিস পুড়লে এবড়োখেবড়ো আকৃতি পায়, কর্কশ হয়ে ওঠে, কিন্তু এটার বেলায় একেবারেই তা ঘটেনি। এটা সুডৌল, প্রায় পিচ্ছিল, মোচড় খেয়ে একটু বাঁকা হয়ে আছে। জিনিসটা কি দিয়ে তৈরি রানার কোন ধারণা নেই। তোয়ালের ভেতর জড়িয়ে আবার সেটা লেদার কেসে ভরে রাখল। ভাবল, নুমার কেমিস্টদের হাতে তুলে দিলেই পরীক্ষা করে বলে দেবে জিনিসটা আসলে কি।

তিনবার যাত্রাবিরতি নিয়ে বিশ ঘণ্টা পর ওয়াশিংটনে পৌঁছে ববি মুরল্যান্ড তার বান্ধবীদের জানাতে চলে গেল এখন তাকে আবার চাহিবা মাত্র পাওয়া যাবে। নুমার একটা জীপ এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি হেডকোয়ার্টারে নিয়ে এল রানাকে। দশতলায় ওঠার পর প্রথমে দেখা হলো কমপিউটর জাদুকর কালোমানিক ল্যারি কিং-এর সঙ্গে, ঠিক যাকে ও খুঁজছিল।

'তোমাদের রেসকিউ অপারেশনের রিপোর্ট পড়লাম,' বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বলল সে। 'সত্যি অবিশ্বাস্য! কিন্তু আমার যেটা অবাক লাগে, এরকম বড় মাপের সর্বনাশের সঙ্গে তুমি কিভাবে জড়িয়ে পড়ো?' কিং 'তুমি' শব্দটার ওপর বিশেষ জোর দিল।

'আমি জড়াই না, আমাকে জড়ানো হয়,' জবাব দিল রানা। 'শোনো, রেসকিউ অপারেশনের কৃতিত্ব আমার নয়, সী রবিনের ক্রুদের। আর ওদেরকে

বোম্বেটেদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে আসলে ববি।'

'হুম।' কিং জানে নিজের কৃতিত্ব জাহির করা রানার স্বভাব নয়। 'সে যাক। প্রথমেই তুমি আমার সেকশনে ঢুকলে–নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে?'

ডক্টর সিরাজুল ইসলামের লেদার কেসটা কিং-এর ডেস্কে রেখে খুলল রানা। ক্রুজ লাইনার থেকে উদ্ধার করা ছোট্ট জিনিসটা তোয়ালের ভাঁজ থেকে বের করে কিং-এর হাতে তুলে দিল। 'আমি চাই এটা তুমি অ্যানালাইজ ও আইডেনটিফাই করো।'

অদ্ভুত আকৃতির জিনিসটা কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখল কিং, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'প্রথমে এটাকে কেমিস্ট্রি ল্যাবে পাঠাতে হবে,' বলল সে। 'মলিকিউলার স্ট্রাকচার জটিল কিছু না হলে দিন দুয়েকের মধ্যে উত্তরটা পেয়ে যাবে। আর কিছু?'

ব্লু নেভিগেটরের ভিডিও ক্যাসেটটা বাড়িয়ে ধরল রানা। 'কমপিউটরের সাহায্যে আকারে বড় আর ডিজিটাইজ করতে হবে–থ্রী-ডাইমেনশনাল ইমেজে।'

'কোন সমস্যা নয়।'

'এটাই শেষ।' কিং-এর ডেস্কে একটা ড্রইং রাখল রানা। 'এরকম কোম্পানি লোগো কোথাও দেখেছ?'

দাঁড়-এ বসা একজোড়া বাজপাখির দিকে একবার তাকিয়েই মুখ তুলল কিং। 'এটা তুমি কোথায় পেলে?'

'বোম্বেটেদের ওঅর্ক বোটে ছিল।'

'একটা অয়েল রিগ ওঅর্ক বোট।'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ,' বলল রানা। 'মনে হচ্ছে চেনো তুমি?'

'চিনি।' চেহারা থমথমে, গলা প্রায় ভাঙা। কিং উদ্বিগ্ন। 'তুমি যদি সী রবিনকে হাইজ্যাক করার জন্যে ফ্যালকন করপরেশনকে দায়ী করো, চিন্তার অতীত জটিল একটা সমস্যার সৃষ্টি করতে যাচ্ছ।'

'ফ্যালকন করপরেশন,' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল রানা। 'আরে, তাই তো! এই কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রে বেশির ভাগ ডোমেস্টিক অয়েল ফিল্ড, কপার ও আয়রন মাইনের মালিক। ওদের কেমিকেল ডিভিশন এক হাজার ধরনের আলাদা আইটেম তৈরি করে। কিং, এই কোম্পানি সম্পর্কে সম্ভাব্য সব কিছু জানতে চাই আমি।' ও জানে, নিজের ডিজাইনে বানানো টেকনিক্যালি অ্যাডভান্সড ভীনাস নামে এমন একটা কমপিউটর তৈরি করেছে কিং, সেটাকে প্রায় মানুষ বললেই চলে।

'হুম।' নিজের কমপিউটরের সামনে বসে কী বোর্ডে আঙুল চালিয়ে একটা কোড টাইপ করল কিং। তার কনসোলের ঠিক উল্টোদিকের চেম্বারে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক তরুণীর মুখ ও শারীরিক কাঠামো আবির্ভূত হলো থ্রী ডাইমেনশান-এ। মেয়েটা ওয়ান-পীস বেদিং সুট পরে আছে।

'তুমি ডেকেছ,' বলল সে।

'হ্যালো, ভীনাস। রানাকে তো তুমি চেনোই।'

জ্বলজ্বলে নীল চোখের পাতা ঘন ঘন কাঁপল, তারপর রানার পা থেকে মাথা

পর্যন্ত দৃষ্টি বুলাল ভীনাস। 'হ্যাঁ, ওকে আমি চিনি। কেমন আছ, মিস্টার রানা?'

'ভাল,' বলল রানা। 'তুমি ভাল তো?'

ভীনাসের চেহারা বদলে গেল, সেখানে রাগ ও অভিমান মিশে আছে। 'এই স্টুপিড বেদিং সুট আমার পছন্দ হয়নি, তাই আমার মন ভাল নেই।'

'কথাটা আগে আমাকে বলোনি কেন?' জিজ্ঞেস করল কিং।

'অপেক্ষা করছিলাম কার সামনে বললে তুমি নিজের কেরামতি দেখাতে উৎসাহ পাবে।'

'ওই সুটের বদলে কি চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করল কিং।

'সুন্দর ডিজাইনের একটা আর্মানি সুট। অ্যান্ড্রা গ্যাব্রিয়েল লনজ্যারি। আর টড-এর তৈরি হাই-হীল, অ্যাঙ্কল-স্ট্র্যাপ স্যান্ডেল। ব্যস।'

ঠোঁট টিপে হাসল কিং। 'রঙ?'

'লাল।'

কমপিউটর কী-বোর্ডে প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াল কিং-এর আঙুল। তারপর চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়ে নিজের হাতের কাজ দেখতে লাগল সে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ভীনাস, তারপর উদয় হলো চোখ-জুড়ানো ডিজাইনের তৈরি লাল সুট পরে–ব্লাউজ, জ্যাকেট ও স্কার্ট সহ। 'এখন ভাল লাগছে,' বলল সে। 'আমি খুশি।'

'এখন যখন তোমার মূড ভাল, কিছু কাজ দেখাও,' বলল কিং। 'আমি ফ্যালকন করপরেশন সম্পর্কে ডাটা চাই।'

'কোন্‌টার কথা বলছ? এই নামের বারোটা কোম্পানির ডাটা আছে আমার কাছে।'

'সিনেটর লীফ এরকুল-এর ফ্যালকন। অয়েল, মাইনিং আর কেমিস্ট্রি নিয়ে ব্যবসা করে।'

'ও, ওটা,' বলল ভীনাস, চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'হাতে ঘণ্টাদশেক সময় আছে তো?'

'ফ্যালকন সম্পর্কে তোমার কাছে এত ডাটা?'

'এই মুহূর্তে খুব বেশি নেই, তবে আর যে-সব কোম্পানির সঙ্গে ওরা ব্যবসা করে তাদের নেট ওঅর্কে ঢোকার পর পেয়ে যাব। ওদের ব্যবসা আর স্বার্থ যেহেতু আন্তর্জাতিক, বিভিন্ন সরকারের কাছেও এই কোম্পানি সম্পর্কে প্রচুর ফাইল আছে।'

চোখে সংশয় নিয়ে কিং-এর দিকে তাকাল রানা। 'করপরেট নেটওঅর্ক হ্যাকিং কবে থেকে আইনসিদ্ধ হলো?'

চতুর শেয়ালের মত মুখ করল ল্যারি কিং। 'আমি ভীনাসকে শুধু কমান্ড দিই, সে কি পদ্ধতিতে কাজ করে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাই না।'

চেয়ার ছাড়ল রানা। 'আমি আশা করব ডাটাগুলো তাড়াতাড়িই পাব।'

এবার ওয়াশিংটনে এসে রোনাল্ড রিগ্যান ইন্টারন্যাশন্যাল এয়ারপোর্টের কাছাকাছি ছোট অথচ অভিজাত একটা ফ্রেঞ্চ হোটেলে উঠল রানা, নাম সিজাঁ পঁয়ার।

নিচতলায় রেস্তোরাঁ, একটা টেবিল বুক করল। পুরানো বান্ধবী, কংগ্রেস সদস্যা পারেলিকে ফোন করতে পারত, তবে সিদ্ধান্ত নিল একা ডিনার খাবে। বন্ধুত্ব ঝালাই পরে হলেও চলবে, তার আগে শরীরের জন্যে প্রচুর পুষ্টি আর বিশ্রাম দরকার। খাওয়াদাওয়ার পর দীর্ঘ একটা ঘুম দেবে।

কাপড়চোপড় পরে তৈরি হবার পর রেস্তোরাঁয় নামার জন্যে হাতে সময় থাকল বিশ মিনিট। তৃষার ফোন নম্বর লেখা কাগজটা বের করে ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল ও। পাঁচবার রিঙ হবার পর কেউ যখন ধরছে না, যোগাযোগ কেটে দিতে যাচ্ছে, এই সময় সাড়া পাওয়া গেল। 'হ্যালো?'

'তৃষা ইসলাম?' প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গে তৃষার দম আটকানোর আওয়াজ পেল রানা।

'মাসুদ রানা? মিস্টার রানা? আপনি এখানে–আমেরিকায়?' তৃষার উচ্ছ্বাস চাপা থাকছে না।

'এসেছি খুব বেশিক্ষণ হয়নি। ভাবলাম একটা ফোন করি।'

'সত্যি, অত্যন্ত খুশি হয়েছি।'

'কাজের মধ্যেই আছি, তবে তারপরও সময় বের করতে পারব বলে মনে হয়,' বলল রানা। 'প্রশ্ন হলো, আপনি কতটা ব্যস্ত?'

'আমার দম ফেলবারও ফুরসত নেই। প্রচণ্ড ব্যস্ত চ্যারিটি ওঅর্ক নিয়ে। আমি অ্যাফ্রো-এশীয় হ্যান্ডিক্যাপড চিলড্রেন'স অর্গানাইজেশন-এর চেয়ারপারসন। আমাদের এখানে এখন বাৎসরিক ফ্লাইং রাউন্ডআপ অনুষ্ঠিত হবে, এই ইভেন্টেরও পরিচালক আমি।'

'জানি বোকামি হয়ে যাচ্ছে, তবু জিজ্ঞেস না করে পারছি না–ফ্লাইং রাউন্ডআপ জিনিসটা আসলে কি?'

হেসে উঠল তৃষা। 'এটাকে আপনি এয়ার শো বলতে পারেন। লোকজন অনেক পুরানো প্লেন নিয়ে দেখাতে আসে। একটা প্লেনে বাচ্চাদেরকে তুলে ঘুরিয়ে আনা হয়। কাজটায় আমি নিজেকে বিশেষভাবে জড়িয়েছি এই জন্যে যে বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রচুর বাঙালী ছেলেমেয়েও আসে।'

'তবে আপনাদের কাজ অন্য লোকেরা করে দেবে।'

'তা কি সবাই দিচ্ছে!' তৃষার গলায় অভিযোগ। 'এক ভদ্রলোকের কাছে পঞ্চাশ বছরের পুরানো ডগলাস ডিসি-থ্রী আছে, তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল বাচ্চাদের নিয়ে ম্যানহাটনের ওপর উড়বেন। কিন্তু ল্যান্ডিং গিয়ার-এ সমস্যা দেখা দেয়ায় ভদ্রলোক অংশগ্রহণ করতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না।'

'এই রাউন্ডআপ কোত্থেকে শুরু হচ্ছে?'

'নিউ জার্সিতে, হাডসন নদীর ঠিক ওপারে। ওখানে একটা প্রাইভেট ফিল্ড আছে ইঙ্গেলউড ক্লিফ নামে ছোট এক শহরের কাছে। আব্বুর ফার্ম আর ল্যাবরেটরি থেকে জায়গাটা বেশি দূরে নয়।' শেষ দিকে তৃষার গলা বিষণ্ন হয়ে উঠল।

রানার চোখের সামনে পুরানো কার ও এয়ারক্রাফটের একটা কালেকশন ভেসে উঠল। এখান থেকে বেশি দূরে নয়, একটা হ্যাঙ্গারে সব রাখা আছে। এই

মুহূর্তে বিশেষ করে একটা প্লেনের কথা ভাবছে ও। উনিশশো উনত্রিশ সালে তৈরি। বড় আকারের তিন এঞ্জিনে চলে। 'আমি বোধহয় শূন্যস্থানটা পূরণ করতে পারব,' তৃষাকে বলল ও।

'আপনি পারবেন?' তৃষা বিস্মিত, বিষণ্ণ ভাবটা কাটিয়ে উঠল। 'পুরানো একটা ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন সত্যি যোগাড় করতে পারবেন বলছেন?'

'রাউন্ডআপটা কবে?'

'আজ থেকে দু'দিন পর'। কিন্তু এত অল্প সময়ের ভেতর প্লেন কোত্থেকে যোগাড় করবেন আপনি?'

একা একা হাসছে রানা। 'আমি এমন একজনকে চিনি যে সুন্দরী মেয়ে আর প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের প্রতি সত্যি ভারি সদয়।'

পরদিন সকাল এগারোটায় নুমা হেডকোয়ার্টারের কনফারেন্স রুমে মীটিং শুরু হলো। সভাপতিত্ব করছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। অংশ নিচ্ছে নুমার কর্মকর্তারা ছাড়াও সিআইএ-এর ডেপুটি ডিরেক্টর চার্লস বোল্ডার ও এফবিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নাথান করবেট। ল্যারি কিং আর মুরল্যান্ডকে নিয়ে সবার শেষে হাজির হলো রানা। ওদেরকে দেখেই অ্যাডমিরাল বললেন, 'সবাই যখন উপস্থিত, মীটিং এবার শুরু করা যাক।'

ডোবা ওয়াটার লিলির ছবি সহ সবাইকে একটা করে ফোল্ডার বিলি করল কিং। 'এগুলো আপনারা দেখতে থাকুন, আমি ভিসিআর চালু করছি।'

সিলিঙের গোপন ফাঁক থেকে তিন পাশ বিশিষ্ট বিশাল মনিটর নেমে এল নিচে। কিং রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ দিতেই সী হর্সের ভিডিও ক্যামেরা থেকে তোলা ত্রিমাত্রিক ইমেজ মিছিলের মত যাত্রা শুরু করল মঞ্চে নেমে আসা স্ক্রীনে। ওয়াটার লিলির পোড়া ধ্বংসাবশেষ করুণ একটা ভাব জাগিয়ে তুলল সবার মনে। এত সুন্দর একটা জাহাজের এই দুঃখজনক পরিণতি কেউই মেনে নিতে পারছে না।

ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে, ওয়াটার লিলির তলা খসে পড়ার পিছনে কি কারণ দায়ী হতে পারে ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিল রানা।

সবশেষে প্রশ্ন উঠল, পুড়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া একটা জাহাজকে কেন কেউ ডোবাতে যাবে? তাছাড়া, ডোবাবেই বা কে? টো করার সময় জাহাজটায় তো কেউ ছিল না।

জর্জ রেডক্লিফ জানালেন, জাহাজে কেউ ছিল না, এ-কথা ঠিক নয়। টাগ বোটের ক্যাপটেন টিম বাটার রিপোর্ট করেছেন, ক্রুজ শিপের একজন অফিসারকে সাগর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, জাহাজটা ডুবে যাবার পরপরই।

সিআইএ কর্মকর্তা চার্লস বোল্ডার প্রশ্ন করলেন, 'অফিসার ভদ্রলোক আগুন থেকে বাঁচলেন কিভাবে?'

নোট বুকে পেন্সিল ঠুকলেন রেডক্লিফ। 'এই প্রশ্ন সবার মনেই জেগেছে। ক্যাপটেন বাটার ব্যাপারটাকে মিরাকল বলেছেন। পানি থেকে তোলার পর অফিসারের আচরণ দেখে মনে হয়েছে তিনি একটা ঘোরের মধ্যে আছেন। কিন্তু

টাগ সিঙ্গাপুরে পৌঁছাবার পরপরই কাউকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে গায়েব হয়ে যান তিনি।'

'তার চেহারার বর্ণনা পাওয়া গেছে?' এফবিআই কর্মকর্তা নাথান করবেট গম্ভীর গলায় জানতে চাইলেন।

'এইটুকু যে সে কালো।'

চার্লস বোল্ডার বললেন, 'বলা হচ্ছে আগুনটা ইচ্ছে করে লাগানো হয়েছে, আর আগুন লাগানোর প্রমাণ ধ্বংস করার জন্যে পোড়া জাহাজটাকে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। রিপোর্টে দেখেছি, এই ঘটনার সঙ্গে নুমার জাহাজ সী রবিনকে হাইজ্যাক করার ব্যাপারটাও জড়িত। সব মিলিয়ে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে?'

'কি দাঁড়াচ্ছে সেটা পরে জানা যাবে,' মাঝখান থেকে ল্যারি কিং কথা বলে উঠল। 'তার আগে আমি প্রমাণ করতে চাই ওয়াটার লিলিতে সত্যি আগুন লাগানো হয়েছিল–এটা এখন আর কোন অমূলক সন্দেহ নয়।'

'কিভাবে প্রমাণ করতে চাও?' অ্যাডমিরাল জিজ্ঞেস করলেন।

'প্রমাণটা আসলে রানা আমাকে দিয়েছে,' বলল কিং। 'ববি আর ও ব্লু নেভিগেটর নিয়ে সাগরে নেমেছিল, জিনিসটা ওয়াটার লিলির ডেক থেকে পেয়েছে।'

'নুমার ল্যাব এত তাড়াতাড়ি জিনিসটাকে আইডেনটিফাই করতে পেরেছে?' রানা একটু অবাকই।

'রেজাল্ট পাবার জন্যে সারারাত খাটতে হয়েছে ওদেরকে,' কিং-এর গলায় বিজয়ীর উল্লাস।

সিআইএ-র ডেপুটি বোল্ডার বললেন, 'এ আপনারা কি বিষয়ে কথা বলছেন?'

'জাহাজটার যেখানে প্রথমে আগুন লাগে সেখান থেকে ছোট্ট একটা জিনিস দেখতে পেয়ে তুলে আনি আমরা,' ব্যাখ্যা করল মুরল্যান্ড।

'ওই এলিমেন্ট কিভাবে ভাঙা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করার জন্যে লম্বা লেকচার দিয়ে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না,' বলল ল্যারি কিং। 'শুধু এটুকু জানাই, আমাদের নুমা বিজ্ঞানীরা বলছেন জিনিসটা হাইলি ইনসেনডিয়ারি, এবং এর পরিচয় হলো "পাইরোটর্চ ৬১০"। একবার এটা জ্বললে, নেভানো প্রায় অসম্ভব। জিনিসটা এতই ভয়ংকর, এমন কি সামরিক বাহিনী পর্যন্ত ছোঁবে না।'

চোখ ঘুরিয়ে সবার হতচকিত ভাবটা লক্ষ করছে কিং। মুরল্যান্ডের বাড়ানো হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল রানা, দু'জনেই নিঃশব্দে হাসছে।

'তাহলে প্রমাণ হলো যেটাকে করুণ দুর্ঘটনা বলে মনে হচ্ছিল আসলে সেটা ছিল ঘৃণ্য একটা অপরাধ।'

'ক্রাইম যখন একটা ঘটেছে, তার তদন্তও হতে হবে,' সিআইএ-র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বোল্ডার বললেন। 'সিঙ্গাপুরে তৈরি হলেও ওয়াটার লিলির শেয়ার হোল্ডাররা প্রায় সবাই ব্রিটিশ ও আমেরিকান। তাছাড়া, নুমার সার্ভে শিপ হাইজ্যাক করার সঙ্গেও ওই ক্রাইমের একটা সম্পর্ক আছে বলে মনে হচ্ছে।'

'আপনারা সী রবিনের হাইজ্যাকিং দিয়ে তদন্ত শুরু করতে পারেন,' বলল রানা। 'একটা কথা–হাইজ্যাকারদের কিন্তু জলদস্যু বলে মনে হয়নি, বরং

মার্সেনারি বলে মনে হয়েছে।'

এফবিআই কর্মকর্তা নাথান করবেট ব্যাখ্যাটা এখনও মেনে নিতে ইতস্তত করছেন। 'নুমার একটা জাহাজ হাইজ্যাক করার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে?'

'ব্যাপারটাকে চুরি-ডাকাতি বলে মনে করলে ভুল হবে,' বলল রানা। 'ক্রু আর বিজ্ঞানীদের সহ জাহাজটা সাগরে ডুবিয়ে দেয়ার প্ল্যান করেছিল ওরা। আপনি মোটিভ খুঁজছেন? মোটিভ হলো—ওরা চাইছিল সাগরের তলা থেকে আমরা যাতে আগুন লাগানোর কোন প্রমাণ তুলে আনতে না পারি।'

রেডক্লিফের কপালে চিন্তার রেখা। 'ফর গডস্ সেক! এ-ধরনের নিষ্ঠুরতা কার পক্ষে সম্ভব?'

'আপনারা তদন্তের জন্যে প্রথমেই ফ্যালকন করপরেশনকে বেছে নিতে পারেন,' বলল কিং, চোখ ঘুরিয়ে রানাকে একবার দেখে নিল।

'ননসেন্স!' নাক ঝাড়ার মত একটা শব্দ করলেন নাথান করবেট। 'দেশের সবচেয়ে বড় আর বিখ্যাত কোম্পানিগুলোর একটা ওই ফ্যালকন, দু'হাজার লোককে খুন করতে যাচ্ছিল দুনিয়ার আরেক প্রান্তে? আপনারা কল্পনা করতে পারেন জেনারেল মোটর, সিঙ্গার, বাটা বা মাইক্রোসফট পাইকারি হত্যাযজ্ঞ চালাবার মত অপরাধের সঙ্গে জড়িত হবে? আমি অন্তত পারি না।'

'আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত,' অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বললেন। 'তবে একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে ফ্যালকন ধোয়া তুলসী পাতা নয়। বেআইনী পন্থায় ব্যবসা করার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আগেও তোলা হয়েছে।'

'কিন্তু সমস্ত অভিযোগ ধামাচাপা দেয়া হয়েছে, কারণ ফ্যালকনের মালিক লীফ এরকুল শুধু সিনেটর নন, প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে প্রায় সব মন্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু।'

'তাসত্ত্বেও কংগ্রেসন্যাল কমিটি অভিযোগগুলোর তদন্ত করেছে,' বললেন করবেট। 'বেশ কয়েকবারই।'

'ও-সব স্রেফ লোক দেখানো ব্যাপার ছিল,' বললেন সিআইএ কর্মকর্তা চার্লস বোল্ডার। 'সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেয়ার কৌশল। তার প্রমাণ একটা তদন্ত কমিটির রিপোর্টও আলোর মুখ দেখেনি।'

'এমন একটা কোম্পানিকে তিরস্কার করা কংগ্রেসের পক্ষে খুবই কঠিন যে কোম্পানি নির্বাচনের সময় দুটো দলকেই মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার চাঁদা দেয়।' নুমা চীফ নিঃশব্দে তিক্ত হাসি হাসছেন।

নাথান করবেট মাথা নাড়ছেন। 'এই মাত্রার একটা ক্রাইমের ব্যাপারে ফ্যালকনের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাতে বললে আমাকে নিরেট প্রমাণ দেখাতে হবে।'

ল্যারি কিং-এর চোখ দুটোয় হঠাৎ কি যেন জ্বলে উঠতে দেখল রানা, সে কথা বলছে সবিনয়ে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে। 'এটা কি আপনার কোন সাহায্যে আসবে, যদি বলি ফ্যালকনের কেমিকেল ডিভিশন পাইরোটর্চ ৬১০ তৈরি করেছে?'

'এ-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন না,' বললেন করবেট, গলায় সন্দেহ।

'দুনিয়ার আর কোন কোম্পানি পাইরোটর্চ ৬১০-এর গুণ ও ধর্ম, অর্থাৎ

উপাদান-সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্য ডুপ্লিকেট করতে পারেনি,' বলল কিং। 'দু'বছর আগে এটা তাদেরই দাবি ছিল।'

করবেট তাড়াতাড়ি বললেন, 'জিনিসটা ওদের কাছ থেকে চুরি হয়ে থাকতে পারে। যে-কারও পক্ষে কাজটা করা সম্ভব।'

অ্যাডমিরাল আলোচনা সংক্ষেপ করার জন্যে বললেন, 'এফবিআই অন্তত তদন্ত করার একটা জায়গা পেল।' চার্লস বোল্ডারের দিকে তাকালেন তিনি। 'সিআইএ কি করবে?'

'আমাদের প্রথম কাজ হাইজ্যাকারদের জাহাজটা লেগুন থেকে উদ্ধার করা,' বললেন বোল্ডার।

'এ-ব্যাপারে আপনি নুমার সাহায্য চাইলে পাবেন,' বলল রানা।

'না, ধন্যবাদ,' বললেন বোল্ডার। 'এ-ধরনের আন্ডারওয়াটার কাজ আমরা একটা প্রাইভেট কোম্পানিকে দিয়ে করাই।'

'বেশ, তাই হোক।' মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল।

করবেট বললেন, 'সী রবিনের ক্রু ও বিজ্ঞানীদের ইন্টারোগেট করার জন্যে আপনার অনুমতি দরকার হবে আমার, মিস্টার হ্যামিলটন।'

'অনুমতি দেয়া হলো,' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বললেন অ্যাডমিরাল।

সিআইএ ও এফবিআই কর্মকর্তারা কনফারেন্স রুম ছেড়ে চলে যাবার পর রানা জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কোত্থেকে শুরু করব?'

'দু'একদিন ছুটি নাও তোমরা,' বললেন নুমা চীফ। 'বিসিআই চীফ, তোমার বসের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তোমরা বিশ্রাম নিয়ে ফিরে এসে দেখবে একটা প্ল্যান তৈরি করে রেখেছি। ইতিমধ্যে মিস্টার রেডক্লিফ আর কিং যতটা পারে ডাটা সংগ্রহ করুক।'

'ছুটি কাটাতে কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?' রানা ও মুরল্যান্ড, দু'জনকেই জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'আমি আমার দু'জন বান্ধবীকে ইয়টে তুলে নিয়ে হাডসন নদীতে বেড়াতে যাচ্ছি,' বলল মুরল্যান্ড।

রানার দিকে তাকালেন রেডক্লিফ। 'আপনি, মিস্টার রানা?'

'আমি?' রানার অকারণে হাসি পেয়ে গেল। 'আমি যাচ্ছি একটা এয়ার শোতে।'

চোদ্দ

দিনটা যে শুধু এয়ার শো-র জন্যে ভাল, তাই নয়, চমৎকার আবহাওয়াটা প্রতিবন্ধী শিশুরাও দারুণ উপভোগ করবে। অনুষ্ঠানটা অ্যাফ্রো-এশীয় প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে হলেও, দর্শক হিসেবে সাদা-কালো কম করেও দশ হাজার লোক জড়ো হয়েছে মাঠে। আটলান্টিক শান্ত আজ। ফুরফুরে বাতাস বইছে।

মিনি মেরিলিন ফিল্ড বড়সড় হাউজিং কমিউনিটির মাঝখানে একটা প্রাইভেট এয়ারপোর্ট, এখানে বসবাসকারীরা প্রায় প্রত্যেকেই এয়ারপ্লেনের মালিক। প্রতিটি রাস্তা এমনভাবে বানানো হয়েছে, পরিবারগুলো যাতে তাদের বিমান নিজেদের বাড়ি থেকে ট্যাক্সির মত চালিয়ে রানওয়েতে নিয়ে যেতে পারে, আবার রানওয়ে থেকে নিজেদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে পারে। রানওয়ের চারপাশে প্রচুর ফাঁকা জায়গা, সেখানে ফুলের বাগান, খেলার মাঠ আর পিকনিক স্পট তৈরি করা হয়েছে।

ছয়টা রাজ্য থেকে প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের নিয়ে এল তাদের মা-বাবা, স্কুল ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সাজানো প্রাচীন প্লেন-এর প্রদর্শনী চলছে, সেগুলো বাচ্চাদের ঘুরিয়ে দেখানোর জন্যে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। অনুষ্ঠানটার মধ্যে একটা ভাবাবেগ আছে, অংশগ্রহণ করতে পেরে সবাই গর্বিত।

তৃষার উদ্বেগ আর উত্তেজনা তুঙ্গে সে জানে তার ব্লাড প্রেশার মারাত্মক পর্যায়ে উঠে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত কোথাও কোন সমস্যা হয়নি। স্বেচ্ছাসেবকরা আশাতীত সাহায্য করছে। নব্বুইটা প্লেনের মালিক ও পাইলট খুশিমনে নিজেদের সময় দিচ্ছেন, অংশগ্রহণও করছেন যে-যার নিজের খরচে। প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের ককপিটে তুলে নিয়ে উড়োজাহাজের ইতিহাস সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু যে প্লেনটার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তৃষা, যেটার কাজ হবে বাচ্চাদের নিয়ে আকাশে ওড়া, ম্যানহাটনের আকাশ ছোঁয়া দালানগুলোর মাথার ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, সেই প্লেনটাই আসেনি। দুঃসংবাদটা বাচ্চাদের দিতে যাবে তৃষা, এই সময় তাদের পারিবারিক শুভানুধ্যায়ী ও কো-ওয়ার্কার খুরশিদা হককে আসতে দেখল সে।

'দুঃখিত,' কাছে এসে খুরশিদা বললেন। 'আমি জানি তুমি ভাবতেই পারোনি যে ভদ্রলোক এভাবে তোমাকে হতাশ করবেন।'

'প্লেন যোগাড় করতে না পারলে ভদ্রলোক অন্তত একটা টেলিফোন তো করবেন!' মাথা নাড়ল তৃষা। 'এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

খুরশিদা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ হাত তুলে রোদ ঠেকালেন, অপর হাত দিয়ে দূরের আকাশ দেখালেন তৃষাকে। 'দক্ষিণ দিক থেকে ওটা কি আসছে বলো তো?'

সেদিকে ভাল করে না তাকিয়ে নিরুত্তাপ গলায় তৃষা বলল, 'কই, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'দেখে তো মনে হচ্ছে পুরানো একটা ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন!' খুরশিদা উত্তেজিত। 'তৃষা, আমার ধারণা ভদ্রলোক আসছেন।'

তৃষার শিরায় শিরায় স্বস্তির ঢেউ বয়ে গেল, সেই সঙ্গে আরও দ্রুত হলো হার্টবিট। 'নিশ্চয়ই তিনি!' আওয়াজটা তার গলা থেকে প্রায় চিৎকার হয়ে বেরিয়ে এল। 'রানা আমাকে ডোবাননি!'

শুধু ওরা নয়, বাচ্চারা সহ সমস্ত দর্শক অদ্ভুতদর্শন প্লেনটাকে দেখছে, ফিল্ডটাকে ঘিরে থাকা গাছপালার মাথা ছুঁয়ে ছুটে আসছে ওটা। গতি বেশি নয়,

ঘণ্টায় মাত্র পঁচাত্তর মাইল। ওটার নাম টিন গূস, নিজের যুগে সবচেয়ে সফল বাণিজ্যিক এয়ারলাইনার ছিল। টিন গূস এর ফাইভ-এটি ট্রাইমোটর তৈরি করে ফোর্ড মোটর কোম্পানি উনিশশো আটাশ-উনত্রিশ সালে। গোটা আমেরিকা জুড়ে খুব কম লোকের কালেকশনেই এই প্লেন খুঁজে পাওয়া যাবে। এই টিন গূসটা রানা কেনেনি, বান্ধবী লরেলি ওর জন্মদিনে ওকে উপহার দিয়েছিল।

প্রাচীন এক জীপ নিয়ে ছুটল একজন স্বেচ্ছাসেবক, ল্যান্ড করার পর টিন গূসকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে পার্কিং এরিয়ায়। লাল রঙ করা ওয়ার্ল্ড ওঅর ওয়ান ফকার ডিআর. ওয়ান ট্রাইপ্লেন আর উনিশশো বত্রিশ সালে তৈরি করা একটা নীল রঙের সিকোরস্কি এস-থারটিএইট অ্যামফিবিয়ান-এর মাঝখানে থামল রানা।

একটা ক্যাডিলাকে চড়ে সেখানে পৌঁছাল তৃষা, তার সঙ্গে খুরশিদা হকও রয়েছেন। ওরাও পৌঁছাল, রানাও টিন গূসের প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে বাইরে উঁকি দিল। একটা বোর্ডিং স্টুল ফেলল ও, সেটায় পা দিয়ে নেমে এল নিচে।

'আপনি!' কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না তৃষা, অকারণে হাঁপিয়ে যাচ্ছে। 'আপনি প্লেন চালাতেও জানেন? এটা যোগাড় করলেন কোত্থেকে—নাকি এটা আপনারই?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ এবং হ্যাঁ।' খুরশিদা হকের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসল ও। 'হ্যালো।' ভদ্রমহিলা সুশ্রী, বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি।

'ওহ্, দুঃখিত,' তাড়াতাড়ি বলল তৃষা। 'ইনি আমাদের পারিবারিক বন্ধু, খুরশিদা হক। এই ইভেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরও উনি। আর খুরশিদা, উনি হলেন—'

'হ্যাঁ, জানি। মাসুদ রানা, যার প্রশংসা সারাক্ষণ তোমার মুখে লেগেই আছে।' রানাকে খুঁটিয়ে পরখ করলেন খুরশিদা, তাঁর সবুজ চোখে মুগ্ধ একটা ভাব ফুটল। 'আ প্লেজার টু মিট ইউ।'

'দা প্লেজার ইজ মাইন।'

'আপনার প্লেনে চড়ার জন্যে বাচ্চারা অস্থির হয়ে আছে,' বলল তৃষা। 'আপনাকে আসতে দেখার পর থেকে শুধু এই একটা বিষয়েই কথা বলছে ওরা। ফ্লাইটের জন্যে এরইমধ্যে ওদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়েছি আমরা।'

প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের দিকে তাকাল রানা। লাইনে অনেক হুইলচেয়ারও রয়েছে। 'ওরা কতজন উড়তে চায়? আমার প্লেনে প্রতিবার মাত্র পনেরোজনকে তোলা যাবে।'

'ওরা ষাটজন,' বললেন খুরশিদা। 'তারমানে চারটে ট্রিপ লাগবে।'

রানা একটু আড়ষ্ট হেসে বলল, 'আমি সামলাতে পারব, কিন্তু প্লেনে প্যাসেঞ্জার থাকলে আমার একজন কো-পাইলট দরকার হবে। আমার বন্ধু ববি আসতে পারেনি।'

'এটা কোন সমস্যাই নয়,' হেসে উঠে বলল তৃষা। 'খুরশিদা সুপারস্টার এয়ারলাইন্সের একজন পাইলট।'

'কতদিন ধরে?'

'বারো বছর সেভেন থারটি-সেভেন আর সেভেন সিক্সটি-সেভেন চালাচ্ছেন।'

'প্রপ প্লেনে কত ঘণ্টা?'

'এক হাজারেরও বেশি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওকে। উঠে পড়ুন, দ্রুত ফ্লাইট চেক সেরে নিই।'

আহ্লাদে আটখানা, খুরশিদা বললেন, 'আমি জানি, আমাকে ফোর্ড ট্রাইমোটর চালাতে দেখলে পুরুষ পাইলটরা ঈর্ষায় সবুজ হয়ে যাবে।'

ককপিটে উঠে যে-যার বাকিট সিটে বসার পর কন্ট্রোল ও ইন্সট্রুমেন্ট কিভাবে ব্যবহার করতে হবে খুরশিদাকে লেকচার দিয়ে বুঝিয়ে দিল রানা। এঞ্জিনগুলো ও-ই চালু করল, তারপর টেক-অফ ও ল্যান্ডিং পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়ে খুরশিদার হাতে ছেড়ে দিল কন্ট্রোল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাহাত্তর বছরের পুরানো প্লেনটা সাবলীলভাবে চালাতে শিখে গেলেন খুরশিদা। রানা দেখাল স্পীড কিভাবে ঘণ্টায় মাত্র চৌষট্টি মাইলে নামিয়ে আনা যায়, কিভাবে দুটো এঞ্জিনের সাহায্যে চালানো যায়, এবং মাত্র একটা এঞ্জিনের সাহায্যেও ল্যান্ড করা সম্ভব।

'আমার গা শিউরানো অনুভূতি হচ্ছে,' ল্যান্ড করার পর চিৎকার করে জানালেন খুরশিদা। 'কোন রকম ঢাকনি বা আবরণ ছাড়া এঞ্জিনগুলো প্লেনের গায়ে ঝুলে আছে।'

'তখনকার দিনের ডিজাইনাররা এটাকে অত্যাধুনিক বলেছিল।'

বাচ্চাদের নিয়ে তিনটে ট্রিপ দিল রানা। রিফুয়েলিং-এর সময় ট্রাইমোটরের পাশে পার্ক করা ওয়ার্ল্ড ওঅর ওয়ান ফকার-এর দিকে হেঁটে এল ও। এঞ্জিন কাউলিং-এ বসানো গান মাউন্টিং দেখছে, হঠাৎ কোত্থেকে পাশে চলে এল এক লোক, পরনে ফ্লাইং টগ। 'কেমন প্লেনটা?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। গাঢ় ত্বক, চোখ-মুখে তীক্ষ্ণ মিশরীয় বৈশিষ্ট্য। বৈরী, কিংবা জেদি একটা ভাব চোখে। রানাকে যেন লোকটা ব্যক্তিগত শত্রু হিসেবে দেখছে, ভাবটা গোপন রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। যথেষ্ট লম্বা সে, দাঁড়িয়ে আছে টান-টান হয়ে—সামরিক একটা ভঙ্গি। চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত, যেন সরাসরি শুধু সামনেই তাকাতে পারে, মণি এদিক ওদিক নড়ে না।

দু'জন দু'জনকে কয়েক মুহূর্ত নীরবে দেখল। নিস্তব্ধতা ভেঙে রানা বলল, 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিকে খুব ভুগিয়েছিল আপনার এই ফকার। প্রপেলারের পিছনে জোড়া গান মাউন্টিং-এর দিকে আঙুল তাক করল। 'দেখে মনে হচ্ছে জেনুইন।'

লোকটা মাথা ঝাঁকাল। 'অ্যারিজিনল স্প্যানডাউ ৭.৯২ মিলিমিটার।'

'আর অ্যামিউনিশন বেল্ট? ওগুলোয় তো দেখছি রাউন্ড লোড করা।'

'শুধুমাত্র দর্শকদের ইমপ্রেস করার জন্যে,' কালো লোকটা বলল। 'নিজের যুগে এই ডাইনী ভয়ংকর এক কিলিং মেশিন ছিল। তার সেই রূপটা আমি ধরে রাখতে চাই, দেখাতেও চাই সবাইকে।' দস্তানা খুলে হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। 'আমি মিশরীয় কাফ্রী, নাম খাদেমুল গহর। আপনি তো ট্রাইমোটরের পাইলট তাই না?'

'হ্যাঁ।' রানার কেন যেন অদ্ভুত একটা ধারণা হলো, এই লোক ওকে চেনে।

'আমি মাসুদ রানা।'

'জানি,' বলল গহর। 'আপনি একজন বাংলাদেশী, তবে নুমার সঙ্গে আছেন।'

'আমাদের কি কখনও পরিচয় হয়েছিল?'

'না, তবে এমন একজন আছে যাকে আমরা দু'জনেই চিনি...'

রানা কিছু বলতে যাবে, এই সময় তৃষার চিৎকার ভেসে এল, 'শেষ ফ্লাইটের জন্যে আমরা তৈরি!'

ঘাড় ফিরিয়ে রানা বলতে যাচ্ছিল, 'আমাকে যেতে হচ্ছে,' কিন্তু দেখল ফকারের পাইলট দ্রুত ঘুরে নিজের প্লেনের পিছনে সরে যাচ্ছে।

বাচ্চাদের নিয়ে শেষবারের মত আকাশে উঠল রানা। এবারও ওদের সঙ্গে তৃষা থাকছে। খুরশিদার হাতে কন্ট্রোল ছেড়ে দিয়ে পিছনে চলে এল রানা বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে–হাত বাড়িয়ে স্ট্যাচু অভ লিবার্টি আর এলিস আইল্যান্ড দেখাল, এক হাজার ফুট ওপর দিয়ে ওগুলোকে ঘিরে চক্কর দেয়ার সময়। তারপর ককপিটে ফিরে এসে নিজের হাতে তুলে নিল কন্ট্রোল, রওনা হলো ইস্ট রিভার আর ব্রুকলিন ব্রিজের দিকে।

সাইড উইন্ডো খুলে দিতে ককপিটের ভেতর ঝড়ের মত বাতাস বইছে। বাচ্চা আরোহীরা না থাকলে পুরানো ব্রিজটার তলা দিয়ে প্লেন চালাবার ঝোঁকটা রানা বোধহয় দমন করতে পারত না। অবশ্য সেক্ষেত্রে ফ্লাইং লাইসেন্সটা হারাতে হত ওকে।

রানার মনোযোগ ছুটে গেল ট্রাইমোটরের পাশে, খানিকটা ওপরে, একটা ছায়া চলে আসায়।

প্যাসেঞ্জার কেবিন থেকে বাচ্চাদের আনন্দমুখর চিৎকার ভেসে এল, ফলে কথা বলার জন্যে গলা চড়াতে হলো খুরশিদাকে। 'আমাদের পাশে একটা প্লেন, মিস্টার রানা।'

উজ্জ্বল নীল আকাশের গায়ে এক ঝলক লাল রঙের মত দেখাল ফকার ট্রাইপ্লেনটাকে। পনেরো ফুটের বেশি দূরে নয়, ককপিট থেকে খাদেমুল গহর হাত নাড়ল রানার উদ্দেশে। লোকটার মাথায় একটা লেজার ফ্লাইট হেলমেট, চোখে গগলস্, মাথার মাঝখান থেকে নেমে এসেছে একটা সিল্ক রিবন। পুরানো ফকারটা এত কাছে, পাইলট গহরের চওড়া হাসির ভেতর ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখতে পাচ্ছে রানা। যেন একজন অনিষ্টকারীর হাসি। এই হাসি শুধু সে-ই হাসতে পারে, বা শুধু তাকেই মানায়, যার মনে পাপ আছে। তবে রানা ভাবল, ওর ভুলও হতে পারে। ভদ্রতার খাতিরে পাল্টা হাত নেড়ে সাড়া দিতে যাবে, কিন্তু সেই মুহূর্তে অ্যান্টিক প্লেন দিক বদলে চলে গেল।

রানা তাকিয়ে আছে: ট্রাইপ্লেন একটা লুপ তৈরি করল, তারপর অকস্মাৎ সিধে হয়েই ছুটে এল ফোর্ড ট্রাইমোটরের দিকে, তির্যক একটা পথ ধরে আসায় ফরওয়ার্ড পোর্ট সাইডটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

'বদ্ধ উন্মাদটা করতে চায় কি?' বিস্ময়ে বিমূঢ় খুরশিদা জিজ্ঞেস করলেন। 'শহরের মাথায় অ্যাক্রব্যাটিক...'

খুরশিদার কথা শেষ হলো না, জোড়া স্প্যানডাউ মেশিন গানের মাজল থেকে

চোখ ঝলসানো আগুন বেরিয়ে এল। মুহূর্তের জন্যে খুরশিদার মনে হলো, ব্যাপারটা আসলে বাচ্চাদের আনন্দ দেয়ার জন্যে একটা এরিয়াল প্রদর্শনী, সেই সঙ্গে সারপ্রাইজও বটে। তবে পরমুহূর্তেই উইন্ডশীল্ড বিস্ফোরিত হতে ভুলটা ভেঙে গেল। একই সঙ্গে তেলের স্প্রে আর উথলে ওঠা ধোঁয়া দেখতে পেলেন খুরশিদা, ককপিটের সামনের এঞ্জিন সম্ভবত ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

পনেরো

বুলেটের ঝাঁক তখনও আঘাত করেনি, তার আগেই বিপদটা টের পেয়ে গেছে রানা। ট্রাইমোটরকে ৩৬০ ডিগ্রি বাঁক ঘোরাতে শুরু করল, অপ্রত্যাশিত এক কৌশলে পৌঁছে গেল ফকারের নিচে ও বাঁ দিকে–তখনও গহর দ্বিতীয় হামলার জন্যে বাঁক ঘোরা শেষ করতে পারেনি। বিরতিগুলোয় না থামতে দিয়ে থ্রটল সবটুকু ঠেলে দিয়ে অনুসরণ করছে রানা, বৃথাই আশা করছে ওটার লেজের পিছনে থাকতে পারবে। আসলে অঙ্কে মেলে না। অক্ষত তিনটে এঞ্জিন নিয়ে ফকার আর তার উন্মাদ পাইলটকে দৌড় প্রতিযোগিতায় অনায়াসে হারিয়ে দিতে পারত রানা। ওর ট্রাইমোটরের টপ স্পীড প্রাচীন ফাইটার প্লেনের চেয়ে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেশি। কিন্তু এখন, একটা এঞ্জিন হারাবার পর, স্পীড তুলে পালাবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

মাঝখানের এঞ্জিনটা থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আগুন ধরতে আর হয়তো দু'চার সেকেন্ড বাকি। দু'পায়ের ফাঁকে হাত গলিয়ে ফুয়েল সিলেক্টরের সুইচ অফ করে দিল ও, তারপর বন্ধ করল থ্রটলের নিচের প্যানেলে বসানো ইগনিশন, দেখল সেন্টার এঞ্জিনের প্রপেলার ধীরে ধীরে হরিজনটাল পজিশনে স্থির হলো।

খুরশিদার চোখে-মুখে দিশেহারা ভাব। 'লোকটা আমাদের গুলি করছে!' হাঁপাচ্ছে সে। 'কেন?'

'জানি না।' দাঁতে দাঁত পিষল রানা।

ককপিটের দরজায় দেখা গেল তৃষাকে। 'প্লেন আকাশের চারদিকে ছুটোছুটি করছে কেন?' জিজ্ঞেস করল সে, গলায় অসন্তোষ। 'আপনারা বাচ্চাদের ভয় দেখাচ্ছেন!' হঠাৎ তার চোখে পড়ল এঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, উইন্ডশীল্ডের কাঁচ বলতে কিছু নেই। তীব্র বাতাসটাও যেন এইমাত্র তার গায়ে লাগল। 'কি ঘটছে?' গলার স্বর আতঙ্কে বিকৃত।

'এক পাগল হামলা চালাচ্ছে।'

'লোকটা সত্যিকার বুলেট ছুঁড়ছে আমাদেরকে টার্গেট করে!' চিৎকার করে বললেন খুরশিদা, তীব্র বাতাস ঠেকাবার জন্যে মুখের সামনে একটা হাত তুলে রেখেছেন।

'আমাদের সঙ্গে বাচ্চারা রয়েছে…এরমানে কি?' জিজ্ঞেস করল তৃষা।

'লোকটা জানে আমাদের প্লেনে কারা আছে,' বলল রানা। 'এ-সব সে গ্রাহ্য করছে না। আপনি ওদের কাছে ফিরে গিয়ে ভান করুন এটা একটা মজার খেলা। সবাইকে গান ধরতে বলুন। মোটকথা, ওদেরকে ভয় পেতে দেবেন না।' ঘাড় সামান্য ফিরিয়ে খুরশিদার উদ্দেশে বলল, 'রেডিও অন করে মেডে মেসেজ পাঠান। যেই সাড়া দিক, পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করুন।'

'সত্যি কারও সাহায্য পাব?'

'সময়মত নয়।'

'তাহলে উপায়?' খুরশিদা ও তৃষা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

রানার বাইরেটা এইমুহূর্তে সম্পূর্ণ শান্ত। ইতোমধ্যে স্পীড বাড়িয়ে দূরে সরে গেছে লাল ফকার, বাঁক ঘুরছে আবার হামলা চালাবার উদ্দেশ্যে। 'কপালে কি আছে জানি না,' ওদের প্রশ্নের উত্তরে বলল ও। 'তবে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব সবাইকে বাঁচানোর।'

তৃষা ও খুরশিদা দু'জনেই রানার মুখে শান্ত-সমাহিত ভাব আর দৃষ্টিতে গম্ভীর আত্মপ্রত্যয় দেখে বিস্মিত হলো। সাহসে বুক বাঁধার প্রেরণা বোধ করল ওরা। দু'জনেই উপলব্ধি করল, কঠিন সব বিপদে ওর মত পুরুষরাই ত্রাতা হিসেবে ভূমিকা রাখে।

খুরশিদা রেডিও অন করে চিৎকার করছেন—মেডে! মেডে! মেডে! তৃষা ঘুরেই ছুটল মেইন কেবিনের দিকে।

আকাশে তল্লাশী চালিয়ে মেঘ খুঁজছে রানার চোখ, ভেতরে ঢুকে ফকারকে ফাঁকি দেবে। কিছু মেঘ আছে, তবে সে-সব কয়েক মাইল দূরে, আর জমিন থেকে অন্তত বিশ হাজার ফুট ওপরে—ট্রাইমোটরের নির্দিষ্ট সিলিঙ-এর চেয়ে তিন হাজার ফুট বেশি উঁচুতে।

মেঘ নেই লুকাবে, এমন কোন জায়গা নেই পালাবে। প্রাচীন ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন যেন খোলা মাঠে অসহায় একটা মেষ শাবক, হিংস্র একটা নেকড়ের হামলার মুখে পড়েছে। সদ্য পরিচিত একজন পাইলট কি কারণে এটা ঘটাতে চাইছে? মাথার ভেতর প্রশ্নটা বারবার ফিরে আসছে, কিন্তু সহজ কোন উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।

প্লেনটাকে ইস্ট রিভারে নামাতে পারে রানা। পানিতে যদি নিরাপদে ল্যান্ড করা সম্ভব হয়, ল্যান্ড করার সময় বাচ্চাদের ও প্লেনের যদি কোন ক্ষতি না হয়, এবং বেশ কিছুক্ষণ ভেসে থাকা যায়, তাহলে, হয়তো...শুরুতেই আইডিয়াটা বাতিল করে দিল রানা। ট্রাইমোটরের আড়ষ্ট ল্যান্ডিং গিয়ার ওয়াটার ল্যান্ডিঙের উপযোগী নয়। তাছাড়া, বাচ্চারা আহত হয়নি দেখে ফকারের পাইলট পানিতে গুলি করলে তারা লুকাবার কোন জায়গাই পাবে না। যে লোক শূন্যে মারতে চাইছে, পানিতেও সে মারতে চাইবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে বাঁক ঘুরছে রানা, ট্রাইমোটর নিয়ে ফিরে যাচ্ছে ব্রুকলিন ব্রিজের দিকে।

ডানার ডগা মাটির দিকে তাক করে নদীর ওপর দিয়ে ট্রাইমোটরের পিছু নিল রক্তবর্ণ যমদূত ফকার। ধীরে ধীরে অবশিষ্ট দুটো এঞ্জিনের থ্রটল নিজের দিকে টেনে নিল রানা, শত্রুকে কাছে চলে আসার সুযোগ করে দিচ্ছে। মিসাইল সহ

আধুনিক একটা জেট ফাইটার এক মাইল দূর থেকে শত্রু-বিমান ফেলে দিতে পারে, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্লেনগুলোকে টার্গেটের একশো গজেরও কম দূরত্ব থেকে ফায়ার করতে হত। রানা আশা করছে ট্রাইমোটরকে গুলি করার জন্যে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ফকারের পাইলট খাদেমুল গহর।

রানার প্লেন পানি লক্ষ্য করে ডাইভ দিল, পিছু নিয়ে আসা ফকারও অনুকরণ করল, তবে সাইট বরাবর টার্গেটকে না পাওয়ায় গুলি করতে পারছে না। নিচে নামতে নামতে এক সময় রানা দেখতে পেল নদীর দুই তীরেই লোকজন হাঁটা-চলা করছে, একটা ইক্সকারশন বোটের আপার ডেকে বহুলোক জড়ো হয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, সেটাকে পাশ কাটাচ্ছে একটা ফায়ারবোট, ফায়ারম্যানরাও দেখছে ওদেরকে, সবাই যেন নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছে প্লেনটা পানিতে পড়তে যাচ্ছে।

তবে একেবারে শেষ মুহূর্তে কন্ট্রোল কলাম টেনে নিল রানা, তারপর এমন একটা কোর্স সেট করল, ট্রাইমোটর সরাসরি ব্রুকলিন ব্রিজের তলা দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

বিখ্যাত ব্রিজটা ঝুলে আছে, যেন মাকড়সার প্রকাণ্ড একটা জাল, সাপোর্ট কেইবল্‌গুলো বটগাছের অসংখ্য ঝুরির মত। এই ব্রিজ দিয়ে গড়ে প্রতিদিন দেড় লাখ প্রাইভেট কার, দু'হাজার মোটরসাইকেল আর তিনশো পথিক পার হয়। সমস্ত ট্র্যাফিক দাঁড়িয়ে পড়েছে, ড্রাইভাররা জানালা দিয়ে মাথা বের করে তাকিয়ে দেখছে দুটো মান্ধাতা আমলের প্লেন সরাসরি ব্রিজ লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। পথিক ও মোটর-সাইকেল আরোহীরা ছুটে এসে ভিড় করল রেইলিং-এ, চোখে দেখেও তাদের যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না প্রথম মহাযুদ্ধের একটা ফাইটার প্লেন সত্যি সত্যি পুরানো একটা ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে।

'আল্লাহ! ও আল্লাহ!' খুরশিদা হক চেঁচিয়ে উঠলেন। 'নিশ্চয় আপনি ব্রিজের নিচে দিয়ে যাচ্ছেন না!'

'দেখুন যাই কিনা!' হিসহিস করে বলল রানা।

রানা ভাল করে লক্ষই করল না যে ব্রিজ টাওয়ার মাথার ওপর দুশো একাত্তর ফুট উঠে যাচ্ছে। দ্রুত আন্দাজ করল, পানি আর রাস্তার মাঝখানে ফাঁকা জায়গা একশো পঞ্চাশ ফুট হবে—আসলে ব্যবধানটা একশো পঁয়ত্রিশ ফুট। সেন্টার এঞ্জিন থেকে এখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে, আলোর একটা ঝলকের মত ব্রিজের তলা দিয়ে খোলা ও ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল ট্রাইমোটর, একটা টাগবোটকে ডজ দিয়ে।

মাথার ওপর দিয়ে ব্রিজটাকে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখে বাচ্চারা ভাবল ওদেরকে মজার কসরত দেখানো হচ্ছে, তৃষা উৎসাহ দেয়ায় সবাই তারা একটা ইংরেজি গান ধরল।

কেনেডি, লা গার্ডিয়া ছাড়াও আশপাশের অন্যান্য ছোটখাট এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ার খুরশিদা হকের পাঠানো মেডে কল সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারল, সেই সঙ্গে টহলরত পুলিস কারগুলোয় খবর পৌঁছে গেল আকাশে একটা বিমানযুদ্ধ শুরু

হয়েছে। খানিক পর কেনেডি এয়ারপোর্টের কন্ট্রোলার তার চীফকে রিপোর্ট পাঠাল, বাচ্চা আরোহীদের নিয়ে ফোর্ড ট্রাইমোটর ইস্ট রিভারের ওদিকে ছিল, হঠাৎ রেডার স্ক্রীন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। চীফ জানতে চাইলেন, প্লেনটা কি ক্র্যাশ করেছে? কন্ট্রোলার জবাব দিল, সেরকমই মনে হচ্ছে।

ট্রাইমোটর ব্রিজের তলায় ঢুকে পড়তে ধাওয়ারত ফকার পড়ে গেল বিপদে। তিন সপ্ত ডানা নিয়ে উচ্চতায় প্রায় দোতলা একটা বাড়ি ওটা, ব্রিজের তলা দিয়ে গলবে ঠিকই, তবে একটু এদিক-ওদিক হলে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। ব্রিজ আর মাত্র কয়েকশো ফুট সামনে, ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়াও সম্ভব কিনা বলা মুশকিল। তবে সিদ্ধান্ত নিতে এক সেকেন্ডের বেশি দেরি করল না আততায়ী লোকটা, ফকারের নাক ওপর দিকে তুলে দিল। ঝাঁক-ঝাঁক কেইবল্ ধনুকের আকৃতি নিয়ে ঝুলে আছে, এক ফুট বাকি থাকতে সেগুলোর ওপর দিয়ে প্লেনটাকে তুলে আনল সে, তারপর একশো আশি ডিগ্রি বাঁক ঘুরে আবার পিছু নিল ফোর্ড ট্রাইমোটরের।

পাথরের মাথায় বসিয়ে রাখা টিনের কৌটার মত সহজ টার্গেট হতে রাজি নয় রানা, ট্রাইমোটরকে পোর্ট উইংটিপ-এর ওপর খাড়া করে যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ একটা বাঁক ঘুরল, সরাসরি এগারো ও তেরো নম্বর জেটির দিকে এগোচ্ছে, নব্বুই ডিগ্রি কোণ তৈরি করে পার হলো সাউথ স্ট্রীট। ওয়াল স্ট্রীটের দুশো ফুট ওপরে পৌঁছে প্লেন সিধে করে নিল, পাশ কাটাল জর্জ ওয়াশিংটনের স্ট্যাচুকে।

কাঁচের টুকরো লাগায় রক্ত বেরুচ্ছে কপাল থেকে, ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত খুরশিদা বললেন, 'দিস ইজ ম্যাডনেস!'

'দুঃখিত,' রানার গলা প্রায় কর্কশ। 'আমার সামনে আর কোন পথ খোলা নেই।' চওড়া একটা রাস্তা দেখতে পেয়ে কন্ট্রোল কলাম টেনে আনল ও, একটু পর বুঝতে পারল রাস্তাটা ব্রডওয়ে-র নিচের প্রান্ত। আবার একটা তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে নিউ ইয়র্ক স্টক একচেঞ্জ বিল্ডিং, সেইন্ট পল চ্যাপেল ও সিটি হল পার্ককে পাশ কাটাল। ওর প্লেনের পথ অনুসরণ করছে কয়েকটা পুলিস কার, তবে এরকম একটা অসম প্রতিযোগিতায় তারা পারবে কেন। রানার প্লেনের সামনে কোন বাধা নেই। কিন্তু রাস্তায় তো ট্র্যাফিক জ্যাম লেগেই আছে।

কংক্রিটের জঙ্গলে কিছুক্ষণের জন্যে ফকারের পাইলট রানাকে হারিয়ে ফেলল। ইস্ট রিভারের ওপর বৃত্তাকারে একটা চক্কর দিল সে, তারপর এক হাজার ফুট ওপরে উঠে রওনা হলো লোয়ার ম্যানহাটনের দিকে। সাউথ স্ট্রীট সীপোর্ট-এ নোঙর ফেলা উঁচু জাহাজগুলোকে পাশ কাটিয়ে আসার পর হঠাৎ ককপিট থেকে সামনের দিকে ঝুঁকল, ট্রাইমোটরটাকে খুঁজছে। ঠিক তখনই রোদ লাগায় রূপালি একটা ঝিলিক চোখে পড়ল। গগলস্ ওপরে তুলে অবিশ্বাস ভরা চোখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সে, দেখল আপার ব্রডওয়ে-এর চারপাশে আকাশ ছোঁয়া দালানগুলোর নিচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ট্রাইমোটর।

রানা আসলে কাঁচ আর কংক্রিটের জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চাইছে, আশা করছে ফকারের উন্মাদ পাইলটকে পুলিসের হেলিকপ্টার ধাওয়া করে কোথাও ল্যান্ড করতে বাধ্য করবে।

কিন্তু হঠাৎ ট্রাইমোটরের নিচের পেভমেন্ট বিস্ফোরিত হলো, ঘাড় ফেরাতেই লাল ফকারকে পিছনে দেখতে পেল রানা, ৭.৬২ শেল ছুঁড়েছে এক পশলা।

শেলগুলো হলুদ একটা ট্যাক্সিক্যাবের ছাদ চিরে দিয়ে রাস্তার কোণে বসানো ডাকবাক্সে আঘাত করল, নেহাতই ভাগ্যের জোরে কেউ আহত হয়নি।

প্রথমে রানা ভাবল, ট্রাইমোটর বড় বাঁচা বেঁচে গেছে, কিন্তু তারপরই খেয়াল করল কন্ট্রোল ঠিকমত সাড়া দিচ্ছে না। দ্রুত চেক করায় ধরা পড়ল রাডার বা স্টিয়ারিং স্টিক নড়বড় করছে, আর এলিভেটরগুলো কোন সাড়াই দিচ্ছে না।

'কি সমস্যা?' জিজ্ঞেস করলেন খুরশিদা।

'আমাদের এলিভেটরে গুলি লেগেছে। প্লেন আর ওপরে তুলতে পারব না।'

ধূর্ত পাইলট ফকারকে ট্রাইমোটরের সরাসরি পিছনে রাখছে, রানা যাতে ওটার অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না পায়। রানার অনুরোধ শুনে খুরশিদা জানালেন সিট বেল্ট খুলে জানালা দিয়ে উঁকি দিতে তাঁর আপত্তি নেই।

'প্লীজ!'

কেবিনের দরজায় আবার দেখা গেল তৃষাকে। 'ওদের আনন্দ না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। ব্যাপারটাকে ওরা এখনও অনুষ্ঠানের অংশ মনে করছে।'

'যদি বলতে পারতেন যে যার আল্লাহকে ডাকো তাহলে ভাল হত।' নিচে তাকিয়ে রানা আন্দাজ করল ওরা গ্রীনউইচ ভিলেজের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। একটু পরই নিচে দেখা গেল ইউনিয়ন স্কয়্যার পার্ক। সামনে থেকে টাইমস্ স্কয়্যারকে এগিয়ে আসতে দেখল ও। শহর কাছে চলে আসছে দেখে প্লেনটাকে ওপরে তুলতে চেষ্টা করল, কিন্তু এলিভেটর কন্ট্রোল সাড়া দিতে ব্যর্থ হলো। অগত্যা সোজা এবং সরল একটা রেখার ওপর, একই লেভেলে থাকতে হচ্ছে রানাকে। ব্রডওয়ে যতক্ষণ পশ্চিমদিকে সামান্য মোচড় খেয়ে এগোবে ততক্ষণ কোন সমস্যা নেই, কিন্তু প্যারামাউন্ট প্লাজার কাছে ফরটি-এইটথ স্ট্রীটে যখন বাঁক নেবে তখন সত্যিকার বিপদে পড়তে হবে ওকে। এলিভেটর তো কোন কাজে আসছেই না, রাডার-এর কাছ থেকেও সাড়া পাবার জন্যে গলদঘর্ম হতে হচ্ছে—শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে চাপ দিতে হচ্ছে পেডালে। এরকম জটিল পরিস্থিতিতে হিসেবের সামান্য একটু ভুল, কন্ট্রোল হুইলের এতটুকু ইতস্তত ভাব প্লেনটাকে সোজা নিয়ে যাবে আকাশ ছোঁয়া যে-কোন একটা বিল্ডিঙের গায়ে।

দরদর করে ঘামছে রানা। ঠোঁট শুকিয়ে কাগজের মত খসখসে। নিউ ইয়র্ক শহরের অসংখ্য বিল্ডিঙের দেয়াল মনে হলো ওর নাগালের এত কাছে যে জানালা দিয়ে হাত বের করে দিলেই যেন ছুঁতে পারবে।

সামনের রাস্তাটা এত লম্বা যে বোঝাই যায় না কোথায় শেষ হয়েছে। যত কাছে সরে আসছে ততই যেন সরু হয়ে যাচ্ছে ওটা, তারপর এক সময় বহুদূরে মিলিয়ে গেছে।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে লোকজন মুখ তুলে বোকার মত তাকিয়ে আছে—দেখছে ব্রডওয়ে-র মাঝখানে, রাস্তা থেকে দশতলা ওপর দিয়ে, ছুটে চলেছে একটা ট্রাইমোটর। জোড়া এঞ্জিনের গর্জন বিল্ডিংগুলোকে যেন কাঁপিয়ে দিচ্ছে, প্লেন মাথার ওপর চলে আসার অনেক আগে থেকে শুনতে পাচ্ছে তারা।

প্লেনের নাক উঁচু করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে রানা, কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে না। থ্রটল টেনে এনে স্পীড ঘণ্টায় সত্তর মাইলে নামিয়ে আনল, ঘণ্টায় আর ছয় মাইল কমালে প্লেন এগোবে না।

লাল ফকারের পাইলট দক্ষ ফ্লায়ার, তার আচরণ একটা মুরগীর পিছু নেয়া চতুর শেয়ালের মত। রানার এই যুদ্ধে পুঁজি হচ্ছে নিখাদ সাহস বা অন্যায়ের কাছে হার না মানার নির্ভীক জেদ। যুদ্ধটা এমন দু'জন লোকের মধ্যে যাদের নৈপুণ্য ও টেকনিক, ধৈর্য ও নিষ্ঠা সমান সমান। রানা অবশ্য একা নিজের নয়, নিজের সঙ্গে আরও পনেরোটা প্রতিবন্ধী শিশু ও দু'জন ভদ্রমহিলার প্রাণ রক্ষার জন্যে লড়ছে। আরও একটা চিন্তা সারাক্ষণ আতংকিত করে রেখেছে ওকে, জনবহুল কোন রাস্তায় বা লোক ভর্তি কোন অফিস বিল্ডিঙে ট্রাইমোটর বিধ্বস্ত হলে নিরীহ আরও না জানি কত লোক প্রাণ হারাবে। প্লেন শুধু তো আর বিধ্বস্ত হবে না, সঙ্গে সঙ্গে সেটা বিস্ফোরিতও হবে। বিস্ফোরণের আগুন কতদূর ছড়াবে কে জানে।

রানার পিছনে জানালার এত কাছে সারি সারি বিল্ডিং দেখতে পেয়ে শিশুদের মনে এই প্রথম ভয়ের একটু ছোঁয়া লাগল। তারপরও নাচের তালে তালে তৃষার করতালি আর সকৌতুক হাসিতে উৎসাহ পেয়ে এখনও তারা গান গাইছে। তৃষার নাচ, গান, করতালি ও হাসি, সবই কৃত্রিম; বেচারি ভয়ে এমন কি জানালার দিকে তাকাচ্ছেই না।

জানালার বাইরে অফিস বিল্ডিংগুলো ঝাপসা একটা প্রবাহের মত দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে, গ্লাস-উইন্ডোর পিছনে কর্মচারীদের হতবিহ্বল মুখ।

এক হাজার ফুট ওপর থেকে নিচে তাকিয়ে ফকারের আততায়ী পাইলট অবাক হয়ে দেখল ব্রডওয়ের দোকানপাট আর দালানের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ট্রাইমোটর। দুর্ঘটনা যে অবধারিত, এটা সে বুঝতে পারছে। প্রশ্ন স্রেফ সময়ের। না, তার কোন তাড়া নেই। ঠিক এখুনি ডাইভ দিয়ে গুলি করার কোন তাগিদ বা প্রয়োজন বোধ করছে না।

একটা পুলিস হেলিকপ্টারকে ধাওয়ায় যোগ দিতে দেখে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, রীতিমত কৌতুক বোধ করল সে। ফকার ও ফোর্ডের মাঝখানে রয়েছে ওটা, ছাদগুলোর ঠিক ওপর দিয়ে উড়ছে।

ঠাণ্ডা ও হিসেবী, সাবধানে কন্ট্রোল স্টিক সামনে ঠেলে দিল সে, ফকারের নাক নিচের দিকে নামিয়ে তাক করল সরাসরি হেলিকপ্টারের ফিউজিলাজে। একজন পুলিস ফকারের ওপর চোখ রাখছে, তাকে উন্মত্তের মত চিৎকার করতে দেখা গেল, হাত ওপর দিকে তুলে পাইলটকে দেখাচ্ছে। আসন্ন আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশে হেলিকপ্টার ঘুরে গেল, কিন্তু পুলিস সদস্যদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র মেশিন গানের সঙ্গে পারবে কেন! জোড়া মাজল থেকে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটে এসে রোটরের নিচে এঞ্জিনটাকে চুরমার করে দিল। গান ফায়ার চলল মাত্র তিন সেকেন্ড। এই তিন সেকেন্ডেই প্রজাপতির মত সুন্দর একটা ফ্লাইং মেশিন ভাঙাচোরা ক্ষতবিক্ষত চেহারা নিয়ে আকাশ থেকে খসে পড়ল একটা ভবনের ছাদে।

আবর্জনার ছোটখাট কিছু টুকরো রাস্তার ওপরও পড়ল, তবে ভাগ্যগুণে কেউ আহত হয়নি। ছাদটার ওপর লোকজন ছিল, তারা সময় মত সাহস করে ছুটে

আসায় কপ্টারের তোবড়ানো ককপিট থেকে পুলিস দু'জনকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনল। দু'জনেরই কয়েকটা করে হাড় ভেঙেছে, হাত ও মুখ থেকে রক্ত ঝরছে, তবে কারও আঘাতই এতটা গুরুতর নয় যে মারা যাবে।

গোটা ব্যাপারটা অমানবিক। ফকার পাইলটের এই আচরণের পিছনে যৌক্তিক কোন কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সে খুব ভাল করে জানে ট্রাইমোটর আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড আকাশে টিকবে, কাজেই পুলিস হেলিকপ্টার দেখার পর ধাওয়া বাদ দিতে পারত। কপ্টারটাকে ফেলে দেয়ার পিছনে আত্মরক্ষার তাগিদ কাজ করেনি। ঠাণ্ডা মাথায় মজা লুটতে চেয়েছে লোকটা। ট্রাইমোটরকে আবার ধাওয়া শুরু করার আগে বিধ্বস্ত কপ্টারের দিকে ভাল করে একবার তাকালও না সে।

পিছনে কি ঘটছে রানা জানে না। ককপিটের সাইড উইন্ডো দিয়ে ঘাড় বাঁকা করে তাকিয়ে ছিলেন খুরশিদা হক, তাই তিনি রোমহর্ষক দৃশ্যটা দেখতে পেলেন। দেখে এমন ভয় পেলেন যে মুখ খোলার শক্তি পর্যন্ত নেই।

রানার সামনে ক্রিস্টোফার কলম্বাস, সত্তর ফুট উঁচু স্ট্যাচু। বাম ডানার নয় কি দশ ফুট তফাত দিয়ে পাশ কাটাল ওটাকে। বাঁক ঘুরে চলে এল সেন্ট্রাল পার্কের ওপর।

পার্কে হাজার হাজার মানুষ। গ্রীষ্মকালের উষ্ণ বিকেল উপভোগ করতে এসেছে সবাই। সব কিছু ভুলে মাথার ওপর অনুষ্ঠিত নাটকটা দেখছে তারা। গোটা শহর থেকে অসংখ্য পুলিস কার বিভিন্ন রাস্তা ধরে এই পার্কের দিকে ছুটে আসছে, পুরোদমে সাইরেন বাজিয়ে। ফিফথ্ অ্যাভিনিউ-এর দিক থেকে আরও কয়েকটা পুলিশ হেলিকপ্টারকে আসতে দেখা গেল, ওগুলোর পিছু নিয়েছে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের একঝাঁক কপ্টার।

'আবার হামলা করছে!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন খুরশিদা হক। 'আটশো ফুট ওপর থেকে আমাদের লেজ লক্ষ্য করে ডাইভ দিয়েছে!'

রানা দিক বদলাতে পারে, প্রাণপণ চেষ্টা করলে কোন রকমে বাঁকও ঘুরতে পারে, কিন্তু এলিভেটর কাজ না করায় এক ফুট ওপরেও উঠতে পারবে না। ওর মাথায় একটা প্ল্যান তৈরি হলো। এই প্ল্যান কাজে লাগবে শুধু লাল ফকার যদি গুলি করতে করতে ট্রাইমোটরের সরাসরি ওপর দিয়ে সামনের দিকে উড়ে যায়।

মিডল্ এঞ্জিনের ইগনিশন ও ফুয়েল সুইচ 'অন' পজিশনে রাখল রানা। তোবড়ানো এঞ্জিন খকখক করে কাশল বার কয়েক, তারপর আবার ঠিকমত ঘুরতে শুরু করল। এবার ডানদিকে যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ বাঁক নিচ্ছে, জানে পিশাচ পাইলট বজ্রের মত নেমে আসছে ওপর থেকে। এড়িয়ে যাবার অ্যাকশন মুহূর্তের জন্যে পাইলটকে হতচকিত করে তুলল, মেশিন গান থেকে বেরিয়ে আসা বুলেটের দুটো ধারা ফোর্ডের অনেকটা বাম দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ফকারের পাইলট দ্রুত নিজের ভুল শুধরে আবার মেশিন গান চালাল। রানা অনুভব করল ওর ট্রাইমোটরের আপার উইং-এ আঘাত করছে বুলেট, ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে স্টারবোর্ড এঞ্জিনটাকে। এঞ্জিনের পিছনে উথলে উঠল কমলা শিখা, তবে ওটার সিলিন্ডারগুলো এখনও খুব জোরেই ঘুরছে। প্লেনটাকে মোচড় খাইয়ে ইউটার্ন নিল। আরও এক পশলা বুলেট ককপিটে ঢুকে কন্ট্রোল প্যানেল চুরমার

করে দিল। তবে এবার রানার পালা। ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল ও। ভাঙা উইন্ডশীল্ডের ওপর দিয়ে সগর্জনে সামনে ছুটে যাচ্ছে লাল ফকার।

তিনটে থ্রটলই সামনে ঠেলে দিল রানা। ওর দুটো এঞ্জিনের যা শক্তি, ফকারের স্পীডের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিতে পারবে। ওর মাঝখানের এঞ্জিনটা শুধু সিলিন্ডারের ওপর সচল থেকে ধোঁয়ার ঘন মেঘ আর তেল ছড়িয়ে দিচ্ছিল। সবগুলো থ্রটল সামনে ঠেলতে যা দেরি, ট্রাইমোটর প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে কামানের গোলার মত ছুটল।

লাল ককপিটে বসা লোকটা অনেক দেরিতে লেদার হেলমেট পরা মাথা ঘুরিয়ে দেখতে পেল রূপালি ট্রাইমোটর শিকারি বাজপাখির মত তার বিশ ফুটের মধ্যে চলে এসেছে। দ্রুত ওপরে উঠতে গিয়ে তিন ডানার ডগায় খাড়া হয়ে গেল ফকার। তিন প্রস্থ ডানা নিয়ে নব্বুই ডিগ্রি কোণ তৈরি করে এই ওপরে উঠতে যাওয়াটাই তার কাল হলো। ট্রাইমোটরের বড় একটা ল্যান্ডিং হুইল কাঠ ভেঙে, কাপড় ছিঁড়ে ওপরের উইংটাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল।

রানা শুধু দেখার সুযোগ পেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে ফকার, এবং অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি ওটার পাইলট হাত তুলে ওকে দেখে নেয়ার ভঙ্গিতে শাসাচ্ছে। গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা গাছের মাথায় পড়তে যাচ্ছে প্লেনটা।

সেন্টার আর স্টারবোর্ড এঞ্জিন ট্রাইমোটরকে একটা জ্বলন্ত মশালে পরিণত করার আগে ওগুলো বন্ধ করে দিল রানা। প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বস্ত কিন্তু আহত ঘোড়ার মত, যে কখনও সামনে ছুটতে দ্বিধা করেনি, পুরানো যান্ত্রিক পাখিটাও বাতাস কামড়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে। ধোঁয়া আর আগুন ছাড়ছে প্লেন. একটা মাত্র অক্ষত এঞ্জিন ফুল আরপিএম-এ ছুটছে। একই লেভেলে থেকে একটা বৃত্ত তৈরি করছে রানা, বড়সড় ফাঁকা একটা জায়গা খুঁজছে যেখানে ল্যান্ড করা যায়।

ফাঁকা জায়গা এদিকে একটাই, নাম শীপ মেডো। অগুনতি মানুষ পিকনিক করতে বা গায়ে রোদ মাখতে এসেছে, সবাই তারা বুলেটে ঝাঁঝরা ট্রাইমোটরকে নেমে আসতে দেখে সন্ত্রস্ত পিঁপড়ের মত চারদিকে ছুটতে শুরু করল। কারও মনে সন্দেহ নেই যে নিচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হবে ওটা।

রানাও জানে, যে-প্লেনের ওপর প্রায় কোন নিয়ন্ত্রণই নেই সেটাকে নিরাপদে ল্যান্ড করানো সম্ভব নয়। থ্রটল ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে ট্রাইমোটরকে ঘাসের দিকে খসে পড়তে দিচ্ছে ও। এছাড়া আর কিছু করার নেই ওর।

হাজার দুয়েক লোক রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে। গোটা মাঠে কোন শব্দ নেই। প্লেনটাকে কখনও দেখা যাচ্ছে, কখনও সেটা ধোঁয়ায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

জমিনের কাছাকাছি এসে ট্রাইমোটর এক সেকেন্ড ইতস্তত করল। তারপর বড় হুইলগুলো নেমে এল ঘাসে। ফুটবলের মত দু'বার ড্রপ খেলো ট্রাইমোটর, শেষবার টেইল হুইলও জমিন স্পর্শ করল। সবাইকে স্বস্তি আর আনন্দের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে কিছু দূর গড়িয়ে স্থির হলো রূপালি ফোর্ড। দর্শকদের মধ্যে ভুলেও কেউ বিশ্বাস করেনি এটা সম্ভব।

এটাই বা কে বিশ্বাস করবে যে জ্বলন্ত প্লেনের কেবিনে বসে তৃষার সঙ্গে গলা মিলিয়ে এখনও গান গাইছে পনেরোজন প্রতিবন্ধী শিশু?

লোকজনকে ছুটে আসতে দেখে অবশিষ্ট এঞ্জিনটাও বন্ধ করে দিল রানা, তাকিয়ে থেকে দেখল প্রপেলারের থেমে যাওয়া। চরম সংকটে সাহায্য করায় ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে খুরশিদা হকের দিকে ফিরল ও, কিন্তু তাঁকে দেখে কথা বলতে সাহস পেল না, কারণ তার মুখের সব রঙ মুছে গেছে। হাত বাড়িয়ে তাঁর ঘাড়ে আঙুল ঠেকাল রানা, পালস খুঁজছে। তারপরই খসে পড়ল ওর হাত, শক্ত মুঠো হয়ে গেল।

তৃষাকে ককপিটের দরজায় দেখা গেল। 'ইউ ডিড ইট!' উল্লাসে তার ফেটে পড়ার অবস্থা।

'বাচ্চাগুলো?' রানার গলা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল।

'কেউ আহত হয়নি।' তারপর কো-পাইলটের সিটের পিছনটা দেখতে পেল তৃষা, প্রায় মাপা একটা নির্দিষ্ট ব্যবধানে ছোট ছোট ফুটো–ফকারের মেশিন গান থেকে করা গুলির কাজ।

অটল পাথুরে মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে আছে তৃষা। গম্ভীর ও নিরানন্দ চেহারা, তার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়ল রানা। প্রথমে তৃষা মানতে চাইল না যে খুশি আন্টি বেঁচে নেই। কিন্তু নিচে তাকিয়ে ককপিটের মেঝেতে রক্ত দেখার পর কঠিন, মর্মান্তিক সত্যটা উপলব্ধি করতে পারল সে।

শোক, তার সঙ্গে দিশেহারা একটা ভাব চোখে-মুখে, জানতে চাইল, 'কেন?' গলার সুরে হাহাকার। 'এরকম কেন ঘটবে? খুশি আন্টির মারা যাবার কোন কারণ ছিল না।'

প্লেনটাকে ঘিরে কয়েকশো মানুষের ভিড় জমে গেছে। আশপাশের রাস্তা থেকে পিল পিল করে আরও বহু মানুষ ছুটে আসছে কি ঘটনা জানার জন্যে। কিন্তু রানার কাছে কেউ যেন তারা দৃশ্যমান নয়, তাদের সম্মিলিত উল্লাস ও আনন্দধ্বনি যেন ওর কানে পৌঁছাচ্ছে না। তৃষাকে ও বলল, 'ওই লোকটা একা শুধু আপনার খুশি আন্টিকে খুন করেনি। আরও বহু মানুষ তার হাতে অকারণে মারা গেছে।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল তৃষা। 'এভাবে একে একে সবাইকে আমার হারাতে হবে? কেন? কেন?'

'এর উত্তর আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে, তৃষা,' নিচু গলায়, অভয় ও সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বলল রানা। 'আমার ধারণা, এ-সবের পিছনে ফ্যালকন করপরেশন-এর ভূমিকা আছে।'

ষোলো

হেলিকপ্টার নিয়ে ডাক্তাররাও পৌঁছেছেন, প্রতিবন্ধী শিশুদের সামান্য কাটা-ছেঁড়া পরীক্ষা করে ওষুধ-পত্র দিলেন তাঁরা। আরেক হেলিকপ্টার থেকে নামল তাদের মা-বাবা ও অভিভাবকরা, বাচ্চাদের বহাল তবিয়তে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা সবাই।

শোকে কাতর ও ম্রিয়মাণ তৃষার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, খুরশিদা হকের লাশ ট্রাইমোটর থেকে বের করে একটা অ্যামবুলেন্সে তোলা হচ্ছে। প্লেনটাকে পুলিস বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলার পর রানা ও তৃষাকে একটা পুলিস কারের কাছে নিয়ে আসা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে ওদেরকে কাছাকাছি একটা থানায় নিয়ে যাওয়া হবে।

তার আগে ট্রাইমোটরটাকে ঘিরে একটা চক্কর দিল রানা। বুলেটে ঝাঁঝরা, ক্ষতবিক্ষত ওর এই প্রিয় অ্যান্টিকটি এতগুলো মানুষকে নিয়ে কিভাবে আকাশে ভেসে ছিল, এটা খুবই বিস্ময়কর লাগছে এখন। ল্যান্ডিং হুইলের ওপর ফেন্ডারে একটা হাত রেখে বিড় বিড় করল ও, 'ধন্যবাদ।'

এরপর রানা পুলিস কারের অফিসারকে জিজ্ঞেস করল, থানায় যাবার পথে বিধ্বস্ত ফকারটাকে ও একবার দেখতে পারে কিনা। মাথা ঝাঁকিয়ে সামনের কারে ওদেরকে উঠতে বলল অফিসার।

লাল ফকারকে দেবদারু গাছের মাথায়, মাটি থেকে বিশ ফুট ওপরে, ছেঁড়া ও দোমড়ানো-মোচড়ানো একটা ঘুড়ির মত লাগল দেখতে। ইতোমধ্যে দমকল বাহিনীর গাড়ি পৌঁছে গেছে। মই-এর ভাঁজ খুলে গাছে উঠছে একজন ফায়ারম্যান। পুলিস কার থেকে নেমে প্লেনের নিচে এসে থমকে দাঁড়াল রানা। গাছের ওপর আটকে আছে ফকারের শুধু খোলসটা, মাউন্টিং থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসা এঞ্জিন খসে পড়েছে নিচে, বেশ খানিকটা ডেবে গেছে নরম মাটিতে। এঞ্জিনটা দেখে চোখ কপালে উঠে যাবার অবস্থা হলো ওর। কিসের পুরানো, নয় সিলিন্ডার বিশিষ্ট একশো দশ হর্সপাওয়ারের সম্পূর্ণ নতুন একটা এঞ্জিন! তারপর রানা খোলা ককপিটে তাকাল।

ককপিট খালি।

গাছটার ডালপালার ওপর চোখ বুলিয়ে মাটিতে চোখ নামাল রানা। অদূরেই ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে একটা লেদার ফ্লাইং জ্যাকেট, হেলমেট ও গগলস্ সহ। গগলসের লেন্সে সামান্য একটু রক্তের দাগ। পাইলটের চিহ্ন বলতে এইটুকুই।

বলা যায় প্রায় ভোজবাজির মতই গায়েব হয়ে গেছে লোকটা।

পুলিস স্টেশনে তৃষাকে অফিসাররা জিজ্ঞাসাবাদ করছে, এই ফাঁকে স্থানীয় এক এয়ারক্রাফট-মেইনটেন্যান্স কোম্পানিকে ফোন করে ওর ট্রাইমোটরটাকে মেরামত করে ওয়াশিংটনের একটা ঠিকানায় পৌঁছে দিতে বলল রানা, পুরানো গাড়ি ও এরোপ্লেনের কালেকশন যেখানে রাখে ও। তারপর নুমার চীফ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে সংক্ষেপে গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিল।

পুলিস স্টেশনের শেরিফের সঙ্গে সরাসরি কথা বললেন হ্যামিলটন। আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো, যা ঘটেছে তার একটা লিখিত রিপোর্ট জমা দেবে রানা ও তৃষা, তারপরও কোন প্রশ্ন করার থাকলে নুমা হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই হবে, ব্যক্তিগতভাবে রানা বা তৃষাকে আর থানায় যেতে হবে না।

তৃষাকে নিয়ে পুলিস স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এল রানা। দু'জন প্রায়

একযোগে হঠাৎ খেয়াল করল পরস্পরের হাত ধরে আছে ওরা। তৃষার মনে পড়ল রানাই প্রথমে তার হাত ধরেছিল। তখন সে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়নি। তারপর অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও তার ইচ্ছে করছে না হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। 'জানেন,' নিচু, ম্লান গলায় বলল সে, 'খুশি আন্টির এই মৃত্যু কোনদিনই আমি মেনে নিতে পারব না। মাকে হারিয়েছি দশ বছর বয়সে, খুশি আন্টির মধ্যে আমি আমার সেই মাকে খুঁজে পেয়েছিলাম। বাবাও তাঁকে খুব ভাল জানতেন।'

'ডক্টর ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ছিল দু'জনের। বিশেষ করে আমি চাইছিলাম, তাই বিয়ে করতেও রাজি হয়েছিলেন ওঁরা।'

'বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, তাই এতসব পারিবারিক প্রশ্ন করতে হচ্ছে,' বলল রানা। 'উনি কি আপনার বাবার আবিষ্কার ও প্রজেক্ট সম্পর্কে সব কথা জানতেন?'

'সব জানতেন কিনা বলতে পারব না। বাবা তো আসলে প্রায় কাউকেই কিছু বলতে চাইতেন না। তবে খুশি আন্টি অনেক কিছুই জানতেন, কারণ বাবার সেক্রেটারি ছিলেন তিনি।'

'আপনার বাবা আপনাকেও তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা দেননি কখনও?'

মাথা নাড়ল তৃষা। 'কিছু জিজ্ঞেস করলে একটাই জবাব দিতেন, কোন বিজ্ঞানী বা এঞ্জিনিয়ার ছাড়া অন্য কাউকে তাঁর কাজ ব্যাখ্যা করে বোঝানো অসম্ভব। নিজের কাজ সম্পর্কে মাত্র একবারই লেকচার দেন আমাকে–সেটা ওই ওয়াটার লিলিতে। তাঁর যে এঞ্জিনিয়ারিং কনসেপ্ট অনুসরণ করে জাহাজটার এঞ্জিন তৈরি করা হয়েছে, সেটা নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন। এক রাতে ডিনারে বসে ওগুলোর ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক প্রিন্সিপল ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন।'

'শুধু এই একবার? আর মাত্র এই একটা বিষয়ে?'

'লাউঞ্জে বসে কয়েক ঢোক মার্টিনি খাবার পর বাবা অবশ্য এও আমাকে বলেছিলেন যে হাজার বছরের সেরা একটা আবিষ্কার তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম একটু নেশা হওয়ায় নিজের স্বপ্নকে সত্যি বলে মনে করছেন।'

'তাহলে যা কিছু জানতেন আপনার খুশি আন্টি একাই?'

'না। ফাহিম চাচাও বাবার অনেক কথা জানেন। ওঁরা দু'জন একসঙ্গে পি.এইচ.ডি করেছিলেন। বাবা এঞ্জিনিয়ারিঙে, ফাহিম চাচা কেমিস্ট্রিতে।'

'আপনি জানেন, কোথায় তাঁকে পাওয়া যাবে?'

'জানি।'

'আর আপনার বাবার ল্যাবরেটরি? সেটা কোথায়?'

'জিনি টেইলর ফিল্ডের কাছাকাছি, বাড়ির সঙ্গেই ল্যাবরেটরি। ফাহিম চাচাও ওখানে থাকেন।'

'আপনার ফাহিম চাচাকে একটা ফোন করতে পারেন?'

'কোন বিশেষ কারণ?'

'ফোনে আপনি তাঁকে বলতে পারেন হাজার বছরের সেরা আবিষ্কারটা

সম্পর্কে জানার জন্যে কৌতূহলে মরে যাচ্ছে গোটা বাংলাদেশ। না, সারা দুনিয়া।

নুমা হেডকোয়ার্টারের রিশেপসন হলে টানা এক ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হলো অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে। আবিষ্কারক ও বিজ্ঞানী ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল হকের মৃত্যুরহস্য, ওয়াটার লিলির এঞ্জিনের ডিজাইন, ক্রুজ শিপের করুণ পরিণতি, নুমা সার্ভে শিপ হাইজ্যাক, ক্রু ও বিজ্ঞানীদের সহ সেটা উদ্ধার, সিআইএ-র পরবর্তী তৎপরতা, এফবিআই-এর ভূমিকা, প্রবাসী অ্যাফ্রো-এশীয় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে নির্দিষ্ট এয়ার শোতে টেরোরিস্টের হামলা ইত্যাদি বিষয়ে ঝাঁক-ঝাঁক প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো তাঁকে।

সংবাদ সম্মেলন শেষ করে তিনি যখন নিজের আউটার অফিসে ঢুকলেন, দেখলেন ল্যারি কিং তাঁর জন্যে ওখানে অপেক্ষা করছে।

প্রায় দশ মিনিট হলো চীফের আউটার অফিসে ঢুকেছে কিং। যে চেয়ারটায় বসেছে, তার পাশেই মেঝেতে পড়েছিল ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের লেদার কেসটা। পুরানো লেদার কেসের প্রতি বিশেষ একটা দুর্বলতা আছে তার। সে ধরে নিল জিনিসটা বাতিল ভেবে কেউ ফেলে গেছে। আপন মনে হাসল কিং। ভাবল, ভালই হলো, সঙ্গের এই একগাদা কাগজ-পত্র এই কেসটায় ভরে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে সে, কারণ সাধারণ ব্রিফকেসের চেয়ে এটা আকারে কিছুটা বড়, আকৃতিটাও একটু বেশি চৌকো। চীফকে ফিরতে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে, তাঁর পিছু নিয়ে দরজার চৌকাঠ পেরুল।

'নতুন কিছু, ল্যারি?' ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন হ্যামিলটন।

'ভাবলাম হাইজ্যাকারদের জাহাজ পানি থেকে তোলার সিআইএ প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে চাইবেন আপনি,' বলল কিং, লেদার কেস খুলে একটা ফাইল ফোল্ডার বের করল।

চশমার ওপর দিয়ে কিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল। 'এই ইনফরমেশন তুমি পেলে কোত্থেকে? সিআই এখনও তাদের এই ডাইভ প্রজেক্ট সম্পর্কে কিছুই আমাদেরকে জানায়নি। আমি জানি কাজটা তারা শুরু করেছে–' হাতঘড়িতে চোখ বুলাবার জন্যে থামলেন–'মাত্র দশ ঘণ্টা আগে।'

'প্রজেক্ট ম্যানেজার কড়া হুকুম দিয়েছেন প্রতি ঘণ্টায় ডাটা প্রোগ্রাম মনিটর করে জানাতে হবে তাঁকে। বলতে পারেন, ওরা যখন যেটা আবিষ্কার করবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তা আমরা জানতে পারব।'

'ওরা যদি জানতে পারে ভীনাস সিআই-এর সিক্রেট ফাইল হ্যাকিং করছে, আমাদের বিশ-বাইশ রকমের নরক দেখিয়ে ছাড়া হবে।'

ল্যারি কিং-এর মুখে শয়তানি হাসি। 'বিশ্বাস করুন, অ্যাডমিরাল, ওরা কখনোই কিছু জানতে পারবে না। ভীনাস ডাটা সংগ্রহ করছে স্যালভিজ জাহাজের কমপিউটর থেকে, ওগুলো ক্রিপটোগ্রামড্ অবস্থায় অ্যানালিসিসের জন্যে হেডকোয়ার্টার ল্যাংলিতে পাঠানোর আগেই।'

এবার অ্যাডমিরালের পালা, তবে তিনি শয়তানি হাসির বদলে প্রশ্রয়দানের হাসি হাসলেন।

'আর, সার, বিশ-বাইশটা নরকের কথা যেটা বললেন, আমি জানি ওটা আপনার কৌতুক।' হাসছে কিং। 'কেউ জানে না, শুধু প্রেসিডেন্ট আর আপনি জানেন, সিআইএ বা এফবিআই নয়, যুক্তরাষ্ট্রে গোপন খবরের সবচেয়ে বড় গুদাম আসলে নুমা। প্রয়োজনে আমরাই বরং ওদেরকে নরক দেখিয়ে ছাড়তে পারি।'

'বলছ কেউ জানে না, তাহলে তুমি জানলে কিভাবে?' অ্যাডমিরাল গম্ভীর।

'আমি জানি ভীনাসের কল্যাণে,' বলল কিং। 'সার, আমি এ-ও জানি যে ক্ষেত্রবিশেষে নুমার ক্ষমতা এত বেশি, স্বয়ং প্রেসিডেন্টের আদেশ পর্যন্ত আমরা অমান্য করতে পারি–তাঁকে এড়িয়ে কংগ্রেসের বিশেষ একটা কমিটিকে ব্যাখ্যা করতে পারি কেন তাঁর আদেশ আমরা মানতে পারছি না।'

'এ-সব তথ্য শুধু গোপনীয় নয়, বিপজ্জনকও,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলে চাকরি খোয়াতে হত, জেলও খাটতে হত।'

'আমি জানি, সার,' বলল কিং। 'তবে আপনিও জানেন এ-সব তথ্য আমার কাছে নিরাপদেই থাকবে, আর কেউ জানবে না।'

'ঠিক আছে, বলো, কি জানতে পারল ভীনাস।'

ফাইল ফোল্ডার খুলে পড়তে শুরু করল কিং। 'হাইজ্যাকারদের ওটা একশো ত্রিশ ফুটী ক্রু/ইউটিলিটি ওঅর্ক বোট, ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়াগোর টাসকান বোট ইয়ার্ডে তৈরি। ইন্দোনেশিয়ার অফশোর অয়েল ইন্ডাস্ট্রিতে সার্ভিস দেয়ার জন্যে ওটার ডিজাইন তৈরি করা হয়। স্পীড ও ফ্লেক্সিবিলিটি অত্যন্ত বেশি...'

'জানা গেছে কে ওটার মালিক?'

'সর্বশেষ চুক্তি ছিল বোরম্যান অয়েল কোম্পানির সঙ্গে, সলেক্সোকো-র একটা সাবসিডিয়ারি কোম্পানি এই বোরম্যান অয়েল।'

'সলেক্সোকো,' অ্যাডমিরালের গলা থেকে প্রতিধ্বনি বেরুল। 'আমি তো জানি বিক্রি হয়ে যাবার পর সলেক্সোকো-র আর কোন অস্তিত্বই নেই।'

'কোম্পানিটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তেল থেকে ইন্দোনেশিয়ার মূল আয়টাই বন্ধ হয়ে যায়।'

'সলেক্সোকোটা কে যেন কিনে নেয়?'

চোখ তুলে অ্যাডমিরালের দিকে তাকিয়ে হাসল কিং। 'সলেক্সোকো-র দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার পর ফ্যালকন করপরেশন ওটার বিলুপ্তি ঘোষণা করে।'

চেয়ারে হেলান দিলেন আডমিরাল। 'খবরটা শোনার সময় নাথান করবেটের চেহারা কেমন দেখাবে?'

'সরাসরি কোন যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যাবে না,' বলল কিং। 'বোটের মালিকানা কখনোই ট্র্যান্সফার করা হয়নি। আমাদের লাইব্রেরী চেক করে দেখা হয়েছে, উনিশশো নিরানব্বুই সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত ওই বোটের কোন হদিশ নেই। আর এ-ও বিশ্বাস করা যায় না যে হাইজ্যাকাররা এমন কোন প্রমাণ রাখবে যা দেখে বোটটার সঙ্গে ফ্যালকনের সম্পর্ক প্রমাণিত হবে।'

'সিআইএ এজেন্টরা হাইজ্যাকারদের কারও পরিচয় জানতে পেরেছে?'

'লাশগুলোর যে অবশিষ্ট পাওয়া গেছে, পরিচয় জানার জন্যে যথেষ্ট নয়,' বলল কিং। 'লেগুনের মুখে যে গার্ডটা পড়েছিল, তার লাশ ভাটার সঙ্গে সাগরে ভেসে গেছে। রানা যা সন্দেহ করেছে সেটাই বোধহয় ঠিক, হাইজ্যাকাররা একটা মার্সেনারি সংগঠন কোবরা ক্লাবের সদস্য। বেশিরভাগই এরা ইউএস আর্মি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বা চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই ক্লাবে যোগ দিয়েছে।'

অ্যাডমিরালকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'তোমার ভীনাস এ-সম্পর্কে কিছু বলতে পারছে, ফ্যালকনের মত এত বড় একটা করপরেশন পাইকারি হারে মানুষ খুন করতে গেল কেন?'

মাথা নাড়ল কিং।

'কোন থিওরিই দিতে পারছে না?'

'না, অর্থবোধক বা বোধগম্য কোন সিনারিয়ো ভীনাস তৈরি করতে পারছে না।'

'চাবি হয়তো ডক্টর সিরাজুল ইসলাম,' অনেকটা জনান্তিকে বিড় বিড় করলেন হ্যামিলটন।

'ভীনাসকে আমি ভদ্রলোকের লাইফ নিয়ে রিসার্চ করতে বলব।'

নিজের বিশাল কমপিউটর ডিপার্টমেন্টে ফিরে এসে কীবোর্ডের সামনে বসল কিং। ভীনাসকে ডাকল, তারপর শূন্যে তাকিয়ে বসে থাকল। ইতোমধ্যে হলোগ্র্যাফিক আদল নিয়ে উদয় হয়েছে ভীনাস, নীরবে অপেক্ষা করছে। অবশেষে এক সময় মুখ তুলে তাকাতে কনসোলের ওপর তাকে দেখতে পেল কিং।

'আমি যখন অ্যাডমিরালের কাছে ছিলাম, এরমধ্যে কিছু ঘটেছে?' জানতে চাইল সে।

'বোম্বেটে ক্রুদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি বলে রিপোর্ট দিয়েছে স্যালভিজ ডাইভাররা। কাপড় আর অস্ত্র ছাড়া কারও কাছে কিছু পাওয়া যায়নি—না মানিব্যাগ, না আইডি কার্ড, না নোটবুক। হাইজ্যাকিং-এর চার্জে যে-ই থাকুক, গোপনীয়তা রক্ষায় উঁচুদরের এক্সপার্ট লোকটা।'

'এই প্রজেক্ট থেকে সরিয়ে আমি তোমাকে ডক্টর সিরাজুল ইসলামের জীবনীর ওপর গবেষণা করাতে চাই।'

'উদ্ভাবক আর আবিষ্কারক ভদ্রলোক?'

'হ্যাঁ।'

'দেখছি সাধারণ জীবনীর বাইরে কি-কি পাওয়া যায়। তবে আমাকে কিছুটা সময় দিতে হবে।'

'ধন্যবাদ, ভীনাস।'

কিং একঘেয়েমির শিকার। আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবে। স্ত্রী আর মেয়ে দুটোকে নিয়ে অনেক দিন পর বেরুবে সে, কোন রেস্তোরাঁয় বসে ডিনার খেয়ে সিনেমা দেখবে। কনসোলের ফাঁকা একটা জায়গায় লেদার কেসটা রেখে খুলল সে, ভেতরে আরও কিছু ফাইল ঢোকাবে।

ল্যারি কিং সহজে চমকে ওঠার লোক নয়। ঠাণ্ডা ও শান্ত প্রকৃতির ব্লাডহাউন্ড হিসেবেই তার পরিচিতি। কিন্তু যা দেখল তাতে তার গোটা অস্তিত্ব প্রবল এক ঝাঁকি খেলো। সাবধানে, অত্যন্ত সাবধানে, লেদার কেসটার ভেতর একটা হাত ভরল সে। যে পদার্থের স্পর্শ পেল সেটা দু'আঙুলে ডলে পরীক্ষা করল।

'তেল,' আপনমনে বিড়বিড় করল কিং, হাঁ করে তাকিয়ে আছে খোলা লেদার কেসটার ভেতর। কেসটা তরল পদার্থে অর্ধেকের বেশি হবে তো কম নয় ভরে আছে। এ সম্ভব নয়, হতভম্ব হয়ে ভাবল সে। অ্যাডমিরালের অফিস থেকে বেরুবার পর কেসটা মুহূর্তের জন্যেও সে হাতছাড়া করেনি। তাহলে এই তেল এল কোত্থেকে?

সতেরো

হাডসন নদীর পশ্চিম তীর ঘেঁষা হাইওয়ে নাইন ধরে গাড়ি চালাচ্ছে তৃষা। ভেজা, স্যাঁতসেঁতে একটা দিন; আকাশে যেমন মেঘের ছুটোছুটি আছে, মাটির কাছাকাছি তেমনি দমকা বাতাসের দাপাদাপি চলছে। ভেজা পেভমেন্টে জাগুয়ার এক্সকে-আর হার্ডটপ স্পোর্টস কারটা সাবলীল ভঙ্গিতে চালাচ্ছে তৃষা। হুডের নিচে তিনশো সত্তর হর্সপাওয়ারের সুপারচার্জড্ একটা এঞ্জিন আর চেসিসের নিচে কমপিউটর-অ্যাকটিভেটেড সাসপেনসন্স অ্যান্ড ট্র্যাকিং কন্ট্রোল থাকায় কোন রকম ইতস্তত না করে মনের সাধ মিটিয়ে স্পীড তুলছে সে।

নরম লেদারের প্যাসেঞ্জার সিটে গা এলিয়ে দিয়ে ড্রাইভটা উপভোগ করছে রানা, চোখের দৃষ্টি মাঝে-মধ্যে বাঁ দিকে সরে গিয়ে দেখে নিচ্ছে স্পীডোমিটারের কাঁটা। গাড়ি চালানোয় তৃষার দক্ষতার ওপর আস্থা রাখতে চায় ও, তবে পরিচয়টা মাত্র কয়েক দিনের হওয়ায় জানা নেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কেমন চালাবে সে। স্বস্তিকর ব্যাপার হলো, রোববার সকাল বলে রাস্তায় গাড়ি খুব কম দেখা যাচ্ছে। পেশি ঢিল করে দিয়ে রাস্তার দু'পাশের খেত-খামার, মাঠ, বাগান আর বনভূমি দেখছে ও। বনভূমির গাছগুলো এত উঁচু, পিছনের পাথুরে পাহাড় পর্যন্ত বেশিরভাগ আড়াল করে রেখেছে।

এক সময় বাঁ দিকে বাঁক নিল তৃষা। এখান থেকে আবাসিক এলাকা শুরু। বাড়িগুলো যেন সৌন্দর্যপিপাসু শিল্পীর তুলির আঁচড়ে সাজানো। প্রতিটি বাড়ির সামনে সযত্নলালিত ফুলবাগান আর সবুজ মখমলের মত লন। রাস্তাটা সাপের মত এঁকেবেঁকে বেশ কিছু দূর এগিয়েছে। অবশেষে একটা গেটের সামনে থামল তৃষা। গেটটা মাঝখানে কাটা। মূল শহর থেকে এতটা দূরে, প্রায় গ্রামীণ একটা পরিবেশে ঠিক এ-ধরনের সিকিউরিটি কেউ আশা করবে না। গেট থেকে ভেতর দিকে প্রসারিত চওড়া পাঁচিল দুটো দশ ফুট উঁচু। গেটটা অস্বাভাবিক পুরু ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি, ফুলস্পীডে ছুটে আসা সীসা ভর্তি যে-কোন পাঁচটনী ট্রাককেও একদম ঠেকিয়ে দিতে পারবে। রাস্তার ওপারে, গেট থেকে বিশ গজ

দূরে, উঁচু একজোড়া পোলের মাথায় ফিট করা হয়েছে দুটো টেলিভিশন ক্যামেরা। ওগুলোকে অকেজো করতে হলে দরকার লক্ষ্যভেদী রাইফেলের বুলেট।

তৃষা গাড়ি থামিয়েছে একটা পাথুরে পিলারের পাশে। বাক্সটাকে এমনভাবে বসানো হয়েছে, দেখে মনে হলো পাথরের ভেতর গাঁথা। বাক্সের গায়ে বোতাম রয়েছে। গাড়ির জানালা খুলে বাইরের দিকে ঝুঁকে কয়েকটা বোতামে চাপ দিল তৃষা। রিমোট কন্ট্রোলটা এতক্ষণে গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে বের করল সে, চাপ দিল আরেকটা কোড-এ। এবার ধীরে ধীরে মাঝখান থেকে ফাঁক হতে শুরু করল গেট। জাগুয়ার ভেতরে ঢুকতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল সেটা, পিছু নিয়ে অন্য কোন গাড়ি যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে।

'সিকিউরিটি সম্পর্কে আপনার বাবা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন,' মন্তব্য করল রানা।

'সবটুকু এখনও আপনি দেখেননি। চোখে পড়ছে না, তবে চারজন গার্ডও আছে।'

রাস্তাটা গম, আখ, সূর্যমুখী ইত্যাদি খেতের মাঝখান দিয়ে এগিয়েছে। এটা আসলে একটা খামারবাড়িই। আঙুর বাগানের মাঝখান দিয়ে এগোচ্ছে জাগুয়ার, হঠাৎ বড়সড় একটা ব্যারিকেড মাথাচাড়া দিল গাড়ির সামনে। বাধাটা সম্পর্কে জানত তৃষা, তাই আগে থেকেই স্পীড কমিয়ে আনছিল।

গাড়ি থামামাত্র মোটাসোটা একটা দেবদারু গাছের আড়াল থেকে মাঝারী আকৃতির এক লোক বেরিয়ে এল, হাতে অটোমেটিক রাইফেল। ঝুঁকে গাড়ির ভেতরটা দেখল সে। চেহারাই বলে দিচ্ছে লোকটা নেপালী। সম্ভবত অবসর নেয়া গুর্খা সৈনিক, ধারণা করল রানা।

রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে তৃষাকে করজোড়ে নমস্কার করল লোকটা। 'নমস্তে, মাইজী,' ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে কথা বলছে সে। 'আপনাকে দেখলেই আনন্দে আমার বুকটা ভরে ওঠে।'

'কেমন আছ, প্রভাস কাকা? তোমার ছোট্ট খুকি মনীষা কেমন আছে?'

'আমরা তাকে হাত-পা বেঁধে নদীতে ফেলে দিয়েছি।'

'ভালই করেছ।' হাত তুলে গাছপালার ফাঁকে একটা কাঠামো দেখাল তৃষা, খানিক চেষ্টা করার পর আন্দাজ করা গেল যে ওটা একটা বাড়ি। 'ফাহিম চাচা কি এখানে?'

'জ্বী, মাঈজী,' জবাব দিল গুর্খা গার্ড প্রভাস। 'আপনার পিতাজী মারা যাবার পর খামারবাড়ি ছেড়ে কোথাও তিনি যাননি।' নিজের বুকে একটা আঙুল রাখল সে। 'বড় চোট পেয়েছি, মাঈজী। মনিবজী আমার দেওতা ছিলেন।'

'ধন্যবাদ, প্রভাস কাকা।' রানার দিকে ফিরল তৃষা, ফিসফিস করে বলল। 'ওর নাম শেরপা প্রভাস থাপা, বাবা ওকে ব্রিটেন থেকে নিয়ে এসে গার্ডের চাকরি দিয়েছিলেন। গুর্খা রেজিমেন্টে ছিল ও। এখানকার সব গার্ডই নেপালী।'

'ভাল থাকুন, মাঈজী,' বলার পর প্রায় ভোজবাজির মত জঙ্গলে মিলিয়ে গেল প্রভাস থাপা।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তৃষার দিকে তাকাল রানা। 'হাত-পা বেঁধে মেয়েকে নদীতে

ফেলে দেয়ার ব্যাপারটা কি?'

'ওটা একটা কোড,' হাসিমুখে ব্যাখ্যা করল তৃষা। 'আমি যদি মেয়ের বদলে ছেলের কথা জিজ্ঞেস করতাম, ও ধরে নিত আমাকে জিম্মি করা হয়েছে। প্রথমে আপনাকে গুলি করত, তারপর বাকি তিন গার্ডকে খবর দিত।'

'আপনি এই পরিবেশে মানুষ হয়েছেন?'

হেসে উঠল তৃষা। 'ওহ্ মাই হেভেন্স, নো! আমার ছোটবেলায় সিকিউরিটির কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। মা মারা যান আমার দশ বছর বয়সে। বাবা নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তাই মায়ের বান্ধবী খুশি আন্টির কাছে নিউ ইয়র্কে পাঠিয়ে দেয়া হয় আমাকে। ওখানেই আমি বড় হয়েছি। পরে খুশি আন্টির ডিভোর্স হয়ে যায়, সেটা অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ।'

বড়সড় একটা দোতলা বাড়ির সামনে বৃত্তাকার গাড়ি-বারান্দায় জাগুয়ার থামাল তৃষা, ফ্রন্ট পোর্চ-এ কয়েক সারি লম্বা প্রাচীন পাথুরে পিলার দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে নেমে তৃষার পিছু নিয়ে সিঁড়ির ধাপ টপকাল রানা, থামল প্রকাণ্ড একটা কাঠের দরজার সামনে।

হাতের মুঠো খুলে একটা চাবি দেখাল তৃষা, তারপর ডোরবেলের বোতামে চাপ দিল। 'তালা খুলে নিজেই ঢুকতে পারি, তবে ফাহিম চাচাকে চমকে দিতে চাই না।'

আধ মিনিট পর এক ভদ্রলোক দরজা খুললেন। বয়স হবে ষাট, প্রায় পুরো মাথা জুড়েই চকচকে টাক। ডোরাকাটা শার্ট আর বো টাই-এর সঙ্গে একটা ভেস্ট পরে আছেন। মাথার দু'পাশে সামান্য কিছু চুল যা আছে, সব পাকা। কালো চোখ দুটো ধ্যানমগ্ন কোন সাধু বা দরবেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। চোখের নিচে পুঁটলি তৈরি হয়েছে, মুখও একটু লালচে—রানার সন্দেহ হলো, ভদ্রলোক নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করেন।

তৃষাকে দেখে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর চোখ-মুখ। 'আয়, মা, আয়!' তৃষার হাত ধরে ভেতরে টেনে নিলেন। হঠাৎই যেন দপ করে নিভে গেল তাঁর হাসি, চোখে শোক ও বিষাদের ছায়া ফুটে উঠল। 'সিরাজ নেই, এ আমি এখনও ভাবতেই পারছি না। সে কি সত্যি তোর চোখের সামনে মারা গেছে?'

'হ্যাঁ, চাচা,' ফিসফিস করল তৃষা, ভদ্রলোকের দুই কাঁধে হাত রেখে তাঁর বুকে কপাল ঠেকাল। 'আপনি ছাড়া আমার আর কেউ রইল না।'

'প্রথমে সিরাজ, তারপর তোর খুশি আন্টি। এ আমি কি করে মেনে নিই! জানতাম শত্রু আছে, কিন্তু এ-ও জানতাম যে সিরাজকে রক্ষা করার লোকও আছে। তাছাড়া, একটা অভয় সবসময় ফিল করতাম—এই পৃথিবীকে অনেক কিছু দেয়ার আছে সিরাজের, কাজেই যতই ভয় দেখাক, সত্যি সত্যি কেউ তাকে মেরে ফেলবে না।'

মনে মনে একটা নোট রাখল রানা, ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতে হবে, এই শত্রু কারা? তৃষা পরিচয় করিয়ে দিতে বাড়ানো হাতটা ধরে ঝাঁকাল ও। হাত ধরার ভঙ্গি যতটা দৃঢ় হলে পছন্দ করে, ততটা নয়; তবে ভদ্রলোককে অমায়িক ও আন্তরিক বলেই মনে হলো ওর।

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' ডক্টর ফিরোজ ফাহিম বললেন। 'টেলিফোনে তৃষা আপনার সম্পর্কে সব কথাই বলেছে। ওকে আপনি একবার নয়, দু'বার বাঁচিয়েছেন—সত্যি আমরা আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকলাম।'

'আমার একটাই দুঃখ,' ম্লান সুরে বলল রানা। 'ডক্টর ইসলামকে বাঁচাতে পারলাম না।'

শোকে ম্লান, তৃষার মাথায় একটা হাত রাখলেন ডক্টর ফিরোজ ফাহিম। 'আর তোর খুশি আন্টি। কী আশ্চর্য একটা প্রাণবন্ত মানুষ। কিন্তু তাঁকে কেন?'

'আমি আমার আরেকটা মাকে হারালাম।' তৃষার চোখ-মুখ দেখে সন্দেহ হলো সে কেঁদে ফেলবে।

মৃত্যুর প্রসঙ্গ থেকে ওদেরকে সরিয়ে আনার জন্যে রানা তাড়াতাড়ি বলল, 'তৃষা বলছিল ওর বাবার সঙ্গে আপনার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল।'

ইঙ্গিতে ওদেরকে ভেতরে ঢোকার আহ্বান জানালেন ডক্টর ফাহিম। 'হ্যাঁ, যতটুকু ঘনিষ্ঠতা হওয়া সম্ভব। চল্লিশ বছরের সংস্পর্শ ও বন্ধুত্বকে আপনি আর কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? বুদ্ধির বিচারে তাঁর সমতুল্য মানুষ আমি আমার জীবনে আর একটিও দেখিনি। একই যুগে জন্মালে সিরাজের সঙ্গে আইনস্টাইনের তুমুল প্রতিযোগিতা হত, এ আমি খুব জোর দিয়ে বলতে পারি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'খুরশিদাও তাঁর যোগ্য স্ত্রীই হতেন। প্লেন আর আকাশকে অতটা ভাল না বাসলে তিনিও একজন ফার্স্ট-রেট সায়ান্টিস্ট হতে পারতেন।'

সাজানো-গোছানো একটা লিভিং রুমে ঢুকল ওরা, সমস্ত ফার্নিচার ভিক্টোরিয়ান। ডক্টর ফাহিম নিজেই ওদেরকে কফি বানিয়ে খাওয়ালেন, তবে নিজের জন্যে সরু একটা গ্লাসে খানিকটা ওয়াইন ঢাললেন। 'অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে আমার,' বললেন তিনি। 'তৃষার বাড়িতে তৃষাকেই আমি আপ্যায়িত করছি।'

'ওই খামারবাড়ি নিয়ে কি করা হবে তা যতদিন না ঠিক করি, এই ব্যবস্থাই বহাল থাকবে,' বলল তৃষা। 'ফাহিম চাচা, বরাবর যেমন মনে করেছেন, এখনও এটাকে নিজের বাড়ি বলে মনে করবেন, প্লীজ।'

'আপনি কি বলতে পারবেন,' কফির কাপে চুমুক দিয়ে কাজের কথা পাড়ল রানা, 'ডক্টর ফাহিম, মারা যাবার আগে কি নিয়ে কাজ করছিলেন ডক্টর ইসলাম?'

তৃষার দিকে তাকালেন ডক্টর ফাহিম। তাকে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বললেন, 'তাঁর বড় প্রজেক্টটা ছিল নিখুঁত ও বিশ্বস্ত একটা ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিনের ডিজাইন তৈরি করা, তারপর এঞ্জিনটার উন্নতি ঘটানো।' থেমে সরাসরি রানার চোখে চোখ রাখলেন। 'তৃষা তো বোধহয় এ-সম্পর্কে আপনাকে আগেই সব বলেছে, তাই না?'

'তা বলেছেন,' স্বীকার করল রানা, ক্ষীণ সন্দেহ হলো ভদ্রলোক ওর কাছে কিছু একটা গোপন করছেন। 'তবে একজন বিজ্ঞানীর মুখে শুনলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার বুঝতে পারব আমি। এটুকু জানি যে ওয়াটার লিলির এঞ্জিন ডক্টর ইসলামের ডিজাইন ধরেই তৈরি করা হয়েছিল। এখন আমি জানতে চাইছি, এই এঞ্জিন তৈরিতে ডক্টর ইসলামের কনট্রিবিউশন কতটুকু ছিল।

ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিন নিয়ে তো আজ নতুন নয়, বিশ বছর ধরেই গবেষণা চলছে। এই একই প্রপালশান প্রিন্সিপল ব্যবহার করে জাপানিরা একটা জাহাজ বানিয়েছিল।'

'তা ঠিক, তবে সেটা খুব একটা কাজের জিনিস হয়নি। জাহাজটার স্পীড এত কম যে কমার্শিয়ালি ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। প্রায় জাদুই বলতে হবে, ডক্টর সিরাজ পাওয়ার-এর এমন একটা উৎস আবিষ্কার করেন, ম্যারিটাইম প্রপালশান জগতে যেটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। মাত্র দু'বছরের কিছু বেশি সময় নিয়ে এঞ্জিনটার ডিজাইন তৈরি করেন তিনি। এটাকে বিস্ময়কর একটা অ্যাচিভমেন্ট বলতে হবে, যেহেতু যা করার সব তিনি একাই করেছেন। রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্টের জন্যে স্বাভাবিক সময় লাগা উচিত ছিল অন্তত এক যুগ, অথচ সিরাজ একটা ওয়ার্কিং মডেল তৈরি করতে সময় নেন মাত্র পাঁচ মাস। তাঁর এক্সপেরিমেন্টাল ইউনিটগুলো ছিল যে-কোন এমএইচডি টেকনোলজির চেয়ে উন্নতমানের।'

'রানাকে আমি বলেছি বাবার এঞ্জিন কিভাবে জ্বালানির উৎস হিসেবে সী ওয়াটার ব্যবহার করতে পারে। প্রথমে একটা এনার্জি সোর্স ক্রিয়েট করা হয়, থ্রাস্টার-এর ভেতর দিয়ে পানি পাম্প করার জন্যে।'

'আইডিয়া আর ডিজাইন বৈপ্লবিক হলেও,' তৃষা থামতে আবার শুরু করলেন ডক্টর ফাহিম, 'প্রথম দিককার এঞ্জিনগুলো ঠিকমত কাজ করেনি, ফ্রিকশান বিল্ডআপ-এর মাত্রা ছাড়ানো হাই রেটের কারণে পুড়ে যাচ্ছিল। সিরাজ তখন সিঙ্গাপুরে গা-ঢাকা দিয়ে কাজ করছেন। গোপনে খবর পাঠাতে আমি গেলাম অ্যাসিস্ট করতে। তিনি তেলের এমন একটা নতুন ফর্মুলা বের করলেন যেটা এক্সট্রিম হীট ও ফ্রিকশানেও ভেঙে পড়বে না। ম্যারিটাইম এঞ্জিনের জগতে এই ফর্মুলা নতুন একটা দরজা খুলে দিল–ওগুলো না ভেঙে অনির্দিষ্টকাল অপারেট করতে পারবে।'

'তারমানে আপনারা দু'জন মিলে একটা সুপার অয়েল ডেভলপ করেছেন?' বলল রানা।

'না, এই আবিষ্কারে আমার কোন অবদান ছিল না, আমি শুধু তাঁকে উৎসাহ আর সামান্য শ্রম দিয়েছি।'

'ইন্টারনল কমবাশ্চান এঞ্জিনে ব্যবহার করা হলে, এ থেকে কি কি সুবিধে পাওয়া যাবে?'

'থিওরি বলে, একটা অটোমোবাইল এঞ্জিন আপনি ইন্টারনল ওয়ার্কিংস্ মেরামত করা ছাড়াই বিশ লাখ মাইল চালাতে পারবেন,' শান্ত-স্বাভাবিক সুরে ব্যাখ্যা করছেন ডক্টর ফাহিম। 'হেভি ডিউটি ডিজেল এঞ্জিন ভালভাবে অপারেট করা যাবে, এই ধরুন, এক কোটি মাইল। বিশেষভাবে উপকৃত হবে এয়ারক্রাফট জেট এঞ্জিন, ওগুলোর আয়ু তো বাড়বেই, মেরামতও অনেক কম লাগবে। একই কথা ফর্কলিফট থেকে শুরু করে আর্থমুভার পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভেহিকেল সম্পর্কেও।'

'আর বোট ও শিপ প্রপালশান ইউনিট তো আছেই, না?'

'মুভিং পার্টস-এর ওপর নির্ভর করে না, এনার্জির জন্যে যতদিন এরকম নতুন টেকনোলজি নিখুঁত করা না হচ্ছে,' বললেন ডক্টর ফাহিম, 'ততদিন সিরাজের ফর্মুলা লুব্রিকেশন-এর প্রয়োজনে তেলের ওপর নির্ভর করে এমন সমস্ত মেকানিক্যাল পাওয়ার সোর্সের জন্যে বিরাট আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য হবে। আমরা, আমি আর সিরাজ, ঠাট্টা করে এই ফর্মুলার নাম দিয়েছিলাম স্লীক সিক্সটি-সিক্স।'

'উৎপাদন ও পরিশোধনের জন্যে কি রকম খরচ পড়বে?'

'বললে বিশ্বাস করবেন এক গ্যালন নরম্যাল মোটর অয়েলের চেয়ে মাত্র তিন সেন্ট বেশি?'

'কোন সন্দেহ নেই, আপনাদের এই ফর্মুলা তেল-কোম্পানিগুলোর মাথায় হেভি ডাণ্ডা মারবে। সহজ হিসাবেই বলে দেয়া যায়, একশো কোটি ডলার লোকসান দেবে তারা। বিশ বছরে হয়তো এক ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। অবশ্য আপনাদের এই ফুর্মলা কিনে নিতে পারে তারা, তারপর নিজেরাই মার্কেটে ছাড়তে পারে।'

ডক্টর ফাহিম ধীরভঙ্গিতে মাথা নাড়ছেন। 'এরকম কখনোই ঘটবে না,' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে, সিদ্ধান্ত ঘোষণার ভঙ্গিতে বললেন তিনি। 'সিরাজ কখনোই এ থেকে পয়সা পেতে চাননি। প্রথমে বাংলাদেশকে, তারপর গোটা দুনিয়াকে বিনামূল্যে তিনি তাঁর এই ফর্মুলা উপহার দিতে যাচ্ছিলেন, কোন শর্ত ব্যতিরেকেই।'

'ফরমুলাটা পেটেন্ট করা হয়নি বলে শুনেছি, ইচ্ছে করলে এটা থেকে আপনারা প্রচুর টাকা আয় করতে পারেন।'

'তৃষা তো অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছে যে ওর বাবার আবিষ্কার থেকে একটা পয়সাও নেবে না সে। আর আমার বয়স পঁয়ষট্টি, মিস্টার রানা। জীবনে বিয়ে করিনি, কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনও নেই। আমার ডায়াবেটিস, অ্যাকিউট আর্থ্রাইটিস, একটা আয়রন-ওভারলোড ডিজিজ-নাম হলো, হেমোক্রোমাইটোসিস–এবং ক্যানসার হয়েছে প্যানক্রিয়াস ও লিভার, দুটোতেই। আজ থেকে পাঁচ বছর পর দুনিয়ার বুকে হেঁটে বেড়াতে পারলে নিজেকে মহা সৌভাগ্যবান একজন বলে মনে করব। এখন আপনিই বলুন বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার কি কাজে আসবে আমার?'

'ফাহিম চাচা!' তৃষার প্রায় মুষড়ে পড়ার অবস্থা। 'আপনি কখনও জানাননি...'

ঝুঁকে তৃষার হাত চাপড়ে দিলেন ডক্টর ফাহিম। 'তোর বাপকেও জানতে দিইনি, রে। তোরাই তো আমার আপনজন, তাই কষ্ট পাবি জেনে এতদিন বলিনি। এখন বলছি, আর কিছু আসে যায় না বলে।' হাত বাড়িয়ে ওয়াইনের বোতলটা তুলে নিলেন। 'তোরা কি কিছু খাবি? আরও কফি দেব?'

'না।' তৃষার চেহারায় রাগ। 'আমরা তোমার কাছে কিছু খেতে আসিনি।'

প্রসঙ্গ পাল্টে রানা বলল, 'বাইরে দেখলাম সিকিউরিটি খুব কড়া।'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর ফাহিম। 'সিরাজ আর আমাকে এখানে সবসময় হুমকির মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। ল্যাবরেটরি ভেঙে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয়ায়

এক চোর একবার আমার একটা পা ভেঙে দিয়েছিল।'

'চোর আপনাদের ফর্মুলা চুরি করতে এসেছিল?'

'আমাদের ফর্মুলা নয়। সিরাজের ফর্মুলা। আর সেই চোরও সাধারণ চোর ছিল না, হামলাটাও একবার হয়ে থেমে যায়নি। আসলে বহুবিধ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত একটা গ্রুপ অভ কোম্পানিজ, কয়েকশো শাখা নিয়ে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় করপরেশনগুলোর একটা, আমাদের পরম শত্রু হয়ে উঠেছিল।'

'কারা তারা?'

'এই করপরেশনেই চাকরি করতাম আমরা, সিরাজ ও আমি। গ্রুপ অভ কোম্পানিজ-এর ডিরেক্টর লীফ এরকুল-এর সঙ্গে সিরাজের চুক্তি হলো, ওদের ল্যাবরেটরিতে বসে একের পর এক বিভিন্ন আবিষ্কারের ফর্মুলা তৈরি করবেন তিনি, সেই ফর্মুলা অনুসারে পণ্য তৈরি করে মার্কেটে ছাড়া হবে, খরচ বাদ দিয়ে যা লাভ হবে তার শতকরা পঁচিশ ভাগ রয়্যালিটি পাবেন তিনি; ওখানে আমি তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করব।

'প্রথম তিন বছরে ছয়টা ফর্মুলা দেন ডক্টর সিরাজ। করপরেশন লাভ করে দেড়শো বিলিয়ন ডলার। সেই শুরু হলো চুক্তিভঙ্গের ঘটনা। ব্যাপারটা প্রথমে আমি টের পাই। সিরাজকে দেয়ার কথা লাভের শতকরা পঁচিশ ভাগ, অথচ দিচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ ভাগের কিছু বেশি। সিরাজ এতটাই নির্বিরোধী মানুষ ছিলেন, তাঁকে ঠকানো হচ্ছে বলবার পরও তিনি এ বিষয়ে করপরেশনের সঙ্গে কোন বিরোধে জড়াতে রাজি হলেন না। এরকুল ঠকানোর পরও যা আসছিল সেটাকে কম বলা যায় না। তাছাড়া, প্রতি মাসে মোটা বেতন তো আমরা পাচ্ছিলামই। তবে ন্যায্য পাওনা থেকে সিরাজের এই বঞ্চিত হওয়াটা আমি কখনোই মেনে নিতে পারিনি। অবশ্য সিরাজ প্রতিবাদ না করার সিদ্ধান্ত নেয়ায় আমার কিছু করবারও ছিল না।

'পরে বুঝেছিলাম কেন সিরাজ কোন ঝামেলায় জড়াতে চাননি। কোন বিতর্কে জড়ানো মানেই তো সময় নষ্ট। আর এই নষ্ট করার সময়ই তাঁর ছিল না...'

'কি রকম?' জানতে চাইল রানা।

'আমরা অফিস করতাম ন'টা-পাঁচটা,' বললেন ডক্টর ফাহিম। 'বাড়িতে ফিরে এসে একটু বিশ্রাম নেয়ার পর শুরু হত ডক্টর সিরাজের ব্যক্তিগত গবেষণা। কখনও আমি তাঁকে সাহায্য করার সুযোগ পেতাম, কখনও বন্ধ দরজার বাইরে থেকে ডেকেও তাঁর কোন সাড়া পেতাম না–নিজের গবেষণায় এতই মগ্ন থাকতেন...'

'কি নিয়ে গবেষণা করছিলেন ডক্টর ইসলাম?' রানার প্রশ্ন।

'এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন ধারণা দেয়া সত্যি কঠিন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল দু'চারটে নয়, অসংখ্য। ভূমণ্ডলের অনেক ওপরে, বস্তু যেখানে ভেসে থাকবে, সেখানে এমন একটা বনভূমি তৈরির স্বপ্ন দেখতেন, যে বনভূমি আমাদের এই গ্রহটাকে ছায়া ও অক্সিজেন দেবে, সেই সঙ্গে ওজোন স্তর ধ্বংসের প্রক্রিয়া যেটা শুরু হয়েছে সেটা থামাবে, ঠেকিয়ে দেবে সূর্যের ক্ষতিকর সমস্ত রশ্মিকে। তাঁর আরেকটা বিষয় ছিল–ট্র্যান্সপোর্টেশন। আর তেল বা জ্বালানি নিয়ে গবেষণা তো

ছিলই। এক পর্যায়ে সিরাজ একাই সময় কাটাতেন ল্যাবে। আমাকে শুধু বলতেন, দুনিয়াকে চমকে দেয়ার মত একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

'এভাবে পাঁচ বছর কাটল। তারপর, যেভাবেই হোক, লীফ এরকুল জানতে পারল ডক্টর সিরাজ ব্যক্তিগতভাবে নিজের ল্যাবে গবেষণা করছেন এবং যুগান্তকারী কিছু একটা আবিষ্কার করতে যাচ্ছেন। এ-ব্যাপারে ডক্টর সিরাজকে প্রশ্ন করে সে। তিনি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, বাধ্য হয়ে গবেষণার বিষয় সম্পর্কে এরকুলকে একটা ধারণা দেন। ওটা ছিল ওই ম্যাগনিটো-হাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিনের ডিজাইন, আর ফুয়েল হিসেবে সীওয়াটার ব্যবহার করার আইডিয়া।

'এই এঞ্জিনের ডিজাইন আর ফুয়েলের আইডিয়ার কথা শুনে লীফ এরকুলের মাথা খারাপ হয়ে যায়। ডক্টর সিরাজকে অঢেল টাকার লোভ দেখাল সে, বিনিময়ে এঞ্জিনের ডিজাইন আর ফুয়েলের ফর্মুলা বা আইডিয়ার স্বত্ব লিখে দিতে হবে তাকে। ডক্টর সিরাজ এতে রাজি হলেন না, বরং মুখের ওপর বলে দিলেন, "তুমি গত প্রায় দশ বছর ধরে আমাকে ঠকাচ্ছ, কাজেই তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া, আমার ব্যক্তিগত কোন আবিষ্কার নিয়ে কাউকেই ব্যবসা করতে দেয়া হবে না–এমন কি নিজেকেও আমি সে অনুমতি দেব না। আমার সমস্ত আবিষ্কার প্রথমে পাবে আমার জন্মভূমি। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ প্রাচুর্যের মুখ দেখার পর আবিষ্কারগুলোর সুবিধে ভোগ করবে এই গ্রহের সমস্ত মানুষ, প্রতিটি দেশ।" এ-সব কথা শুনে উন্মাদ হয়ে উঠল লীফ এরকুল। চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ এনে নিজের হাতে আইন তুলে নিল সে, বন্দি করল ডক্টর সিরাজকে...'

'বাকিটুকু আমি জানি,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'ডক্টর ইসলাম তাঁর মনের ইচ্ছে পূরণও করেছেন। বন্দি অবস্থা থেকে কোন এক সুযোগে ই-মেইলের মাধ্যমে জটিল সব অঙ্ক; বিচিত্র সব গ্রাফ, নকশা ও ডায়াগ্রাম; অদ্ভুত আকৃতির সাংকেতিক চিহ্ন; বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন বইয়ের রেফারেন্স ইত্যাদি বাংলাদেশে পাঠান তিনি। এ-সব কমপিউটর প্রিন্টারে প্রিন্ট করার পর পঁচিশ পাতা হলো। সবই দুর্বোধ্য, আমাদের বিজ্ঞানীরা কোন অর্থই বের করতে পারল না। ডক্টর ইসলাম একটা চিঠিও লিখেছিলেন, সেটার ভাষা ছিল সহজ ইংরেজি। তাতে তিনি বলেন, প্রথম পঁচিশ পাতায় রয়েছে তাঁর নিজের এমন সব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফর্মুলা যার কোড ভাঙতে বাংলাদেশের একশো বছর লাগবে। তবে একশো বছর সময়সীমা বিশ বছরে কমিয়ে আনার উপায়ও তিনি ওই চিঠিতে বাতলে দেন। প্রথমে সতেরো নম্বর পাতার শেষ প্যারাটার কোড ভাঙতে হবে। তাঁর হিসাবে, বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের এতে সময় লাগবে দশ বছর। এটা ভাঙতে পারলে পঁচিশ পাতার বাকিটুকু অনুবাদ করতে লাগবে আরও দশ বছর।

'যাই হোক, চিঠিতে ডক্টর ইসলাম জানিয়েছিলেন যে তাঁকে টেক্সাসের ওডেসার কাছে চারশো বালিয়াড়ির মাঝখানে এক পাথুরে গুহায় বন্দি করে রাখা হয়েছে। বিসিআই অভিযান চালিয়ে কোবরা ক্লাব নামে মার্সেনারিদের একটা গ্রুপের হাত থেকে তাঁকে মুক্ত করে। ওই অভিযানে আমিই নেতৃত্ব দিই। কিন্তু মুক্ত হবার পর আমাকে না জানিয়ে একটা হেলিকপ্টার নিয়ে অজ্ঞাত কোন

জায়গায় চলে যান ডক্টর সিরাজ। অবশ্য একটা চিঠি রেখে গিয়েছিলেন।'

'এই চিঠিটার কথা তো আপনি আমাকে বলেননি! এ-ও বলেননি যে বাংলাদেশ থেকে আপনি নিজে বাবাকে উদ্ধার করার জন্যে টেক্সাসে এসেছিলেন।'

'সময় পেলাম কখন যে বলব।' ক্ষীণ হাসি রানার ঠোঁটে। 'তো যা বলছিলাম। এই চিঠিটায় ডক্টর ইসলাম নিজের এই অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যা দেন। তারপর লেখেন, তাঁর সাংকেতিক মেসেজের সতেরো নম্বর পাতার শেষ প্যারার কোড ভাঙা অনেক সহজ হয়ে যাবে যদি কোন সাইফার বিশেষজ্ঞ রবি ঠাকুরের সঞ্চিতার বসুন্ধরা কবিতাটির বিশেষ একটা অংশের অক্ষরগুলোকে কী বা চাবি হিসেবে ব্যবহার করেন। তবে এ-সব অতীত প্রসঙ্গ, সমাধান পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে। বর্তমান দাবি করে সমস্যাটার ধরন আর গভীরতা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা। ডক্টর ফাহিম, আপনি কি বিশ্বাস করেন ফ্যালকন করপরেশনের মালিক লীফ এরকুল বন্দি করেছিল ডক্টর সিরাজকে? কোবরা ক্লাবের মার্সেনারি সদস্যরা তারই ভাড়াটে খুনী ছিল? তারাই ওয়াটার লিলিতে ডক্টর সিরাজ আর তৃষাকে খুন করতে চেষ্টা করে?'

'হ্যাঁ, আমার তাই ধারণা। লীফ এরকুল ছাড়া আর কে এমন জঘন্য ক্রাইম করতে পারে!'

'এরকম একটা জায়ান্ট আমেরিকান করপরেশন শুধু লাভের জন্যে পাইকারি হারে খুন পর্যন্ত করতে চাইছে, এ সত্যি বড় ভয়ংকর কথা।'

'ফ্যালকনের আশি ভাগ শেয়ারহোল্ডারের মালিক লীফ এরকুল একজন প্রভাবশালী সিনেটর, দুনিয়ার অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ ধনী, শোনা যাচ্ছে তিন বছর পর আগামী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করবে। বিশ্বাস করুন, এই লোককে শয়তানের সঙ্গে তুলনা করলে শয়তানকে রীতিমত অসম্মান করা হয়। আমি আপনাকে এমন বহু লোকের তালিকা দিতে পারি যারা কোন না কোনভাবে ফ্যালকন করপরেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, এবং যে-কোন অজ্ঞাত কারণেই হোক হয় নিখোঁজ হয়ে গেছে নয়তো তাদের লাশ পাওয়া গেছে। লাশ পাওয়ার প্রতিটি ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলে চালানো হয়েছে, বেশিরভাগই আত্মহত্যা।'

'কিন্তু এটাও খুব আশ্চর্য নয় কি যে সরকার তাদের ক্রিমিন্যাল অপারেশনগুলো ইনভেস্টিগেট করেনি?'

'প্রতিটি রাজ্য ও ফেডারেল সরকারে ফ্যালকনের নিজস্ব লোক আছে। ছোটখাট একজন কর্মকর্তাকে নিজেদের কাজ করানোর জন্যে এক মিলিয়ন ডলার দিতে এতটুকু দ্বিধা করে না তারা, বিনিময়ে তার কাছ থেকে গোপন ও গুরুত্বপুর্ণ তথ্য আদায় করতেও ছাড়ে না। যে-কোন রাজনীতিক ফ্যালকনের স্বার্থে কাজ করতে রাজি হলে রাতারাতি ধনী বনে যায়, উপরি পাওনা বিদেশী অ্যাকাউন্টে মোটা টাকা রাজনীতি থেকে অবসর নেয়ার পর।

'ফ্যালকনের পক্ষে কাজ করছে এমন কোন লোক পুলিশের ইনফর্মার হয়ে গেল বা হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল সৎ হয়ে যাবে, এমনটি কখনও ঘটেনি, কখনও ঘটবেও না। নিজেদের নোংরা কাজ যাতে প্রকাশ না পায় তার জন্যে বিশেষ প্রোগ্রাম আছে ফ্যালকনের। ইনফর্মারের আপনজনদের শারীরিক ক্ষতি করার হুমকি দেয়া

স্বামী-স্ত্রী, ছেলে বা মেয়ের হাত বা পা ভেঙে যেতে পারে, দেখে মনে হবে ব্যাপারটা নেহাতই দুর্ঘটনা ছিল। এতেও যদি ইনফর্মার লাইনে না আসে বা চুপ না করে, আপনজনদের কেউ মারা যাবে–আত্মহত্যা করে। কিংবা প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে কেউ গায়ে সুই ঢুকিয়ে দিল, কোন মারাত্মক সংক্রামক রোগে মারা যাবে। আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন, নিউজ মিডিয়ার কত তদন্ত নিউজপেপারের বা টেলিভিশন নেটওঅর্ক-এর মালিকদের সঙ্গে ফ্যালকন ডিরেক্টরদের মীটিঙের পর বাতিল হয়ে গেছে। এদের মধ্যে এক ভদ্রলোক ফ্যালকনের দু'জন ডিরেক্টরকে নিজের অফিস থেকে বের করে দেন, তবে পরে নতি স্বীকার করে তদন্ত বাতিল করতে রাজি হন–নিজের মেয়েকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করছে, এই খবর পেয়ে। বিশ্বাস করুন, মিস্টার রানা, এরা ভয়ংকর প্রাণী।'

'কোবরা ক্লাবের সঙ্গে ফ্যালকনের কি সম্পর্ক?'

'কোবরা ক্লাব আসলে লীফ এরকুলের নিজের গোপন একটা সংগঠন। সিনেটর নিজে সেনাবাহিনীতে ছিল, জানেন নিশ্চয়। বেছে বেছে বদরাগী, হিংস্র, বিবেক-বর্জিত খুনী একদল মার্সেনারিকে নিয়ে এই ক্লাবটা গড়ে তোলা হয়েছে। একমাত্র এরকুলের নির্দেশ মেনে চলে তারা। এই তথ্যটা আমি জেনেছিলাম আমার এক পুরানো বন্ধুর কাছ থেকে, সে আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল যে এরকুলের মার্ডার লিস্টে ডক্টর সিরাজ আর আমার নামও আছে।'

'আপনার সেই পুরানো বন্ধু এখন কোথায়?'

'সে গায়েব হয়ে গেছে,' এমন তিক্ত সুরে বললেন ডক্টর ফাহিম, যেন এ বিষয়ে আলাপ করে আর কোন লাভ নেই।

'ফ্যালকনে যারা চাকরি করে, তারা কেমন মানুষ?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বিশ-ত্রিশ হাজার কর্মচারী নিশ্চয়ই চোখ বন্ধ করে কাজ করে না। তারা সবাই অসৎ? বা অপরাধ হতে দেখেও মুখ বুজে থাকে?'

'কোনও কর্মচারী ফ্যালকনে যেদিন থেকে কাজ শুরু করে, তার জগৎ প্রায় রাতারাতি সম্পূর্ণ বদলে যায়। এ যেন অনেকটা কোন কাল্ট-এ নাম লেখানো। ফ্যালকন নিজের একটা আদর্শ বা দর্শন প্রথমেই কর্মচারীদের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়–কোন রাষ্ট্র বা পরাশক্তি নয়, একটি করপরেশন দুনিয়া শাসনের দায়িত্ব পালন করবে, আর সেই করপরেশনের নাম ফ্যালকন। কর্মচারীরা হপ্তায় ছুটি পায় তিন দিন, কাজ করে চারদিন। বছর শেষে মোটা অঙ্কের কয়েকটা করে বোনাস। নিজেদের অজ্ঞাতে ক্রীতদাসে পরিণত হয় তারা।'

'ইউনিয়নগুলো কি করে? ওগুলোর সঙ্গে গোলমাল বাধে না?'

'কোন ইউনিয়নই ফ্যালকনে দাঁত বসাতে পারেনি। ইউনিয়ন কর্মকর্তারা আপিল করলে একটা কথা তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে দেয়া হয় যে কেউ যদি ইউনিয়ন করে তার চাকরি যাবে না, তবে সবগুলো বোনাস আর ফ্রিঞ্জ বেনিফিট থেকে বঞ্চিত হবে সে। আপনিই বলুন, কে ইউনিয়ন করতে চাইবে? পুরানো কোন কর্মচারী মারা গেলে বা অবসর নিলে চাকরিটা সাধারণত তার ছেলে অথবা মেয়ে পাবে; এবার কল্পনা করুন কোম্পানির ইনফ্র্যাস্ট্রাক্টচার ভাঙা কতটা কঠিন। সাধারণ কর্মচারীদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে জানানো হয় লীফ এরকুল একজন

মহামানব, নিজের কর্মচারীদের তিনি নিজ সন্তানদের চেয়ে কম ভালবাসেন না। তাদের ধারণা, ফ্যালকন কর্তৃপক্ষ কোন অপরাধ করতে পারে না।'

'এটা কিভাবে সম্ভব হলো, কোম্পানি ছেড়ে চলে আসার পরও বেশ ক'বছর ডক্টর সিরাজ আর আপনি বেঁচে থাকলেন?'

ডক্টর ফাহিম এই প্রথম একটু হাসলেন। 'ভাল প্রশ্ন করেছেন। আমার ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা, আমাকে ওরা কখনোই খুন করার চেষ্টা করেনি। তবে ডক্টর সিরাজের ব্যাপারটা আমি যতটুকু বুঝি, সেটা বলি। তাঁর ওপর নজর রাখার ও তাঁর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব যার ওপর ছিল সে ইচ্ছে করে এতদিন তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, এই আশায় যে সুযোগ পেলে দুনিয়ার মানুষকে চমকে দেয়ার মত আবিষ্কারের ফর্মুলাটা চুরি করবে। শুধু এই আবিষ্কারটা নয়, ওরা আমাদের তেলের ফর্মুলা আর ডক্টর সিরাজের ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিনের ডিজাইনও চুরি করার মতলবে ছিল...'

'কিন্তু তেলের ফর্মুলা বা এঞ্জিনের ডিজাইন, দুটোর একটাও চুরি করতে পারেনি ওরা,' বলল রানা। 'অথচ ডক্টর ইসলামের এঞ্জিন পারফেক্ট করে ওয়াটার লিলিতে ফিট করার পর সেটাকে ওরা ডুবিয়ে দিল। কেন?'

'এর পিছনে একটাই কারণ কাজ করেছে। ডক্টর সিরাজের তৈরি এঞ্জিন নিরাপদ নয়, ঠিকমত কাজই করছে না, এটা প্রমাণ করা। এই ডিজাইনের এঞ্জিন নিয়ে আর যে-সব কোম্পানি জাহাজ তৈরি করছে তারা যাতে ভয় পেয়ে নিজেদের প্রজেক্ট বাতিল করে দেয়। তখন ওই ফর্মুলা আর ডিজাইন পেটেন্ট করিয়ে নিতে পারবে ফ্যালকন। ওগুলো ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই তাদের হাতেও পৌঁছে গেছে।'

'কিন্তু আগুনটা তো এঞ্জিন রুম থেকে শুরু হয়নি।'

'তাই নাকি?' ডক্টর ফাহিমকে বিমূঢ় দেখাল। 'আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতে হবে জাহাজ পোড়ানোর অপারেশনটা ওরা ঠিকমত চালাতে পারেনি, কোথাও কিছু একটা গোলমাল করে ফেলেছিল। তবে এ স্রেফ আমার ধারণা...'

'সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ একটা ধারণা,' বলল রানা। 'আমরা জাহাজের চ্যাপেলে ইনসেনডিয়ারি ডিভাইস পেয়েছি, ক্রুরা জানিয়েছে ওখানেই প্রথমে আগুনটা লাগে। প্ল্যানটা সম্ভবত এরকম ছিল যে নির্দিষ্ট সময়ে এক এক করে অনেকগুলো জায়গায় আগুন ধরবে—শুরু হবে এঞ্জিন রুমে, আপার ডেক হয়ে উঠে আসবে, তারপর সবশেষে ধরানো হবে চ্যাপেলে। কিন্তু আপনি যেমন বলছেন, কোথাও কিছু গোলমাল করে ফেলে ওরা।'

ডক্টর ফাহিম গলা নামিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'আমি এখন এমারেল্ড মার্লিন-এর কথা ভাবছি। ওরা ওটাকেও ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে না তো?'

'নতুন লাকজারি সাবমেরিন? আন্ডারওয়াটার ক্রুজ শিপ হিসেবে যেটার ডিজাইন করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আজ থেকে দু'দিন পর ওটা প্রথম যাত্রায় বেরুবে।'

'ওটাকে নিয়ে আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন?' জানতে চাইল তৃষা।

মুখ তুলে তার দিকে তাকালেন ডক্টর ফাহিম। 'তুই জানিস না?'

'কি জানবেন উনি?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা।

'এমারেল্ড মার্লিন-এর মালিকও লং লেলাং ক্রুজ লাইনস্। ডক্টর সিরাজের ডেভলপ করা এঞ্জিন ওটাতেও ফিট করা হয়েছে।'

আঠারো

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে সতর্ক করল রানা। নুমা চীফও সময় নষ্ট না করে জিনি টেইলর এয়ারফিল্ডে একটা জেট প্লেন পাঠিয়ে দিলেন। নদীর তীর ঘেঁষা ফিরতি পথে তৃষা এবার তার জাগুয়ার আরও জোরে ছোটাল, পৌঁছালও জেটটা ল্যান্ড করার কয়েক মিনিট আগে। রানার কোন যুক্তিই হালে পানি পেল না, 'দেখবেন আমি অনেক কাজে আসব,' বলে প্লেনে একরকম জোর করেই উঠে বসল সে। পাইলটও দেরি না করে ওদেরকে নিয়ে ওয়াশিংটনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

ল্যাংলি ফিল্ডে ল্যান্ড করে জেটটা থামার পর রানা দেখল বিবি মুরল্যান্ড ও জর্জ রেডক্লিফ টারমাকে অপেক্ষা করছেন। ওরা দু'জন প্লেনে উঠতে আবার রওনা হলো পাইলট, এবার দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে, গন্তব্য ফোর্ট লডারডেল, ফ্লোরিডা; সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে পৌঁছাতে হবে লং লেলাং ক্রুজ লাইন-এর হেডকোয়ার্টারে।

টেলিফোনে আগেই গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছেন রেডক্লিফ, একটা লিংকন টাউন কার; জেট ল্যান্ড করার কয়েক মিনিটের মধ্যে হারবার অভিমুখে ছুটল সেটা, ড্রাইভিং সিটে মুরল্যান্ড।

একটা দ্বীপে, পানির কিনারা ঘেঁষে, ন'শো ফুট উঁচু লং লেলাং হেডকোয়ার্টার। এই ক্রুজ লাইন কোম্পানি শুধু যুক্তরাষ্ট্রে নয়, সিঙ্গাপুর ও মিশর সহ আরও কয়েকটা দেশে জাহাজ তৈরি করে। লং লেলাং-এর পূর্ব-পুরুষরা মূল চীনের অধিবাসী ছিলেন, তবে গত তিন পুরুষ ধরে তারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

দালানটার ডিজাইন করা হয়েছে একটা সেইলবোটের আদলে। বাইরের এলিভেটর প্রকাণ্ড শ্যাফ্‌ট্ থেকে বেরিয়ে একটা মাস্তুলের মত আকাশে উঠে গেছে। দালানের বাকি অংশ, বেশিরভাগটাই কাঁচ দিয়ে মোড়া, যেন বাতাস লেগে ফুলে ওঠা বিশাল একটা পাল। কাঁচের দেয়ালগুলো নীল, শুধু মাঝখানের দেয়ালটা সাদা ফ্যাব্রিক, ঘণ্টায় দেড়শো মাইল ঝড়েও ছিঁড়বে না। দালানের নিচের চল্লিশটা ফ্লোরে ক্রুজ লাইনের অফিস, ওপরের পঞ্চাশটা ফ্লোরে প্যাসেঞ্জারদের জন্যে ফাইভ স্টার হোটেল তৈরি করা হয়েছে, ক্রুজ শিপে ওঠার আগে এখানেই তাদেরকে থাকতে দেয়া হয়।

গাড়ি নিয়ে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলে ঢুকে পড়ল মুরল্যান্ড, পানির নিচে দিয়ে দ্বীপটায় পৌঁছাবে, যেখানে দৈত্যাকার সেইলবোটের আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দালানটা।

গাড়ির দায়িত্ব চেয়ে নিল একজন ভ্যালিট। অনেকগুলো আউটার এলিভেটরের একটায় উঠল ওরা। সাতশো ফুট ওপরে মেইন লবি। লং লেলাং ক্রুজ লাইনের সিইও, অর্থাৎ চীফ এগজিকিউটিভ অফিসার অপেক্ষা করছিলেন। পথ দেখিয়ে ওদেরকে একটা প্রাইভেট এলিভেটরে নিয়ে এলেন তিনি। এলিভেটর ওদেরকে চল্লিশতলায়, হেড অফিসে নামিয়ে আনল। ডেভিড লং লেলাং, ক্রুজ লাইনের প্রেসিডেন্ট, নিজের ডেস্কের পিছন থেকে বেরিয়ে এলেন ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে।

পরিচয় করিয়ে দেয়ার দায়িত্বটা রেডক্লিফ পালন করলেন, সবাই একটা করে চেয়ারে বসল।

'এখন কথা হলো,' বলে একটু থামলেন ডেভিড লেলাং; পূর্ব-পুরুষদের মত খাটো নন তিনি, চুলে পাক ধরলেও শরীর-স্বাস্থ্য আভাস দিচ্ছে কলেজ জীবনে ফুটবল, বা এমনকি হয়তো রাগবিও খেলেছেন; নীলচে চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে রানা, মুরল্যান্ড ও তৃষাকে ছুঁয়ে, স্থির হলো রেডক্লিফের ওপর; 'ব্যাপারটা কি নিয়ে? ফোনে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কথা শুনে মনে হলো তিনি রীতিমত জেদ ধরে বলতে চাইছেন এমারেল্ড মার্লিনের যাত্রা আমরা যেন অবশ্যই বাতিল করি।'

'কারণ আশঙ্কা করা হচ্ছে এই শিপের পরিণতিও ওয়াটার লিলির মত হতে পারে,' জবাব দিলেন রেডক্লিফ।

'এখন পর্যন্ত যতগুলো রিপোর্ট দেখেছি সবগুলোতে বলা হয়েছে ওটা ছিল নেহাতই একটা দুর্ঘটনা,' বললেন ডেভিড লেলাং, চোখেমুখে সংশয়। 'আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটবেই, এটা আমাকে বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়।'

চেয়ার থেকে সামান্য একটু সামনের দিকে ঝুঁকল রানা। 'আমি আপনাকে হানড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, মিস্টার লেলাং, ওয়াটার লিলিতে ইচ্ছে করে আগুন লাগানো হয়েছিল। আমাদের কাছে অকাট্য প্রমাণ আছে, টো করার সময় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওয়াটার লিলির তলা খসিয়ে দেয়া হয়, তা না হলে ওটা ডুবত না।'

'এ-কথা এই প্রথম শুনছি আমি।' হঠাৎ রেগে ওঠায় ডেভিড লেলাং-এর কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। 'যে-সব ইন্সুরেন্স কোম্পানি থেকে ওয়াটার লিলির বীমা করিয়েছি ওগুলোর একটাও আমাকে বা আমার কোন ডিরেক্টরকে জানায়নি যে আগুনটা ইচ্ছে করে ধরানো হয়েছে। আমরা শুধু জানি, যে-কোন কারণেই হোক, ফায়ার ইমার্জেন্সি সিস্টেম ঠিকমত কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। লং লেলাং, অবশ্যই, ওই সিস্টেম যারা সাপ্লাই দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করবে।'

'সেটা একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে, যদি প্রমাণ হয় ফায়ার সিস্টেমও ইচ্ছে করে অকেজো করে রাখা হয়েছিল।'

'সরি, এ-ধরনের রূপকথা আপনারা আমার কাছে বেচতে পারবেন না।'

'বিশ্বাস করুন,' বলল রানা। 'এটা রূপকথা নয়।'

'ওয়াটার লিলিকে ধ্বংস করে, কয়েক হাজার মানুষকে খুন করে, কে কি লাভ করতে চায় বলবেন দয়া করে?'

'কেন, আপনারা যখন ডক্টর সিরাজুল ইসলামের কাছ থেকে এঞ্জিনের

ডিজাইন আর ফুয়েলের ফর্মুলা পেলেন তখন তিনি তাঁর কোন শত্রুর কথা বলেননি, যে শত্রু ওই ডিজাইন আর ফর্মুলা চুরি করতে চাইছে?'

'এত কিছু বলেননি। শুধু বলেছিলেন যে তাঁর আর তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্টের নিরাপত্তা দরকার। এঞ্জিনের ডিজাইন আর অয়েল ফর্মুলা আমরা বিনামূল্যে পাই। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলেন, তাই আমরা ডক্টর ইসলামকে আমাদের সিঙ্গাপুর শিপইয়ার্ডে পাঠিয়ে দিই, ওখানে আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম খুব ভাল।'

'ওয়াটার লিলি সিঙ্গাপুরে তৈরি হচ্ছিল, এমারেল্ড মার্লিন তৈরি হচ্ছিল এখানে,' বলল রানা। 'জাহাজ দুটো তৈরি করতে প্রায় তিন বছর সময় লেগেছে। এরমধ্যে আপনাদেরকে কেউ কোন হুমকি দেয়নি বা স্যাবটাজ করার চেষ্টা করেনি?'

'হ্যাঁ, করেছে। টেলিফোনে হুমকি দিয়েছে। বলেছে, এই ডিজাইনের পেটেন্ট চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে, কাজেই আমরা এটা ধরে কোন জাহাজ তৈরি করতে পারি না। আমরা প্রমাণ দেখতে চেয়েছি, কিন্তু প্রমাণ নিয়ে কেউ সামনে এসে দাঁড়ায়নি। তবে...'

'তবে কি?'

'হয়তো এটা স্রেফ সিঁধেল চোরের কাজ, এই সমস্যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই...'

'তবু বলুন, ঘটনাটা কি?'

'আমার বাড়ি থেকে এঞ্জিনের ডিজাইন আর তেলের ফর্মুলার মূল কপিটা চুরি হয়ে গেছে।'

'রানা!' ডেভিড লেলাং থামতেই তৃষা প্রায় চিৎকার করে উঠল। 'আপনাকে বোধহয় একটা কথা বলা হয়নি। ঠিক কখন জানি না, তবে বাবাকে দিয়ে জোর করে সাদা কাগজে সই করিয়ে নেয়া হয়েছিল। হয়তো বাবাকে যখন কোবরা গ্রাবের মার্সেনারিরা টেক্সাসে বন্দি করে রেখেছিল, তখন।'

'ওহ্, গড!' নিজের মাথায় হাত রাখল রানা। 'তাহলে পেটেন্টের জন্যে আবেদন করার দাবিটা মিথ্যে নয়।' ডেভিড লেলাং-এর দিকে ফিরল ও। 'ওয়াটার লিলি ডুবিয়ে দেয়ার কারণ আর কিছুই নয়, স্রেফ কমপিটিশন–ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা। একটা করপরেশন চাইছে একা শুধু তারাই ওই যুগান্তকারী এঞ্জিন আর ওই নতুন উদ্ভাবিত তেল ব্যবহার করে ব্যবসা করবে।'

'দুঃখিত, মিস্টার রানা,' বললেন ডেভিড লেলাং। 'আপনাদের এই গল্প আমার কাছে গল্পই মনে হচ্ছে।'

'আরও খোলাখুলি ব্যাখ্যা করতে পারলে খুশি হতাম,' বললেন রেডক্লিফ, 'কিন্তু সিআইএ ও এফবিআই তাদের তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ না করা পর্যন্ত আমাদের হাত বাঁধা।'

ডেভিড লেলাং বোকা নন। 'এটা তাহলে নুমার অফিশিয়াল ইনকোয়্যারি নয়?'

'সত্যি কথা বলতে কি, না,' জবাব দিলেন রেডক্লিফ।

'আমি আশা করি এ-ধরনের অবাস্তব কাহিনী বাজারে আপনারা ছড়াতে যাচ্ছেন না।'

'নুমা চীফ রাজি হয়েছেন, সংশ্লিষ্ট সবগুলো এজেন্সি তদন্ত শেষ না করা পর্যন্ত কোন অফিশিয়াল রিপোর্ট রিলিজ করা হবে না। এটা আপনাদের সবার ব্যবসার স্বার্থেই,' বলল রানা। 'টেরোরিস্টরা জাহাজ ধ্বংস করছে, মিডিয়া এ-খবর প্রচার শুরু করলে কেউ আর জাহাজে চড়তে চাইবে না।'

'এ-ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একমত আমি,' সুর একটু নরম করলেন ডেভিড লেলাং। 'কিন্তু এমারেল্ড মার্লিনকে যাত্রা বাতিল করতে বলার কারণ কি? আগে থেকে যখন জানা গেছে টেরোরিস্টরা হামলা চালাতে পারে তখন সিআইএ, এফবিআই, জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন ও নুমার ভূমিকা কি হওয়া উচিত? ইন্টারপোল আর ন্যাটোই বা কি করছে? ওরা আমাদেরকে প্রটেকশন দিতে পারছে না?' ভদ্রলোক আবার রেগে উঠে ঘন ঘন মাথা নাড়লেন। 'এটা এমারেল্ড মার্লিনের প্রথম যাত্রা, বাতিল করা সম্ভব নয়। সম্মানী মানুষরা কেউ কেউ দু'বছর আগে নিজেদের রিজার্ভেশন কনফার্ম করেছেন। চারশো মিলিওনিয়ার-বিলিওনিয়ার প্যাসেজ বুক করেছেন, আমি তাঁদেরকে হতাশ করতে পারব না। তাঁদের অনেকেই ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছেন, হোটেলে উঠে অপেক্ষা করছেন। আমি দুঃখিত। এমারেল্ড মার্লিন শেডিউল ধরে কালই যাত্রা করবে।'

'আপনাকে যখন অন্য কোন কিছুতে রাজি করা সম্ভব নয়,' নরম সুরে বলল রানা, 'তখন আপনি যা চাইছেন তাই হোক।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে রানার দিকে তাকালেন ডেভিড লেলাং। 'আমি কি চাইছি?'

'প্রটেকশন,' বলল রানা। 'কয়েকজন মাত্র ক্রু আর মেরিন ইন্সপেক্টর থাকবে শিপে, যাদের কাজ হবে সমস্ত ইকুইপমেন্ট আর সিস্টেম সারাক্ষণ চেক করা...'

'বোট,' বাধা দিয়ে বললেন ডেভিড লেলাং। 'সাবমেরিনকে শিপ বলে না, বলে বোট।'

'ওটা একটা লাকশারি লাইনার নয়?' জিজ্ঞেস করল তৃষা।

'লাকশারি লাইনার, তবে শুধু যখন সারফেস ধরে চলবে; এই ভেসেলটাকে তৈরি করা হয়েছে পানির নিচে দিয়ে চলাচলের উপযোগী করে।'

'আমরা কি অতিরিক্ত সিকিউরিটি আর ইন্সপেকশন টীম সম্পর্কে একমত হতে পেরেছি?' রেডক্লিফ সাবধানে জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' এক গাল হেসে বললেন ক্রুজ লাইনের ডিরেক্টর। 'অসুবিধে কি, বিনা খরচায় প্রটেকশন পাচ্ছি।'

তবে রানার অনুরোধ এখনও শেষ হয়নি। 'আমি আরও চাইব একটা ডাইভ টীম ওয়াটারলাইনের নিচে খোল পরীক্ষা করবে।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন ডেভিড লেলাং। 'আমি ডাইভার দিতে পারব। আন্ডারওয়াটার রিপেয়ার ও মেইনটেন্যান্সের জন্যে সারা বছরই বেতন দিয়ে পুষতে হয় ওদের।'

'সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে,' বললেন রেডক্লিফ।

'যদিও আমার বিশ্বাস যে এ-ধরনের সাবধানতার কোন প্রয়োজন নেই, তবে এ ও চাই না যে ওয়াটার লিলি ট্রাজেডি রিপিট হোক। লন্ডনের লয়েডস্ ইন্স্যুরেন্স আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, তা না হলে লেলাং ক্রুজ লাইন দেউলিয়া হয়ে যেত।'

'ববি আর আমি ইন্সপেকশন টীমে থাকতে চাই, আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে আর কি,' রানার সুর আরও নরম।

'ওঁদের সঙ্গে আমিও,' তাড়াতাড়ি বলল তৃষা। 'আপনি তো জানেনই যে আমি কার মেয়ে। বাবার কাজের প্রতি মেয়ের আগ্রহ থাকাটা স্বাভাবিক, বোঝেনই তো।'

ডেভিড লেলাং চেয়ার ছাড়লেন। 'আমি কোন সমস্যা দেখছি না। মত-পার্থক্য যতই থাকুক, খুশি মনেই স্টেট রুমের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সমস্ত প্যাসেঞ্জার অ্যাকমডেশন বুক হয়ে গেছে, তবে তারপরও হাতে কিছু রাখা হয়। তা-ও যদি না পাই, আশা করি ক্রু কোয়ার্টারে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হোটেলের ডক ফ্রন্টে বোট পৌঁছাবে কাল সকাল সাতটায়। আপনারা তখন উঠবেন।'

রেডক্লিফ ভদ্রলোকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। 'ধন্যবাদ, মিস্টার লেলাং। আপনাকে সতর্ক না করতে হলেই খুশি হতাম, কিন্তু অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন সিদ্ধান্ত নেন সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করাটা জরুরী।'

'আমি তাঁর সিদ্ধান্ত সমর্থন করি। প্লীজ, অ্যাডমিরালকে বলবেন তাঁর উদ্বেগের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। তবে আমার দৃষ্টিতে কোন গুরুতর সমস্যা ধরা পড়ছে না। এমারেল্ড মার্লিন ব্যাপক সী ট্রায়ালে উতরে গেছে; ডক্টর ইসলামের এঞ্জিন ও বোটের সমস্ত ইমার্জেন্সি সিস্টেম চমৎকার কাজ করছে।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার লেলাং,' বলল রানা। 'যদি কিছু ঘটে, আপনাকে আমরা অবশ্যই জানাব।'

ডেভিড লেলাঙের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে এলিভেটরে চড়ার সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুরল্যান্ড। 'যাক, কেউ বলতে পারবে না যে আমরা চেষ্টা করিনি।'

'আমি কিন্তু আশ্চর্য হইনি,' রেডক্লিফ বললেন। 'ওয়াটার লিলিকে হারিয়ে কিনারায় এসে ঝুলে আছে কোম্পানি। এখন এমারেল্ড মার্লিনের যাত্রা বাতিল করে দিলে নির্ঘাত নিচে খসে পড়বে। ডেভিড লেলাং আর তাঁর ডিরেক্টরদের সামনে অন্য কোন পথ খোলা নেই।'

ওয়াশিংটনে ফেরার জন্যে প্লেন ধরতে এয়ারপোর্টে চলে গেলেন জর্জ রেডক্লিফ। মুরল্যান্ড, তৃষা আর রানাকে পথ দেখিয়ে হোটেলে পৌঁছে দিল ডেভিড লেলাং-এর প্রাইভেট সেক্রেটারি। নিজের কামরায় একা হতেই অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে ফোন করল রানা। 'মিস্টার লেলাংকে যাত্রা বাতিল করতে রাজি করানো যায়নি,' সংক্ষেপে রিপোর্ট করল ও।

'জানতাম উনি রাজি হবেন না।' বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন নুমা চীফ।

'আমি আর ববি বোটে থাকছি। আমাদের সঙ্গে ডক্টর ইসলামের মেয়ে তৃষাও থাকছেন।'

'মিস্টার লেলাং-এর অনুমতি পেয়েছ?'

'উনি খুশি মনেই রাজি হয়েছেন।'

ফোনের রিসিভার থেকে কাগজ ওল্টাবার শব্দ ভেসে আসতে শুনল রানা। তারপর অ্যাডমিরাল বললেন, 'তোমার জন্যে কিছু খবর আছে, রানা। এফবিআই বলছে, ওয়াটার লিলির বেঁচে যাওয়া প্যাসেঞ্জারদের দেয়া বর্ণনা থেকে একটা লোককে তারা চিনতে পারছে। তাদের ধারণা এই লোকটাই ওয়াটার লিলিতে আগুন ধরায়।'

'কে সে?'

'সত্যিকার একটা পচা আপেল, রানা। লোকটার আসল নাম কাকাস জাভালা। জন্ম লস অ্যাঞ্জেলসে। একজন অ্যাফ্রো-আমেরিকান, মানে পূর্ব-পুরুষরা আফ্রিকান ছিল। আঠারো বছরে পা দেয়ার আগেই মারপিটের যে-সব ঘটনা ঘটায় তার তালিকা তৈরি করতে পুলিসের খাতার সাত পৃষ্ঠা লাগে। একটা খুনের দায় এড়াবার জন্যে পালিয়ে যায়, নাম বদলে ঢুকে পড়ে সেনাবাহিনীতে। অল্প সময়ে দ্রুত উন্নতি করে জাভালা, অফিসার হবার পর তাকে ট্র্যান্সফার করা হয় হাইলি সিক্রেট মিলিটারি অর্গানাইজেশন সিইএএসই-তে। উচ্চারণটা সীজ।'

'কখনও শুনিনি।'

'ওদের কর্মসূচি বা অ্যাকশন সম্পর্কে অনেক সরকারী কর্মকর্তাও কিছু জানেন না,' বললেন হ্যামিলটন। 'কভার্ট ইলিট অ্যাকশন ফর সিলেক্ট এলিমিনেশন, সংক্ষেপে সীজ।'

'না, এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।'

'এটা আসলে গড়ে তোলা হয়েছিল উগ্রপন্থী সন্ত্রাসী নেতাদের খুন করে সন্ত্রাস দমন করার উদ্দেশে, তাদের তৎপরতা আমেরিকান নাগরিকদের জানমালের জন্যে হুমকি হয়ে ওঠার আগেই। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, একটা কংগ্রেস কমিটি সীজ-এর তৎপরতার ওপর তদন্ত চালিয়ে এমন কিছু খুঁজে পায়, তারা সুপারিশ করে সীজ যেন ভেঙে দেয়া হয়। তিন মাস পর পেন্টাগন সীজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এখন দেখা যাচ্ছে সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল না। পলিটিক্যাল ও কভার্ট মার্ডারে উঁচুদরের ট্রেনিং পাওয়া কাকাস জাভালা, একজন মেজর, নিজের বারোজন অধস্তন লোককে নিয়ে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে খুলে বসেছে একটা কমার্শিয়াল অ্যাসাসিনেশন কোম্পানি।'

'একটা ক্রাইম সিন্ডিকেট।'

'হ্যাঁ, পেশায় ভাড়াটে খুনী ওরা। গত এক বছরে অমীমাংসিত হত্যাকাণ্ডের তালিকা দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে—এদের মধ্যে ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক, রাজনীতিক নেতা, কোম্পানি ডিরেক্টর থেকে শুরু করে কিছু সিলেব্রিটিও আছেন। ওরা এমন কি মাফিয়া লীডারদেরও মারছে।'

'কোন তদন্ত নেই?' রানা বিস্মিত।

'এফবিআই ফাইল তৈরি করেছে, কিন্তু এই লোকগুলো সত্যি ভারি চালাক

নিজেদের সংশ্লিষ্টতার কোন প্রমাণ কখনোই তারা রেখে যায় না। তদন্তকারী অফিসাররা হতাশায় ভুগছে, কারণ এখন পর্যন্ত তারা জাভালা বা তার মার্ডারিং গাঙের দিকে একবারও আঙুল তাক করতে পারেনি। দিনে দিনে এই ভয়টাই সবার মনে জেঁকে বসছে যে ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় নেতৃত্ব দেবে ডেথ স্কোয়াড।'

'গড!'

'শুনতে যতই খারাপ লাগুক,' ম্লান সুরে বললেন অ্যাডমিরাল, 'এদিক সেদিক বেশ কিছু করপরেট সিইও আছে যারা একচেটিয়া ব্যবসা আর ক্ষমতা অর্জন করার জন্যে পারে না এমন কোন কাজ নেই।'

'ফ্যালকন প্রসঙ্গ ফিরে আসছে।'

'হ্যাঁ,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'এখন একটা বা দুটো নয়, চার-চারটে অপরাধের জন্যে কাকাস জাভালাকে দায়ী করা হচ্ছে। এটা প্রায় নিশ্চিত যে ওয়াটার লিলিতে সেই আগুন ধরিয়েছিল। বিস্ফোরণটাও সেই ঘটায়, যার ফলে ক্রুজ শিপের তলা খসে পড়ে। তার তৃতীয় অপরাধ, জাহাজের একজন অফিসার সেজে ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম স্যাবটাজ করে।'

'একজন লোক এতকিছু করতে পারে না,' রানার গলায় সন্দেহ।

'জাভালা সব সময় একা কাজ করে না। সেজন্যেই আমি বলছি, এমারেল্ড মার্লিনে প্রতিটি সেকেন্ড সতর্ক থাকতে হবে তোমাদেরকে।'

'ঠিক আছে, ক্রুদের কেউ সন্দেহজনক আচরণ করে কিনা লক্ষ রাখব।'

'তুমি বরং লক্ষ রাখবে জাভালাকে দেখতে পাও কিনা।'

'ঠিক বুঝলাম না,' বলল রানা, ভুরু একটু কোঁচকাল।

'নিজেকে নিয়ে তার অহংকারের সীমা নেই। এত বড় একটা কাজ সে তার অধস্তনদের ওপর ছেড়ে দেবে না। তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, এই শোতে সে-ই প্রধান ভূমিকায় থাকতে চাইবে।'

'আপনার কোন ধারণা আছে সে দেখতে কেমন?'

'সেটা তো আমার চেয়ে তোমারই ভাল জানার কথা। তার সঙ্গে তোমার তো দেখা হয়েছে।'

'আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে? কোথায়?'

'আমি এই মাত্র নিউ ইয়র্ক পুলিস ইনভেস্টিগেটরদের রিপোর্ট পেলাম। সেই পুরানো ফকারটার পাইলট ছিল কাকাস জাভালা, যে ফকারটা গুলি করে তোমার ট্রাইমোটরকে নামাতে চেয়েছিল।'

'ও, আচ্ছা–এটাই তাহলে তার চার নম্বর অপরাধ।'

***

দ্বিতীয় খণ্ড

মাসুদ রানা

স্বর্ণখনি

কাজী আনোয়ার হোসেন

স্বর্ণখনি-২

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

এক

দুনিয়ার যেখানে যত ক্রুজ লাইনার আছে, এমারেল্ড মার্লিনের সঙ্গে সেগুলোর চেহারা এতটুকু মিলবে না। এটায় কোন প্রম্যানাড ডেক নেই, স্টেট রুম ব্যালকনি নেই, নেই কোন স্মোক বা ইগজস্ট ফানেল। সুন্দরী জলকন্যার গোলাকৃতি সুপারস্ট্রাকচারে গিজ গিজ করছে সারিবদ্ধ বৃত্তাকার ভিউইং পোর্ট। বো-র ওপর চোখে পড়ার মত একমাত্র কাঠামো বলতে গম্বুজসদৃশ একটা আকৃতি, যার ভেতর খুঁজে পাওয়া যাবে ব্রিজ আর কন্ট্রোল রুম। পিছন দিকে, স্টার্নে, উঁচু ফিন বিলাসবহুল একটা লাউঞ্জ আর ক্যাসিনোর অবস্থান; সব কিছুকে নিয়ে স্থির ভিউইং পোর্টগুলোকে ঘিরে ফিনটা সারাক্ষণ অলসভঙ্গিতে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরছে।

লম্বায় চারশো ফুট, প্রস্থে চল্লিশ; লাকশারি ক্রুজ লাইনার হিসেবে এমারেল্ড মার্লিনকে ছোটই বলতে হবে। আজ পর্যন্ত পানির তলা দিয়ে ট্যুরিস্টদের বেড়িয়ে আনাবার জন্যে যে-সব সাবমেরিন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর দৌড় আর গভীরে ডুব দেয়ার ক্ষমতা খুব কম। ওগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে এমারেল্ড মার্লিন ক্রুজিং-এর ইতিহাস বদলে দিতে যাচ্ছে। ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের ডিজাইন করা স্বয়ংচালিত এঞ্জিন থাকায় এই মৎস্যকন্যা গোটা ক্যারিবিয়ান সাগর পাড়ি দিতে পারবে, খাবারদাবার ও সাপ্লাইয়ের জন্যে কোন বন্দরে ভেড়ার আগে এক হাজার ফুট গভীরতায় কাটাতে পারবে একটানা চোদ্দদিন।

অবসর সময়টা বিনোদনে গা ভাসাবার উদগ্র কামনা, সেই সঙ্গে সারা দুনিয়া জুড়ে বিত্তবান লোকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক ট্র্যাভেল ও ট্যুরিজমের বাজার দাঁড়িয়েছে তিন ট্রিলিয়ন ডলারে। এই অঙ্কের একটা মোটা অংশে ভাগ বসাতে যাচ্ছে ওশান ক্রুজিং ব্যবসা। সাবমেরিন ক্রুজ লাইনার বাজারে চলে আসায় ধনিক শ্রেণীর ঢল নামবে এদিকে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'সত্যি অসম্ভব, অসম্ভব সুন্দর!' তৃষা ইসলাম অভিভূত, সকালের শুরুতে ডকে দাঁড়িয়ে আছে, চোখ তুলে দেখছে তুলনাহীন ভেসেলটাকে।

'জেল্লা-জলুস একটু বেশি,' বিড়বিড় করল ববি মুরল্যান্ড, সদ্য ওঠা সূর্যের আলো সুপারস্ট্রাকচারে প্রতিফলিত হয়ে চোখে লাগায় সানগ্লাস অ্যাডজাস্ট করল।

কথা বলছে না, মাসুদ রানা তাকিয়ে আছে টাইটানিয়াম খোলের জোড়াবিহীন আকৃতির দিকে। সাধারণ শিপে যেমন দেখা যায়, এমারেল্ড মার্লিনের গায়ে সেরকম কোনও প্লেট বা রিভিট নেই। এই ট্যুরিস্ট সাবমেরিন মেরিনটেকনোলজির একটা বিস্ময়। ডিজাইনের শৈল্পিক উৎকর্ষ দেখে মুগ্ধ রানাও। এই সময় গ্যাঙওয়ে ধরে জাহাজের একজন অফিসারকে এগিয়ে আসতে দেখল ও।

'মাফ করবেন, আপনারাই কি নুমার লোকজন?'

'মাফ করবেন, আমরাই,' বলল মুরল্যান্ড।

'আমি জ্যাসন জনসন, বোটের ফার্স্ট অফিসার। মিস্টার ডেভিড লেলাং ক্যাপটেন জিম অগাস্টাসকে জানিয়েছেন প্রথম যাত্রায় আপনারা আমাদের অতিথি হিসেবে যোগ দিচ্ছেন। আপনাদের সঙ্গে কোন লাগেজ আছে কি?'

'শুধু সঙ্গে যা দেখছেন,' জানাল তৃষা, সামনের দিকে তাকিয়ে বোটের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করছে। অনেকদিন পর আজ সালোয়ার-কামিজ পড়েছে সে, ওড়নাটা গলায় পেঁচানো।

'আপনি একটা স্টেট রুম পাবেন, মিস তৃষা,' সবিনয়ে বলল ফার্স্ট অফিসার জনসন। 'মিস্টার রানা আর মিস্টার মুরল্যান্ডকে ক্রুদের কোয়ার্টারে একটা কেবিন শেয়ার করতে হবে।'

'থিয়েটারে পারফর্ম করে, সেই সুন্দরী শোগার্লের পাশের কেবিনটা তো?' চেহারায় নিরীহ ও নিভাঁজ একটা ভাব ধরে রেখে জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'দুঃখিত, ভাগ্য বোধহয় অতটা সদয় নয়।' হেসে উঠল জনসন। 'প্লীজ, আমার পিছু নিন।'

'আমি এক মিনিট পরে আসছি,' বলল রানা। ঘুরে ডক ধরে একটা মইয়ের দিকে এগোচ্ছে, মইটা নেমে গেছে পানিতে। ওয়েটসুট পরা একটা লোক ও একটা মেয়ে নিজেদের ডাইভ গিয়ার চেক করছে ডকের কিনারায় দাঁড়িয়ে। বোঝা যাচ্ছে, এখুনি পানিতে নামবে।

'খোলের তলায় তল্লাশী চালাবে একটা টীম, তোমরাই কি?' ওদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল রানা।

একহারা গড়ন, বয়সে তরুণ, বলল, 'হ্যাঁ, আমরাই।'

'মাসুদ রানা। আমিই তোমাদের সার্ভিস চেয়েছি।'

'উইলিয়াম হফার।'

'আর তুমি?' মেয়েটার দিকে তাকাল রানা।

'আমি ওর বউ, মিলিন্ডা।' স্বামীর দিকে তাকাল মিলিন্ডা। 'ডার্লিং, উনি নুমার একজন প্রজেক্ট ডিরেক্টর। কাজটা দেয়ার জন্যে ওঁকে আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার রানা।' মিটি মিটি হাসছে হফার।

মিলিন্ডা হাত বাড়াতে তার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা, মুঠোর শক্তি অনুভব করে বিস্মিত হলো। 'আমি ধরেই নিচ্ছি ডাইভার হিসেবে তোমরা এক্সপার্ট।'

'দশ বছর ধরে এই পেশায় আছি আমরা।'

'মিলিন্ডা ডাইভিং-এ যে-কোন পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে।' স্ত্রীকে দিয়ে হফারকে গর্বিত মনে হলো।

'আপনি ঠিক করে বলতে পারেন আসলে কি খুঁজব আমরা?' জিজ্ঞেস করল মিলিন্ডা।

'গোপন রাখতে চাওয়াটা বোকামি,' বলল রানা। 'তোমরা দেখবে বোটের খোলে কিছু আটকে রাখা হয়েছে কিনা, বিশেষ করে কোন এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস।'

হফারের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। 'যদি পাই?'

'একটা পেলে, আরও পাবে। তবে ছোঁবে না। ওগুলো সরাবার জন্যে আমরা

একটা আন্ডারওয়াটার ডিমলিশন টীমের ব্যবস্থা করব।'

'আমরা রিপোর্ট করব কাকে?'

'জাহাজের ক্যাপটেনকে। ওই পর্যায়ে দায়িত্বটা তাঁর।'

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা খুশি, মিস্টার রানা।'

'আমিও।' সোনালি চুল ঝাঁকিয়ে হাসল মিলিন্ডা।

'গুডলাক,' রানা আন্তরিক সুরে বলল। 'তোমরা কিছু না পেলে সবাই আমরা খুশি হব।' ও গ্যাঙওয়ের কাছে ফেরার আগেই স্ত্রীকে নিয়ে পানিতে নেমে গেছে হফার, ডুব সাঁতার দিয়ে এমারেল্ড মার্লিনের খোলের তলায় পৌঁছাবে।

বোটের ফার্স্ট অফিসার জনসন তৃষাকে পথ দেখিয়ে বিলাসবহুল একটা সোলেরারিয়াম-এর ভেতর দিয়ে নিয়ে এসে কাঁচ মোড়া এলিভেটরে তুলল, তারপর মান্টা ডেক সংলগ্ন আরামদায়ক স্টেট রুমে পৌঁছে দিল। এরপর রানা ও মুরল্যান্ডকে নিয়ে প্যাসেঞ্জার ডেকের নিচে ক্রুদের কোয়ার্টারে নেমে এসে ছোট একটা কেবিন দেখাল।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যাপটেন অগাস্টাসের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি,' তাকে বলল রানা।

'ক্যাপটেন এখন থেকে ঠিক আধ ঘণ্টা পর আপনাদের জন্যে অফিসার্স ডাইনিং রুমে অপেক্ষা করবেন, আপনাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করার জন্যে।' হাসল ফার্স্ট অফিসার জনসন। 'ব্রেকফাস্টে বোটের সব অফিসার উপস্থিত থাকবেন, আরও থাকবে বোটবিল্ডারদের তরফ থেকে ইন্সপেকশনের জন্যে পাঠানো একটা টীম। ওঁরা কাল রাতে পৌঁছেছেন।'

'মিস তৃষাকে ডাকা হলে আমি খুশি হব,' বলল রানা, গলার সুরে ইচ্ছে করে একটু গাম্ভীর্য ফোটাল।

জনসন অস্বস্তিতে পড়ে গেল, তবে দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। 'ক্যাপটেন অগাস্টাসকে আমি জিজ্ঞেস করে দেখছি মীটিঙে উনি ভদ্রমহিলাকে আমন্ত্রণ জানাতে চান কিনা।'

'ওঁর বাবার ডিজাইন ছাড়া আপনাদের এই বোটের অস্তিত্বই যেখানে সম্ভব ছিল না,' মাঝখান থেকে একটু তীক্ষ্ণ সুরে বলল মুরল্যান্ড, 'সেখানে ব্রেকফাস্টে ওকে আমন্ত্রণ না করাটা কেমন দেখায় আপনিই বলুন?'

'আমি জানি, ক্যাপটেন সম্মতি দেবেন,' দ্রুত বলল জনসন, কেবিন থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

অপরিসর ক্লজিটসদৃশ কেবিনটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে মুখ বাঁকাল মুরল্যান্ড। 'যেন মনে হচ্ছে আমরা আসায় ওরা খুশি হতে পারেনি।'

'খুশি হোক বা না হোক,' রানা জবাব দিল, 'এসেই যখন পড়েছি, বোট আর প্যাসেঞ্জারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে আমাদের।' নিজের ডাফল্ ব্যাগ থেকে হাত বের করে বন্ধুর দিকে একটা পোর্টেবল রেডিও বাড়িয়ে দিল। 'তুমি কিছু পেলে আমাকে জানাবে। আমিও তাই করব।'

'কোত্থেকে শুরু করব আমরা?'

'সমস্ত ক্রু আর প্যাসেঞ্জার সহ এই ভেসেলকে তুমি যদি পানির তলায় ডুবিয়ে

দিতে চাও, তোমার পদ্ধতিটা কি হবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তিত দেখাল মুরল্যান্ডকে। 'আমি যদি ওয়াটার লিলিতে আগুন লাগিয়ে ধরা না পড়তাম তাহলে হয়তো আবার ওই আগুনটাকেই অস্ত্র হিসেবে বেছে নিতাম। কিন্তু যদি ঝামেলা ও বিশৃংখলা এড়িয়ে এটাকে সাগর তলে পৌঁছে দিতে চাই, তাহলে হয় খোল নয়তো ব্যালাস্ট ট্যাংক উড়িয়ে দেব।'

'ঠিক আমি যা ভাবছি। তাহলে ওই সিনারিয়ো ধরে কাজ শুরু করে দাও, খুঁজে দেখো বোটের কোথাও বিস্ফোরক পাও কিনা।'

'আর তুমি? তুমি কি খুঁজবে?'

রানা হাসল, তবে তাতে হাস্যরসের ছিটেফোঁটাও নেই। 'আমি সেই লোকটাকে খুঁজতে যাব, যে ফিউজে আগুন ধরিয়ে ওই বিস্ফোরক ফাটাবে।'

রানা যদি ভেবে থাকে এমারেল্ড মার্লিনের ক্যাপটেন স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে যাচ্ছেন, তাহলে ভুল করবে। ক্যাপটেন জিম অগাস্টাস এমন একজন মানুষ যিনি সোজা পথে হাঁটেন, এবং কখনোই নিজের পথ ছেড়ে সরে যান না। কড়া নিয়ম-শৃংখলার ভেতর জাহাজ চালান ভদ্রলোক, চান না বহিরাগত কেউ এসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রুটিনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করুক।

যখন যে শিপে থাকেন তখন সেটাই অকৃতদার জিম অগাস্টাসের বাড়ি। তাঁর মুখ গম্ভীর ও লাল একটা মুখোশ, কখনোই সেখানে হাসি ফোটে না। ভারী পাতার ভাঁজে বাদামী চোখ জোড়া সত্যি একটা দুঃসংবাদ–কোন ত্রুটি, অসামঞ্জস্য, বিশৃঙ্খলা যত সামান্যই হোক ঠিক ধরা পড়ে যাবে। শুধু বাহারি একরাশ সোনালি কেশর ভদ্রলোকের চেহারায় আঁভিজাত্য ও কর্তৃত্বের ভাব ধরে রাখতে পেরেছে। কাঁধ দুটো প্রায় মুরল্যান্ডের সমানই চওড়া, তবে তার তুলনায় কোমর ইঞ্চি দশেক বেশি ভারী। এই মুহূর্তে অফিসার্স ডাইনিং রুমে বসে আঙুল দিয়ে টেবিলে ড্রাম বাজাচ্ছেন তিনি, রানার দিকে তাকিয়ে থাকা চোখে পলক পড়ছে না।

পলক রানার চোখেও পড়ছে না, কারণ এরকম দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতেই ও অভ্যস্ত।

'আপনি বলছেন আমার এই জাহাজ বিপদের মধ্যে রয়েছে?'

'বলছি,' রানার জবাব।

'ননসেন্স।' মুখের ওপর পষ্ট বলে দিলেন, চেয়ারের হাতল ধরা হাতের গিঁট সাদা হয়ে গেছে। 'আমাদের একটা লাইনার ধ্বংস হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে হবে ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে, এ আমি মানি না। আমার এই বোট ততটাই নিরাপদ, যতটা হওয়া সম্ভব। আমি নিজে এটার প্রতিটি ইঞ্চি দেখেছি। আরে, এটার জন্মই হয়েছে আমার চোখের সামনে। তৈরি করার সময় আমি ছিলাম সুপারভাইজারদের একজন।' টেবিলের চারধারে বসা রানা, মুরল্যান্ড ও কাল রাতে কোম্পানির শিপবিল্ডিং সেকশন থেকে আসা ইন্সপেকশন-টীমের চারজন লোকের দিকে একবার করে তাকালেন। 'আপনাদের যা করার আপনারা তা করুন। কিন্তু আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে সাবধান করে দিয়ে বলছি, বোট চলার সময় আমাদের অপারেশনে আপনারা কেউ নাক গলাতে আসবেন না। সেক্ষেত্রে

পরবর্তী পোর্টে আপনাদেরকে আমি নামিয়ে দিতে বাধ্য হব। সেজন্যে ম্যানেজমেন্ট আমাকে যতই তিরস্কার করুক, আমি কিছু মনে করব না।'

পল কেমপ্রেসো, ইন্সপেকশন টীমের প্রধান, অন্তত হাবভাব ও চেহারায় ক্যাপটেন অগাস্টাসের মতই আরেকটা বাঘ, ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ বিদ্রূপাত্মক হাসি ঝুলিয়ে বলল, 'অন্তত আমাদের তরফ থেকে আপনাকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি—নাক গলানো হবে না। তবে আমরা আশা করব সেফটি সিস্টেমে কোন সমস্যা দেখা দিলে সেটা ঠিক করবার জন্যে আপনি সহযোগিতা করবেন।'

'যেখানে খুশি তল্লাশী চালান,' বিড়বিড় করলেন অগাস্টাস। 'আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি এই বোটকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে এমন কিছু আপনারা পাবেন না। আমি বোট ছাড়ার নির্দেশ দিচ্ছি।'

এবার রানার পালা। 'একটু অপেক্ষা করতে হবে, মিস্টার অগাস্টাস। দু'জন ডাইভার বোটের লোয়ার হাল পরীক্ষা করতে গেছে। ওরা ফিরে আসুক, তারপর বোট ছাড়বেন।'

'আমি অপেক্ষা করার কোন কারণ দেখছি না!' প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন অগাস্টাস।

রানা যেন তাঁর মেজাজ সম্পর্কে সচেতন নয়, আগের সেই শান্ত ও ভারী গলায় বলল, 'খোলের সঙ্গে ফরেন অবজেক্ট সেঁটে থাকার সম্ভাবনা আছে।'

'এটা বাস্তব জীবন, মিস্টার রানা,' নির্লিপ্ত সুরে বললেন ক্যাপটেন। 'কোন ফ্যানটাসি ফিল্ম নয়।'

এরপর সম্ভবত প্রায় আধ মিনিট কেউ কোন কথা বলল না। ডাইনিং রুমে নিস্তব্ধতা ঠাণ্ডা বরফের মত জমাট বেঁধে থাকল। তারপর দেখা গেল চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। দুই হাত সামনে বাড়াল ও, টেবিলের ওপর ভর দিয়ে ক্যাপটেনের দিকে ঝুঁকল, ঠোঁটের কোণে মেরুপ্রদেশের হিম হাসির আভাস, চোখের দৃষ্টি জিম অগাস্টাসের মণি ভেদ করছে।

এ সংকেতগুলো মুরল্যান্ডের চেনা। এইবার শুরু হবে। ভাই রানা, পুলকিত মুরল্যান্ড ভাবল, কাঠগোঁয়ারটাকে ভালমত একটা সবক শিখিয়ে দাও।

'বোঝা গেল, এই বোট কি ধরনের বিপদের মধ্যে আছে সে-সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই,' বলল রানা; গম্ভীর সুর, তবে বলার ভঙ্গিতে উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও নেই। 'এই টেবিলে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে নিজের চোখে দেখেছি আগুনটা ওয়াটার লিলিকে নিয়ে কি ভয়ংকর খেলাটা খেলেছে। পুরুষ, মহিলা, শিশু শ'য়ে শ'য়ে চোখের সামনে মরে গেল—কেউ কেউ জ্যান্ত পুড়ে। আমরা উদ্ধার করার আগেই ডুবে গেল, স্রোতের টানে ভেসে গেল আরও কয়েকশো মানুষ। সাগরের তলায় এমন জাহাজের ছড়াছড়ি, যেগুলোর ক্যাপটেন মনে করত তাদের কোন বিপদ হবে না। টাইটানিক, লুসিটানিয়া, মোরো ক্যাসল্—এগুলোর ক্যাপটেনও বিপদসংকেত গুরুত্বের সঙ্গে নেননি, আর সেজন্যে তাঁদেরকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। বিপদটা যখন আসবে, ক্যাপটেন অগাস্টাস আপনি বা আপনার ক্রুরা রিয়্যাক্ট করার সময় পর্যন্ত পাবেন না। এবং বিপদটা যে সত্যি আসবে, এ-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।

'সেটা শুধু যে দ্রুত আসবে তা নয়, এমন একটা দিক থেকে আসবে যে আপনি তা কল্পনাও করেননি। তখন কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে, সাবধান হবার সময় পাবেন না। যে তুলনাহীন বোটের ক্যাপটেন হতে পেরে আপনি এত গর্বিত, সেটার সমস্ত প্যাসেঞ্জার ও ক্রু মারা যাবে। আর সেজন্যে দায়ী হবেন একা আপনি।'

রানা থামল শিরদাঁড়া খাড়া করার জন্যে। 'যারা আপনার এই বোট ধ্বংস করতে চায় তারা নির্ঘাত এরইমধ্যে এখানে পৌঁছে গেছে–অভিনয় করছে আপনার অফিসার, ক্রু অথবা প্যাসেঞ্জার হিসেবে। ছবিটা এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মিস্টার অগাস্টাস? নাকি আপনি জন্মান্ধ?'

অদ্ভুত বললেও কম বলা হয়, ক্যাপটেন অগাস্টাস এতটুকু রাগলেন না। মনে হলো এখানে, এমারেল্ড মার্লিনের অফিসার্স ডাইনিং রুমে তিনি নেই, অন্য কোন জগতে বিচরণ করছেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'নিজের ধারণা প্রকাশ করায় আপনাকে ধন্যবাদ, মিস্টার রানা। আপনার কথা আমি বিবেচনার মধ্যে রাখব।' তারপরই চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগোলেন। 'সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা এখন থেকে ঠিক সাঁইত্রিশ মিনিট পর যাত্রা শুরু করব।'

ক্যাপটেনের পিছু নিয়ে আর সবাই রুম ছেড়ে চলে গেলেও রানা, মুরল্যান্ড আর পল কেমপ্রেসো চেয়ার ছেড়ে নড়ল না।

নিস্তব্ধতা ভাঙল মুরল্যান্ড। তার আগে চেয়ারে হেলান দিয়ে কনফারেন্স টেবিলের ওপর পা দুটো তুলে একটার ওপর একটা রাখল সে। 'আমরা এখন থেকে ঠিক সাঁইত্রিশ মিনিট পর যাত্রা শুরু করব,' ক্যাপটেনের কথা ও সুর নকল করে ব্যঙ্গ করল ক্যাপটেন অগাস্টাসকে। 'নিজের কথায় রাজা, তাই না?'

'ওই লোক মনুষ্যবিষ্ঠা আর কংক্রিট দিয়ে তৈরি,' মন্তব্য করল কেমপ্রেসো।

ইন্সপেকশন টীমের এই লীডারকে দেখেই ভাল লেগেছে রানার। 'দেখলেন তো, ক্যাপটেন আমাদের বক্তব্য সিরিয়াসলি নিলেন না। আশা করি ওই একই ভুল আপনিও করবেন না।'

শব্দ নেই, তবে সবগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়ল কেমপ্রেসোর। 'আপনার কথা সত্যি বলে ধরে নিলে আমাদের আয়ু বাড়বে, এটুকু বোঝার ক্ষমতা আমার আছে, মিস্টার রানা। আর যেখানেই হোক, মিলিওনেয়ার-বিলিওনেয়ারদের জন্যে তৈরি করা এই বোটে আমি মরতে চাই না।'

'আমার যেন সন্দেহ হচ্ছে এমারেল্ড মার্লিনকে আপনি খুব একটা পছন্দ করেন না,' বলল রানা; কৌতুক ও কৌতূহল দুটোই অনুভব করছে।

'আপনি জানেন না?' কেমপ্রেসোর মুখের হাসি নিভে গেল। 'কোম্পানি তো কথা রাখেনি! ডক্টর সিরাজুল ইসলাম লং লেলাং কোম্পানিকে বিনামূল্যে তাঁর আবিষ্কৃত এঞ্জিনের ডিজাইন ও ফুয়েলের ফর্মুলা দান করেছিলেন বিশেষ একটা শর্তে–বিশাল আকারের জাহাজ তৈরি করতে হবে, গরিব দেশগুলো যাতে অবিশ্বাস্য কম ভাড়ায় কার্গো আনা-নেয়া করতে পারে, সাধারণ মানুষও যাতে নামমাত্র খরচায় এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পায়। কিন্তু কোম্পানি লোভ সামলাতে না পেরে প্রথমে ওয়াটার লিলি আর এমারেল্ড মার্লিন

বানাল। ভালমানুষ ডক্টর ইসলামকে এ-কথা বলে বুঝ দেয়া হলো–এই দুই ক্রুজ লাইনার থেকে যা লাভ হবে, সেই লাভের টাকা বিনিয়োগ করা হবে জনহিতকর পরিবহন খাতে।'

কথা না বলে রানা ও মুরল্যান্ড দৃষ্টি বিনিময় করল।

'যতই সাকসেসফুল সী ট্রায়াল সম্পন্ন করুক,' আবার বলল কেমপ্রেসো, 'এই বোট ডুব দিয়ে আর কোনদিন সারফেসে না উঠলে আমি একটুও অবাক হব না।'

'আপনার এই কথাটা শুনতে আমার ভাল লাগল না,' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠে বলল মুরল্যান্ড। 'বিশেষ করে আপনি যেখানে শিপ কনস্ট্রাকশন-এ একজন এক্সপার্ট।'

'এক্সপার্ট বলেই তো জানি, এঞ্জিনিয়ারিং সিস্টেমের পিছনে যে টাকা খরচ করা হয়েছে তারচেয়ে একশো গুণ বেশি খরচ করা হয়েছে অলঙ্করণ, আসবাব, সাজসজ্জা ইত্যাদির পিছনে।'

বুকে হাত বাঁধল রানা। 'আমি বিপদটা নিয়ে আলাপ করতে চাই,' বলল ও। 'যন্ত্র নয়, আমার উদ্বেগ মন্দ লোকের হাত।'

চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল কেমপ্রেসো। 'আপনি জানেন এই টাবকে ডোবাবার জন্যে মন্দ একজন লোক কত জায়গায় বিস্ফোরক বসাতে পারে?'

'বোট যখন পানির গভীরে থাকবে, হালের যে-কোন জায়গায় একটা ফাটল ধরাতে পারলেই তার উদ্দেশ্য সফল হবে।'

'হ্যাঁ, আর যদি ব্যালাস্ট ট্যাংক ফাটিয়ে দিতে পারে।'

'বোটের প্ল্যান আর স্পেসিফিকেশন এখনও আমি স্টাডি করার সময় পাইনি, কাল রাতে একবার শুধু চোখ বুলিয়েছি,' বলল রানা। 'তবে এই জাহাজে আন্ডারওয়াটার ইভ্যাকিউয়েশন সিস্টেম নিশ্চয়ই আছে।'

'আছে বৈকি,' জবাব দিল কেমপ্রেসো। 'খুব উন্নতমানের সিস্টেম। লাইফবোটের বদলে প্যাসেঞ্জাররা তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা পড-এ ঢুকবে। একেকটা পডে পঞ্চাশজন ঢুকতে পারবে। সবাই ঢোকার পর এন্ট্রি ডোর লাগিয়ে সীল করে দেয়া হবে। একই সঙ্গে খুলে যাবে আউটার ডোর, বাতাসের একটা শক্তিশালী প্রবাহ তাক করা হবে ইজেক্টিং সিস্টেমে, পড বোট থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবে, তারপর ভেসে উঠবে সারফেসে। আমার কথায় বিশ্বাস রাখতে পারেন, এই সিস্টেম সত্যি ভাল।'

'বেশ, ভাল। এখন বলুন, এই ইভ্যাকিউয়েশন সিস্টেম অচল করে দিতে হলে কি করতে হবে আপনাকে।'

'চিন্তাটা শুভ নয়।'

'সমস্ত মন্দ দিক আমাদের বিবেচনায় রাখা উচিত হবে।'

কেমপ্রেসো মাথা চুলকাচ্ছে। 'আমি এমন কিছু করব যাতে এয়ার-ইজেকশন কাজ করবে না।'

'আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব আপনারা যদি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চেক করে দেখেন ওই সিস্টেমে কেউ কিছু করে রেখেছে কিনা,' বলল রানা।

রানার দিকে আধবোজা চোখে তাকিয়ে থাকল কেমপ্রেসো। 'যেখানে আমার

নিজের জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, চেক করায় কোন গাফলতি পাবেন না।'

নিজের হাতের আঙুল খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে মুরল্যান্ড; চোখ না তুলেই বলল, জাজ্বল্যমান সত্যি কথাগুলো মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে হয় না।'

বোলার্ড থেকে মুরিং রশি খুলে দিল ডক ক্রুরা, উইঞ্চের সাহায্যে বোটে গুটিয়ে নেয়া হলো সেগুলো। এর কয়েক সেকেন্ড পরই স্টারবোর্ড থ্রাস্টার সচল হতে আড়াআড়ি ভঙ্গিতে ডক থেকে সরে যেতে শুরু করল বোট। প্রথম আন্ডারওয়াটার ক্রুজ বোটের প্রথম শুভযাত্রা চাক্ষুষ করতে এক হাজারের কিছু বেশি লোক ভিড় করেছে ডক এরিয়ায়। একটা রিভিউইং স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ফ্লোরিডার গভর্নর সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও নামকরা লোকজন শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করলেন। তাদের দু'একজন উল্লেখ করলেন, ডক্টর ইসলাম সত্যিই মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। ফ্লোরিডা ইউনিভার্সিটির একদল বাঙালী ছাত্র-ছাত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গাইল, তাদের সবার গায়ে বাংলাদেশের পতাকা দিয়ে তৈরি শার্ট বা শাড়ি। সত্যিকার অর্থে আবেগঘন একটা পরিবেশ তৈরি হলো, বিশেষ করে উপস্থিত প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে। রানা খেয়াল করল, তাদের অনেকেই নীরবে চোখ মুছছে। দেখা গেল, ওর পাশে দাঁড়ানো তৃষার চোখ দুটোও ছলছল করছে।

চারদিকে কোথাও রানা ডাইভার দু'জনকে দেখতে পাচ্ছে না। ব্রিজে যোগদান করে ক্যাপটেন অগাস্টাসের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল ও, লাইনে তিনি আসেননি। অত্যন্ত অস্থির ও উদ্বেগ বোধ করছে রানা, কিন্তু বোটের যাত্রা বন্ধ করার কোন উপায় ওর জানা নেই।

বোট এখনও চ্যানেলে রয়েছে, ফ্লোরিডাকে পিছনে ফেলে নীল-সবুজাভ খোলা সাগরে গিয়ে পড়বে, তবে গতি এখনও খুব মন্থর। সমস্ত প্যাসেঞ্জারকে থিয়েটারে আসন গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, ওখানে বোটের ফার্স্ট অফিসার জ্যাসন জনসন সাবমেরিন ক্রুজ বোটের অপারেশন সম্পর্কে একটা ধারণা দেবে, সেই সঙ্গে ব্যাখ্যা কারবে ইভ্যাকিউয়েশন সিস্টেম।

থিয়েটারের সামনের অংশে, এক প্রান্তে বসেছে তৃষা; রানা বসেছে পিছন দিকটায়, আরেক প্রান্তে। সব মিলিয়ে বোটে ছয়টা কালো পরিবার উঠেছে, কিন্তু পুরুষদের কারও সঙ্গেই কাকাস জাভালার চেহারার কোন মিল নেই।

ফার্স্ট অফিসারের লেকচার শেষ হওয়া মাত্র একসঙ্গে কয়েকটা ঘণ্টা বেজে উঠল, প্যাসেঞ্জারদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের ইভ্যাকিউয়েশন পড স্টেশনে।

মুরল্যান্ড কাজ করছে ইন্সপেকশন টীমের সঙ্গে। এক্সপ্লোসিভ খুঁজছে ওরা, পরীক্ষা করছে কোনও ইকুইপমেন্টের ক্ষতি করা হয়েছে কিনা।

তৃষা রয়েছে রানার সঙ্গে। ওরা পারসার-এর কাছ থেকে তালিকা নিয়ে মিলিয়ে দেখে নিচ্ছে কোন স্টেট রুমে কে উঠেছে, তাদের নাম কি, বয়স কত, পেশা কি ইত্যাদি।

তল্লাশীর কাজ খুব ধীরে এগোচ্ছে। লাঞ্চের সময় দেখা গেল মাত্র অর্ধেক প্যাসেঞ্জার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া সম্ভব হয়েছে। বাকি অর্ধেক প্যাসেঞ্জার আর

ক্রুদের সম্পর্কে এখনও ওরা অন্ধকারে।

'আমার বারবার খালি মনে হচ্ছে,' ক্লান্ত তৃষা বিড়বিড় করে বলল, 'সে বোটে আছে।'

'হয় ছদ্মবেশ নিয়ে ক্রু বা প্যাসেঞ্জার হিসেবে, নয়তো,' বলল রানা, 'বিনা টিকিটে উঠে লুকিয়ে আছে কোথাও।' এক গাদা ফটো পরীক্ষা করছে রানা, প্যাসেঞ্জাররা বোটে ওঠার সময় ক্যামেরাম্যানরা তুলেছে। একটা ছবি আলোর সামনে তুলল ও, প্যাসেঞ্জারের চেহারা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। তারপর ফটোটা ধরিয়ে দিল তৃষার হাতে। 'দেখুন তো, পরিচিত লাগছে?'

ছবিটা বেশ সময় নিয়ে দেখল তৃষা। উল্টোপিঠে লেখা লোকটার নামও পড়ল। তারপর হাসল সে। 'মিল অবশ্যই আছে। তবে একমাত্র সমস্যা হলো, এই জন সিমন একজন শ্বেতাঙ্গ।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ, জানি। চলুন, ড্রইংবোর্ডে ফেরা যাক।'

বিকেল চারটের দিকে স্পীকারের মাধ্যমে গোটা বোটে একটা গান প্রচার করা হলো—'বাই দা সী, বাই দা বিউটিফুল সী।' এ হলো বোটের পানিতে ডুব দেয়ার সংকেত। প্যাসেঞ্জাররা সবাই ছুটল ভিউইংপোর্টের সামনে চেয়ার পাবার জন্যে। ধীরে ধীরে সারফেসের নিচে নেমে আসার সময় বোট একটুও কাঁপল না, গতিও যেমন ছিল তেমনি থাকল। রাশি রাশি বুদ্বুদ তুলে বোট নামতে শুরু করায় সাগরকে মনে হলো উঠে আসছে। উজ্জ্বল আলো ও আকাশ গভীর নীল তরলে পরিণত হতে বুদ্বুদগুলো দ্রুত হারিয়ে গেল।

ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিন কোন শব্দ করে না, কোনরকম ঝাঁকি বা কম্পনও সৃষ্টি করে না; ফলে গতি বা বেগ বা নড়াচড়া সম্পর্কে কারও কোন অনুভূতি নেই। এয়ার রিজেনারেটরগুলো একদিকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করছে, আরেক দিকে ফুসফুসে গ্রহণযোগ্য বোটের বাতাস বিশুদ্ধ ও তাজা করে দিচ্ছে।

যদিও প্রথম দিকে দেখার তেমন কিছু নেই, তারপরও প্যাসেঞ্জাররা নিজেদের পরিচিত পরিবেশের বাইরের সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা জগতের দিকে মগ্ন হয়ে তাকিয়ে থাকল। একটু পরেই দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে এল মাছ, নিজেদের রাজ্যে বিশাল ভেসেলটাকে অনুপ্রবেশ করতে দেখেও তেমন আগ্রহী নয়। ভিউ পোর্টের সামনে দিয়ে উজ্জ্বল হলুদ, বেগুনি আর লাল মাছের ঝাঁক ছুটে যাচ্ছে, প্রতিটি রঙ যেন আলো হয়ে জ্বলছে ওগুলোর গায়ে। লোনাজলের বাসিন্দারা মিষ্টি পানির লেক বা নদীর বাসিন্দাদের চেয়ে অনেক বেশি চোখ-ধাঁধানো। সাব আরও নিচে নামতে ওপর দিকে হারিয়ে গেল মাছের ঝাঁক।

ব্যারাকুডার একটা দল, তাদের লম্বা পিচ্ছিল শরীর এত চকচকে যেন রূপোর পাত দিয়ে মোড়া, অলসভঙ্গিতে বোটের পাশাপাশি সাঁতরাচ্ছে, কালো চোখ খাবার খুঁজছে, নিচের ঠোঁট সামনের দিকে বাড়ানো। ওদের সাঁতার কাটার ভঙ্গিটা সাবলীল ও অনায়াস, বোটের পাশে থাকতে কোন অসুবিধেই হচ্ছে না। তারপর, চোখের পলক পড়া মাত্র, গোটা দল একই সঙ্গে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বোটের পোর্ট সাইডের প্যাসেঞ্জারদের ভাগ্যে জুটল প্রকাণ্ড একটা সানফিশ,

মাঝে মধ্যে এটাকে মোলা মোলা নামেও ডাকা হয়। সাদা ও কমলা রঙের মসৃণ গোলাকার শরীর, দশ ফুট লম্বা, প্রায় ওই রকমই উঁচু, ওজন দুই টনের কাছাকাছি। উঁচু ডরসাল ও এইনাল ফিন বিশিষ্ট এ এক অদ্ভুত দর্শন মাছ, শরীরটা দেখে মনে হবে দৈর্ঘ্যে বাড়তে ভুলে গেছে। বিশাল লেজটা ঠিক মাথার পিছন থেকে বেরিয়ে আছে। অতল গভীরতায় সুবোধ এক দৈত্য, সানফিশ একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল বোটের পিছনে।

ক্রুজ লাইনের তরফ থেকে মেরিন বায়োলজিস্ট রাখা হয়েছে বোটে, কোনও মাছ দেখামাত্র সেটার পরিচয়, চরিত্র, স্বভাব ও অভিবাসন ছক ব্যাখ্যা করছে তারা। সানফিশের পর এল একজোড়া ছোট হ্যামারহেড শার্ক, দুটোর একটাও লম্বায় পাঁচ ফুটের বেশি নয়। দর্শকরা অবাক হয়ে ভাবল একটা মাছের মাথার সামনে কিভাবে এত বড় একটা হাতুড়ি তৈরি হয়, যেটার শেষ মাথায় আবার বসানো রয়েছে অক্ষিগোলক! শার্ক দুটো খুব কৌতূহলী, ভিউ পোর্টের পাশে সাঁতরাচ্ছে, এক চোখে তাকিয়ে আছে অদ্ভুতদর্শন এমারেল্ড মার্লিনের দিকে। বাকি মাছগুলোর মত এরাও একসময় দৈত্যাকার অনুপ্রবেশকারীর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলল, চোখ জুড়ানো একটা ছন্দে লেজ ঝাঁকিয়ে পিচ্ছিল শরীর নিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

তারা ডিজিটাল মিটারে সাবমেরিনের গভীরতা পড়া যায়, প্রতিটি ভিউ পোর্টের পাশে একটা করে বসানো আছে। তা সত্ত্বেও ফার্স্ট অফিসার জনসন স্পীকার সিস্টেমে ঘোষণা করলেন যে এই মুহূর্তে সারফেস থেকে ছয়শো ফুট নিচে রয়েছে তারা, এবং বোট সাগরের তলায় পৌঁছাতে যাচ্ছে। প্যাসেঞ্জাররা একযোগে ভিউ পোর্টের দিকে ঝুঁকে পড়ল, নিচের দিকে তাকাতে দেখতে পেল ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হচ্ছে সাগরের মেঝে, তারপর বোটের নিচে বিস্তৃত হচ্ছে–এমন একটা ভূতল, যেটা সমুদ্র উঠে আসার আগে প্রবালদ্বীপ ছিল, এখন ঢাকা পড়ে আছে প্রাচীন শেল, পলি আর এবড়োখেবড়ো লাভা পাথরে, তার ওপর ছড়িয়ে আছে বহু-বিচিত্র সামুদ্রিক প্রাণ। এই গভীরতায় উজ্জ্বল রঙ হারিয়ে যাবার কারণে সাগরতল ধূসর-সবুজাভ একটা চেহারা পেয়েছে।

সামনের গম্বুজ যেটা ব্রিজ আর কন্ট্রোল রুম হিসেবে কাজ করে, সেখানে দাঁড়িয়ে ক্যাপটেন অগাস্টাস সমুদ্রের মেঝে থেকে পঞ্চাশ ফুট ওপরে রেখে এমারেল্ড মার্লিনকে সাবধানে গাইড করছেন; তাঁর সতর্ক চোখ সারাক্ষণ খুঁজে বেড়াচ্ছে নিচে, সামনে বা দু'পাশে অপ্রত্যাশিত কোন পরিবর্তন দেখা যায় কিনা। রেডার আর সাইড-স্ক্যান সোনার আধ মাইল সামনের ও দু'পাশের মেঝের খবর জানাতে পারে, কাজেই কোর্স বদল করার জন্যে অপারেটররা যথেষ্ট সময় পাবে, অকস্মাৎ পাথর স্তূপের উত্থান দেখলে বোট নিয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে আসতেও সমস্যা হবে না।

পরবর্তী দশ দিনের কোর্স চরম সতর্কতার সঙ্গে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাইভেট একটা ওশানাগ্র্যাফিক সার্ভে কোম্পানিকে দিয়ে চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্তী সাগরের মেঝে স্টাডি করার মাধ্যমে গভীরতা চিহ্নিত করা হয়েছে। সমস্ত ডাটা ব্যবহার করে কমপিউটর একটা নিরাপদ কোর্স তৈরি করেছে, এই মুহূর্তে

সেটাই অনুসরণ করছে ক্যাপটেন অগাস্টাস।

সাগরের মেঝে হঠাৎ নেমে গেল। বোট গভীর একটা ট্রেঞ্চের ওপর চলে এসেছে। এই ট্রেঞ্চের গভীরতা তিন হাজার ফুট–এমারেল্ড মার্লিনের খোলের জন্যে যে সীমা বোট আর্কিটেক্টরা বরাদ্দ করেছে তারচেয়ে দু'হাজার ফুট বেশি। হেলম্-এর দায়িত্ব থার্ড অফিসারের হাতে তুলে দিলেন ক্যাপটেন অগাস্টাস, ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন কমিউনিকেশন অফিসার এগিয়ে আসছে, হাতে একটা মেসেজ।

কাগজটা নিয়ে পড়লেন ক্যাপটেন, চোখ-মুখে প্রশ্নবোধক একটা ভাব ফুটল। 'মিস্টার রানাকে খুঁজে বের করো,' একজন সী ম্যানকে নির্দেশ দিলেন তিনি। 'বলবে আমি তাঁকে ব্রিজে আসার অনুরোধ জানিয়েছি।'

পানির তলার দৃশ্য দেখার আনন্দ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে তৃষা ও রানা এখনও পারলার-এর অফিসে বসে মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে। কেউ বাদ পড়ছে না, ক্রুদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত রেকর্ড খুঁটিয়ে পড়ছে ওরা। খবর পেয়ে তৃষাকে ওখানে রেখে রানা একা উঠে এল ব্রিজে। ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতে ওর দিকে ঝট করে মেসেজটা বাড়িয়ে ধরলেন অগাস্টাস। 'এ থেকে আপনি কি বোঝেন?'

মেসেজটা ইংরেজিতে লেখা, রানা জোরেই পড়ল। বাংলা করলে এরকম হবে, 'আপনার বোটের তলা পরীক্ষা করার জন্যে যে ডাইভারদের নিয়োগ করা হয়েছিল তাদেরকে চ্যানেল সারফেসের নিচে ডক পাইলিং-এর সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে অজ্ঞাত পরিচয় এক বা একাধিক লোক দু'জনকেই পিছন থেকে ছুরি মেরে খুন করেছে, ছুরির ফলা ভেদ করে গেছে তাদের হৃৎপিণ্ড। আপনার জবাবের অপেক্ষায়। ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট জনি ওয়াকার, ফোর্ট লডারডেল পুলিস ডিপার্টমেন্ট।'

অকস্মাৎ অপরাধবোধে আক্রান্ত হলো রানা, কারণ জানে নিজের অজ্ঞাতে ও-ই হফার আর মিলিন্ডাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। 'আমাদের ডেপথ্ কত?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল ও।

'ডেপথ্?' চমকে উঠে পুনরাবৃত্তি করলেন অগাস্টাস। 'আমরা কন্টিনেন্টাল শেলফ্ পার হয়ে গভীর পানিতে চলে এসেছি।' জানালার ওপর বসানো ডেপথ্ গজের দিকে আঙুল তাক করলেন। 'নিজেই দেখুন। আমাদের কীল থেকে সাগরের তলা দু'হাজার চারশো ফুট নিচে।'

'এই মুহূর্তে ঘুরুন!' রানার কথায় তীক্ষ্ণ নির্দেশ। 'দেরি করলে সর্বনাশ ঠেকানো যাবে না, অগভীর পানিতে ফিরে চলুন।'

অগাস্টাস শক্ত পাথরের মূর্তি হয়ে গেলেন। 'আপনার এ কথার মানে?'

'ডাইভারদের খুন করা হয়েছে, কারণ এই বোটের খোলে আটকানো বিস্ফোরক পেয়েছিল তারা। আমি আপনাকে কোন অনুরোধ করছি না, ক্যাপটেন। এই বোটে যারা আছেন তাঁদের সবার প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে ঘুরুন, দেরি হবার আগেই অগভীর পানিতে ফিরে চলুন।'

'আর যদি না যাই?' অগাস্টাস চ্যালেঞ্জ করছেন রানাকে।

রানার চোখ যেন একজোড়া ব্ল্যাকহোলে পরিণত হলো, তীব্র আকর্ষণে ধরে

রেখেছে অনিচ্ছুক ক্যাপটেনের সমস্ত মনোযোগ। যখন মুখ খুলল, মনে হলো স্বয়ং শয়তান কথা বলছে। 'তাহলে, মানবতার নামে, এখানে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনাকে খুন করব আমি, তারপর বোটের কমান্ড নিজের হাতে তুলে নেব।'

ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গেলেন ক্যাপটেন, কেউ যেন তাঁর গায়ে বল্লম গেঁথেছে। ধীরে ধীরে, অত্যন্ত ধীরে ধীরে, ধাক্কাটা সামলে নিলেন তিনি, তাঁর ফরসা মুখে লালচে ঠোঁট প্রসারিত হলো টান টান হাসিতে। ঘুরে হেলমস্‌ম্যানের দিকে তাকালেন; সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বড় হতে হতে গাড়ির চাকার কাভারের আকৃতি পেয়েছে চোখ দুটো। 'বোট ঘোরাও, ফিরে চলো ফুল স্পীডে।' আবার ঘুরলেন। 'এখন আপনি সন্তুষ্ট, মিস্টার রানা?'

'আমার পরামর্শ হলো, ওয়ার্নিং সিগন্যাল দিয়ে প্যাসেঞ্জারদের ইভ্যাকিউয়েশন পড-এ পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

মাথা ঝাঁকালেন অগাস্টাস। 'ধরে নিন পাঠিয়ে দিয়েছি।' তারপর ফার্স্ট অফিসার জনসনের দিকে ফিরে অর্ডার দিলেন, 'ব্লো দা ব্যালাস্ট ট্যাংকস। সারফেসে উঠতে পারলে স্পীড বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যাবে।'

'আসুন প্রার্থনা করি সময় মত যেন পৌঁছাতে পারি আমরা,' বলল রানা, উত্তেজনা একটু কমেছে।

পারসার-এর অফিসে বসে একমনে কাজ করছে তৃষা, ক্রুদের ব্যক্তিগত ফাইলের ভেতর কোন তথ্যগত ফাঁক বা কারচুপি করা হয়েছে কি না খুঁজে দেখছে, এই সময় অনুভব করল অফিসে সে একা নয়। মুখ তুলতেই দেখল, কোন রকম শব্দ না করে এক লোক ভেতরে ঢুকে পড়েছে। লোকটার পরনে গলফ শার্ট আর শর্টস। চেহারায় নিষ্ঠুরতার ছাপ, চোখে শয়তানি হাসি। লোকটাকে দেখামাত্র তৃষার মনে পড়ল, এই প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে রানার সঙ্গে তার একবার আলাপ হয়েছে। লোকটা কোন কথা বলছে না, শুধু হাসছে আর তাকিয়ে আছে। তার মুখটা ভাল করে দেখতে দেখতে আতংকে হিম হয়ে গেল তৃষা। 'আপনার নাম জন সিমন।'

'তুমি আমাকে চেনো?'

'না···ঠিক তা নয়–' তোতলাচ্ছে তৃষা।

'চেনা উচিত। ওয়াটার লিলিতে অল্প সময়ের জন্যে আমাদের দেখা হয়েছিল।'

গোটা ব্যাপারটা দুর্বোধ্য লাগছে তৃষার। ওয়াটার লিলির যে নিগ্রো অফিসার তাকে আর তার বাবাকে খুন করতে চেয়েছিল, সেই লোকের সঙ্গে এই জন সিমনের চেহারা অনেকটাই মিলছে, কিন্তু ওর সামনে দাঁড়ানো সিমন নিগ্রো নয়–শ্বেতাঙ্গ। 'এ সম্ভব নয়···'

'সম্ভব। এবং বাস্তব সত্য।' ক্রূর হাসি চওড়া হলো মুখে। 'তুমি দেখছি রহস্যে হাবুডুবু খাচ্ছ।' হাসতে হাসতেই প্যান্টের পকেট থেকে একটা রুমাল বের করল সে। রুমালের এক কোণ জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে ভেজা অংশটা বাঁ হাতের কব্জিতে ঘষল। সাদা মেকআপ উঠে এল, বেরিয়ে পড়ল নিচের কফি-ব্রাউন ত্বক।

টলমলে একটা ভাব নিয়ে চেয়ার ছাড়ল তৃষা, তারপর চেষ্টা করল দরজার

দিকে দৌড় দিতে। কিন্তু লোকটা তাকে ধরে দেয়ালের সঙ্গে চেপে রাখল। 'আমার নাম কাকাস জাভালা। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার হুকুম দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'সঙ্গে করে···কোথায়?' কেঁদে-ককিয়ে জানতে চাইল তৃষা। জানে ঘটবে না, তারপরও আশা করছে রানা অথবা মুরল্যান্ড কেউ একজন এসে পড়বে।

'কোথায় মানে? বাড়িতে, আবার কোথায়।'

তৃষা এই উত্তরের কোন অর্থ খুঁজে পেল না। সে শুধু লোকটার চোখে ফুটে ওঠা শয়তানি ভাব, নিষ্ঠুরতা আর অশ্লীল দৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন। তারপর অনুভব করল ভেজা একটা কাপড় চেপে ধরা হলো মুখে। তরল জিনিসটার গন্ধ মিষ্টি। তারপর পায়ের নিচে যেন কালো একটা গহ্বর তৈরি হলো, তার ভেতর পড়ে গেল সে।

দুই

ব্যাপারটা এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতা। রানা নিঃসন্দেহ যে খোলের গায়ে অবশ্যই বিস্ফোরক ফিট করা হয়েছে। হফার ও মিলিন্ডা সেগুলো দেখতে পায়, কিন্তু ক্যাপটেন অগাস্টাসকে সাবধান করার আগেই তারা খুন হয়ে গেছে।

পোর্টেবল রেডিওতে মুরল্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করল ও। 'তল্লাশী বন্ধ করে ইন্সপেক্টরদের ডেকে নিতে পারো। বিস্ফোরক জাহাজের ভেতরে রাখা হয়নি।'

'আচ্ছা!' বলে শুধু সাড়া দিল মুরল্যান্ড, তারপর এক ছুটে চলে এল ব্রিজে। 'কি জানো তুমি যা আমি জানি না?' জিজ্ঞেস করল সে, তার পিছু নিয়ে কেমপ্রেসোও ভেতরে ঢুকল।

'এইমাত্র খবর পেলাম ডাইভারদের খুন করা হয়েছে,' বলল রানা।

'এর মানে সর্বনাশটা যে-কোন মুহূর্তে ঘটবে!' মুরল্যান্ড ভয়ে নয়, রাগে কাঁপছে।

'এই ডাইভাররা বোটের তলায় তল্লাশী চালাচ্ছিল?' জানতে চাইল কেমপ্রেসো।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'দেখেশুনে মনে হচ্ছে, বিস্ফোরক ফাটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে আমাদের যখন গভীর পানিতে থাকার কথা।'

'এখন আমরা তাই রয়েছি,' শান্ত সুরে বলল মুরল্যান্ড, চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে ডেপথ্ মিটারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ক্যাপটেনের দিকে তাকাল রানা, কন্ট্রোল কনসোলের সামনে হেলমসম্যানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। 'অগভীর পানিতে ফিরতে কতক্ষণ লাগবে আর?' জিজ্ঞেস করল ও।

'বিশ মিনিট লাগবে ট্রেঞ্চের কিনারা পার হয়ে কন্টিনেন্টাল শেলফে পৌঁছাতে,' জবাব দিলেন ক্যাপটেন। তাঁর বোট সত্যিকার বিপদে পড়েছে, এটা বিশ্বাস করার পর থেকে দরদর করে ঘামছেন তিনি। 'আরও দশ মিনিট পর সারফেসে উঠব আমরা, তখন অগভীর পানিতে পৌঁছাবার জন্যে স্পীড বাড়িয়ে দ্বিগুন করা যাবে।'

বোটের মেইন কনসোলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সীম্যান হঠাৎ গলা চড়িয়ে ডাকল, 'ক্যাপটেন, ইভ্যাকিউয়েশন পডগুলোয় কিছু একটা ঘটেছে।'

ক্যাপটেন ও কেমপ্রেসো দ্রুত এগিয়ে এসে কনসোলের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। ষোলোটা ইভ্যাকিউয়েশন পড-এর প্রতিনিধিত্ব করছে ষোলোটা আলো। তার মধ্যে একটা মাত্র সবুজ হয়ে জ্বলছে, বাকি সবগুলো লাল।

'ওগুলো অ্যাকটিভেট করা হয়েছে!' ক্যাপটেন হাঁপিয়ে উঠলেন।

'অথচ এখনও কেউ ওগুলোয় ওঠেনি,' গম্ভীর গলায় জানাল কেমপ্রেসো। 'এর মানে হলো, বোট থেকে ক্রু ও প্যাসেঞ্জারদের আমরা বের করতে পারব না।'

খোল বিস্ফোরিত হলো, বোটের ভেতর পানি ঢুকল, সেই পানির ভার সাতশো প্যাসেঞ্জার ও ক্রু সহ বোটকে সাগরের গভীর তলায় নামিয়ে নিয়ে গেল–এই দৃশ্য এতই ভয়াবহ যে কল্পনা করাও কঠিন, অথচ আসলে এত বাস্তব যে উড়িয়ে দেয়াও সম্ভব নয়।

রানা জানে ইভ্যাকিউয়েশন পডগুলো যে-ই অ্যাকটিভেট করে থাকুক, সে সম্ভবত ওগুলোর একটা নিয়ে পালিয়েছে। এরমানে হলো, এখন থেকে প্রায় যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরকগুলো ফাটতে পারে। হেঁটে রেডার স্ক্রীনের সামনে চলে এল সে, ওটার পাশেই রয়েছে সাইড-স্ক্যান সোনার ডিসপ্লে। কন্টিনেন্টাল ঢাল ওপরে উঠছে, তবে গতি অত্যন্ত ধীর। ওদের নিচে এখনও পানির গভীরতা এক হাজার ফুট। এমারেল্ড মার্লিন ওই গভীরতার পানির চাপ সহ্য করতে পারবে, সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে খোলটা। কিন্তু ওখান থেকে উদ্ধার পাবার আশা নেই বললেই চলে। সবার চোখ ডেপথ্ মিটারের দিকে, স্থির হয়ে আছে, সবাই মনে মনে প্রতিটি সেকেন্ড গুণছে।

সাগরের মেঝে অসহ্য ধীরগতিতে ওপরে উঠছে। সারফেস ভেঙে মাথাচাড়া দিতে বোটের আর মাত্র একশো ফুট বাকি। কন্ট্রোলরুমে উপস্থিত সবার স্বস্তির নিঃশ্বাস একযোগে শোনা গেল এমারেল্ড মার্লিন কন্টিনেন্টাল শেলফ-এর কিনারা পার হয়ে আসতে, সেই সঙ্গে বোটের তলা থেকে সাগরের তলার দূরত্ব কমে এসে দাঁড়াল ছ'শো ফুটে। ভিউপোর্টের বাইরে পানি এখন আলোকিত, সূর্যের নিচে আলোড়িত সারফেস চকচক করছে।

'খোলের নিচে গভীরতা পাঁচশো পঞ্চাশ ফুট, আরও কমছে,' ঘোষণা করল ফার্স্ট অফিসার।

কথাগুলো মাত্র মুখ থেকে বেরিয়েছে, অসুস্থকর প্রচণ্ডতার সঙ্গে কেঁপে উঠল বোট। প্রতিক্রিয়া প্রকাশের সময় পাওয়া গেল না, অবধারিত ধ্বংসযজ্ঞ এবং ব্যাপক প্রাণহানি নিয়ে কথা বলবার সুযোগও নেই। বোট মোচড় খাচ্ছে, নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে। আধুনিক প্রযুক্তির বিচারে অনেক এগিয়ে থাকা

এঞ্জিন–যেগুলোর আবিষ্কার ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের মহৎ কীর্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছিল–বোটের তলায় বিস্ফোরণে সৃষ্ট ফাটল দিয়ে ক্ষুধার্ত সাগর ভেতরে ঢুকে পড়ায় থেমে গেল।

এমারেল্ড মার্লিন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, মৃদু স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওটাকে। ধীরে ধীরে, তবে ডুবে যাচ্ছে ঠিকই। বোটের ভেতর টন-কে-টন পানি ঢুকছে, যদিও কন্ট্রোল রুমের লোকজন এখনও জানে না ঠিক কোত্থেকে বা কত বড় ফাঁক দিয়ে। সারফেস এত কাছে, মনে হয় যেন হাতের ছড়ি দিয়ে নাগাল পাওয়া যাবে।

ক্যাপটেন অগাস্টাস নিজেকে কোন মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছেন না। তিনি জানেন তাঁর বোট ডুবে যাচ্ছে। 'এঞ্জিন রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করে চীফকে ড্যামেজ সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে বলো!' সেকেন্ড অফিসারকে নির্দেশ দিলেন তিনি।

জবাব এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। 'চীফ এঞ্জিনিয়ার রিপোর্ট করলেন, এঞ্জিন রুমে পানি ঢুকছে। ব্যাগেজ কমপার্টমেন্টেও পানি ঢুকছে, তবে খোল এখনও অক্ষত। পাম্পগুলো উনি ফুল ক্যাপাসিটিতে চালাচ্ছেন। তিনি আরও রিপোর্ট করলেন, সামনের দিকে বিস্ফোরণের ফলে ব্যালাস্ট ট্যাংক পাম্প সিস্টেমও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ট্যাংকগুলোয় পানি ঢুকছে ইগজস্ট টিউব দিয়ে। স্রোত বন্ধ করার সম্ভাব্য সব কিছু করছে ক্রুরা, কিন্তু পানি খুব দ্রুত ওপরে উঠছে, ওদেরকে সম্ভবত এঞ্জিন রুম ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। দুঃখিত, সার, চীফ বলছেন–বোট নিউট্রাল বয়ান্সি হারাচ্ছে অথচ তাঁর কিছু করার নেই।'

'ওহ্, গড!' কন্ট্রোল কনসোলে দাঁড়িয়ে থাকা একজন তরুণ নাবিক বিড়বিড় করল। 'আমরা ডুবে যাচ্ছি!'

অগাস্টাস নির্দেশ দিলেন, 'চীফকে সব ক'টা ওয়াটারটাইট দরজা বন্ধ করে দিতে বলো। যতক্ষণ সম্ভব সবগুলো জেনারেটর চালাতে হবে।' এতক্ষণে রানার দিকে তাকালেন তিনি–রানা নিশ্চুপ, চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই–তারপর বললেন, 'এবার, মিস্টার রানা, আমাকে বোধহয় শুনতে হবে–"আমি আগেই বলেছিলাম", তাই না?'

রানার ভাবলেশহীন পাথুরে চেহারা থমথম করছে, শুধু চোখ দেখে বোঝা যায় মাথার ভেতর তুমুল একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে; বোট, প্যাসেঞ্জার আর ক্রুদের বাঁচাবার প্রতিটি সম্ভাবনা দ্রুত বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখছে ও। ওর এই ভাব ও আচরণের সঙ্গে মুরল্যান্ড পরিচিত। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ও। 'খুশি হতাম যদি আমার কথা না ফলত।'

'বটম কামিং আপ!' ফার্স্ট অফিসার জনসনের চোখ মুহূর্তের জন্যেও রেডার ও সাইড-ক্যান সোনার ডিসপ্লে থেকে সরেনি। কথাটা মুখ থেকে বেরুতে যা দেরি, সাগরের মেঝের সঙ্গে ধাক্কা খেলো এমারেল্ড মার্লিন। ধাতব গোঙানির কর্কশ শব্দ শোনা গেল। ঝাঁকি খেলো সবাই। নরম পলিতে ধীরে ধীরে স্থির হলো বোট। পানি ঘোলা হয়ে যাওয়ায় ভিউ পোর্টের বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

কি ঘটছে প্যাসেঞ্জারদের জানাবার জন্যে সার দিয়ে ক্লাসে বসিয়ে লেকচার দিতে হলো না, তারা নিজেরাই বুঝে নিল জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নটা বাস্তবে

শারগত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও প্যাসেঞ্জার ডেকগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়াটারটাইট থাকল আর ক্রুদের দেখে মনে হলো না তারা ভয় পেয়েছে, ততক্ষণ কেউ আতংকে দিশেহারাও হলো না। স্পীকার সিস্টেমে ক্যাপটেন অগাস্টাসের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন এমারেল্ড মার্লিন পাওয়ার হারালেও, পরিস্থিতি কিছুক্ষণের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে আসবে। এই আশ্বাসে অবশ্য সবাই আস্থা রাখতে পারল না, বিশেষ করে যে-সব প্যাসেঞ্জার ও ক্রু দেখল যে প্রায় সবগুলো পড চেম্বারই খালি। অনেককেই উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। কেউ কেউ ভিউ পোর্ট ছেড়ে নড়েনি, পলি সরে যাবার পর মাছেদের ছুটোছুটি দেখছে। কেউ কেউ লাউঞ্জে ফিরে গিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছে, হাতে ব্রান্ডি বা হুইস্কির গ্লাস–বোট কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে পরিবেশন করছে।

ক্যাপটেন অগাস্টাস আর তাঁর অফিসাররা ইমার্জেন্সির সময় কি করণীয় পড়ে দেখছেন। এ ম্যানুয়েল যারা লিখেছে তাদের কোন ধারণা ছিল না সাতশো আদম সন্তানকে নিয়ে একটা সাবমেরিন ক্রুজ লাইনার সাগরের তলায় নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে পড়ে থাকলে কি করতে হবে, কাজেই এই পাঠ থেকে কাজে লাগানোর মত কিছু পাওয়া গেল না।

শব্দ পরীক্ষা করার জন্যে খোলে আঘাত করা হচ্ছে, আওয়াজ শুনে সিদ্ধান্তে আসা হলো ওটার প্রায় পুরো অংশ এখনও ওয়াটারটাইট। নিশ্চিত হয়ে ক্রুরা জানাল যে বাল্কহেডের প্রতিটি দরজা বন্ধ করা হয়েছে। এঞ্জিন রুম আর ব্যাগেজ কমপার্টমেন্টের পানি এঞ্জিনিয়ারিং ক্রুরা পাম্প করে বের করে দিচ্ছে। ভাগ্যই বলতে হবে যে প্রপালশান ছাড়া বাকি কোন সিস্টেমই বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

ক্যাপটেন অগাস্টাস কমিউনিকেশন রুমে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে বসে আছেন, নেশাগ্রস্ত মাতালের মত লাগছে তাঁকে। নিজের ওপর জোর খাটিয়ে কোম্পানি হেডকোয়ার্টার, কোস্টগার্ড ও পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে যে-কোন শিপের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা চালালেন। তারপর এমারেল্ড মার্লিনের পজিশন জানিয়ে একটা মেডে কল প্রচার করলেন। আর কিছু করার নেই, চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। প্রথমে ভাবলেন, সাগরে তাঁর দীর্ঘদিনের ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে গেল। তারপর উপলব্ধি করলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর ক্যারিয়ার কত তুচ্ছ একটা ব্যাপার। তার প্রথম দায়িত্ব প্যাসেঞ্জার আর ক্রু। 'ক্যারিয়ারের নিকুচি করি!' বলে ঝট করে দাঁড়ালেন তিনি, ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ একটা রিপোর্ট পাবার জন্যে প্রথমে ঢুকলেন এঞ্জিন রুমে, তারপর গোটা বোটে ঘুরে ঘুরে প্যাসেঞ্জারদের আশ্বাস দিলেন এখনও কেউ তাঁরা মারাত্মক কোন বিপদে পড়েননি। সবাইকে একই গল্প শোনালেন–ব্যালাস্ট ট্যাংকে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, মেরামতের কাজ শুরু করা হয়েছে।

মুরল্যান্ড ও কেমপ্রেসোকে নিয়ে ইভ্যাকিউয়েশন পড ডেকে চলে এল রানা। ইন্সপেকশন প্যানেলগুলো খুলে সিস্টেমটা চেক করে দেখছে কেমপ্রেসো। এই আইরিশ লোকটার দশাসই কাঠামোর মধ্যে আশ্বস্ত করার মত কি যেন একটা আছে। নিজের কাজ খুব ভাল বোঝে সে। ইন্সপেকশন শুরু করেছে পুরো পাঁচ মিনিটও হয়নি, খোলা প্যানেলগুলোর সামনে থেকে পিছিয়ে এসে ধপ্ করে

চেয়ারে বসল, বড় করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'যেই ইভ্যাকিউয়েশন পড অ্যাকটিভেট করে থাকুক, লোকটা এই কাজে দক্ষ। ব্রিজের দিকে যে সার্কিট গেছে সেটাকে এড়িয়ে ইমার্জেন্সি ম্যানুয়াল কন্ট্রোল ব্যবহার করে পডগুলো অ্যাকটিভেট করেছে। সম্ভবত ভাগ্যক্রমেই, একটা পড রিলিজ হতে ব্যর্থ হয়।'

'তাতে আমি কোন সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি না,' বিড়বিড় করল মুরল্যান্ড।

হতাশ একটা ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। 'শুরু থেকেই আমাদের চেয়ে দু'কদম এগিয়ে থাকছে ওরা। ওদের প্ল্যানিংকে আমি এ-প্লাস না হলেও, এ তো বলবই।'

'ওরা কারা?' জানতে চাইল কেমপ্রেসো।

'যারা মশা-মাছির মত সহজেই মানুষ খুন করতে পারে।'

'কিন্তু এর তো কোন কারণ নেই!'

'উন্মাদ পশুদের কারণের দরকার হয় না।'

'একটা পড যখন আছে,' বলল মুরল্যান্ড। 'ওটায় বাচ্চাদের তোলা যায়।'

'নির্দেশটা ক্যাপটেনের কাছ থেকে আসতে হবে,' বলল রানা, তাকিয়ে আছে অবশিষ্ট পডটার দিকে। 'প্রশ্ন হলো, ওটায় আমরা ক'জনকে জায়গা দিতে পারব?'

এক ঘণ্টা পর অকুস্থলে একটা কোস্টগার্ড কাটার এসে পৌঁছাল। এমারেল্ড মার্লিন থেকে রিলিজ করা টেলিফোন লাইন সহ কমলা রঙের মার্কার বয়াটা পানি থেকে তুলল ওরা, তারপর যোগাযোগ করল। এতক্ষণে ক্যাপটেন অগাস্টাস প্যাসেঞ্জারদের থিয়েটার হলে ডেকে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলেন। বিপদের ঝুঁকি ও মাত্রা যতটুকু পারা যায় কমিয়ে বললেন। তারপর জানালেন কোম্পানির বিধি হলো ইমার্জেন্সি দেখা দিলে প্রথমে বাচ্চাদের সারফেসে পাঠাতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিবাদ শুরু হলো। সবারই প্রশ্ন আর অভিযোগ আছে। কিছু করার নেই, অস্থির ও আতংকিত না হবার পরামর্শ দিয়ে ব্রিজে ফিরে গেলেন অগাস্টাস।

পারসারের অফিসে বসে কমপিউটরে হিসেব করছে ওরা ম্যানুফাকচারার-এর উল্লেখ করা সেফ লিমিট অমান্য করে কত বেশি বাচ্চাকে তোলার পরও পডটা সারফেসে ভেসে উঠতে পারবে। রানার সঙ্গে মুরল্যান্ড আর কেমপ্রেসোও রয়েছে। তবে তৃষা কি করছে দেখে আসার জন্যে একটু পর বেরিয়ে গেল মুরল্যান্ড।

'বোটে আমাদের বাচ্চার সংখ্যা কত হবে?' জিজ্ঞেস করল কেমপ্রেসো।

প্যাসেঞ্জার লিস্টের ওপর চোখ বুলিয়ে সংখ্যাগুলো যোগ করল রানা। 'আঠারো বছরের নিচে চুয়ান্নজন।'

'গড় ওজন জনপ্রতি একশো ষাট পাউন্ড ধরে পঞ্চাশজন লোককে জায়গা দেয়ার ডিজাইন অনুসারে প্রতিটি পড তৈরি করা হয়েছে। সর্বমোট ওজন সীমা আট হাজার পাউন্ড। বোঝা এর চেয়ে ভারী হয়ে গেলে পড সারফেসে উঠবে না।'

'বাচ্চাদের ওজন আমরা অর্ধেক ধরতে পারি, অর্থাৎ আশি পাউন্ড।'

'হাতে চার হাজার পাউন্ড থাকছে, ফলে কিছু মায়েদেরও জায়গা দেয়া যাবে' বলল কেমপ্রেসো–ভাবতে তার অদ্ভুত লাগছে যে ওদের আলোচনার বিষয় কাদের

জীবন রক্ষা করা হবে, কাদের হবে না।

'মায়েদের ওজন গড়ে একশো চল্লিশ পাউন্ড ধরুন, তাহলে প্রায় ঊনত্রিশজনকে তোলা যাবে।'

বাচ্চাসহ পরিবারগুলোর সংখ্যা জানার জন্যে কেমপ্রেসো কমপিউটরের বোতামে চাপ দিল। 'সব মিলিয়ে বোটে মায়ের সংখ্যা সাতাশ,' উৎসাহের সঙ্গে বলল সে। 'ওপরওয়ালার দয়া, সব বাচ্চাগুলোকে মায়ের সঙ্গেই পাঠিয়ে দিতে পারব আমরা।'

তারপরও দু'একজনের জায়গা হবে,' বলল রানা।

তা হবে, কিন্তু বাকি ছয়শো সতেরোজন প্যাসেঞ্জারকে আমরা টস করতে বলতে পারি না।'

'না,' বলল রানা। 'আমাদের কোন একজনকে পাঠাতে হবে।'

'কেন?'

এখানকার পরিস্থিতির ডিটেলস্ রিপোর্ট ওপরে পৌছানো দরকার, আন্ডারওয়াটার কমিউনিকেশনের মাধ্যমে যা পুরোপুরি সম্ভব নয়।'

'আমার এখানে থাকাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ,' জোর দিয়ে বলল কেমপ্রেসো।

ঠিক এই সময় ফিরে এল মুরল্যান্ড। চেহারাই বলে দিল মূর্তিমান একটা দুঃসংবাদ। 'তৃষা নিখোঁজ,' বলল সে। 'রীতিমত সার্চ পার্টি দিয়ে তল্লাশী চালানো হচ্ছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাকে কোথাও পাওয়া যায়নি।'

'কি বলছ তুমি!' প্রায় আঁতকে উঠল রানা। মুরল্যান্ডের কথা অবিশ্বাস করেনি ও, মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ জাগেনি যে সে ভুল করতে পারে। ওর মনই গাইছে কথাটা সত্যি। হঠাৎ করে স্মৃতির পর্দায় একজন প্যাসেঞ্জারের ছবি ভেসে উঠল। প্যাসেঞ্জার লিস্টটা কমপিউটরের মেমোরিতে আছে, ও শুধু জন সিমনের নামটা টাইপ করল।

মনিটর জুড়ে ফুটে উঠল সিমনের ছবি। ফটোটা তোলা হয়েছে সে যখন গ্যাঙওয়ে থেকে বোটের ডেকে পা রাখছিল। প্রিন্ট কী-তে চাপ দিল রানা। একটু পরই প্রিন্টার থেকে বেরিয়ে এল তার কালার ইমেজ।

মুরল্যান্ড ও কেমপ্রেসো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল, গভীর মনোযোগের সঙ্গে ছবিটা পরীক্ষা করছে রানা, মনে মনে মিলিয়ে দেখছে লাল ফকার পাইলটের সঙ্গে এই লোকের চেহারায় কি কি অমিল আছে।

ফটোটা নিয়ে একটা ডেস্কের সামনে চলে এল রানা, একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে লোকটার মুখ কালো করছে। কাজটা শেষ হতে ওর অনুভূতি হলো পেটে কেউ যেন ঘুসি মেরেছে।

'বোটেই ছিল সে। ধরা পড়েনি আমার ভুলে।'

কিছুই জানা নেই, কেমপ্রেসো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কার কথা বলছেন বলুন তো?'

নিউ ইয়র্কের ঘটনাটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা—প্লেন ভর্তি একদল প্রতিবন্ধী শিশুকে হত্যা করতে চেয়েছিল লোকটা। খালি ইভ্যাকিউয়েশন পড রিলিজ করা আর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বোটকে সাগরের তলায় নামিয়ে দেয়ার জন্যেও

সে-ই দায়ী। সবশেষে বলল, 'কোন সন্দেহ নেই যে একটা পড নিয়ে পালাবার সময় তৃষাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।'

কথা না বলে রানার কাঁধে একটা হাত রাখল মুরল্যান্ড। রানার কতটুকু খারাপ লাগছে, উপলব্ধি করতে পারছে সে। তৃষা শুধু একটা মেয়ে নয়, একজন বাঙালী; তার ওপর জগৎ-বিখ্যাত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের কাতারে সামিল হবার যোগ্য এক বঙ্গ সন্তানের কন্যা। মুরল্যান্ডের এ-ও জানা আছে যে বিজ্ঞানী ভদ্র-লোকের উদ্ভাবিত ও আবিষ্কৃত বিভিন্ন সিস্টেম ও ডিজাইন কারা যেন মেরে দেয়ার তালে আছে। আবিষ্কারগুলো উদ্ধার করার একটা গুরুদায়িত্ব চেপেছে রানার কাঁধে, সেই দায়িত্ব পালন করতে হলে তৃষাকে ওর হারানো চলে না। সেই সঙ্গে মুরল্যান্ড নিজের ওপরও খানিকটা অসন্তুষ্ট হলো। এ ব্যর্থতা একা শুধু রানার নয়, তারও–তৃষার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সে-ও তো ব্যর্থ হয়েছে। মুরল্যান্ডের মনে হলো, তৃষার যদি কিছু হয়ে যায় নিজেকে সে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না।

সিমনের স্টেট রুমের নম্বরটা আরেকবার দেখে নিয়ে দ্রুত প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা, পিছু নিয়ে মুরল্যান্ড ও কেমপ্রেসোও। স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে চাবি চাওয়ার সময় ও ধৈর্য কোনটাই নেই, ছুটে গিয়ে লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলল। স্টুয়ার্ডেস কামরাটা পরিষ্কার করে গুছিয়ে রেখে গেছে, কিন্তু কোথাও কোন লাগেজের চিহ্নমাত্র নেই। ড্রয়ার আর ড্রেসার খুলে দেখল রানা। সব খালি। ক্লজিট খুলে ওপরের শেলফে সাদা একটা জিনিস দেখল মুরল্যান্ড। হাত তুলে রোল করা কাগজটা নামিয়ে আনল, তারপর বিছানায় ফেলে মেলে ধরল।

'বোটের ব্লুপ্রিন্ট,' বিড়বিড় করল কেমপ্রেসো। 'এ-সব সে পেল কিভাবে?'

রানার সারা শরীরে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, সিমনের আরও একটা অ্যাসাইনমেন্ট ছিল তৃষাকে কিডন্যাপ করা। 'লোকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজ অপারেশন থেকে সাহায্য পাচ্ছে। এই বোটের প্রতিটি সিস্টেম, ইকুইপমেন্ট, ডেক, বাল্কহেড ও স্ট্রাকচার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল তার।'

'সেজন্যেই জানত কোথায় বিস্ফোরক বসাতে হবে, আর কিভাবে ম্যানুয়ালি অ্যাকটিভেট করা যাবে ইভ্যাকিউয়েশন পড,' বলল কেমপ্রেসো।

'এখানে আর কিছু দেখার নেই আমাদের,' বলল মুরল্যান্ড। 'করারও খুব বেশি কিছু নেই। সারফেসে কোস্ট গার্ড পৌঁছেছে, ওদেরকে বলতে হবে পডটা দেখতে পেলে তা থেকে ওই শয়তানের চেলা আর তৃষাকে যেন নিজেদের জাহাজে তুলে নেয়।'

তৃষাকে নিয়ে সিমনের পলায়ন রূঢ় বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিলেও নিজের অযোগ্যতা আর অসাফল্য রানাকে কষ্ট দিচ্ছে। সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করছে ও, মেয়েটাকে উদ্ধার করার কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছে না। চুপসানো বেলুনের মত একটা চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল।

আরও ভয়ংকর একটা ব্যাপার একেবারে কাবু করে ফেলেছে রানাকে। সবগুলো পড ভেসে গেছে, ফিরিয়ে এনে ওগুলোয় লোকজনকে তোলার কোনই

উপায় নেই। তাহলে এই ডুবে যাওয়া বোট থেকে ছয়শোর ওপর মানুষকে বাঁচাবার কি হবে? প্রচণ্ড অস্থিরতা নিয়ে আরও কয়েক সেকেন্ড ওখানে বসে থাকল রানা, তারপর নিঃশব্দে ও ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কেমপ্রেসোর দিকে মুখ তুলে তাকাল। 'আপনি বোটের প্রতিটি ইঞ্চি চেনেন,' গলায় নরম সুর–কোন প্রশ্ন করেনি, ব্যাপারটা শুধু উল্লেখ করল।

কেমপ্রেসো ইতস্তত করছে, রানা আরও কি জানতে চাইবে জানে না। 'হ্যাঁ, এই বোট আমার খুব ভাল করে চেনা।'

'পড ছাড়া অন্য কোন ইভ্যাকিউয়েশন সিস্টেম নেই?'

'আপনার প্রশ্ন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'শিপইয়ার্ডের বোটবিল্ডাররা চেম্বার রেসকিউ-এর জন্যে একটা ব্যাকআপ এয়ারলক সিস্টেম ইনস্টল করেনি?'

'আপনি কি খোলের মাথায় বিশেষভাবে ডিজাইন করা হ্যাচের কথা বলছেন?'

'ঠিক তাই।'

'হ্যাঁ, আছে একটা। তবে সব লোককে ওই পথে উদ্ধার করা সম্ভব নয়, কারণ তার আগেই আমাদের অক্সিজেন শেষ হয়ে যাবে।'

'এ-কথা আপনি কিভাবে বলেন?' প্রশ্ন করল মুরল্যান্ড। 'এখনই যদি রেসকিউ অপারেশন শুরু করা হয়...'

'আপনারা জানেন না?'

'আপনি না বললে জানব কোত্থেকে,' রানার গলা প্রায় কর্কশ।

'এমারেল্ড মার্লিনের ডিজাইন এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, পানির নিচে চারদিনের বেশি থাকতে পারবে না। তারপর খুব তাড়াতাড়ি বাতাস দূষিত হয়ে যাবে।'

মুরল্যান্ড অবাক হয়ে বলল, 'কেন, এয়ার জেনারেটরগুলোর কাজই তো ভেতরের পরিবেশ বিশুদ্ধ করা!'

'করেও বিশুদ্ধ,' বলল কেমপ্রেসো। 'কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর ছয়-সাতশো লোকের কার্বন ডাইঅক্সাইড বদ্ধ একটা জায়গার ভেতর জমে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে ফিল্টার আর স্ক্রাবার কুলিয়ে উঠতে পারে না। এরপরই এয়ার পিউরিফিকেশন সিস্টেম ভেঙে পড়তে শুরু করে।' গম্ভীর মুখ, ভারী কাঁধটা ঝাঁকাল। 'এমন কি এসব আলোচনারও কোন গুরুত্ব থাকবে না পানি যদি জেনারেটরের নাগাল পেয়ে যায়। পাওয়ার নেই মানে সব অচল, এয়ার রিজেনারেশন ইকুইপমেন্টও কাজ করবে না।'

'ভাগ্য ভাল হলে, চারদিন,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'আসলে সাড়ে তিন দিন, কারণ আমরা পানির নিচে ডুব দেয়ার পর এরইমধ্যে প্রায় বারো ঘণ্টা পার হয়ে গেছে।'

'নেভির কাছে একটা ডীপ সাবমারশন রেসকিউ ভেসেল আছে,' বলল মুরল্যান্ড, 'ওই কাজটা অনায়াসে করতে পারবে।'

'তা পারবে–কিন্তু অনুরোধ করা, অনুমোদন পাওয়া, অপারেটিং টীমসহ ওটাকে এখানে নিয়ে আসা, তারপর রেসকিউ অপারেশন শুরুর প্রস্তুতি নেয়া, সব

মিলিয়ে চারদিন লেগে যেতে পারে।' কেমপ্রেসো উত্তেজিত নয়, কথা বলছে শান্ত সুরে। 'ওটাকে নিচে নামাতে হবে, তারপর এয়ার এস্কেপ চেম্বারের সঙ্গে লক করতে হবে। এ-সব কাজ সারার পর হাতে যে সময় থাকবে তাতে মাত্র হাতে গোনা কয়েকজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।'

মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল রানা। 'বব, বাচ্চা আর মায়েদের নিয়ে ওপরে উঠতে হবে তোমাকে।'

সম্ভবত পাঁচটা অবিশ্বাস ভরা সেকেন্ড পার হয়ে গেল, বোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল মুরল্যান্ড। আহত বিস্ময়ের সঙ্গে ব্যাপারটা যখন বোধে ধরা দিল, তার গলা থেকে ঝরে পড়ল একাধারে রাগ, ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও তিরস্কার। 'মিসেস মুরল্যান্ডের ছেলে কাপুরুষ নয়! তুমি জানো, জাহাজ থেকে পালিয়ে মেয়েছেলেদের স্কার্টের আড়ালে লুকাবার বান্দা আমি অন্তত নই!'

'আরে, দূর, আগে শুনবে তো!' রানার সুর নরম। 'তুমি সারফেস থেকে আমার সঙ্গে কাজ করলে সবাইকে বাঁচানোর একটা উপায় হয়তো পেয়ে যাব আমরা।'

মুরল্যান্ড বলতে যাচ্ছিল, তুমি কেন যাচ্ছ না? কিন্তু কি ভেবে প্রশ্নটা না তুলে রানার যুক্তিই সঠিক বলে মেনে নিল। 'ঠিক আছে, সারফেসে পৌঁছালাম, তারপর?'

'প্রথম কাজ, প্রথম গুরুত্ব–এখানে আমরা যাতে বাতাস বিশুদ্ধ করার জন্যে খোলা একটা লাইন পাই।'

'পাঁচশো ফুট হোস পাইপ লাগবে, কোথায় পাব সেটা? প্রায় সাতশো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তাজা বাতাস পাম্প করতে পারবে এমন মেশিনই বা কে দেবে আমাকে? ডুবন্ত একটা বোটের সঙ্গে সিস্টেমটা জোড়াই বা কিভাবে লাগাব?'

পুরানো বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আওয়াজ না করে হাসছে রানা, বলল, 'তোমাকে যদি আমি চিনে থাকি, একটা না একটা ব্যবস্থা ঠিকই তুমি করে ফেলবে।'

তিন

তলিয়ে যাওয়া এমারেল্ড মার্লিনের ওপরের সারফেসে প্রথম পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে সব মিলিয়ে চারটে ভেসেল পৌঁছাল–কোস্ট গার্ড কাটার হেলপার ওয়ান, সৌদি অয়েল ট্যাংকার কিং ফয়সল, ইউ.এস. নেভির টাগ বোট হারবিঞ্জার আর কোস্টাল কার্গো ক্যারিয়ার ফ্যাবিউলাস। পরে এগুলোর সঙ্গে যোগ দিল এক ঝাঁক সেইলিং ইয়ট আর পাওয়ারবোট, বেশিরভাগ মায়ামি থেকে এসেছে, যতটা না উদ্ধার অভিযানে অংশ নিতে তারচেয়ে বেশি কৌতূহলে। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনও নুমার একটা স্যালভিজ শিপকে রওনা হবার নির্দেশ দিয়েছেন, তবে সেটা পৌঁছাতে আরও

বারো ঘণ্টা সময় লাগবে।

নেভির সাবমারশন রেসকিউ ভেসেল ডীপ ওয়ার্কার আসছে পুয়ার্টো রিকো থেকে ওটাকে নিয়ে আসছে মাদারশিপ গোল্ডেন মেডিফিস। পুয়ার্টো রিকোয় প্র্যাকটিস মিশনে ছিল ওগুলো।

কোস্ট গার্ড ভেসেল হেলপার ওয়ানের মাধ্যমে ক্যাপটেন অগাস্টাস গোল্ডেন মেডিফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাগরের তলায় পড়ে থাকা নিজের বোটের অসহায় অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করলেন। গোল্ডেন মেডিফিশ থেকে খুঁটিনাটি জানার জন্যে বেশকিছু প্রশ্নও করা হলো।

সাগরের তলায়, এমারেল্ড মার্লিনে কি ঘটছে? কেমপ্রেসো রিলিজ মেকানিজম মেরামত করার পর ইভ্যাকিউয়েশন পডে প্যাসেঞ্জারদের বাচ্চাকাচ্চা আর তাদের মায়েদের এই মাত্র তোলা হলো। বাবা, কোন কোন ক্ষেত্রে দাদা-দাদী, ভেজা চোখে বিদায় জানালেন। ছোট্ট জায়গার ভেতর ঠাসাঠাসি ভিড় দেখে একেবারে যারা শিশু তারা কান্নার প্রতিযোগিতা শুরু করল। ওদেরকে শান্ত করা অসম্ভব না হলেও, কঠিন হয়ে দাড়াল।

পুরুষমানুষ বলতে যেহেতু সে একাই যাচ্ছে, তাই ক্রন্দনরত শিশু আর তাদের অস্থির হয়ে ওঠা মায়েদের শান্ত করার কঠিন দায়িত্বটা ববি মুরল্যান্ডকেই পালন করতে হচ্ছে। সবাইকে ফেলে একা যেতে হওয়ায় মন এখনও খুব খারাপ তার। 'আমার অনুভূতি সেই লোকটার মত, যে মেয়েদের কাপড় পরে টাইটানিকের লাইফবোটে উঠেছিল।'

এক হাতে তার কাঁধটা জড়িয়ে ধরল রানা। 'সারফেস থেকে রেসকিউ অপারেশন চালানো অত্যন্ত কঠিন হবে, ওখানে ঠিক তোমার মত দায়িত্ববান একজনকে খুব দরকার আমার।'

'এই অপারেশন ব্যর্থ হলে সারাজীবন আধমরা হয়ে বেঁচে থাকব,' কাতর গলায় বলল মুরল্যান্ড, সুরে গাঢ় আবেদন। 'মনে থাকবে তো, তোমাকে কিন্তু ওপরে ফিরতেই হবে? যদি সব ব্যর্থ হয়, তুমি উঠতে না পারো...'

'আমি পারব,' বন্ধুকে আশ্বাস দিল রানা, 'যদি তুমি ওপর থেকে নেতৃত্ব দাও।'

শেষ আরেকবার হ্যান্ডশেক করল ওরা, কাঁধে চাপ দিয়ে ইভ্যাকিউয়েশন পডের একমাত্র খোলা সীটটায় মুরল্যান্ডকে বসিয়ে দিল রানা। সিটকাতে শুরু করা মুরল্যান্ডের কোলে এক মা তার ক্রন্দনরত বাচ্চাকে জোর করে ঠেলে দিল, দৃশ্যটা দেখেও প্রাণপণ চেষ্টা করায় না হেসে থাকতে পারছে রানা। খুদে মানবশিশুটিকে শব্দদূষণ সৃষ্টি করার একটা যন্ত্র বলে মনে হলো ওর, তার কান্না দেখে একটাই উপসংহারে পৌছানো যায়–নিশ্চয়ই তাকে একরাশ ভাঙা কাঁচের ওপর বসিয়ে রাখা হয়েছে। মুরল্যান্ডের দিকে তাকাতে রানার মনে হলো, এমন অসহায় চেহারা জীবনে খুব কমই দেখেছে সে। এই সময় হিস্‌স্‌ শব্দ করে পডের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, সেই সঙ্গে লঞ্চ সিকোয়েন্স অ্যাকটিভেট করা হলো। ষাট সেকেন্ড পর হু-উ-উ-উ-স্‌-স্‌ শব্দের সঙ্গে সারফেস অভিমুখে রওনা হয়ে গেল পড, ওপর দিকে ভেসে যাচ্ছে খুবই ধীরগতিতে, কারণ ওটার ওজন বয়ান্সি লিমিটের প্রায় সমান।

'এরপর বোধহয় অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের,' বলল কেমপ্রেসো, রানার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

'আছে,' বলল রানা। 'আমরা প্রস্তুতি নেব।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে কেমপ্রেসো জানতে চাইল, 'কোত্থেকে শুরু করব?'

'এয়ারলক এস্কেপ চেম্বার।'

'কি জানতে চান আপনি?'

'নেভির সাবমারসিবল্ রেসকিউ ভেসেলের হ্যাচের সঙ্গে ওটার হ্যাচ খাপ খাবে কিনা।'

মাথা ঝাঁকাল কেমপ্রেসো। 'এ-ধরনের ইমার্জেন্সির কথা মনে রেখে ওটার ডিজাইন নেভির স্পেকিফিকেশন ধরেই তৈরি করা হয়েছে, কাজেই খাপ না খাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।'

এরইমধ্যে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা। 'পথ দেখান। আমি নিজে একবার ওটা চেক করে দেখতে চাই।'

এলিভেটরে তুলে আপার ডেকে নিয়ে এল কেমপ্রেসো রানাকে। ডাইনিং রুমকে পাশ কাটিয়ে, গ্যালির ভেতর দিয়ে এগোল ওরা–দেখল শেফরা এমন ব্যস্ততার সঙ্গে ডিনার তৈরি করছে যেন এমারেল্ড মার্লিনের আনন্দমুখর যাত্রা কখনোই ব্যাহত হয়নি। প্রকৃত পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখলে, এখানকার দৃশ্যটা একেবারেই অবাস্তব বলে মনে হতে বাধ্য। বোট এঞ্জিনিয়ারের পিছু নিয়ে সরু এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে উঠল রানা, বাল্কহেড বরাবর বেঞ্চসীট সহ ছোট একটা চেম্বারে ঢুকল। মাঝখানে ধাপ, একটা প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দিল। প্ল্যাটফর্মের মাথায় মই, অদৃশ্য হয়ে গেছে একটা টানেলের ভেতর। টানেলের শেষ মাথায় হ্যাচ, ডায়ামিটারে তিন ফুট। মই বেয়ে টানেলে ঢুকল কেমপ্রেসো হ্যাচটা পরীক্ষা করার জন্যে। ঢোকার পর আর বেরুবার নাম নেই।

অনেকক্ষণ পর ক্লান্ত ও ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে নেমে এসে কেমপ্রেসো ম্লান গলায় বলল, 'আপনার লোক নিজের কাজে কোন খুঁত রাখেনি।'

'মানে?'

'ফ্রেমটা বাঁকা হয়ে হ্যাচের চারদিক মুড়ে ফেলেছে। ওটাকে খুলতে দশ পাউন্ড প্লাস্টিক চার্জ লাগবে।'

টানেলের ভেতর দিয়ে উঠে গেল রানার দৃষ্টি, বাঁকা ও বিকৃত চেহারার এস্কেপ হ্যাচটা দেখছে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল ওর। এটাই একমাত্র বিকল্প পথ ছিল, অথচ কোনভাবেই কাজে লাগানো যাবে না। 'তাহলে আমরা রেসকিউ ভেসেলে যাব কিভাবে?'

'অন্তত এই পথ দিয়ে যাবার কোন উপায় নেই,' ভারী গলায় বলল কেমপ্রেসো, জানে ছয়শো সতেরোজন মানুষকে বাঁচানোর আর কোন আশা নেই। 'না এ পথ দিয়ে, না অন্য কোন পথ দিয়ে।'

ব্রিজে এসে দুঃসংবাদটা ক্যাপটেন অগাস্টাসকে জানাল রানা।

'আপনারা পজিটিভ তো?' ক্যাপটেন হতাশ সুরে জিজ্ঞেস করলেন। 'ফ্রেম ভেঙেও এস্কেপ হ্যাচ খোলা যাবে না?'

'কাটিং টর্চ দিয়ে ভাঙা হয়তো যাবে,' বলল রানা, 'কিন্তু তাতে যে তোড় নিয়ে ভেতরে পানি ঢুকবে তা সামাল দিয়ে ওটাকে আর পরে সীল করা যাবে না। এই গভীরতায় ধরুন কমবেশি সেভেনটিন অ্যাটমস্‌ফিয়ার-এ রয়েছি আমরা। প্রতি তেত্রিশ ফুটে এক অ্যাটমস্‌ফিয়ার, এই হিসেবে আমাদের খোলের গায়ে ওয়াটার প্রেসার প্রতি বর্গফুটে দুশো পঞ্চাশ পাউন্ড। ওরকম একটা পানির চাপের সঙ্গে যুদ্ধ করে রেসকিউ ভেসেলে পৌঁছানো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।'

ক্যাপটেনের চেহারা দেখার মত থাকল না। ভাবাবেগে যিনি খুব কমই আক্রান্ত হন, নিজেকে তিনি বিশ্বাস করাতে পারছেন না যে এমারেল্ড মার্লিনে তাঁর সঙ্গে যারা রয়েছে তাদের সবাই মারা যাবে। 'স্পষ্ট করে বলুন। উদ্ধার পাবার কোন আশাই কি নেই আমাদের?'

'আশা সব সময় থাকে,' বলল রানা। 'তবে আমাদের জানা পদ্ধতি কোন কাজে আসছে না।'

ক্যাপটেন অগাস্টাসের কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ল, ডেকের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। 'সেক্ষেত্রে আমরা শুধু যতক্ষণ পারা যায় বেঁচে থাকার চেষ্টা করব।'

ফার্স্ট অফিসার জনসন রানার হাতে একটা ফোন ধরিয়ে দিল। 'সারফেস থেকে মিস্টার মুরল্যান্ড কথা বলবেন।'

রিসিভারটা কানে ঠেকাল রানা। 'ববি?'

'কোস্ট গার্ড কাটার থেকে,' পরিচিত কণ্ঠস্বর থেকে জবাব ভেসে এল।

'সারফেসে ঠিকমত উঠতে পেরেছ সবাই?'

'আমি ছাড়া। বাচ্চাটা আমার কানের পর্দা ফাটিয়ে দিয়েছে।'

'ওদের সবাই ভাল তো?'

'বাচ্চা আর তাদের মায়েরা খোদার রহমতে বহাল তবিয়তে আছে। কাটারের চেয়ে কোস্টাল কার্গো ক্যারিয়ারে ফ্যাসিলিটি অনেক বেশি, তাই সবাইকে ওটায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কাছাকাছি বন্দরের দিকে রওনাও হয়ে গেছে কার্গো ক্যারিয়ার। স্বামীরা সঙ্গে নেই তো, তাই প্রায় সব মহিলাই চেয়েছিল আমিও ওদের সঙ্গে যাই। উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে আমি এড়িয়ে গেছি—ওরা আমাকে বাচ্চা সামলাবার কাজে লাগাত।'

'কোন খবর পেয়েছ, ডীপ সাবমারশন রেসকিউ ভেসেল কখন পৌঁছাবে?'

'এদেরকে বলতে শুনছি আরও ছত্রিশ ঘণ্টা,' জবাব দিল মুরল্যান্ড। 'তোমার ওদিকের খবর কি?'

'ভাল নয়। আমাদের বন্ধু কাকাস জাভালা বোট ছেড়ে চলে যাবার আগে এস্কেপ হ্যাচ জ্যাম করে দিয়ে গেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না মুরল্যান্ড। তারপর জানতে চাইল, 'কতটা খারাপ?'

'যতটা খারাপ হওয়া সম্ভব। কেমপ্রেসো বলছে অর্ধেক বোট পানিতে না ভরিয়ে ওটা খোলা যাবে না।'

ক্যাপটেন অগাস্টাসের মত মুরল্যান্ডও মেনে নিতে পারছে না যে পানির নিচে এমারেল্ড মার্লিনে যারা রয়েছে তাদের কাউকে আর বাঁচানো সম্ভব নয়। 'তুমি কি পুরোপুরি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এদিকে আমরা হাল ছাড়তে রাজি নই,' একটা একটা শব্দ আলাদাভাবে উচ্চারণ করে বলল মুরল্যান্ড, শান্ত গলায় দৃঢ় সুর। 'আমি ল্যারি কিংকে ডেকে সমস্যাটা ভীনাসের ঘাড়ে চাপাতে বলছি। তোমাদেরকে ওপরে তোলার কোন না কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে।'

রানা অনুভব করল অনেক কষ্টে নিজের আবেগের লাগাম টেনে রেখেছে মুরল্যান্ড। সিদ্ধান্ত নিল প্রসঙ্গটা আপাতত এখানেই শেষ করা উচিত। 'যোগাযোগ রেখো,' কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে বলল ও, 'তবে ফোনের বিলটা যেন আমাকে দিতে না হয়।'

মরা সাবমেরিন ক্রুজ লাইনারের অসহায় ক্রু আর প্যাসেঞ্জারদের কোন ধারণা নেই তাদের মাথার ওপর সারফেসে কি তুমুল একটা আলোড়ন সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। গত এক হপ্তা ধরে সারা দুনিয়ার খবরের কাগজ আর টেলিভিশন নেটওঅর্ক ওয়াটার লিলি ট্রাজেডির খবর ছাপলেও, রিপোর্টার আর ফটো-জার্নালিস্টরা সরাসরি অকুস্থল থেকে কোন খবর বা ছবি পাঠাতে সফল হয়নি। এর অন্যতম কারণ ঘটনাস্থল ছিল পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমের নাগালের একেবারে শেষ প্রান্তে। কিন্তু এবার এমারেল্ড মার্লিন ডুবেছে শুনে বাঁধভাঙা বন্যার মত দলে দলে ছুটে এল তারা। ইতিমধ্যে সবাই জেনে ফেলেছে যে সাবমেরিনে আটকা পড়া কয়েকশো প্যাসেঞ্জার ও ক্রুকে বাঁচানোর জন্যে সময়ের সঙ্গে শুরু হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। শুধু মিডিয়ার লোকজন নয়, বিখ্যাত ব্যক্তি ও রাজনীতিকরাও আসতে শুরু করেছেন।

এক ডজন বোটে ভর্তি হয়ে ভোজবাজির মত হঠাৎ হাজির হলো ক্যামেরাম্যানরা। রিপোর্টাররা এলো এক ঝাঁক হালকা প্লেন আর হেলিকপ্টার নিয়ে। সাবমেরিন ক্রুজ লাইনার ডুবেছে পুরো দু'দিনও হয়নি, অকুস্থলের মাথায় জাহাজ ও বোটের সব মিলিয়ে সংখ্যা দাঁড়াল একশোর ওপর। তবে অ্যাক্রেডিটেড জার্নালিস্ট ছাড়া বাকি সবাইকে তাড়া করে ভাগিয়ে দিল কোস্ট গার্ড।

এটা বাংলাদেশের জলসীমার ভেতর বঙ্গোপসাগর নয় যে খবর পেতে দেরি হবে ওয়েস্টার্ন মিডিয়ার, বোটডুবির ঘটনাটা ঘটেছে আমেরিকার ফ্লোরিডা উপকূল থেকে মাত্র সাতানব্বুই মাইল দূরে। ঘটনার প্রতিটি মোড় ও মোচড় কাভার করার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে উত্তেজনা। মানুষ যেমন ভয় পাচ্ছে, তেমনি আশাতেও বুক বাঁধছে। পানির গভীর তলদেশে বন্দী ছয়শো সতেরোজন মানুষ। কি আছে তাদের ভাগ্যে? তারা কি বাঁচবে? যদি মারা যায়, সবাই একসঙ্গে? কিছু লোকও কি রক্ষা পাবে না? হাতে গোনা দু'একজন? কেউ না? তৃতীয় দিন নিউজ মিডিয়া সার্কাস হয়ে উঠল শ্বাসরুদ্ধকর। সবাই বুঝতে পারছে কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদ শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই।

তলিয়ে যাওয়া বোটের কোন প্যাসেঞ্জার বা ক্রুর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে কত বিচিত্র উপায়েই না চেষ্টা চালাচ্ছে জার্নালিস্টরা। কেউ কেউ এমন কি বয়ার সঙ্গে আটকানো ফোন লাইনে আড়িপাতা যন্ত্র বসাতেও চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা অঙ্কুরেই নষ্ট করে দিল কোস্ট গার্ড। নিউজ মিডিয়া বোটের বো লক্ষ্য করে সত্যি সত্যি কিছু গুলিও ছোঁড়া হলো, যাতে ছয়শো সতেরোজনকে বাঁচানোর কাজে যারা উন্মত্ত ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করছে তাদের পথ থেকে সরে যেতে বাধ্য হয় সমস্ত উটকো ঝামেলা।

রিপোর্টাররা মুরল্যান্ডের নাগাল পাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠল। নুমার সার্ভে শিপ পৌঁছাতে তাতে উঠে পড়েছে মুরল্যান্ড, সেখান থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল কারও সঙ্গে কথা বলবে না সে। কাজের মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদের সাহায্য নিয়ে সী মার্ভেল নামে একটা আরওভি পানির তলায় পাঠাবার ব্যবস্থা করল, খোলের বাইরে থেকে পরীক্ষা করে এমারেল্ড মার্লিনের অবস্থা জানার জন্যে। সী মার্ভেল সী হর্সেরই সিস্টার ভেসেল।

চেয়ারে বসে কোলের ওপর ধরে রাখা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে আরওভি-কে গাইড করছে, গভীর হতাশা মুরল্যান্ডের গোটা অস্তিত্বকে গ্রাস করে ফেলতে চাইল। ভিডিও মনিটরের ইমেজ রানার দেয়া দুঃসংবাদটাই শুধু নিশ্চিত করছে। এমারেল্ড মার্লিনের খোলের মাথার এস্কেপ হ্যাচ বাঁকিয়ে এমনভাবে জ্যাম করে দেয়া হয়েছে যে তা কোনভাবেই খোলা সম্ভব নয়। হয় বিস্ফোরক বসিয়ে হ্যাচ কাভার উড়িয়ে দিতে হবে, নয়তো একটা কাটিং টর্চ দিয়ে কেটে ফেলতে হবে। কিন্তু দুটোরই সম্ভাব্য পরিণতি এক–প্রাণ নিয়ে কেউ বেরিয়ে আসার আগে বোটের ভেতরে প্রচণ্ড বেগে ঢুকে পড়বে সাগর। রেসকিউ ভেহিকেলের সাহায্যে ক্ষতটা সীল করে দেয়াও সম্ভব হবে না।

পরদিন সকালে ডীপ সাবমারশন রেসকিউ ভেসেলকে নিয়ে ন্যাভাল সাপোর্ট শিপ অকুস্থলের ওপরে পৌঁছাল। মুরল্যান্ড তার কাজ-কর্ম গোল্ডেন মেডিফিস-এ সরিয়ে নিল, সময় নষ্ট না করে ক্রুদের তাগাদা দিয়ে বলল, রেসকিউ ভেসেলকে রেডি করে এখুনি নিচে পাঠাতে পারলে ভাল হয়। জাহাজের ক্যাপটেন, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার স্টিভ কালভিন, অভ্যর্থনা জানালেন মুরল্যান্ডকে।

'গোল্ডেন মেডিফিসে আপনাকে স্বাগতম,' বললেন তিনি। 'নুমার সঙ্গে কাজ করতে নেভির সবার খুব ভাল লাগে।'

নেভি শিপের বেশির ভাগ কমান্ডারের নাক-উঁচু হাবভাব দেখে মনে হবে জাহাজটা যেন নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে কেনা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কমান্ডার কালভিন ব্যতিক্রম। তাঁর চোখে-মুখে আন্তরিকতার ছোঁয়া দেখল মুরল্যান্ড, হাসিটাও কৃত্রিম মনে হলো না। চোখ দুটো ধূসর, মাথার সোনালি চুল কমতে শুরু করেছে। 'নুমার তরফ থেকে আমারও একই অনুভূতি,' জবাবে বলল মুরল্যান্ড। 'তবে পরিস্থিতিটা আরও কম বিপজ্জনক হলে খুশি হতাম।'

'ঠিক বলেছেন,' গম্ভীর সুরে সায় দিলেন কমান্ডার কালভিন। 'আমার একজন অফিসার আপনাকে আপনার কোয়ার্টারে পৌঁছে দেবে। আপনি কি কিছু খাবেন?

ডীপ ওয়ার্কারকে অন্তত এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা নামাচ্ছি না।'

'আশা করি ডীপ ওয়ার্কারের সঙ্গে আমাকেও আপনি নিচে নামার অনুমতি দেবেন–মানে, জায়গায় যদি কুলায় আর কি।'

কালভিন হাসলেন। 'ডীপ ওয়ার্কারে বিশজনের জায়গা হবে। আপনি সঙ্গে থাকলে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না।'

'আমাদের…মানে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড। তার খুব ভাল করে জানা আছে যে এ-ধরনের অপারেশনে অধস্তন একজন অফিসারকেই পাঠানোর নিয়ম, জাহাজের ক্যাপটেন নিজে কখনও যান না। 'আপনিও যাচ্ছেন নাকি?'

মাথা ঝাঁকালেন কালভিন, তাঁর মুখের হাসি অদৃশ্য হয়ে গেল। 'ডীপ ওয়ার্কার নিয়ে এই প্রথম নামছি না। যখন দেখি শুধু আমাদের ভেহিকেলই অনেকগুলো মানুষের বাঁচার একমাত্র আশা, তখন কি আর নিজে না নেমে পারা যায়?'

মাদারশিপ গোল্ডেন মেডিফিস-এর ওঅর্ক ডেকের ওপর ঝুলে রয়েছে ডীপ ওয়ার্কার, হলুদ খোলের গায়ে বৃত্তাকার লাল ফিতে আঁকা–আধুনিক একজন শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রকাণ্ড একটা সাগরকলা হিসেবে ধরা দিতে পারে, যেটার গা থেকে সম্ভাব্য সব রকম অদ্ভুত দর্শন জিনিস ঝুলে আছে। দৈর্ঘ্যে আটত্রিশ ফুট, দশ ফুট উঁচু, পানির স্থানচ্যুতি ঘটায় ত্রিশ টন। নিচে নামার সীমারেখা বারোশো ফুট। স্পীড আড়াই নট।

ক্যাপটেন কালভিন একটা মই বেয়ে মেইন হ্যাচে উঠছেন, তাঁর পিছনে রয়েছে জাহাজের একজন ক্রু। কোপাইলটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন–চীফ ওয়ারেন্ট অফিসার জো ফেলান, মাথায় সাদা-কালো চুল, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিল মুরল্যান্ডের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন সে। তারপর বলল, 'আমি শুনেছি, আপনিও একজন পুরানো সাবমারসিবল্ ম্যান।'

'হ্যাঁ, জীবনের বড় একটা সময় ওগুলোর ভেতর কেটেছে।'

'গুজব ছড়িয়েছে আপনি নাকি বিশ হাজার ফুট গভীরতায় নেমে ওয়াটার লিলির খোল পরীক্ষা করে এসেছেন। সত্যি নাকি?'

'না, ওটা গুজব নয়,' বলল মুরল্যান্ড। 'সত্যি। তবে একা আমি নই, আমার সঙ্গে নুমার প্রজেক্ট ডিরেক্টর মাসুদ রানা আর মেরিন বায়োলজিস্ট জিনা ক্যারল ছিল।'

'তাহলে তো এই সাড়ে পাঁচশো ফুট গভীরতা কিছুই নয়।'

'রেসকিউ হ্যাচের সঙ্গে নিজেদেরকে হুক দিয়ে আটকাতে না পারলে এটাই সাড়ে পাঁচ কোটি আলোক বর্ষ দূরে বলে মনে হবে।'

জো ফেলান মুরল্যান্ডের চোখে বিষাদ ও গাম্ভীর্য দেখতে পেল। 'আমরা আপনাকে ওই হ্যাচের ঠিক ওপরে বসিয়ে দেব।' তারপর, যেন অভয়দানের উদ্দেশে বলল, 'চিন্তা করবেন না। জ্যাম লাগা কোন হ্যাচ কেউ যদি খুলতে পারে তো সে আমি আর ডীপ ওয়ার্কার। এই কাজ করার প্রয়োজনীয় সমস্ত ইকুইপমেন্ট আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ! ওহ্, ধন্যবাদ!' হাসতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো মুরল্যান্ড। 'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, ভাই!'

কন্ট্রোল কনসোলে বসেছে চীফ জো ফেলান, সাগরের তলায় পড়ে থাকা এমারেল্ড মার্লিনের কাছে পৌঁছাতে ডীপ ওয়ার্কারের সময় লাগল পনেরো মিনিটের কিছু কম। বোটের খোল বরাবর রেসকিউ ভেহিকেল চালাল চীফ। মরা একটা বিশাল প্রাণীর মত লাগছে ওটাকে। তিনজনই ভিউপোর্ট দিয়ে তাকিয়ে আছে, ওদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো এমারেল্ড মার্লিনের ভিউপোর্টে চোখ লাগিয়ে রাখা প্যাসেঞ্জার আর ক্রুদের। অদ্ভুত, প্রায় অলৌকিক, প্রায় অবাস্তব একটা অনুভূতি ওদের তিনজনের: ছয়শো সতেরোজন মানুষ এত কাছে, অথচ কতদূরে! মাত্র কয়েক ইঞ্চির ব্যবধান, তবু ছোঁয়ার উপায় নেই। এ যেন প্রায় ভৌতিক একটা অভিজ্ঞতা। একটা পোর্টের দিকে তাকাতে মুরল্যান্ডের মনে হলো রানাকে হাত নাড়তে দেখছে সে। কিন্তু নিশ্চিত হওয়া গেল না, তার আগেই পোর্টটাকে পিছনে ফেলে এল ডীপ ওয়ার্কার।

পলির ওপর পড়ে থাকা বোটটাকে তিন ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করল ওরা। ওদের ক্যামেরাগুলো ভিডিওটেপ ঘুরিয়ে যাচ্ছে, দু'সেকেন্ডের বিরতি নিয়ে ক্লিক-ক্লিক করে স্থিরচিত্র তোলা হচ্ছে।

'ইন্টারেস্টিং,' এক সময় শান্ত গলায় বললেন কমান্ডার কালভিন। 'খোলের প্রতি বর্গফুট পরীক্ষা করলাম আমরা, কিন্তু বুদ্বুদ দেখলাম খুবই কম।'

'ব্যাপারটা সত্যি অস্বাভাবিক,' বলল ফেলান। 'এর আগে আমরা রেসকিউ অপারেশন চালিয়েছি মাত্র দুটো সাবমেরিনে। একটা জার্মান, একটা রাশিয়ান। দুটো সাবমেরিনই সারফেসে জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। সংঘর্ষের অনেক পরেও ঝাঁক ঝাঁক বুদ্বুদ উঠতে দেখেছি আমরা—দুটো থেকেই।'

ভিউ পোর্টের বাইরে মন খারাপ করে তাকিয়ে আছে মুরল্যান্ড। 'পানি ঢুকছিল শুধু এঞ্জিন রুম আর ব্যাগেজ কমপার্টমেন্ট, এই দু'জায়গা দিয়ে। এতক্ষণে ওগুলো নিশ্চয়ই পুরোপুরি পানিতে ভরে গেছে, রিলিজ করার মত আর কোন এয়ার নেই।'

ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলোর আরও কাছাকাছি সাবমারসিবল্ নিয়ে এল ফেলান। বিস্ফোরণের ফলে বোটের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ ভেতর দিকে বেঁকে গেছে। পোর্টের দিকে হাত তুলল সে। 'ক্ষতগুলো আকারে কিন্তু খুব বড় নয়।'

'তবে বোট ডোবাবার জন্যে যথেষ্ট বড়।'

'ব্যালাস্ট ট্যাংক? ওগুলো ভাঙেনি তো?' কালভিন জানতে চাইলেন।

'না।' জবাব দিল মুরল্যান্ড, 'সব ক'টা অক্ষত আছে। কিন্তু ক্যাপটেন অগাস্টাস ওগুলো খালি করা সত্ত্বেও খোলের ভাঙা অংশ দিয়ে ঢোকা পানিতে বোট তলিয়ে গেল। পানির যে প্রচণ্ড তোড়, পাম্পগুলো কুলিয়ে উঠতে পারেনি। বোট রক্ষা পেয়েছে ওয়াটারটাইট দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়ায়, এঞ্জিন রুম আর কার্গো কমপার্টমেন্টই শুধু পানিতে ভরে ওঠে।'

'বিরাট একটা ট্র্যাজিডিই বলতে হবে,' ধীরে ধীরে বললেন কমান্ডার কালভিন, পোর্টের দিকে আঙুল তুলে খোলের ভাঙা অংশ দুটো দেখাচ্ছেন।

'ওগুলো এক কি দু'ফুট ছোট হলে বোটটা হয়তো সারফেসে উঠে যেতে পারত।'

'সার, আমি বলি কি, ওপরে ফিরে যাবার আগে এস্কেপ হ্যাচটা চেক করে নিই।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' চীফ ফেলানকে অনুমতি দিলেন কমান্ডার কালভিন। 'ওটার ঠিক ওপরে নিয়ে চলো আমাদের, দেখি কি অবস্থা। ভাগ্য ভাল হলে ওপর থেকে ক্রু এনে জ্যাম ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা যাবে।'

রেসকিউ ভেহিকেলকে এমারেল্ড মার্লিনের ওপর দিয়ে গাইড করে নিয়ে এল ফেলান, থামাল হ্যাচের একটু ওপরে আর একটু পাশে। বিস্ফোরণের ফলে কি ক্ষতি হয়েছে ফেলান ও কালভিন দু'জনেই সময় নিয়ে দেখলেন।

'আমি হতাশ বোধ করছি,' বলল ফেলান।

কমান্ডার কালভিনকেও আশাবাদী বলে মনে হলো না। 'হ্যাচের নিচে, চারধারে যে সীলিং ফ্ল্যাঞ্জ বা কানা থাকে সেটা ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে। রেসকিউ চেম্বারে যে এয়ার লক আছে মেরামতের কাজে সেটা ব্যবহার করার কোন উপায় দেখছি না আমি, কারণ খোল এত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে এয়ারটাইট সীল লাগানো, পাম্প করে পানি বের করা, তারপর কাটিং টর্চ সহ ক্রুদের কাজ করতে পাঠানো সম্ভব নয়।'

'ডাইভাররা?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড। 'এরকম গভীরতায় ওরা যে একদম কাজ করে না তা তো নয়।'

'থাকতে হবে একটা ডিকমপ্রেশন চেম্বারে, কাজ করতে হবে পালা করে। সাইটে চেম্বার এনে মেরামতের কাজ শেষ করতে চারদিন লেগে যাবে। ততক্ষণে–,' কমান্ডারের কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়ে থেমে গেল।

এস্কেপ হ্যাচের ছিন্নভিন্ন অংশটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওরা। হঠাৎ করে মুরল্যান্ডের বড় বেশি ক্লান্ত মনে হলো নিজেকে। এরজন্যে বিশুদ্ধ বাতাসের অভাব নাকি সর্বগ্রাসী হতাশা দায়ী, জানে না। সে একজন কোয়ালিফাইড এঞ্জিনিয়ার হিসেবে খুব বোঝে যে বোটের ভেতর পানি ঢুকতে না দিয়ে হ্যাচ ভাঙা সম্ভব নয়, আর পানি একবার ঢুকতে শুরু করলে সেটাকে থামাবার সাধ্য কারও নেই, ফলে ছয়শো সতেরোজনের একজনকেও ওরা বাঁচাতে পারবে না। এই পরিস্থিতিতে যে-কোন চেষ্টা নিষ্ফল হতে বাধ্য। রেসকিউ ভেহিকেল নিয়ে হ্যাচটার ওপর আরও এক মিনিট স্থির হয়ে থাকল চীফ ফেলান।

'আমাদের একটা প্রেশার চেম্বার দরকার। সারফেস থেকে খোলের ওপর নামাতে হবে ওটাকে, একটা সীল তৈরি করতে হবে, তারপর প্লেট কেটে বড় এক গর্ত তৈরি করতে হবে যাতে সবাইকে বের করে এনে ডীপ ওয়ার্কারে তোলা যায়,' পদ্ধতিটা এমন হালকা সুরে ব্যাখ্যা করলেন কমান্ডার কালভিন, এ যেন পানির চেয়েও সহজ একটা কাজ।

'তাতে কি রকম সময় লাগবে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'কাজটা আমাদের আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে পারা উচিত।'

'তাহলে কোন লাভ নেই,' ধারণাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল মুরল্যান্ড। 'বোটের ভেতর যে বাতাস আছে তাতে ওদের মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা চলবে। আপনি

প্যাসেজ খুলে প্রকাণ্ড একটা কফিনে পৌঁছাবেন।'

'আপনার কথাও ঠিক,' বললেন কালভিন। 'তবে সিঙ্গাপুরে থেকে ফ্যাক্সে জানানো বোটটার যে প্ল্যান আমরা দেখেছি, তাতে একটা আউটসাইড এয়ার কানেক্টর আছে–রাখা হয়েছে ঠিক এ-ধরনের ইমার্জেন্সির কথা ভেবে। সারফেস থেকে নামানো একটা হোসপাইপ ওই কানেক্টরে ঢোকাতে হবে। কানেক্টরটা কোথায় জানেন? স্টার্নে, ফিনের ঠিক সামনে।'

ঘামছে মুরল্যান্ড, ঠাণ্ডা লাগছে, তুলোর মত হালকা হয়ে গেছে শরীরটা। 'হোসপাইপ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমাদের কাছে হোসসহ একটা পাম্প আছে, পানির চাপ সহ্য করার ক্ষমতা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এক হাজার পাউন্ডেরও বেশি। ওটা রেডি করতে আমাদের সময় লাগবে খুব বেশি হলে…এই ঘণ্টা তিনেক।'

'কি, আপনাকে চিন্তা করতে বারণ করিনি?' মুরল্যান্ডের দিকে ফিরে হাসল চীফ ফেলান। 'বোটে যারা আছে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারাটা সবচেয়ে জরুরী, তারপর ধীরে-সুস্থে একটা শুকনো পথ তৈরি করে উদ্ধার করা হবে

মুরল্যান্ড বলল, 'ভেতরে যে একটা এয়ার ইমার্জেন্সি ইনলেট আছে, সে আমি জানি। তবে বাইরের কানেক্টরটা একবার চেক করে দেখা দরকার।'

কমান্ডারের অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে সাবমারসিবল ঘুরিয়ে নিল চীফ ফেলান, রওনা হলো স্টার্ন ফিন-এর সামনের দিকে। এই ফিন খাড়া হয়ে সারফেসের দিকে প্রসারিত, এটাতেই জায়গা করে নিয়েছে বোটের লাউঞ্জ। চীফ ফেলান ভেহিকেল থামাল ছোট গোলাকার একটা চেম্বারের ওপর, ফিনের গোড়ায় খোলের সঙ্গে সংযুক্ত। 'এটাই কি এয়ার কানেক্টরের হাউজিং?' জানতে চাইল সে।

'তাই তো হবার কথা,' কমান্ডার কালভিন বললেন, চোখ বুলাচ্ছেন বোটের নকশায়।

'দেখে তো মনে হচ্ছে অক্ষত।'

'সকল প্রশংসা তাঁর,' সিলিঙের দিকে তাকাল চীফ ফেলান। 'এখন আশা করা যায় সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব।'

'আপনাদের কাছে ম্যানিপুলেটরস রয়েছে,' বলল মুরল্যান্ড, এখুনি উৎসবে মেতে উঠতে রাজি নয়। 'ঢাকনিটা তুলে নিশ্চিত হয়ে নিন না, আপনাদের হোস ফিটিং কানেক্টরের সঙ্গে ম্যাচ করে কিনা?'

'কথাটায় যুক্তি আছে,' বললেন কালভিন। 'এখানে যখন আমরা রয়েছিই, জোড়া লাগাবার প্রস্তুতিটা সেরে রাখলে পরে সময় বাঁচবে।' সীটে ঘুরে বসে হ্যান্ড টগল সহ ছোট একটা রিমোট তুলে নিয়ে জোড়া ম্যানিপুলেটরের ধাতব বাহু দুটো অপারেট করতে শুরু করলেন। অত্যন্ত সাবধানে চারটে তালা খুললেন, চেম্বারের প্রতি দিকে একটা করে। তারপর কব্জার উল্টো দিকটা তুললেন।

এরকম কিছু দেখবে বলে ওরা আশা করেনি। এয়ার হোসের সঙ্গে সংযুক্ত পুং-ফিটিঙের জন্যে যে স্ত্রী-ফিটিংটা থাকার কথা, সেটা নেই। দেখে মনে হলো বাড়ি মেরে জিনিসটাকে প্রথমে ঢিলে করার চেষ্টা হয়েছে, তারপর সরানো হয়েছে

বড় হাতুড়ি আর বাটালির সাহায্যে।

'এই কাজ কে করবে!' কমান্ডার কালভিন বিস্ময়ে বিমূঢ়।

'সাংঘাতিক কোন ধূর্ত ঘাতক,' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করল মুরল্যান্ড গোটা অস্তিত্বে খুনের নেশা অনুভব করছে।

'ওদের বাতাস ফুরিয়ে যাবার আগে রিপ্লেসমেন্ট ও মেরামতের কাজ শেষ করা সম্ভব নয়,' চীফ ফেলান বলল, ক্ষতিগ্রস্ত কানেক্টরটা খুঁটিয়ে দেখছে।

'আপনারা বলতে চাইছেন কয়েকশো লোক মারা যাবে আর আমরা সেটা মাটির তৈরি পুতুলের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড, এখনি না কেঁদে ফেলে।

চীফ ফেলান আর কমান্ডার কালভিন পরস্পরের দিকে তাকালেন, ভাব দেখে মনে হলো মরুঝড়ের মধ্যে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছেন। বলবার মত কিছুই তারা খুঁজে পাচ্ছেন না। পদে পদে বাধা পেয়ে অবিশ্বাস ও বিস্ময়ের ঘোর লেগে গেছে।

মুরল্যান্ডের অনুভূতি হলো সে বাস্তব জগতে নেই। আকস্মিক কোন দুর্ঘটনায় ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর মৃত্যু মেনে নিতে খুবই কষ্ট হয়, তবে সে বেঁচে নেই এই সত্যটাই ধীরে ধীরে মনে প্রতিষ্ঠা পায়। এখানে পরিস্থিতিটা মোটেও সে-রকম নয়। রানা বেঁচে আছে, কিন্তু ওকে সাহায্য করতে না পারলে বেঁচে থাকবে না। দূরত্ব সামান্যই, অথচ ওকে সাহায্য করার কোন উপায় কারও জানা নেই। অসহায় তুমি, অপেক্ষা করো, দেখো কখন মরে। এ বোধহয় শুধু পাগলই সহ্য করতে পারবে, কিংবা এই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেলে যে-কোন মানুষ পাগল হয়ে যেতে বাধ্য। রানা মারা যাবে কেন? কারণ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ওর নাগাল পাচ্ছে না। এ স্রেফ গ্রহণযোগ্য নয়। শোকে বিভ্রান্ত একজন মানুষ ঈশ্বরকে অমান্য করতে যাচ্ছে। কিছু একটা করতে মুরল্যান্ড দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; যে-কোন কিছু এমন কি ওকে যদি পাঁচশো পঞ্চাশ ফুট ওপর থেকে ডাইভ দিয়ে নিজের সর্বনাশ করতে বলা হয় তা-ও সে করবে।

চেহারায় গভীর অনিশ্চয়তার ছাপ, কমান্ডারের অনুমতি না নিয়েই চীফ ফেলান ব্যালাস্ট ট্যাংক খালি করে এমারেল্ড মার্লিনের ওপর থেকে ডীপ ওয়ার্কারকে সরিয়ে নিল, তারপর রওনা হলো সারফেসের দিকে। তিনজনই ওরা অনুভব করল, যদিও বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করতে চাইছে না–এমারেল্ড মার্লিনের ভেতর থেকে প্যাসেঞ্জাররা ওদেরকে ফিরে যেতে দেখছে, তবে এখনও জানে না ওদের বাঁচার কোন আশা নেই।

চার

এমারেল্ড মার্লিনের ভেতর পরিবেশ প্রায় ভৌতিকই বলতে হবে। প্যাসেঞ্জাররা যে যার সময় ও অভ্যাস মত ডাইনিং রুমে ঢুকে যাচ্ছে, ক্যাসিনোয় জুয়া খেলছে লাইব্রেরিতে বসে পত্রিকা বা বই পড়ছে, তারপর ঘুমাবার জন্যে বিছানায় উঠছে,

যেন তাদের আনন্দভ্রমণে কোথাও কোন ছেদ পড়েনি। কেউ যদি খেয়াল করেও থাকে যে অক্সিজেনের মাত্রা ধীরে ধীরে কমছে, কারও চেহারা বা আচরণ দেখে তা বোঝা গেল না। নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে তারা হালকা সুরে আলাপ করল, লোকে যেভাবে আবহাওয়া নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। সবাই যেন চোখ বুজে আছে, অমোঘ নিয়তিকে স্বীকৃতি দিতে চাইছে না।

প্যাসেঞ্জাররা বেশিরভাগই বিভিন্ন দেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক, তাঁদের বয়সও একটু বেশি। কিছু আছে তরুণ দম্পতি, এখনও সন্তানের মা-বাবা হয়নি। অবিবাহিত তরুণ-তরুণী সব মিলিয়ে ডজন দুয়েক। আর আছে একমাত্র ইভ্যাকিউয়েশন পডে চড়ে সারফেসে ফিরে যাওয়া শিশু-কিশোরদের বাবারা। সার্ভিস ক্রুরা নিজেদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছে–ডিউটি দিচ্ছে টেবিলে, গ্যালিতে রান্না করছে, স্টেট রুম পরিষ্কার করছে, থিয়েটারে অভিনয় করছে বা সার্কাস দেখাচ্ছে। তবে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে শুধু এঞ্জিন রুমের ক্রুরা। জেনারেটর আর পাম্পগুলো সারাক্ষণ চালু রেখেছে তারা, ওগুলো থেকে এখনও পাওয়ার সাপ্লাই পাওয়া যাচ্ছে। ভাগ্য ভাল যে এগুলো এঞ্জিন রুমে নয়, আলাদা একটা কমপার্টমেন্টে ছিল, বিস্ফোরণের পরপরই সীল করে দেয়া হয়।

রেসকিউ ভেহিকেলকে সারফেসে ফিরে যেতে দেখে রানা বুঝতে পারল সবচেয়ে খারাপ ঘটনাটাই ঘটতে চলেছে। ওর ভয়টাকে সত্যি বলে জানাল মুরল্যান্ডের ফোন কল। তারপর কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে রানা ব্রিজ কন্ট্রোল রুমে, চার্ট টেবিলে বসে বোটের নকশাগুলো বারবার পরীক্ষা করছে। কি খুঁজছে নিজেও জানে না, তবে সেটা পেলে ঠিকই চিনতে পারবে–ছোট্ট, সূক্ষ্ম কোন সূত্র। যে সূত্র ওদেরকে বাঁচার পথ দেখাবে। কোন উপায়ই নেই, এ কি হতে পারে?

ধীর পায়ে ব্রিজে ঢুকলেন ক্যাপটেন অগাস্টাস; প্রকাণ্ড শরীর, বাঘের মত চেহারা, কিন্তু এই মুহূর্তে হাবভাব চোরের মত। যেন মস্ত এক অপরাধ করে অনুতপ্ত। তাঁর মনে যাই ঘটুক, বোঝা গেল রানাকে তিনি বিরক্ত করতে চাইছেন না। চার্ট টেবিলের উল্টোদিকের একটা টুলে ধীরে ধীরে বসলেন তিনি এতটুকু শব্দ না করে। গুরুদায়িত্ব নিয়ে ভারী কাঁধ দুটো তাঁর এখনও ঝুলে আছে। সামান্য একটু হাঁপাচ্ছেন। দু'বার মুখ খুলতে গিয়েও খুললেন না। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে।

বিশ মিনিট পর নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না, অগাস্টাস বললেন, 'একটানা তিন দিন চোখের পাতা এক করেননি। এবার একটু ঘুমালে হয় না?'

'আমি যদি ঘুমাতে যাই, আমাদের কেউ যদি ঘুমাতে যায়, সে ঘুম আর ভাঙবে না।'

'মিথ্যা বলে এ পর্যন্ত পার পেয়েছি,' অগাস্টাস কাতর কণ্ঠে বললেন। 'কিন্তু সত্যকে আর তো চেপে রাখা যাচ্ছে না। সবাই ওরা বুঝে ফেলছে। ওরা দুর্বল, হয়তো সেজন্যই রক্তারক্তি কোন কাণ্ড ঘটবে না।'

লাল চোখ দুটো রগড়াল রানা, ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কফিতে একটা চুমুক দিল, তারপর আবার মনোযোগ দিল বোটের নকশায়–এবার নিয়ে সম্ভবত একশোরও

বেশি বার। 'একটা চাবি তো থাকতেই হবে, তাই না?' নিচু গলায় যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে ও। 'হোস লাগিয়ে বোটে তাজা বাতাস ঢোকানোর কোন না কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে।'

রুমাল বের করে ভুরুর ঘাম মুছলেন অগাস্টাস। 'ছিল। হ্যাচ আর এয়ার কানেক্টর নষ্ট করে দেয়ার পর আর কোন উপায় নেই। এখন খোলে যদি কোন গর্ত করা হয়, বোটের বাকিটুকুও পানিতে ভরে যাবে। দুঃখজনক হলেও, নির্মম সত্যকে আমাদের মেনে নেয়া উচিত। ড্যামেজ মেরামত করতে, একটা এয়ারটাইট সীল তৈরি করতে, তারপর খোল পেনিট্রেট করতে নেভির যে সময় লাগবে তার অনেক আগেই আমাদের বাতাস শেষ হয়ে যাবে।'

'আমরা জেনারেটরগুলো বন্ধ রাখতে পারি। তাতে কয়েক ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় পাওয়া যাবে।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন অগাস্টাস। 'একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেচারি প্যাসেঞ্জারদের স্বাভাবিক জীবন কাটাতে দিন। তাছাড়া, পাম্পগুলো চালু রাখতে হলে জেনারেটর বন্ধ করা যাবে না। পাম্প বন্ধ হয়ে গেলে ভরা কমপার্টমেন্টগুলো থেকে পানি উপচাতে শুরু করবে।'

বোটের ডাক্তার, ডক্টর নক্স ঢুকলেন কন্ট্রোল রুমে। আগেই রিপোর্ট করা হয়েছে, ডক্টর নক্সের হসপিটালে কোন বেড খালি নেই। প্যাসেঞ্জাররা দলে দলে তাঁর কাছে এসে মাথাব্যথা, অনিদ্রা আর বমির ওষুধ চাইছে।

ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে প্রায় আঁতকে উঠল রানা। স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন একজন মানুষ এই অল্পসময়ের ভেতর এতটা কিভাবে বদলান! রানার সামনে যেন ডক্টর নক্সের ভূত দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর ভয় হলো, ভদ্রলোক না পড়ে যান। 'আমাকেও কি আপনার মত দেখাচ্ছে?'

ডক্টর নক্স জোর করে হাসার চেষ্টা করলেন। 'বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না–আরও খারাপ।'

'বিশ্বাস করলাম।'

ঠিক বসলেন না, ডক্টর নক্স যেন ধপ করে একটা চেয়ারে পড়ে গেলেন। 'আমাদের সমস্যা হলো অ্যাস্‌ফিকসিয়া। রক্তে অক্সিজেনের অভাব। আমরা কম অক্সিজেন নিচ্ছি, বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ছি।'

'গ্রহণযোগ্য মাত্রাটা কি?' জানতে চাইল রানা।

'অক্সিজেন, বিশ পার্সেন্ট। কার্বন ডাইঅক্সাইড, এক পার্সেন্টের দশ ভাগের তিন ভাগ।'

'এখন আমাদের কি অবস্থা?'

'অক্সিজেন আঠারো পার্সেন্ট।' জবাব দিলেন ডক্টর নক্স। 'কার্বন ডাইঅক্সাইড চার পার্সেন্টের কিছু বেশি।'

'আর ডেঞ্জার লিমিট?' ক্যাপটেন অগাস্টাসের পাথুরে চেহারা থেকে কর্কশ আওয়াজ বেরিয়ে এল।

'যথাক্রমে ষোলো আর পাঁচ পার্সেন্ট। এরপর কোন বিষয়ে গভীর মনোযোগ দেয়া সাংঘাতিক বিপজ্জনক।'

'আর বিপদ!' বিড়বিড় করল রানা।

যে প্রশ্নের মুখে কেউ পড়তে চায় না, ডক্টর নক্সকে সেই প্রশ্নটা করলেন ক্যাপটেন আগাস্টাস। 'আমাদের হাতে সময় আছে কতটুকু?'

'আমার মত আপনারাও অক্সিজেনের অভাব টের পাচ্ছেন,' শান্ত ভঙ্গিতে বললেন ডক্টর নক্স। 'দু'ঘণ্টা, কিংবা আড়াই ঘণ্টা, তার বেশি অবশ্যই নয়।'

'মূল্যবান ধারণা দেয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, ডক্টর নক্স,' আন্তরিক সুরে বললেন আগাস্টাস। 'ফায়ার ক্রুদের রেসপারেটার পেলে কিছু প্যাসেঞ্জারকে আরও কিছুটা সময় বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন কি?'

'আমি জানি কাদেরকে। বিশের নিচে বয়স, সংখ্যায় প্রায় দশজন। যতক্ষণ পারি ওদেরকে আমি অক্সিজেন সাপ্লাই দেব।' ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়লেন ডাক্তার। 'আমি বরং তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ফিরে যাই। সন্দেহ করছি বড় একটা লাইন দেখতে পাব।'

ডাক্তার ফিরে যাবার পর রানা আবার মন দিয়ে নকশাগুলো ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করল। 'যে-কোন জটিল সমস্যার সহজ একটা সমাধান আছে,' ফের সেই নিজের সঙ্গে কথা বলছে, তবে ভঙ্গিটা এবার একজন দার্শনিকের।

সেটা পাওয়া গেলে,' কৌতুকবোধের পরিচয় দিয়ে বললেন অগাস্টাস, রানার কথা শুনে ফেলেছেন, 'আমাকে জানাতে ভুলবেন না।' টুল ছেড়ে সিধে ছিলেন, ভারী শরীরটাকে দরজার দিকে ধীরে ধীরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। 'যাই। ডাইনিং রুমে আরেকবার চেহারা দেখাবার সময় হয়েছে। গুড লাক।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা।

ধীরে ধীরে অবশ করা একটা ভয় ঢুকে পড়ছে ওর মনে। মৃত্যুভয় নয়। যতগুলো মানুষের জীবন ঝুলে আছে ওর একটা সমাধান খুঁজে পাবার ওপর, সেটা না পাবার ভয়। তবে কয়েক মুহূর্ত পর এই অনুভূতি ওর বোধ-বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে তুলল, সব কিছু অস্বাভাবিক স্বচ্ছ ও পরিষ্কারভাবে দেখতে ও বুঝতে পারছে। তারপরই ঘটলো প্রায় একটা অলৌকিক ঘটনা, যেন অদৃশ্য কেউ সাহায্য করায় একটা গোপন রহস্য উদ্ঘাটিত হলো। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল, একটা ঝাঁকি খেয়ে মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল রানা। সমাধানটা সত্যি সহজ। মনে লাগলও প্রায় অনায়াসে। এরকম কত রহস্যই তো কত মানুষের কাছে ফাঁস হচ্ছে, তাদের মত রানারও মনে হলো এত সহজ সমাধানটা আগে কেন দেখতে পায়নি সে?

লাফ দিয়ে সিধে হয়েই ছুটল রানা, পায়ের ধাক্কায় টুলটা ফেলে দিল, তারপর কনসোলের পাশ থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল ফোনটা। এই ফোনের তারই সারফেসের দিকে উঠে বয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 'ববি! লাইনে আছ?'

'আছি,' গম্ভীর, থমথমে গলা।

আমি সম্ভবত উত্তরটা জানি! না, আমি নিশ্চিত, এটাই উত্তর।'

বন্ধুকে চেনে মুরল্যান্ড। এরকম ব্যাকুলতা ওর স্বভাববিরুদ্ধ। বিস্ময়ের ধাক্কা কোনমতে সামলে নিয়ে সে বলল, এক মিনিট। লাইনটা ব্রিজ স্পীকারে জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছি, কমান্ডার কালভিন সহ জাহাজের সবাই শুনুন তুমি কি বলতে চাও।'

একমুহূর্তের বিরতি, তারপর আবার তার গলা শোনা গেল, 'হ্যাঁ, বলো।'

'এয়ারহোস রেডি করে নিচে নামাতে কতক্ষণ সময় নেবে তোমরা?'

'অবশ্যই আপনি জানেন, মিস্টার রানা, হোস পাইপ জোড়া লাগানো সম্ভব নয়, বললেন কমান্ডার কালভিন, জলভরা মেঘের মত ভারী হয়ে আছে তাঁর চেহারা।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, ও-সব আমি জানি,' দ্রুত বলল রানা, ধৈর্য ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। 'শুধু বলুন কত তাড়াতাড়ি বাতাস পাম্প করতে পারবেন।'

ব্রিজের আরেক প্রান্তে, চীফ ফেলানের দিকে তাকালেন কমান্ডার কালভিন। ফেলান পায়ের সামনে এমন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যেন বোঝার চেষ্টা করবে ডেকের নিচে কি থাকতে পারে।

'এয়ার পাম্প করতে আমরা সময় নেব তিন ঘণ্টা,' মুখ না তুলেই জবাব দিল চীফ ফেলান।

'হয় দু'ঘণ্টার মধ্যে সারুন, না হয় ভুলে যান।'

'তাতে লাভটা কি, শুনি? হোস তো আমরা জোড়া লাগাতে পারব না।'

'আপনার পাম্প কি এই গভীরতায় চারপাশের পানির চাপ সহ্য করবে পারবে?'

'প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এক হাজার পাউন্ড,' জবাব দিল চীফ ফেলান। 'আপনার গভীরতায় পানির যে চাপ, তারচেয়ে কয়েকগুণ বেশি।'

'ভেরি গুড।' তীক্ষ্ণ গলায় বলল রানা। মাথার ভেতরটা কেমন ঝিম-ঝিম করছে ওর। 'হোসটা তাড়াতাড়ি নিচে নামান। লক্ষণ দেখা দিয়েছে–লোকজন এবার ঢলে পড়বে। ভেহিকেলের ম্যানিপুলেটর ব্যবহার করার দরকার হবে, তৈরি থাকবেন।'

'দয়া করে বলবেন কি, আসলে ঠিক কি করতে চান আপনি?' একটু যেন রাগের সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন কমান্ডার কালভিন।

'আপনি সাইটে আসুন, তখন ব্যাখ্যা করব। পৌঁছে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন পরবর্তী ইনস্ট্রাকশনের জন্যে।'

পড়িমরি করে ছুটে কন্ট্রোলরুমে ঢুকেছে কেমপ্রেসো, গোল্ডেন মেডিফিসের সঙ্গে রানার আলাপ প্রায় সবটুকুই শুনতে পেয়েছে। 'আমাকে অন্তত বলুন। কি লুকিয়ে রেখেছেন আস্তিনে?'

'দারুণ একটা আইডিয়া,' বলল রানা। 'এত ভাল আইডিয়া খুব কমই পেয়েছি আমি।'

'আপনি এই সাবমেরিনে কিভাবে বাতাস ঢোকাতে চান?'

'চাই না।'

এমন দৃষ্টিতে তাকাল কেমপ্রেসো, রানা যেন এরই মধ্যে মারা গেছে। 'তাহলে আপনার আইডিয়া দারুণ হলো কি করে?'

'সহজেই,' সহজ সুরে ব্যাখ্যা করল রানা। 'কথায় আছে না–ইফ মহম্মদ উড নট গো টু দা মাউন্টেন...'

'আপনার কথার কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না।'

'সেক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে দেখতে থাকুন,' রহস্য করে বলল রানা। 'ব্যাপারটা কিছুই না, স্রেফ ফিজিক্সের একটা মূলসূত্র, হাইস্কুলে পড়ানো ও পরীক্ষা করানো হয়।'

পাঁচ

এমারেল্ড মার্লিন সম্ভবত জলমগ্ন একটা কবরস্থানে পরিণত হতে চলেছে। বাতাস দুষিত হবার মাত্রা ভীতিকর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। লোকজনের হাবভাব ও আচরণ দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে জ্ঞান হারাতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। পৃথিবী ত্যাগ করার তিনটে ধাপের এটাই প্রথম। পরের দুটো–কোমা ও মৃত্যু। কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রুত এমন এক মাত্রায় পৌঁছাচ্ছে, যে মাত্রায় প্রাণধারণ সম্ভব নয়। রানা ও কেমপ্রেসো, ব্রিজে শুধু ওরা দু'জনই, কোন রকমে দাঁত কামড়ে পড়ে আছে।

অক্সিজেনের অভাবে মন ও মাথা ঠিকমত কাজ করছে না, ফলে প্যাসেঞ্জাররা বোধ- বুদ্ধিহীন আর অলস হয়ে পড়ছে। শেষ সময়টায় চলে এসে আতংকে অস্থির হলো না কেউ, কারণ পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারছে না যে মৃত্যুর এত কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তারা। ডাইনিং রুমে এখনও যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে কথা বলছেন ক্যাপটেন অগাস্টাস। এমন সব শব্দ ব্যবহার করে তিনি তাদেরকে বেঁচে থাকার উৎসাহ যোগাতে চাইছেন, যে শব্দগুলো তাঁর নিজের কাছেই অর্থহীন। ব্রিজে ফেরার পথে রয়েছেন, এই সময় করিডরে তাঁর হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, কার্পেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। প্রৌঢ় এক দম্পতি ধীরগতিতে পাশ কাটাল তাঁকে, শূন্যদৃষ্টিতে দেখল ক্যাপটেন পড়ে আছেন। নিজেরাই বারবার হোঁচট খাচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে ঢলে পড়বে, তাদের আর কি প্রতিক্রিয়া হবে।

কন্ট্রোল রুমে দুর্বোধ্য প্রলাপ বকছে কেমপ্রেসো, মৃত্যুর প্রথম ধাপ থেকে তার দূরত্ব খুব বেশি নয়, যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাবে। রানার অবস্থা এভাবে বর্ণনা করা যায়–গুণে গুণে ষাট সেকেন্ড পর ওর কপালে কি আছে ভাবতে নিজেই ভয় পাচ্ছে ও। ছোট হতে হতে আকাঙ্ক্ষার চেহারা দাঁড়িয়েছে–'একটা মিনিটও যদি বাঁচি!' কামরার ভেতর যে সামান্য অক্সিজেন অবশিষ্ট আছে সেটুকু ফুসফুসে ভরার জন্যে বড় করে শ্বাস টানছে রানা। 'কোথায় তোমরা?' প্রশ্নটা করার পর নিজেই ভাবল, প্রলাপ বকছি, তারপর যেন এই প্রথম খেয়াল করল ওর হাতে ফোনের রিসিভার রয়েছে। 'আমরা তো প্রায় শেষ।'

'আসছি!' মুরল্যান্ডের গলায় মরিয়া সুর। 'পোর্ট দিয়ে তাকাও। আমরা কন্ট্রোল রুম গম্বুজের দিকে পৌঁছাব।'

টলছে রানা, দু'পা এগিয়ে এক পা পিছাচ্ছে। কনসোল কন্ট্রোলের সামনে মেইন পোর্ট। বিদ্রূপাত্মক এক চিলতে হাসি ফুটল ঠোঁটে। নিজেকেই চ্যালেঞ্জ করছে মাসুদ রানা–ওখানে অন্তত এ জীবনে তোমাকে পৌঁছাতে হচ্ছে না, সে

ক্ষমতাই তোমার নেই। পৌঁছানোর পর ভুলে গেল আদৌ কেউ কাউকে চ্যালেঞ্জ করেছিল কিনা পোর্টের বাইরে তাকাতে ডীপ ওয়ার্কারকে নেমে আসতে দেখল। 'সঙ্গে হোস আছে তো?' প্রশ্নটা শোনার পর উপলব্ধি করল এটা ওর নিজেরই গলা।

'আপনি বললেই পাম্প করার জন্যে তৈরি,' জবাব দিল চীফ ফেলান। সারফেস থেকে অপারেশনের নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে গোল্ডেন মেডিফিসে রয়ে গেছেন কমান্ডার কালভিন।

'নিচে নামুন। নামতে থাকুন। মেঝের সঙ্গে ঘষা খান। তারপর এঞ্জিন রুমের উল্টোদিকে খোল যেখানটায় ভেঙেছে সেদিকে এগোন।'

'রওনা হয়ে গেছি,' জানাল মুরল্যান্ড, এখনও জানতে চাইছে না ঠিক কি করতে চায় রানা।

পাঁচ মিনিট পর মুরল্যান্ড রিপোর্ট পাঠাল রানাকে, 'বিস্ফোরণে তৈরি গর্তের লেভেলে পৌঁছেছি আমরা।'

ওদের সব কথা সারফেস থেকে কমান্ডার কালভিনও শুনতে পাচ্ছেন।

বাতাসের জন্যে এই যুদ্ধটাকে কার যেন এক নির্দয় কৌতুক বলে মনে হলো রানার, বিশেষ করে যখন দেখতে পাচ্ছে সারা জীবনে যতটুকু লাগবে তারচেয়ে অনেক বেশি বাতাস রয়েছে মাত্র কয়েক ফুট দূরে। কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিস্ফোরণ হয়ে বেরিয়ে এল শব্দগুলো, 'ম্যানিপুলেটর ব্যবহার করে এয়ার হোসের মুখ এঞ্জিন রুমের যতটা পারো ভেতরে ঢোকাও।'

সাবমারসিবলের ভেতর চীফ ফেলান ও মুরল্যান্ড দ্রুত একবার দৃষ্টি বিনিময় করল। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ম্যানিপুলেটরের সাহায্যে এমারেল্ড মার্লিনের ভাঙা খোলের ভেতর হোস ঢোকানোর কাজ শুরু করল মুরল্যান্ড। কাজটা শেষ করতে দশ মিনিট লেগে গেল তার। একসময় অনুভব করল এঞ্জিন রুমের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে হোস, আটকে গেছে এঞ্জিন মাউন্টিংগুলোর ফাঁকে। 'হোস পাইপ ভেতরে,' ঘোষণা করল সে।

রানা কথা বলছে–শ্বাস টানার সঙ্গে একটা শব্দ, নিঃশ্বাস ফেলবার সঙ্গে একটা। 'ঠিক...আছে...পাম্প...শুরু...করো...'

আবার রেসকিউ ভেহিকেলে দৃষ্টি বিনিময় করল চীফ ফেলান ও মুরল্যান্ড, তবে এবারও রানার নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করল না ওরা। দেরি করেনি, কমান্ডার কালভিনের কাছে মেসেজ পাঠাল চীফ ফেলান। দু'মিনিটের মাথায় হোস পাইপের মুখ থেকে বিপুল বেগে বাতাস ঢুকতে শুরু করল এঞ্জিন রুমে।

'এটা আমরা কি করছি?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড, একই সঙ্গে বিস্ময়ে বিমূঢ় ও অশুভ আশঙ্কায় প্রায় অসুস্থ। রানার অস্ফুট কণ্ঠস্বর কোন রকমে শুনতে পাচ্ছে সে, ধরে নিয়েছে বন্ধুকে বাঁচাবার শেষ সুযোগটাও সম্ভবত হাতছাড়া হয়ে গেছে।

'একটা...বোট...তখনই ডোবে, যখন...চাপের...মধ্যে থাকা পানিতে...খোলের...এয়ারস্পেস...ভরাট...হয়ে...যায়–, কিছুক্ষণ হাঁপিয়ে নিল রানা, তারপর আবার শুরু করল, আগের চেয়ে একটু স্পষ্ট শোনাল গলার আওয়াজ, যেন শরীরের সবটুকু শক্তি আর ফুসফুসের সমস্ত বাতাস কাজে

লাগাচ্ছে ও। 'কিন্তু··· এই···গভীরতায়···তোমার হোস থেকে···যে বাতাস বেরুচ্ছে... তার প্রেশার বা চাপ···পানির চেয়ে দ্বিগুণ, ফলে ওই পানিকে তোমার বাতাস···গায়ের জোরে···সাগরে বের করে···দিচ্ছে।' এটুকু ব্যাখ্যা করতেই নিজের শারীরিক শক্তি ও মনোবল যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সব হারিয়ে ফেলল রানা, অবশ শরীরটা ঢলে পড়ল কেমপ্রেসোর পাশে। সে আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

ভাঙা খোল থেকে এঞ্জিন রুমের পানি উথলে বেরিয়ে আসছে দেখে হঠাৎ করেই আশার আলো দেখতে পেল মুরল্যান্ড। পাঁচশো পঞ্চাশ ফুট ওপর সারফেস থেকে এয়ার পাম্প এত তীব্র চাপ সৃষ্টি করছে যে এঞ্জিন রুমের ভেতরকার পানি বাতাসকে জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। 'ওহ্, গড! ওহ্, গড! ইট'স ওয়ার্কিং!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'বাতাস এঞ্জিন রুমের ভেতর একটা প্রকাণ্ড বুদ্বুদ তৈরি করছে।'

'হ্যাঁ, তা করছে,' বলল চীফ ফেলান, 'কিন্তু ওই বাতাস তো আর কোনভাবেই বোটের অন্য কোন অংশে যেতে পারছে না।'

মুরল্যান্ডের হাসিটাকে কান্নার মত দেখাচ্ছে। যেটাকে রানার পাগলামি মনে হয়েছিল, সেটার ভেতর সমাধান দেখতে পেয়ে বন্ধুর জন্যে গর্বে হাসছে সে। ভাবাবেগে আক্রান্ত হলে কোন কোন হাসি-কান্নার মত দেখাতেই পারে। 'ভাই ফেলান, প্রথম থেকেই ব্যাপারটাকে আমরা ভুল বুঝেছি। আমার বন্ধু বোটের বাতাস বিশুদ্ধ করতে চাননি। উনি বোটটাকে সারফেসে তোলার চেষ্টা করছেন।'

নিচে তাকিয়ে চীফ ফেলান দেখল সাবমেরিন এমারেল্ড মার্লিনের খোল এখনও পলির ভেতর ডুবে রয়েছে। তার সন্দেহ আরও বরং বাড়ল—পলি থেকে মুক্ত হয়ে এই বোট উঠবে বলে মনে হয় না। একটু পর সে শান্ত সুরে বলল, 'আপনার বন্ধু কোন সাড়া দিচ্ছেন না।'

'রানা!' ফোনে গর্জন করে উঠল মুরল্যান্ড। 'আমার সঙ্গে কথা বলো!'

কিন্তু কোন সাড়া পেল না।

সারফেস থেকে অনেক নিচে একটা বিয়োগান্তক নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে. নেভির সাপোর্ট শিপ গোল্ডেন মেডিফিশের ব্রিজে পায়চারি করতে করতে তা শুনছেন কমান্ডার কালভিন। রানার প্ল্যানটার মধ্যে শুধু বুদ্ধির ঝিলিক নয়, প্রতিভার দ্যুতিও তিনি দেখতে পেয়েছেন। সমাধানটা এত অবিশ্বাস্য মাত্রায় সহজ যে তাঁর মনে সংশয় আছে বাস্তবে এটা কাজ দেবে কিনা।

সাপোর্ট শিপের ব্রিজে সব মিলিয়ে আটজন লোক। ভয় আর হতাশা ভিজে চাদরের মত ঝুলে আছে। সবাই ওরা একটা কথাই ভাবছে-সব শেষ হতে চলছে, এমারেল্ড মার্লিন টাইটেনিয়ামের তৈরি একটা গোরস্থানে পরিণত হবে। এটা প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে যে ওদের পায়ের নিচে সিকি মাইলেরও কম দূরত্বে ছয়শো সতেরোজন মানুষ জীবনে শেষবারের মত শ্বাস নিচ্ছে। স্পীকারের চারপাশে জড়ো হয়েছে তারা, নিজেদের মধ্যে এত নিচু গলায় কথা বলছে এটা যেন একটা পবিত্র উপাসনালয়, অপেক্ষা করছে ডীপ ওয়ার্কার থেকে কি বলা হয় শোনার আশায়।

'লাশগুলো কি উদ্ধার করবে ওরা?' এ স্রেফ থার্ড অফিসারের একটা জল্পনা।

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন কমান্ডার কালভিন। 'এরকম একটা স্যালভিজ অপারেশনে কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ পড়বে। আমার ধারণা, যেহেতু আর কোন লাভ নেই, লাশ নিয়ে কেউ আর টানাটানি করতে চাইবে না।'

একজন তরুণ নাবিক হঠাৎ একটা কাউন্টারে ঘুসি মেরে বসল। 'ওরা রিপোর্ট করছেন না কেন? নিচে কি ঘটছে চীফ ফেলান আমাদেরকে বলছেন না কেন?'

'ইজি, সান। নিজেদের সমস্যায় পাগল হয়ে আছে ওরা, এদিক থেকে বিরক্ত করা উচিত হবে না।'

'বোট ওপরে উঠছে! বোট ওপরে উঠছে!' সাইড-স্ক্যান সোনার অপারেটর ছ'টা শব্দ উচ্চারণ করল, সে এক মুহূর্তের জন্যেও রেকর্ডার থেকে চোখ সরায়নি।

সোনার অপারেটরের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়লেন কমান্ডার কালভিন, রেকর্ডারের দিকে তাকাতে হাঁ হয়ে গেলেন। এমারেল্ড মার্লিনের ইমেজ নড়ে গেছে। 'সত্যি উঠছে, কোন সন্দেহ নেই,' বলে উঠলেন তিনি।

স্পীকার থেকে বেরিয়ে এল কর্কশ ও একটানা একটা গোঁ-গোঁ শব্দ, নিশ্চিত আভাস পাওয়া গেল বোট পলি থেকে ওঠার সময় টান পড়ায় ধাতব কাঠামো গোঙাচ্ছে, ভাঁজ ভেঙে প্রসারিত হচ্ছে। তারপর ভেসে এল চীফ ফেলানের গর্জন। 'খোদার কসম, বোট নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে! সারফেসের দিকে উঠছে ওটা। এঞ্জিন রুমে বাতাস পাম্প করাটাই ছিল জাদু। সাকশান ভাঙার জন্যে যথেষ্ট বয়ান্সি পেয়ে যায় সাবমেরিন, ছিটকে পলি থেকে বেরিয়ে এসেছে...'

'আমরা বোটের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করছি,' তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল মুরল্যান্ড, 'হোসটা যাতে ওটার ভেতর বাতাস পাম্প করতে পারে, তা না হলে আবার ডুবে যাবে।'

'আমরা এখানে তৈরি হয়ে থাকব!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানালেন কমান্ডার কালভিন। তারপর নিজের এঞ্জিনিয়ারিং ক্রুদের নির্দেশ দিলেন, সারফেসে ভেসে ওঠা মাত্র তারা যেন ক্রুজ শিপে উঠে কাটিং টর্চ দিয়ে একটা গর্ত করে খোলের মাথার দিকটায়, যাতে খুব অল্প সময়ের ভেতর বোটের ভেতর পাম্প করে বাতাস ঢোকানো যায়। এমারেল্ড মার্লিন অসম্ভবকে সম্ভব করে সারফেসে যখন উঠে আসছে তখন এ কথা ভাবতে দোষ কি যে প্যাসেঞ্জার আর ক্রুরা বেশিরভাগই বেঁচে আছে। কিংবা হয়তো সময়মত চিকিৎসা ও সেবা-যত্ন পেলে বেঁচে যাবে।

এরপর কমান্ডার কালভিন বিশ মাইলের মধ্যে প্রতিটি বোটকে অনুরোধ করলেন জ্ঞান ফেরাবার ও অক্সিজেন সাপ্লাই দেয়ার ইকুইপমেন্ট থাকলে তারা যেন ফুল স্পীডে ছুটে আসে। কাছাকাছি যত ডাক্তার আছেন তাঁদেরকেও তৈরি থাকতে বলা হলো, খোল কাটা শেষ হওয়া মাত্র প্রথমে তাঁদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হবে। সময় এখানে সবচেয়ে অমূল্য। অক্সিজেনের অভাবে যে-সব প্যাসেঞ্জার ও ক্রু জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে তাদের চিকিৎসা সবার আগে হওয়া চাই।

এমারেল্ড মার্লিন উঠে আসছে, এ-খবর সারফেসের এক ঝাঁক জাহাজে দাবানলের চেয়েও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। শোক ও হতাশায় ম্লান পরিবেশটা অকস্মাৎ হাসি-আনন্দে মুখর হয়ে উঠল। বোট আর জাহাজ বৃত্তাকারে ভাসছে, মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় তাকিয়ে আছে নিষ্পলক এক হাজার চোখ। এইসময় পানিতে

একরাশ বুদ্বুদ মাথাচাড়া দিল, সকালের সূর্যের নিচে বিস্ফোরিত হয়ে খুদে খুদে অসংখ্য রঙধনু তৈরি করছে। তারপর উদয় হলো এমারেল্ড মার্লিন। উথলানো পানির মাঝখানে হঠাৎ করেই দেখা গেল পুরো আকৃতি একসঙ্গে, বোটের তলি কোন দিকে হেলে বা কাত হয়ে নেই। বিরাট একটা ঢেউ চারপাশের বড় বড় বোট আর জাহাজগুলোকে দুলিয়ে দিল, আর ছোট ইয়টগুলোকে ঘন ঘন ঝাঁকি খেতে দেখে মনে হলো দমকা বাতাসে গাছ থেকে ঝরে পড়া শুকনো পাতা।

'উঠেছে! উঠেছে!' উল্লাস চেপে রাখতে পারলেন না কমান্ডার কালভিন, বাচ্চা ছেলের মত বার কয়েক লাফালেনও। পরমুহূর্তে হাতের বুলহর্ন মুখের সামনে তুলে গর্জে উঠলেন। 'রেসকিউ বোট!' ব্রিজ উইং থেকে দেখতে পাচ্ছেন এরইমধ্যে পানিতে নামানো হয়েছে লঞ্চগুলোকে। 'তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! ওদিকে যাও তোমরা!'

প্রায় স্থির বাতাসকে কাঁপিয়ে দিল বহুলোকের মিলিত উল্লাসধ্বনি। মানুষ আনন্দে চিৎকার করতে করতে গলার আওয়াজ কর্কশ করে ফেলল। অনেকেই শিস দিচ্ছে। থেমে নেই একটাও হর্ন আর সাইরেন। কমান্ডার কালভিনের মতই, চোখে দেখেও দৃশ্যটা কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। পুনরুত্থান-এর ঘটনাটা এত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত, অনেকের জন্যেই যেন তা পুরোপুরি মেনে নেয়া কঠিন। বোট, হেলিকপ্টার আর প্লেনে যে-সব মিডিয়া ক্যামেরাম্যান রয়েছে তারা কমান্ডার কালভিন আর কোস্ট গার্ড কাটার ক্যাপটেনের নির্দেশ, ও হুমকি উপেক্ষা করে নিষিদ্ধ পরিধির ভেতর ঢুকে পড়ল। তাদের বেশিরভাগের উদ্দেশ্য যতটা সম্ভব কাছ থেকে ভাল ছবি তোলা, তবে কিছু লোক যে-কোন মূল্যে ক্রুজ শিপের ভেতর ঢুকতে চায়।

এমারেল্ড মার্লিন ডিমে তা দিতে বসা মুরগীর মত পানিতে স্থির হওয়ামাত্র উদ্ধার কর্মীদের একটা বাহিনী ওটাকে লক্ষ্য করে ছুটল। প্রথমে পৌঁছে পাশে ভিড়ল গোল্ডেন মেডিফিশের বোটগুলো। কাটিং ইকুইপমেন্ট দিয়ে খোল কাটার নির্দেশ নিজেই বাতিল করে দিয়ে কমান্ডার কালভিন বোর্ডিং ও কার্গো হ্যাচ দিয়ে ভেতরে ঢোকার পরামর্শ দিলেন ক্রুদের। হ্যাচগুলো তো এখন বাইরে থেকেই খোলা সম্ভব, যেহেতু ভেতরে পানি ঢোকার ভয় নেই।

প্রকাণ্ড বোটের পাশেই ভেসে উঠেছে ডীপ ওয়ার্কার। চীফ ফেলান সাবমারসিবলকে ঠিক জায়গা মত ভাসিয়ে রাখছে, এঞ্জিন রুমে হোসটা যাতে ঠিকমত আটকানো থাকে। হোসটা এখনও বাতাস ভরছে এঞ্জিন রুমে। হাতের এক ধাক্কায় হ্যাচ খুলে ফেলল মুরল্যান্ড। চীফ ফেলান বুঝতেই পারেনি কি করতে যাচ্ছে সে, পারলে ঠিকই পিছন থেকে ধরে ফেলত। সাবমারসিবল থেকে পানিতে ডাইভ দিল মুরল্যান্ড, দ্রুত সাঁতার কেটে একটা বোটের দিকে এগোল, বোটের ক্রুরা এমারেল্ড মার্লিনের স্টারবোর্ড সাইডের বোর্ডিং হ্যাচ-এর ল্যাচ বা খিল খুলতে ব্যস্ত। ভাগ্য ভাল বলেই কোস্টগার্ডের রেসকিউ টীমের একজন সদস্য চিনতে পারল মুরল্যান্ডকে, তা না হলে তারা তাকে কাছেই ঘেঁষতে দিত না। টেনে বোটে তলা হতে, সবার সঙ্গে সে-ও নিজের পেশী কাজে লাগাল হ্যাচটা টেনে খুলতে-পলিতে শুধু ঢাকা পড়েনি, জ্যামও হয়ে গেছে ওটা।

সবাই মিলে টান দিতে হ্যাচ আধ ইঞ্চি খুলল। আবার টানল ওরা। এবার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ বেরুল কব্জা থেকে, হাঁ হয়ে পুরোটা খুলে গেল। প্রথম এক মুহূর্ত কেউ নড়ার শক্তি পেল না, বোবা হয়ে তাকিয়ে থাকল ভেতরে, অনুভব করল বাসী ও অস্বাস্থ্যকর একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। এ-ও বাতাস, তবে ওরা জানে যে এই বাতাস শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে উপযোগী নয়। জেনারেটরগুলো এখনও চলছে তাসত্ত্বেও বোটের ভেতরটা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে আছে দেখে বিস্মিত হলো ওরা।

ওই একই সময় খোলের উল্টোদিকে অপর এক দল ক্রু পোর্ট হ্যাচ খুলে ফেলল, ফলে মুখোমুখি দুটো পথ পেয়ে দূষিত বাতাস বেরিয়ে গিয়ে বিশুদ্ধ বাতাসকে ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে দিল। ভেতরে পা দিয়ে দু'দল ক্রুই দেখতে পেল ডেকের ওপর লোকজন পড়ে আছে। প্রস্তুতি নেয়াই আছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু হয়ে গেল। অজ্ঞান লোকজনের মধ্যে একজনকে চিনতে পারল মুরল্যান্ড—ক্যাপটেন অগাস্টাস।

তার আরও জরুরী কাজ আছে, কাজেই সে থামল না। প্রবল একটা দমকা বাতাসের মত বেরিয়ে এল লবিতে। দ্রুত চারদিকে চোখ বুলাল, ঘুরল, তারপর আবার ছুটল। প্যাসেজওয়ে ধরে বো-র দিকে যাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে কন্ট্রোল রুমে উঠবে। মুরল্যান্ড ছুটছে মরিয়া হয়ে, অনুভব করছে হিম ও তরল কিছুর ভেতর ডুবে যাচ্ছে তার হৃৎপিণ্ড। বাতাস দূষিত হওয়ায় হাঁপাচ্ছে সে। এই দূষিত বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ছে খুব ধীরে। বুকে ভয়ংকর ও কুৎসিত একটা আশঙ্কা নিয়ে কন্ট্রোল রুমে ঢুকল সে। জানে না সারা জীবনের শ্রেষ্ঠতম বন্ধুটিকে হারিয়ে ফেলেছে কিনা।

কেমপ্রেসোর অসাড় শরীরটাকে টপকে রানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল মুরল্যান্ড। হাত-পা মেলে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ও, চোখ বন্ধ, মনে হলো নিঃশ্বাসও বন্ধ। পালস খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট করার লোক মুরল্যান্ড নয়, সঙ্গে সঙ্গে মাউথ-টু-মাউথ রিসাসিটেশন শুরু করার জন্যে রানার মুখের দিকে ঝুঁকল। কিন্তু হঠাৎ, তাকে চমকে দিয়ে, মায়াভরা চির-পরিচিত সেই চোখ দুটো খুলে গেল, তারপর শোনা গেল নিচু একটা গলা, 'আশা করি মনোরঞ্জন পর্বের এখানেই সমাপ্তি।'

মৃত্যুর এত কাছে এত লোক একই সময়ে আগে কখনও পৌঁছায়নি। কোন ভিলেনকেও বোধহয় এত লোক একসঙ্গে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে থাকেনি। এ যেন অসম্ভব, প্রায় অলৌকিক একটা ব্যাপার যে এমারেল্ড মার্লিনের কোন প্যাসেঞ্জার বা ক্রু সত্যি সত্যি মারা যায়নি। সবাইকে ওই মৃত্যুর দরজা থেকে টেনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মাত্র সতেরোজনকে, বেশিরভাগই বুড়ো-বুড়ি, কোস্ট গার্ড হেলিকপ্টারে তুলে মায়ামির হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হলো। দু'জন বাদে বাকি সবাই কোন ক্ষতিকর প্রভাব ছাড়াই সুস্থ হয়ে উঠল। এই দু'জন মাথাব্যথা আর আচ্ছন্নতায় ভুগছে, ডাক্তাররা পরীক্ষা করে জানালেন, হপ্তাখানেকের মধ্যে এরাও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে।

বোটের ভেতর তাজা বাতাস নতুন করে ঢুকতেই বেশিরভাগ লোক আপনিই সুস্থ হয়ে ওঠে। অক্সিজেন ইকুইপমেন্টের সাহায্যে রিসাসিটেশন প্রয়োজন হলো মাত্র বাহান্নজনের। লং লেলাং ক্রুজ লাইন্স-এর ডিরেক্টররা, নিউজ মিডিয়াও, ক্যাপটেন আগাস্টাসকে 'হিরো' বলে অভিহিত করল, যিনি বড় মাপের একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে দেননি; অকুণ্ঠ প্রশংসা করা হলো ডক্টর নক্সেরও, যার অক্লান্ত পরিশ্রমেই মৃত্যুহার শূন্যের কোঠায় রাখা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধার অভিযানে ভূমিকা রাখার সময় কমান্ডার কালভিন আর তার ক্রুদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও সাহসের স্বীকৃতি দিল নেভি।

গোটা বোট আর তার কয়েকশো প্যাসেঞ্জার ও ক্রুকে বাঁচাতে রানা ও মুরল্যান্ড যে অবদান রাখল, সে-কথা জানবার সুযোগ পেল মাত্র দু'চারজন মানুষ। তবে নিউজ মিডিয়া এক সময় ঠিকই খবর পেয়ে গেল, যে-লোক বঙ্গোপসাগরে ওয়াটারলিলির দু'হাজার লোককে বাঁচিয়েছিল, সে-ই লোকের মাথা থেকেই বেরিয়েছে এমারেল্ড মার্লিনকে সারফেসে ফিরিয়ে আনার বুদ্ধি বা আইডিয়া। অমনি চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। কিন্তু রানাকে ওরা পাবে কোত্থেকে! গোল্ডেন মেডিফিশের স্টার্ন হেলিপ্যাডে নুমার একটা কপ্টার নেমেছিল, সেটায় চড়ে অনেক আগেই চলে গেছে ও। ওর সঙ্গে, বলাই বাহুল্য, মুরল্যান্ডও ছিল।

সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্যে রিপোর্টাররা গোটা দুনিয়া চষে ফেলেও রানার কোন হদিশ বের করতে পারল না। রানা যেন একটা গর্তের ভেতরে পড়ে গেছে, তারপর বন্ধ করে দিয়েছে সেটার মুখ।

ছয়

নিউ জার্সির টোহোনো লেক জনবসতি থেকে অনেকটা দূরে। রাজ্যে এটাই সম্ভবত একমাত্র লেক যেটার ধারে কাছে কোন বাড়ি-ঘর নেই। এটা আসলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, মালিক ফ্যালকন করপরেশন; শুধুমাত্র ওপর সারির কর্মকর্তারা এখানে আসার অনুমতি পায়। অধস্তন কর্মচারীরা ত্রিশ মাইল দূরে আরেকটা রিসর্ট লেক ব্যবহার করে আনন্দভ্রমণ বা পিকনিকের জন্যে। টোহোনো যেহেতু নির্জন একটা লেক, তাই চারধারে কোন বেড়া রাখা হয়নি। একমাত্র সিকিউরিটি বলতে পাঁচ মাইল দূরে রাস্তার ওপর তালা দেয়া একটা গেট। রাস্তাটা নিচু পাহাড় আর ঘন বনভূমির ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ তৈরি করে এগিয়ে এসে থেমেছে সুদৃশ্য একটা বাড়ির সামনে। বাড়িটা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি, মুখটা লেকের দিকে। সামনেই বোট হাউস সহ একটা ডক। বোট হাউসে ঠাঁই পেয়েছে কয়েকটা ক্যানু আর রো-বোট। এঞ্জিনচালিত কোন বোট এই লেকে নামানো নিষেধ।

আলবার্ট লোগান ফ্যালকন করপরেশনের কোন কর্মকর্তা নয়। এমনকি ওদের অধনস্ত কোন কর্মচারীরও নয়। সে আসলে এলাকার হাতে গোনা কয়েকজন লোকের মধ্যে একজন, যে কিনা 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা সাইনবোর্ড গুরুত্বের সঙ্গে

নেয় না, বনভূমির ভেতর দিয়ে হেঁটে এসে লেকে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে বসে যায়। লেকটাকে ঘিরে আছে প্রচুর গাছপালা, তার ভেতর ছোট্ট একটা ক্যাম্প ফেলেছে লোগান। এই লেকে প্রচুর ব্যাস মাছ পাওয়া যায়, যেহেতু ধরা হয় খুব কম। মাছ ধরতে খুব পটু, দুপুরের আগেই পাঁচ থেকে দশ পাউন্ড ওজনের কয়েকটা ব্যাস ধরল লোগান। পানিতে নেমে আরেকবার ছিপ ফেলতে যাবে, এইসময় হঠাৎ দেখল বড় আকৃতির একটা কালো লিমুজিন এসে থামল বোট র‍্যাম্পের গোড়ায়। গাড়ি থেকে ফিশিং গিয়ার নিয়ে দু'জন লোক নামল। র‍্যাম্পের পাশে একসারিতে অনেকগুলো বোট ভাসছে, তারই একটা টেনে আলাদা করল শোফার।

মহা ক্ষমতাধর করপরেট এক্সিকিউটিভ হয়ে একটা আউটবোর্ড মোটর ব্যবহার না করাটা ওঁদের জন্যে বেমানান, ভাবল লোগান। দু'জন লোকের মধ্যে একজন বৈঠা চালিয়ে লেকের মাঝখানে পৌঁছাল। নৌকা ভাসছে, লোক দু'জন বড়শিতে টোপ গেঁথে পানিতে ফেলল ব্যাস ধরার আশায়। সাবধানে পিছিয়ে জঙ্গলের ভেতর নিজের ক্যাম্পে ফিরে এল লোগান। কোলম্যান স্টোভে পানি চড়িয়ে এক কাপ কফি বানাল সে, তারপর একটা পেপারব্যাক নিয়ে পড়তে বসল। লেক থেকে মালিকের লোকজন ফিরে যাক, তারপর আবার মাছ ধরতে যাবে সে।

নৌকার মাঝখানে বসে যে লোকটা বৈঠা চালাচ্ছে তার বয়স হবে পঞ্চান্ন, লম্বা ছ'ফুটের সামান্য কম, চওড়া কাঠামোর ওপর বাড়তি কোন চর্বি নেই। মাথার চুল লালচে-খয়েরি, এখনও পাক ধরেনি। তার সবকিছুই যেন কোনও প্রাচীন গ্রীকের হাতে পাথরে খোদাই করা। মাথা, চোয়াল, নাক, কান, বাহু, পা, পায়ের পাতা আর হাত যেন নিখুঁত মাপ ধরে তৈরি। চোখ জোড়া নীলচে সাদা, তবে দৃষ্টি যতটা না অন্তর্ভেদী তারচেয়ে অনেক বেশি মায়াবী—অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করে, যেন বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে সম্মোহিত না হয়ে উপায় নেই। তার এই দৃষ্টি মানুষের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে—তারা তাকে যখন আন্তরিক ও বন্ধু বলে মনে করছে, সে তখন নাগালের মধ্যে সবাইকে নিজের বশীভূত করার চেষ্টা করছে। তার নড়াচড়া সব সময় ঠিক যতটুকু প্রয়োজন। কখনও অপচয় ঘটে না।

লীফ হেরকুল একজন পারফেকশনিস্ট। খালি পায়ে মাইলের পর মাইল শস্যখেত পার হয়ে নিজেদের খামারে কাজ করতে যাওয়া সেই বালকটিকে তার মধ্যে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাবা মারা যাবার পর বারো বছর বয়সে পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা করার জন্যে স্কুল ছাড়তে হয় তাকে, সেই থেকে নিজের হাতে তুলে নেয় নিজেকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব। পরবর্তী আট বছরে, তার বয়স যখন বিশ, নিজ রাজ্যের সবচেয়ে বড় খামার-এর মালিক হয় সে, সেটাকে মা ও বোনেদের হয়ে চালাবার জন্যে একজন ম্যানেজার নিয়োগ করে।

ধূর্তামি আর শয়তানির পরিচয় দিয়ে লীফ হেরকুল স্কুল রেকর্ড জাল করে নিউ ইংল্যান্ডের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বিজনেস স্কুলে ভর্তি হয়। শেখার বয়সটায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পেলে কি হবে, প্রকৃতির কাছ থেকে বিশেষ উপহার হিসেবে ক্ষুরধার বুদ্ধি আর ফটোগ্রাফিক মেমোরি পেয়েছে সে। অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট হয়

হেরকুল, তারপর ইকোনমিক্সে পিএইচ.ডি. করে।

সেই থেকে তার জীবন একটা ছক ধরে এগিয়েছে: এক সঙ্গে একাধিক কোম্পানি চালু করে সে, সবগুলোকে সাফল্যের চরম শিখরে তুলেই বিক্রি করে দেয়। আটত্রিশ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ধনীদের তালিকায় নাম লেখাল হেরকুল, সিরিয়াল নম্বর আট। টাকার সঙ্গে না চাইতেই এল ক্ষমতা। বন্ধু-বান্ধবরা বোঝাল, তোমার টাকা আরও একশো গুণ বাড়বে যদি ঢাল হিসেবে রাজনীতিকে ব্যবহার করতে পারো। হেরকুল মনে মনে হাসল। তার তো ইচ্ছাই আছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবে। বন্ধুরা ভক্ত সেজে যে-সব বুদ্ধি দেয় তার বেশিরভাগই প্রত্যাখ্যান করে সে, যে-দু'একটা গ্রহণ করে সেগুলো আসলে তার নিজ পরিকল্পনারই অংশ। টাকা ওড়ালে সিনেটর হওয়া কোন ব্যাপার নয়, হেরকুলও হলো। একজন সিনেটরকে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়, অন্য যেকোনো সিনেটরের চেয়ে সে-সব দায়িত্ব অনেক ভালভাবে পালন করল সে-বেশিরভাগ কাজই বেতনভুক যোগ্য লোকদের দিয়ে করিয়ে নিয়ে। তবে তখনও টাকা বানিয়ে তৃপ্তি হয়নি হেরকুলের, তাই প্রিয় এই কাজটায় আবার মন-প্রাণ ঢেলে দিল সে। এবার এমন একটা তেল কোম্পানি কিনল যেটা লাভ খুব কমই করে, তবে গোটা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে তার অনেকগুলো অয়েল ফিল্ড লীজ নেয়া আছে, আলাস্কা সহ। ছ'বছর পর পুরানো ও লাভজনক এক কেমিকেল কোম্পানিকে এই তেল কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত করল সে, নাম দিল ফ্যালকন গ্রুপ অভ কোম্পানিজ।

পরপর তিনবার সিনেটর নির্বাচিত হবার পরও প্রচলিত অর্থে জনপ্রিয় রাজনীতিক হতে পারেনি লীফ হেরকুল। আসলে হতে পারেনি কথাটা ঠিক নয়, সে আসলে হতে চায়নি। ব্যক্তিগত বন্ধু তার নেই বললেই চলে, যারা আছে তাদেরকে মোসাহেব বলাই ভাল। কখনও কোন পার্টি বা সামাজিক অনুষ্ঠানে যায় না। জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের কয়েকজনকে সে পোষা কুকুরের মত পালন করছে। বিয়ে করেনি, কখনও করবেও না। জ্ঞান হবার পর থেকে শুধু একটা জিনিসকেই ভালবাসতে পেরেছে–টাকা। নির্দয় একজন মানুষ, বরফের মতই কঠিন ও ঠাণ্ডা। ব্যবসায়িক লেনদেনে আজ পর্যন্ত তার কোন প্রতিপক্ষই তাকে হারাতে পারেনি। বরং নোংরা ষড়যন্ত্র আর নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে তাদের বেশিরভাগই নিঃস্ব হয়ে বিদায় নিয়েছে।

ভয়ানক চতুর আর অসম্ভব সতর্ক সে ভুক্তভোগীরা ছাড়া কেউ আজ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারেনি যে লীফ হেরকুলের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হলো ব্ল্যাকমেইল ও খুন। যার সঙ্গেই তার ব্যবসায়িক স্বার্থ নিয়ে গোলমাল বাধুক, হেরকুলকে জিততেই হবে। হয় জিততে দাও, তা না হলে চড়া মূল্য দাও। প্রতিপক্ষ নিজে বা তার স্ত্রী আত্মহত্যা করতে পারে, কিংবা তার ছেলে বা মেয়ে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যেতে পারে। তার নির্দেশে একশোর বেশি খুনের ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু কেউ সন্দেহই করতে পারেনি যে ওগুলো খুনের ঘটনা ছিল। ডাক্তাররা ডেথ সার্টিফিকেটে লিখেছে–ক্যানসার, হার্টঅ্যাটাক, লিভার সিরোসিস, ফুড পয়জনিং, রোড অ্যাক্সিডেন্ট, সুইসাইড ইত্যাদি। কিছু লোক ডুবে মারা

গেছে। এই একশোজন বাদে বেমালুম নিখোঁজ হয়েছে সত্তরজন। কোন তদন্তই লীফ হেরকুলের বাড়ির দিকে এগোয়নি।

বিবেকের ছিটেফোঁটাও নেই, হেরকুল ঠাণ্ডা মাথার একজন সোশিওপ্যাথ। তার নীলচে সাদা চোখ এই মুহূর্তে হুয়াং ফো-র দিকে নিবদ্ধ। ফো তার বিশাল সাম্রাজ্যের সিকিউরিটি চীফ। রীলে জড়িয়ে যাওয়া লাইন খুলতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে লোকটা।

'এত মাথা খাটিয়ে, কমপিউটরকে দিয়ে অ্যানালিসিস করিয়ে ভাইটাল তিনটে প্রজেক্টের প্ল্যান তৈরি করা হলো। এ কেমন কথা যে তিনটেই ব্যর্থ হয়ে গেল?'

আর সব চীনাদের মত হুয়াং ফোর চেহারায় দুর্বোধ্য কোন ভাব বা রহস্যময়তা নেই। তাদের তুলনায় অনেক বেশি লম্বা-চওড়া সে, ইউ.এস. আর্মির স্পেশাল ফোর্সের একজন সাবেক মেজর, ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, প্রয়োজনের সময় মামবা সাপের চেয়েও হিংস্র ও ক্ষিপ্র। নোংরা ব্ল্যাকমেইল আর খুনগুলোর বেশিরভাগ একে দিয়েই করায় হেরকুল। ফো হলো তার গোপন অর্গানাইজেশন কোবরা ক্লাবের ডিরেক্টর।

'কিছু ঘটনা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল,' জবাব দিল ফো, প্যাঁচ লেগে যাওয়া লাইন তাকে পাগল করে তুলছে। 'ওয়াটার লিলিতে ঠিকমতই আগুন লাগানো হয়, কিন্তু কে জানত ঠিক ওই সময় ওই জায়গায় নুমার বিজ্ঞানীরা চলে আসবে। ক্রুজ শিপের বেশিরভাগ আরোহীই বেঁচে গেল। এখানেই শেষ নয়, ওয়াটার লিলিকে আমরা ডুবিয়ে দেয়ার পর আবার তারা উদয় হলো—পানিতে ডুব দিয়ে সার্ভে করে এল জাহাজটাকে। এরপর কি ঘটল? সার্ভে ক্রুদের হাইজ্যাক করলাম আমরা, কিন্তু তারাও পালাল। এবং এখন, লেটেস্ট যে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট পেয়েছি, এমারেল্ড মার্লিনকেও ওই নুমাই বাঁচিয়েছে। নুমা যেন আমাদের জন্যে একটা দুষ্টগ্রহ হয়ে দেখা দিয়েছে।'

'এটাকে তুমি ব্যাখ্যা করবে কিভাবে, ফো? নুমা একটা ওশানগ্র্যাফিক এজেন্সি—সরকারের কোন মিলিটারি, ইন্টেলিজেন্স বা ইনভেস্টিগেটিভ ডিপার্টমেন্ট নয়। ওদের একমাত্র কাজ সাগর নিয়ে গবেষণা। দুনিয়ার সবচেয়ে দক্ষ প্রফেশনাল মার্সেনারিদের পরিচালিত অপারেশন এরা ব্যর্থ করে দেয় কিভাবে?'

হুয়াং ফো তার রড ও লাইন নামিয়ে রাখল। 'নুমা আমাদের পিছনে লেগে থাকবে, এটা তো আগে থেকে জানার কোন উপায় ছিল না আমার। যা ঘটেছে, স্রেফ আমাদের দুর্ভাগ্য।'

'ব্যর্থতা আমি সহজভাবে নিই না,' বেসুরো গলায় বলল হেরকুল। 'প্ল্যানিঙে ত্রুটি থাকলেই অপ্রত্যাশিত কারণে ব্যর্থতার মুখ দেখতে হয়, পরিস্থিতি লেজেগোবরে হবার জন্যে দায়ী আসলে অযোগ্যতা।'

'যা ঘটেছে, আমার চেয়ে বেশি অনুতপ্ত কেউ নয়,' বলল ফো।

'নিউ ইয়র্কে কাকাস জাভালার ওই বোকামিটাও আমাকে খুব বিরক্ত করেছে। এখনও আমার বোধগম্য হচ্ছে না যে প্লেনভর্তি একদল শিশুকে খুন করতে গিয়ে অত্যন্ত দামী একটা অ্যান্টিক এয়ারক্রাফট কি কারণে খোয়াল সে। কে তাকে এই কাজের অনুমতি দিয়েছিল?'

'নুমার প্রজেক্ট ডিরেক্টর মাসুদ রানাকে দেখতে পেয়ে সে নিজেই তাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয়। আপনার স্থায়ী নির্দেশেও বলা আছে, আমাদের প্ল্যান-প্রোগ্রামে যারা বাধা দেবে তাদের বাঁচিয়ে রাখার দরকার নেই। তাছাড়া, বলতে ভুলে গেছি, ওই প্লেনে তৃষা ইসলামও ছিল।'

'তাকে কেন খুন করা দরকার?'

'মেয়েটা জাভালাকে আবার দেখলে চিনে ফেলতে পারে।'

'আমরা খুবই ভাগ্যবান যে পুলিস কোবরা ক্লাবের সঙ্গে জাভালার যোগসূত্র খুঁজে পায়নি, তা পেলে তোমার খোঁজও বের করে ফেলত। তারপর তোমার সঙ্গে ফ্যালকনের সম্পর্ক জানাটা স্রেফ সময়ের ব্যাপার হোত।'

'আমি আপনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, সে-ধরনের আশঙ্কা একেবারেই নেই, বিন্দুমাত্র না।' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল ফো। 'ট্রেইলে কাদা মাখাবার জন্যে যা যা করা দরকার তার সবই করা হয়েছে। আমাদের পাওয়ার বেস রক্ষার জন্যে প্রতিটি অপারেশনের পরই এ-ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। সেজন্যই একের পর এক কয়েকশো অপারেশন চালানো সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কেউ আমাদের দিকে আঙুল তুলতে পারেনি।'

'কিন্তু আমি হলে ব্যাপারটাকে অন্যভাবে সাজাতাম,' বলল হেরকুল, কণ্ঠস্বর ভাঙা কাঁচের মত ধারাল।

'বিবেচ্য হলো ফলাফল,' যুক্তি দেখাল ফো। 'প্রপালশান-এ সত্যি অবদান রাখবে, মাঝপথে অচল হয়ে পড়বে না, ডক্টর ইসলামের এঞ্জিন সম্পর্কে এই নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারছিল না। পারতও না, যতদিন ওয়াটার লিলি আর এমারেল্ড মার্লিনের ওপর চালানো তদন্ত শেষ না হোত। তাতে সময় লাগত কম করেও এক বছর। আমরা সেদিকে যাইনি। তার ফল কি হয়েছে ভেবে দেখুন। ডক্টর ইসলাম মারা যাওয়ায় তার ফর্মুলা স্লীক সিক্সটিসিক্স শিগ্‌গির আপনার হাতে চলে আসবে।'

'যদি তুমি ওটা আমাকে এনে দাও।'

'ধরে নিন কাজটা করা হয়ে গেছে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ফো। 'এই অ্যাসাইনমেন্ট আমি জাভালাকে দিয়েছি। এবার আমাকে হতাশ করার সাহস হবে না তার।'

'ডক্টর ইসলামকে মারলে, তার অন্যান্য আবিষ্কারের ফর্মুলা এখন কিভাবে পাব আমি?'

সে সব ফর্মুলার অস্তিত্ব যদি সত্যি থাকে, সব পাওয়া যাবে তার বন্ধু ডক্টর ফিরোজ ফাহিমের কাছে।'

'সে দেবে কেন?'

ফো হাসল। 'আমি কথা দিচ্ছি, মদ্যপ বুড়োটার কাছে যা কিছু আছে সব সে তুলে দেবে আমাদের হাতে।'

'তোমাকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকাল হুয়াং ফো। 'নিজের ব্যর্থতা কিছুটা পুষিয়ে নিয়েছে জাভালা। এমারেল্ড মার্লিনকে ডুবিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করার পর তৃষা ইসলামকে কিডন্যাপ করেছে সে। মেয়েটাকে তার বাপের নিউ জার্সির বাড়িতে নিয়ে আসছে।'

'তারমানে ওখানে, ডক্টর ফাহিমের সামনে, মেয়েটার ওপর টরচার করবে সে–ডক্টর ফাহিম যাতে ফর্মুলাগুলো হস্তান্তর করে?'

'স্বীকার করছি খুব উন্নতমানের প্ল্যান নয়, তবে লোকটার মুখ থেকে যে রীতিমত তথ্যবৃষ্টি হবে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'ফার্মের গার্ডদের ব্যাপারে কি করা হবে?'

'ওদেরকে সতর্ক না করে, ওদের অ্যালার্মকে এড়িয়ে সিকিউরিটি পেনিট্রেট করার একটা উপায় খুঁজে বের করেছি আমরা।'

'জাভালার ভাগ্যই বলতে হবে আন্দামান সাগর থেকে তাকে তুমি ডেকে নিয়েছিলে, তা না হলে নিজের লোকজন আর জাহাজ সহ তাকেও পুড়ে মরতে হত।'

'তাকে আমার অন্য কাজের জন্যে এখানে দরকার ছিল।'

হেরকুল কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ বসে থাকল। তারপর বলল, 'আমি ডক্টর ইসলামের সবগুলো আবিষ্কারের ফর্মুলা চাই। ওগুলো পাওয়ার ওপর নির্ভর করছে ফ্যালকন করপরেশন দুনিয়ার সমস্ত করপরেশনকে কিনে নিয়ে দুনিয়ার সর্ববৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারবে, কি পারবে না। আমি আমার স্বপ্ন সম্পর্কে আগেও তোমাদেরকে ধারণা দিয়েছি। ফ্যালকনকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করানো আমার স্বপ্নের একটা অংশমাত্র। আমার পরবর্তী পদক্ষেপ হবে একটা করপরেশনের হাতে আমেরিকার শাসনভার তুলে দেয়া। করপরেশনের চেয়ারম্যান হবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। এ হবে পুঁজিবাদের চরম বিকশিত একটা রূপ। এখানে করপরেশন আর চেয়ারম্যান বলতে স্বভাবতই ফ্যালকন আর আমাকে বোঝাতে চাইছি। আমি জর্জ বুশের ভক্ত, তারই দেখানো পথ ধরে একে একে খতম করব ইরাক, ইরান, উত্তর কোরিয়া, পাকিস্তান, সিরিয়া ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া...'

'মিস্টার হেরকুল,' একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মাঝপথে বাধা না দিয়ে পারল না ফো।

'হোয়াট!'

'মিস্টার হেরকুল, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি আপনাকে।'

'কি কথা?'

'এক মার্কিন ঠিকাদারি কোম্পানি বাংলাদেশে একটা সামুদ্রিক বন্দর তৈরি করতে চায়, তারা কোবরা ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।'

'বুঝলাম না। কোবরা ক্লাবের সঙ্গে ঠিকাদারির কি সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক আছে। তারা জানতে চায় কোবরা ক্লাবের মার্সেনারিরা বাংলাদেশের চট্টগ্রামে যে বন্দরটা আছে, কোনভাবে সেটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে সক্ষম কিনা। ওটা ধ্বংস হলে আরেকটা বন্দর দরকার হবে, তখন এই কোম্পানি ওদের মন্ত্রী-মিনিস্টারকে ঘুষ দিয়ে কাজটা বাগিয়ে নেবে।'

'কাজ তৈরি করার চমৎকার ক্রিয়েটিভ বুদ্ধি তো!' হেরকুলের গলা থেকে দুর্লভ প্রশংসা বেরুল। 'তো তোমরা কি বলেছ?'

'আমরা জবাব দেয়ার জন্যে সময় চেয়েছি,' বলল ফো। 'আবার যোগাযোগ

করলে কি বলব?'

'প্রথমে তুমি আমাকে এই মাসুদ রানা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা দাও, তারপর জানাচ্ছি,' বলল হেরকুল, হঠাৎ হিংস্র সাপের মত লাগছে তাকে। 'নুমার অ্যাকুয়ারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর স্রেফ একটা কাভার। আসলে কি সে?'

রানা উপাখ্যান শেষ করতে বিশ মিনিট সময় নিল হুয়াং ফো। সে থামতে হেরকুল বলল, 'একটা অশনি সংকেত, তোমার এই মাসুদ রানা। ঠিক আছে। তাদেরকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। নির্দিষ্ট ফি পেলে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর নিশ্চিহ্ন করে দেব আমরা–হারবার আর হারবারের বাইরে যত জাহাজ লোডিং-আনলোডিঙের জন্যে অপেক্ষা করছে, সেগুলো সহ।'

'ভেরি গুড।'

'আবার নিজেদের প্রসঙ্গে আসি। আমাদের চলতি প্রজেক্ট বাইরের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়া শেষ হওয়া চাই। আর কোন ব্যর্থতার কথা আমি শুনব না। আমার বোধহয় এমন একজন লোক পাওয়া উচিত যে কোবরা ক্লাবের কাজগুলো কোন রকম জটিলতা ছাড়াই শেষ করতে পারবে।'

ফো কিছু বলবার আগেই হিট করল হেরকুল। রডটা বেঁকে ইংরেজি হরফ U হয়ে গেল। একটা ব্যাস টোপ গিলেছে। সারফেস ভেঙে উপরে উঠল মাছটা, তারপর পানি ছলকে দিয়ে আবার ডুবে গেল। ফো আন্দাজ করল, দশ পাউন্ড তো হবেই। দু'জনেই ওরা চুপ করে গেছে। মাছটা সুতো টেনে নিয়ে দূরে চলে যায়, তারপর দক্ষতার সঙ্গে একটু একটু করে তাকে কাছে নিয়ে আসে হেরকুল। ধীরে ধীরে মাছটাকে ক্লান্ত করে লাইন গুটিয়ে কাছে নিয়ে আসছে। মাছটা বোটের পাশে নিয়ে আসতে হ্যান্ড-নেটে আটকে ফো ওটাকে তুলে আনল বোটে। তার পায়ের কাছে ঘন ঘন লেজ আছড়াচ্ছে ওটা। 'ভাল ক্যাচ!' বসের প্রশংসা করল সে।

মাছটার মুখ থেকে বড়শি খুলে নিল ফ্যালকন করপরেশনের সর্বেসর্বা, চোখেমুখে ফুটে উঠেছে তৃপ্তির ভাব। ট্যাকল বাক্সের দিকে হাত বাড়াল সে, সম্ভবত আরেকটা টোপ খুঁজছে। 'সূর্য মাথায় চড়ছে। এবার বোধহয় আমাকে বাছাইয়ের কাজটা সেরে ফেলতে হয়।'

ফো-র মনের পিছন দিকটায় একটা হুঁশিয়ারি বাতি জ্বলে উঠল। সরাসরি হেরকুলের চোখে তাকাল সে, পড়তে চেষ্টা করল ওগুলোর পিছনে কি লেখা আছে। 'আপনি বলতে চাইছেন কোবরা ক্লাবের ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করার যোগ্যতা আমি হারিয়ে ফেলেছি?'

'আমার মনে হয় অন্যেরা পরবর্তী কাজগুলো আরও অনেক নিখুঁতভাবে শেষ করতে পারবে।'

'আমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে বারো বছর আপনার সেবা করেছি,' শান্ত রাগের সঙ্গে বলল ফো। 'সেটার কি কোনই মূল্য নেই?'

'বিশ্বাস করো, আমি কৃতজ্ঞ–,' হঠাৎ ফো-র পিছনে পানির দিকে ইঙ্গিত করল হেরকুল। 'তোমার টোপ খেয়েছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ফো, তাকিয়েই বুঝতে পারল তার লাইন এখনও প্যাঁচ খেয়ে বোটেই পড়ে আছে, পানিতে কোন বড়শি বা টোপ নেই। ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ

খেলে গেছে হেরকুলের শরীরে। ট্যাকল বক্স থেকে একটা সিরিঞ্জ তুলে নিয়ে সুইটা ফো-র ঘাড়ে ঢুকিয়ে দিল সে, সেইসাথে চাপ দিল প্লাঞ্জারে।

বিষটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাজ করল। বাধা দেয়ার আগেই অসাড় অবশ ভাব চলে এসে দ্রুত মৃত্যু ঘটাল। বোটের কিনারে পিঠ দিয়ে ঢলে পড়ল লাশটা. বিপন্ন বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ দুটো।

হেরকুল গুনগুন করে গান গাইছে। পালস দেখার সময় চুপ করল। তারপর লাশের দুই গোড়ালি এক করে একটা রশি বাঁধল সে। রশির অপর প্রান্ত বোটের নোঙরের সঙ্গে বাঁধা। নোঙরটা বোট থেকে লেকের পানিতে ফেলে দিল সে, সেই সঙ্গে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলল ফো-র লাশটাও। গুনগুন করে আবার গান গাইছে, পানি থেকে চোখ সরাল বুদ্বুদ ওঠা বন্ধ হতে।

বোটের তলায় এখনও দু'একবার লাফাচ্ছে মাছটা। তুলে সেটাকেও পানিতে ফেলে দিল হেরকুল। 'দুঃখিত, পুরানো বন্ধু,' সহাস্যে বলল সে। 'আসলে এক ব্যর্থতা আরেক ব্যর্থতার জন্ম দেয়। কারও বোধ-বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেলে তার জায়গায় অন্য লোক তো আসতেই হবে।'

ধৈর্য হারিয়ে জঙ্গলের ভেতর থেকে সাবধানে উঁকি দিল আলবার্ট লোগান। পানির ওপর চোখ পড়তে দেখল নিঃসঙ্গ এক লোক বৈঠা চালিয়ে অপেক্ষারত কালো লিমুজিনের দিকে ফিরে যাচ্ছে। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত তো,' আপন মনে বিড়বিড় করল সে। 'আমি কসম খেয়ে বলতে পারি একটু আগে ওই বোটে দু'জন লোক দেখেছিলাম।'

সাত

কাকাস জাভালার নেতৃত্বে নতুন করে সংগঠিত কোবরা ক্লাবের সদস্যরা ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের খামারে সিকিউরিটি গার্ডদের পালা বদলের সময়টা খুব সহজেই জেনে নিল। নতুন গার্ডদের নিয়ে একটা গাড়িকে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখল তারা, আরেকটা গাড়ি পুরানো গার্ডদের নিয়ে বেরিয়ে গেল। এরপর এরিয়াল ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে গার্ডদের পিছু নিয়ে তাদের গোপন লোকেশনও দেখে এল কোবরা ক্লাবের সার্ভেইলান্স টীমের লোকেরা। পরবর্তী পদক্ষেপ ডেপুটি শেরিফের ব্যাজ লাগানো ইউনিফর্ম যোগাড় করা আর একটা গাড়িকে রঙ করে কাউন্টি পেট্রল কার বানানো। তাতেও খুব একটা সময় লাগল না। দু'দিন পরই রোড গার্ডকে খুন করে বাড়ির ভেতর অনায়াসে ঢুকে পড়ল তারা। বন্দী ডক্টর ফাহিমকে দিয়ে নিরাপত্তা সম্পর্কে জরুরী মীটিঙের কথা বলিয়ে সব ক'জন গার্ডকে বাড়ির ভেতর ডেকে পাঠানো হলো।

বাড়ির ভেতর ঢোকা মাত্র ব্রাশ ফায়ার করে গার্ডদের মেরে ফেলল কোবরা ক্লাবের মার্সেনারিরা। লাশগুলো ফেলে দিয়ে এল গোলাবাড়ির ভেতর স্টর্ম সেলারে।

কাছাকাছি একটা এয়ারস্ট্রিপে প্লেন থেকে নামল কাকাস জাভালা। প্লেনের গায়ে কিছু লেখা না থাকায় বোঝার উপায় নেই যে ওটার মালিক ফ্যালকন করপরেশন। তৃষাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে, নার্সের ইউনিফর্ম পরা জাভালার দু'জন সহকারী ধরাধরি করে প্লেন থেকে নামিয়ে একটা মার্সিডিজের ব্যাকসীটে তুলে শুইয়ে দিল তাকে। মার্সিডিজ চালিয়ে ডক্টর ইসলামের ফার্ম হাউসে চলে এল জাভালা। তৃষাকে পাঁজাকোলা করে ভেতরে ঢুকল সে, নামিয়ে দিল ডক্টর ফিরোজ ফাহিমের পায়ের সামনে। তাঁকে একটা ডেস্ক চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে, হাত-পা চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা, মুখে টেপ লাগানো।

তৃষাকে দেখামাত্র বাঁধনগুলোর বিরুদ্ধে মোচড় খেতে শুরু করলেন ডক্টর ফাহিম, নাক দিয়ে দুর্বোধ্য শব্দ করছেন। তাঁর এই আচরণ কোন সুফল বয়ে আনল না, কামরায় উপস্থিত পাঁচজন গার্ড শুধু হেসে উঠল। ডেপুটি শেরিফের ইউনিফর্ম আগেই খুলে ফেলেছে তারা, পরে আছে নিজেদের কালো ওঅর্ক আউটফিট।

'সব ঠিক আছে তো?' জাভালার প্রথম প্রশ্ন।

পাহাড় বললেই হয়, এক লোক, প্রায় তিনশো পাউন্ড ওজন, মাথা ঝাঁকাল। লম্বায় লোকটা ছ'ফুট সাত। 'আপনার মিস্টার ইসলামের গার্ডরা ভাল কোন ট্রেনিং পায়নি। মিস্টার ফাহিম ডাকতেই সবাই একসঙ্গে চলে এল, কারও মনে কোন সন্দেহ জাগল না। তবে মিস্টার ফাহিমকে দিয়ে আমরা বলিয়েছিলাম যে শেরিফ নিজে ওদের সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'কোথায় তারা?'

'নেই।'

দক্ষ সহকারীকে হাসতে দেখছে জাভালা। লোকটা শুধু পালোয়ান নয়। তার সারা মুখে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ, সামনের সারির একটা দাঁত আর ডান কান নেই, নাকটা ভাঙা। এই চিহ্ন আর বৈশিষ্ট্যগুলোও তাকে আর সবার থেকে আলাদা করেছে। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল জাভালা। 'তোমার কাজে আমি খুশি, গুজম্যান।'

সাবেক কুস্তিগির নিগ্রো গুজম্যানের চোখ দুটো কাজের স্বীকৃতি পেয়ে ঝিক করে উঠল। তারা দু'জন প্রায় তিন বছর ইরাকের ভেতর একসঙ্গে কাজ করেছে সাদ্দাম হোসেন সহ বাথ পার্টির প্রভাবশালী নেতাদের খুন করার অ্যাসাইনমেন্টে। ইশারায় ডক্টর ফাহিমকে দেখাল গুজম্যান। 'প্লীজ, লক্ষ করুন। শরীরে একটু দাগ পাবেন না, অথচ আমার বিশ্বাস যে পরিমাণে নরম করা হয়েছে, আপনার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে লোকটা।'

ডক্টর ফাহিমের দিকে ভাল করে তাকাল জাভালা। মুখের চেহারা ব্যথায় কোঁচকানো। অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণায় ভুগছে লোকটা। গুজম্যান নিশ্চয়ই তার পাঁজরের হাড় ভেঙে দিয়েছে। জাভালা আরও লক্ষ করল, তৃষাকে অর্ধ-অচেতন অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে বিজ্ঞানীর চোখে ক্রোধ ফুটে উঠেছে। তাঁর চোখে চোখ রেখে হাসল জাভালা, তারপর এক পা সামনে এগিয়ে তৃষার পেটে ঝেড়ে একটা লাথি মারল।

বেদনায় আর্ত একটা ভাব ফুটল তৃষার চেহারায়, একই সঙ্গে কাতর একটা কান্নার শব্দ বেরুল গলা থেকে, তারপর কয়েকবার কেঁপে উঠে চোখের পাতা দুটো খুলে গেল। 'জাগো, জাগো, মিস ইসলাম। মিস্টার ফাহিমের কাছ থেকে তোমার বাবার অয়েল ফর্মুলাটা চাওয়ার সময় হয়েছে।'

গুটিয়ে শরীরটাকে প্রায় গোল করে ফেলছে তৃষা, পেটটা খামচে ধরে আছে, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে। এই ব্যথা তার সম্পূর্ণ অচেনা। জাভালা একজন এক্সপার্ট, জানে বুটের ডগা ঠিক কোথায় ঢোকালে সবচেয়ে বেশি ব্যথা দেয়া যায়। প্রায় এক মিনিট পর একটা কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটা একটু উঁচু করতে পারল তৃষা, ডক্টর ফাহিমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই কুকুরটাকে আপনি কিছুই বলবেন না, ফাহিম চাচা...'

ওই পর্যন্তই, তৃষার গলা থেকে আর কোন শব্দ বেরুল না। জাভালা তার ঘাড়ে বুট রেখে চাপ দিয়ে মাথাটা কার্পেটে সেঁটে ধরল। 'তুমি তো দেখছি ভয়ানক দুঃসাহসী মেয়ে! এতবড় স্পর্ধা, এমন ভাষায় কথা বলো যে আমরা কেউ বুঝি না!' চিৎকার করার সময় জাভালার গলার শিরাগুলো ফুলে উঠল। 'তুমি কি ব্যথা পেতে ভালবাস? কারণ তুমি জানো বেয়াদবি করলে এই ব্যথাই শুধু জুটবে তোমার কপালে।'

কামরার ভেতর জাভালার একজন লোক ঢুকল, হাতে একটা পোর্টেবল রেডিও। 'এইমাত্র রিপোর্ট পেলাম সামনের গেটে একটা গাড়ি আসছে। আমরা কি ওটাকে ফিরিয়ে দেব?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল জাভালা। 'উচিত হবে ঢুকতে দিয়ে দেখা কারা ওরা। গেটের বাইরে থেকে বিদায় করে দেয়াটা সন্দেহের সৃষ্টি করবে।'

'ও কে, মাস্টারমাইন্ড,' একটা হাই তুলে বলল মুরল্যান্ড, মায়ামি থেকে প্লেন জার্নির ধকল এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। 'দুর্গম দুর্গের গেট খোলার প্ল্যানটা শোনাও আমাকে।'

'কোড ভাঙার জন্যে বোতামে চাপ দেব,' বলল রানা, পুরানো একটা ফোর্ড পিকআপ ট্রাকের পিছনে বসে আছে। ট্রাকটা একজন ফার্ম অ্যাপ্লায়ান্স ডিলারের কাছ থেকে ভাড়া নেয়া।

পাশের সীটে নড়েচড়ে বসল মুরল্যান্ড। 'এমারেল্ড মার্লিন থেকে তোমাকে বুকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এসেছি এক ঘণ্টাও হয়নি, মিস তৃষাকে নিয়ে জাভালা পালিয়েছে বলে তুমি আমাকে এত দূর টেনে নিয়ে এসেছ, আর এখন বলছ সিকিউরিটি কোড জানো না?'

'আমি প্রায় নিশ্চিত তৃষাকে নিয়ে এখানে, মানে ডক্টর ইসলামের ল্যাবরেটরিতেই আসবে জাভালা,' বলল রানা। 'ফর্মুলাগুলো তো ল্যাবেরই কোথাও থাকার কথা।'

'হ্যাঁ, বুঝলাম। কিন্তু তোমার হাতে কি জাদুর লাঠি আছে যে ভেতরে ঢুকতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড, প্রকাণ্ড গেট আর উঁচু পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে আছে।

কথা না বলে গাড়ি থেকে বাইরের দিকে ঝুঁকে কয়েকটা বোতামে দ্রুত চাপ দিল রানা। 'এতেই কাজ হতে হবে। আসলে, তৃষার কাছে আলাদা কোডসহ একটা ব্যাকআপ রিমোট ছিল। এই গেট খোলার জন্যে ওকে আমি দুটো কোডই ব্যবহার করতে দেখেছি।'

'আচ্ছা,' প্রশ্ন করল মুরল্যান্ড, 'ধরো, জাভালা আর তার লোকজন সিকিউরিটি সিস্টেম সম্পর্কে যা জানার সব জেনে ফেলেছে, তারা গার্ডদেরও নিরস্ত্র করে কোথাও আটকে রেখেছে, এরকম পরিস্থিতিতে কিভাবে তুমি আশা করো আমাদেরকে গেট খুলে দেবে সে?'

'এই জন্যে খুলে দেবে যে আমি কোড হিসেবে ফ্যালকন টাইপ করেছি।'

কোটরের ভেতর চোখের মণি দুটোকে দু'পাক ঘোরাল মুরল্যান্ড। 'আমার ভেতর যদি এক আউন্স কমনসেন্সও থাকত, ঠিক এই জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে যেতাম আমি।'

হঠাৎ রানার চোখ কালো মেঘ হয়ে গেল। 'আমার যদি ভুল হয়ে থাকে, ধরো গেট খুলল না, তাহলে বুঝে নিতে হবে তৃষাকে আমরা চিরকালের জন্যে হারিয়েছি।'

বদলে গেল মুরল্যান্ডের মুডও। তার অভয়দানের ভঙ্গিটা দৃঢ়। 'আমরা তাকে ঠিকই খুঁজে বের করব,' বলল সে। 'যতক্ষণ না পাই ততক্ষণ তল্লাশী চলবে।'

গেট যখন খুলছেই না, ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আরও কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর রানা কিছু বলতে যাচ্ছে, এই সময় দেখা গেল ধীরে ধীরে গেটটা খুলছে।

'আমার বিশ্বাস আমরা কারও প্রাণে সাড়া জাগাতে পেরেছি,' বলল রানা, নিক্ষিপ্ত ঢিল লক্ষ্যভেদ করায় খুশি।

'এ-ও নিশ্চয়ই জানো যে ওরা অ্যামবুশ পেতে বসে আছে, ব্রাশ করে দু'জনকেই ঝাঁঝরা করে দেবে।'

গাড়ি নিয়ে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে রানা। 'অস্ত্র আমাদের কাছেও আছে।'

'তা আছে বৈকি। তোমার কাছে সেই পুরানো একটা ওয়ালথার, আর আমার কাছে আছে গ্লাভ কমপার্টমেন্ট থেকে পাওয়া একটা স্ক্রু ড্রাইভার। যাদের সঙ্গে লাগতে এসেছি ওদের কাছে অ্যাসল্ট উইপন আছে, বুঝলে!'

'আমরা হয়তো পথ থেকে কিছু কুড়িয়ে নিতে পারব।'

বিশাল শস্যখেত পিছনে ফেলে এল রানা, আঙুর খেতে ঢোকার আগে ট্রাকের স্পীড কমিয়ে আনল, রাস্তার ওপর থেকে ব্যারিকেড সরানোর অপেক্ষায় রয়েছে। গাড়ি থামার পর ওপরে উঠে গেল ব্যারিকেড। সিকিউরিটি গার্ডের ইউনিফর্ম পরা কাকাস জাভালার সহকারীদের একজন গাড়ির দিকে হেঁটে আসছে। পাশে এসে থামল সে, জানালার কাছাকাছি মুখ নামিয়ে ভেতরটা দেখল, অ্যাসল্ট রাইফেল বুকের কাছে আড়াআড়িভাবে ধরে আছে। 'আপনাদের কোন সাহায্যে আসতে পারি, প্লীজ?'

'ডক্টর ফাহিম কোথায়?' প্রশ্নটা এমন সুরে করা হলো, রানা যেন নিরীহ নির্বিরোধী একজন মানুষ।

'তাঁর শরীর ভাল না,' জবাব দিল গার্ড। তার চোখ গাড়ির ভেতর আরেকবার তল্লাশী চালাল, কিছু দেখতে না পাওয়ায় ঢিল পড়ল পেশীতে।

'তাঁর ছোট মেয়েটা ভাল আছে তো?'

গার্ডের ভুরু সামান্য একটু উঁচু হলো। 'হ্যাঁ, শেষবার যখন শুনেছি ভালই ছিলেন...'

ডান উরুর আড়ালে ওয়ালথারটা উল্টো করে ধরে রেখেছিল রানা, হুইলের ওপর দিয়ে সবেগে তুলে এনে গার্ডের প্রশস্ত ললাটে আঘাত করল। জ্ঞান হারিয়ে গাড়ির দরজার নিচে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

লোকটা মাটিতে পড়েছে কি পড়েনি, আঙুর খেতের ভেতর দিয়ে তার দুই হাত ধরে ছুটল রানা ও মুরল্যান্ড, গাছের প্রকাণ্ড এক গুঁড়ির ভেতর ঢুকে আটটা ধাপ বেয়ে নেমে এল আন্ডারগ্রাউন্ড সার্ভেইল্যান্স রুমে। একদিকের দেয়ালে পাশাপাশি রাখা হয়েছে বিশটা মনিটর, ওগুলোর ক্যামেরা চোখ বুলাচ্ছে খেত, মাঠ আর বাড়ির ভেতর। ডক্টর ফিরোজ ফাহিমকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে, আর তাঁর সামনে মেঝেতে মোচড় খাচ্ছে তৃষার শরীর, দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। তবে তৃষা বেঁচে থাকায় অদ্ভুত একটা স্বস্তিও বোধ করল ও। বেঁচে আছে, এবং মাত্র কয়েকশো গজের মধ্যে। কামরার ভেতর পাঁচজন কোবরা মার্সেনারি রয়েছে, তবে ক্যামেরার নজরদারি সম্পর্কে তাদের কাউকে এতটুকু সচেতন বলে মনে হলো না।

'দেখা যাচ্ছে তৃষাকে সহজেই পেয়ে গেলাম আমরা!' আনন্দ ও বিস্ময়, মুরল্যান্ড কোনটাই চেপে রাখতে পারল না।

'পেলাম, বেঁচেও আছে,' বলল রানা, রাগ ক্রমশ চড়ছে। 'কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে শয়তানগুলো খুব ভুগিয়েছে তাকে।'

'এখানকার সিকিউরিটি সিস্টেমের সাহায্যে গোটা ফার্ম আর বাড়ি কাভার করতে পারছি আমরা,' বলল মুরল্যান্ড। 'জাভালার বাকি লোকগুলো কোথায়, এখানে বসেই জানতে পারব। এখন বুদ্ধি বার করো দুশমনদের হাত থেকে চাচা-ভাইঝিকে কিভাবে উদ্ধার করা যায়।' কনসোলের সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে।

এই কামরা থেকেই রাস্তার ব্যারিকেডের কাছে গিয়েছিল ভাড়াটে খুনীটা, যাবার আগে নিজের কালো ইউনিফর্ম খুলে আসল একজন গার্ডের ইউনিফর্ম পরে নিয়েছিল। কালো ড্রেসটা দেখতে পেয়ে পরীক্ষা করল রানা, মোটামুটি ওর সাইজই। নিজের কাপড়চোপড় খুলে দ্রুত পরে নিল কালো প্যান্ট আর সোয়েটার। বুট জোড়া একটু ছোট, তবে জোরে চাপ দিতে পা ঠিকই ঢুকল ভেতরে, সবশেষে একটা স্কী মাস্ক পরে কাজটা শেষ করল।

'এরা মানুষ নয়!' কনসোল থেকে আঁতকে উঠে বলল মুরল্যান্ড, একটা মনিটরে গোলাবাড়ির ভেতর স্টর্ম সেলারে বস্তার মত দেয়াল ঘেঁষে বসিয়ে রাখা হয়েছে গার্ডদের লাশগুলো। জাভালার সহকারীদের খোঁজে এক ক্যামেরা থেকে আরেক ক্যামেরায় সরে যাচ্ছে সে। 'খামারবাড়ির সব ক'জন গার্ডকে খুন করেছে ওরা। বাড়ির ভেতর পাঁচজন ছাড়া ওদের আর মাত্র দু'জনকে দেখতে পাচ্ছি

আমি-একজন পিছনের দরজার ওপর নজর রাখছে, নদীর দিকে মুখ করে, আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে গোলাবাড়ির পাশে।'

'সব মিলিয়ে তাহলে আটজন, মেঝের এই ব্যাটাকে ধরে।'

'হ্যাঁ। আমি বলি কি, সুযোগ যখন আছে তখন রিইনফোর্সমেন্টের ব্যবস্থা করা দরকার।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'রাইট।' ইঙ্গিতে কাউন্টারে রাখা ফোনটা দেখাল। 'শেরিফ ডিপার্টমেন্টকে পরিস্থিতিটা জানাও, বলো তারা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা সোয়াট টীম পাঠায়।'

'আর তুমি? তোমার কাজটা কি?'

'এই আউটফিটে আমাকে ওদের একজন বলে মনে করবে ওরা,' বলল রানা। 'মাথার ওপর যখন নরক ভেঙে পড়বে, বাড়ির ভেতর একজন বন্ধু থাকলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই কিছু।'

'আর আমি?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'এখানেই থাকো; সিচুয়েশন মনিটর করবে আর সোয়াট টীমকে নির্দেশ দেবে।'

'কিন্তু জাভালা যখন জিজ্ঞেস করবে গাড়ির প্যাসেঞ্জাররা গেল কোথায়?'

'জবাব বানাবে। বলবে ইউরিয়া সার বিক্রি করতে এসেছিল দু'জন সেলসম্যান, তুমি তাদের ব্যবস্থা করেছ। তুমি, মানে এই লোকটা,' আঙুল দিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটাকে দেখাল রানা।

'এখান থেকে তুমি বাড়ির ভেতর যাচ্ছ কিভাবে?'

'আঙুরের বাগান বাড়ির প্রায় সামনে পৌঁছেছে, আড়াল নিয়ে এগোতে কোন অসুবিধে হবে না। তারপর ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে সারি সারি থামের পিছনে গা ঢাকা দেব। সমস্যা হবে ঘাস মোড়া সামান্য একটু জায়গা পেরুতে। চিন্তা কোরো না, ওদের চোখকে ফাঁকি দিতেই হবে, এমন কোন কথা নেই।'

'তবু সাবধান কিন্তু, কেমন? আমরা নতুন কোন ঝামেলায় পড়তে চাই না।' মুরল্যান্ড হাসছে।

'কথা দিলাম ভাল থাকব,' বলল রানা।

মুরল্যান্ড আবার কনসোলের দিকে ঘুরে বসছে, ধাপ বেয়ে ওপরে উঠল রানা, গাছের গুঁড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আঙুর বাগানের ভেতর দিয়ে হন-হন করে বাড়িটার দিকে এগোল।

রানার ভেতর দুটো আবেগ কাজ করছে, একটা হলো এই ভয় যে জাভালার লোকজন আবার নির্যাতন শুরু করার আগে তৃষাকে হয়তো উদ্ধার করতে পারবে না ও; দ্বিতীয়টা, প্রতিশোধ গ্রহণের প্রায় হিংস্র একটা স্পৃহা। এ সত্যি বিশ্বাস করা কঠিন যে ভাড়াটে সৈনিক বা খুনীদের একটা সংগঠনের সাহায্যে অসংখ্য নিরীহ মানুষের লাশ পিছনে ফেলে যাচ্ছে একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ফ্যালকন করপরেশন। কেন, কিসের জন্যে? লাভ? ক্ষমতার মোহ? এ-ধরনের অভিশপ্ত পুরস্কার পেয়ে তা ভোগ করার জন্যে কেউই বেশিদিন বাঁচে না। রানা উপলব্ধি

করল, ওর কাঁধে একটা গুরুদায়িত্ব চেপেছে। এত সব নিরীহ মানুষকে হত্যা করার জন্যে যারা দায়ী তাদেরকে শায়েস্তা না করাটাও অপরাধ। ও জানে, এ বড় কঠিন কাজ। প্রতিপক্ষ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ীদের অন্যতম। শুধু তাই নয়, শোনা যায় সিনেট আর হোয়াইট হাউসকে সে নাকি নিজের পকেটে ভরে রেখেছে। আকার-আয়তনে প্রকাণ্ড, এ-ধরনের কয়েকটা করপরেশন গোটা বিশ্বের সমস্ত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করবে, হোয়াইট হাউসে বসে মিস্টার বুশ যে বাণী প্রচার করছেন তা নাকি ফ্যালকনের সর্বেসর্বা লীফ হেরকুলের পরামর্শেই। কিন্তু বুশ কি জানেন হেরকুল তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে গোটা বিশ্ব শাসন করার পরিকল্পনা করছে? হয়তো জানেন। হয়তো এতে তাঁর সমর্থনও আছে। সেজন্যেই রানার প্রতিপক্ষ লীফ হেরকুলকে শায়েস্তা করাটা কঠিন। দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি বুশ, তাঁর ছত্রছায়া ও সাহায্য সমর্থন পেয়ে হেরকুল রীতিমত একটা প্রাইভেট সেনাবাহিনী পুষছে। হেরকুলের ওপর আঘাত বুশ নিজের ওপর আঘাত বলে মনে করলে রানা যে সংকটে পড়বে তা থেকে ওকে উদ্ধার করার শক্তি পৃথিবীর কারও নেই। কাজেই শুধু ঘৃণা আর আক্রোশ দিয়ে প্রতিশোধ নেয়া যাবে না। এই নরাধমকে উচিত শাস্তি দিতে হলে আশ্রয় নিতে হবে কৌশলের।

আঙুর বাগানের ভেতর দিয়ে, ডালপালার আড়াল নিয়ে ছুটছে রানা, বুট জোড়া নরম মাটিতে ডেবে যেতে চাইছে। অচেতন কোবরার অটোমেটিক রাইফেলটা সঙ্গে করে আনেনি। বাড়ির ভেতর বা ক্লোজ রেঞ্জে রাইফেল ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না ও। একজোড়া স্পেয়ার অ্যামিউনিশনের ক্লিপ সহ নিজের প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার আছে সঙ্গে, তাই যথেষ্ট। গরমের দিন, স্কী মাস্কের ভেতর সারাক্ষণ ঘামছে। ইচ্ছে করেই খুলছে না, কারণ জানে বাধ্য না হলে কোন কোবরা এটা মুখ থেকে নামায় না।

প্রায় একশো গজ দৌড়ে সারি সারি আঙুর গাছের শেষ প্রান্তে চলে এল রানা। বাড়িটা সামনেই, তবে ঘাস মোড়া একটা সরু লন আছে মাঝখানে। যে কোবরারা গোলাঘর আর পিছনের দরজা পাহারা দিচ্ছে তাদের দৃষ্টিপথের বাইরে রয়েছে ও, কিন্তু বাড়ির ভেতরকার কোন লোকের চোখে ধরা না পড়ে পঞ্চাশ ফুট ফাঁকা জায়গা পেরুনো কি সম্ভব? জানালাগুলোর দিকে তাকাতে ভেতরে নড়াচড়ার আভাস পেল রানা। উঁহুঁ, গাছের আড়াল থেকে বেরুলেই ওদের চোখে পড়ে যাবার ভয় আছে।

বাড়ির সামনে পোর্চ-এর প্রথম পাথুরে পিলার আর ওর মাঝখানে এই পঞ্চাশ ফুট লন রোদে ঝলমল করছে। একটু একটু করে সরে এসে আঙুর বাগানের একেবারে কিনারায় চলে এল রানা। হঠাৎ দৌড় দিলে বাড়ির ভেতর থেকে কেউ এদিকে তাকাতে পারে, তাই অত্যন্ত ধীরগতিতে হাঁটতে শুরু করল, লক্ষ রাখছে বাড়ির পিছনের গার্ড এদিকে এসে পড়ছে কিনা। প্রতিবার এক পা, থেমে থেমে এগোচ্ছে রানা–ঠিক যেভাবে পোকা ধরার অপেক্ষায় থাকা পাখির দিকে এগোয় শিকারি বিড়াল।

পিলার ঘেরা পোর্চ-এর দিকে উঠে গেছে পাঁচটা কাঠের ধাপ। সাবধানে উঠছে রানা, ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হবার ভয়ে কলজে শুকিয়ে আসছে। তবে না,

ধাপগুলো কোন প্রতিবাদ করল না। কয়েক সেকেন্ড পর দেখা গেল একটা বাঁক ঘুরে বাড়ির গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, লিভিং রুমের বড় জানালাটা ওর মাত্র দু'ফুট সামনে। ধীরে ধীরে হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হলো রানা, জানালার নিচ দিয়ে পেরিয়ে এল জায়গাটা, তারপর আবার সিধে হয়ে এগোল সদর দরজার দিকে। ধীরে ধীরে নব ঘুরিয়ে ফাঁক করল কবাট। ফোয়ে বা অ্যান্টি রুমে কেউ নেই, ভেতরে ঢুকল যেন গাঢ় একটা ছায়া।

এখান থেকে লিভিং রুমে যাওয়ার জন্যে কোন দরজা নেই। খোলা একটা খিলানের ভেতর দিয়ে ঢোকার পথ। খিলানের একপাশে মাটির তৈরি একটা পাত্র দেখা যাচ্ছে, সেটা থেকে প্রায় লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাহারি পাতা সহ একটা উদ্ভিদ। লিভিং রুমে উঁকি মারার জন্যে এটাকে আড়াল হিসেবে কাজে লাগাল রানা। চট করে এক পলক দেখে নেয়া নয়, কার কি পজিশন মাথায় গেঁথে রাখার জন্যে গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ।

ডক্টর ফারুক ফাহিমের নাক, কান ও কপাল থেকে রক্ত ঝরছে। তাঁকে বসিয়ে রাখা হয়েছে ঘরের মাঝখানে ফেলা একটা চেয়ারের সঙ্গে হাত-পা বেঁধে। লাল ফকারের পাইলট অর্থাৎ কাকাস জাভালাকে চিনতে পারল রানা। জাভালা বসেছে বড় একটা লেদার সোফার মাঝখানে, সহজ ভঙ্গিতে একটা হাতলের দিকে কাত হয়ে আছে, শান্ত ভাবে মাঝে মধ্যে টান দিচ্ছে হাতের চুরুটে। দু'জন কোবরা ফায়ারপ্লেসের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে, পরনে ব্ল্যাক আউটফিট, হাতে বাগিয়ে ধরা অস্ত্র। আরেকজন কোবরা দাঁড়িয়েছে ডক্টর ফাহিমের পাশে, হাতের ছুরি তাঁর একটা চোখ বরাবর তাক করা। পঞ্চম কোবরা প্রকাণ্ড হাতি, লম্বা চুল মুঠোর ভেতর ধরে অনায়াসে কার্পেটের দু'ইঞ্চি ওপরে ঝুলিয়ে রেখেছে তৃষাকে, তৃষা হাত-পা ছুঁড়েও তার জন্যে কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারছে না। মেয়েটার গলায় কোন চিৎকার নেই, মাঝেমধ্যে শুধু কাতর গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

খিলানের কাছ থেকে একটু পিছিয়ে এল রানা, ভাবছে মনিটরে ওকে মুরল্যান্ড দেখতে পাচ্ছে কিনা। ব্যাপারটা খুব উদ্ভট হবে এখন যদি ও পিস্তল উঁচিয়ে ঘরে ঢুকে ওদের সবাইকে আত্মসমর্পণ করতে বলে। কোবরারা ওকে বা ওর পিস্তলকে গ্রাহ্যই করবে না, একসঙ্গে গুলি করে অন্তত শখানেক বুলেট ঢুকিয়ে দেবে ওর শরীরে। খুন করার ট্রেনিং নেয়া আছে ওদের, ট্রেনিং নেয়া আছে একটা মাইক্রোসেকেন্ডও নষ্ট না করার। এইসব লোকের কাছে মানুষ হত্যা দাঁত ব্রাশ করার মতই সহজ ও স্বাভাবিক একটা কাজ। কিন্তু কাউকে গুলি করার আগে প্রতিবার নিজেকে রানার প্রস্তুত করে নিতে হয়। আত্মরক্ষার জন্যে গুলি করাটা এই হিসাবের বাইরে–তখন এত বেশি রিফ্লেক্স অ্যাকশন আর ক্ষিপ্রতা দরকার হয় যে চিন্তা-ভাবনার কোন অবকাশই থাকে না, তা করতে গেলে মরে ভূত হয়ে যেতে হবে। এখানে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার কথা ভাবছে রানা। নিজেকে ওর শক্ত করতে হবে, যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝাতে হবে যে তৃষা আর ডক্টর ফাহিমকে বাঁচাতে হলে গুলি না চালিয়ে ওর সামনে অন্য কোন পথ খোলা নেই।

অন্য আরেকটা হিসাব করতে হচ্ছে রানাকে। বিস্ময়ের আঘাত ওর অনুকূলে কাজ করবে। কামরার ভেতর ও যদি ঢোকে, পরনে কোবরা ক্লাবের ইউনিফর্ম

থাকায় সঙ্গে সঙ্গে ওকে তারা সন্দেহ করবে না বা বিপদ বলে চিনতে পারবে না। কিন্তু এ-সবের বিপরীতে ও যদি মাটির পাত্র আর ওটা থেকে বেরিয়ে আসা উদ্ভিদের আড়ালে দাঁড়িয়ে গুলি করে? সঙ্গে সঙ্গে ওরা টের পাবে না কোত্থেকে আসছে বুলেটগুলো, ফলে ওদের রিয়াকশন টাইম মন্থর হয়ে পড়বে। তাছাড়া, টার্গেট বাছাই করার সুযোগ পাবে ও, সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কাকে আগে বা পরে গুলি করবে।

দ্বিতীয় ধারণাটাও বাতিল করে দিল রানা। আড়াল থেকে গুলি করা হলে শত্রুপক্ষের কার কি প্রতিক্রিয়া হবে বলা মুশকিল। ডক্টর ফাহিম আর তৃষাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে ওরা। নিজেদের সামনে ওদেরকে ধরে রাখবে, ওদের মাথায় অস্ত্রও তাক করবে, তারপর আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানাবে রানাকে। তৃষা আর ডক্টর ফাহিমের লাশ দেখতে না চাইলে আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের হাতে ধরা দিতে হবে ওকে। কিংবা, এসব যদি না-ও ঘটে, দু'পক্ষের বন্দুকযুদ্ধে তৃষা ও ডক্টর ফাহিম আহত হতে পারেন। রানা সিদ্ধান্ত নিল, ওদের কাছ থেকে সময় আদায় করাটাই একমাত্র আশা, যতক্ষণ না সোয়াট টীম পৌঁছায়। একটা ফ্লাওয়ার ভাসের পিছনে, টেবিলের ওপর ওয়ালথারটা রাখল ও, তারপর শান্ত পায়ে লিভিং রুমে ঢুকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

প্রথমে রানার দিকে কেউ কোন খেয়ালই দিল না। সবার দৃষ্টি তৃষার ওপর, হাতি গুজম্যানের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে সে। চোখ থেকে বেরুনো পানিতে গাল ভিজে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ের ওপর শারীরিক নির্যাতন চলতে দেখা রানার জন্যে অত্যন্ত কষ্টকর। ওর হিসেবে সোয়াট টীম পৌঁছাতে আরও কমপক্ষে পাঁচ মিনিট লাগবে। পাঁচ মিনিট সাত বা দশ মিনিটেও দাঁড়াতে পারে। অথচ মাত্র এক মিনিট পরই তৃষার বুকে গুজম্যানের হাত পড়তে রানা সিদ্ধান্ত নিল, ওর পক্ষে এর বেশি সহ্য করা সম্ভব নয়।

রানা অত্যন্ত শান্ত গলায় জাভালাকে বলল, 'মোটকুকে বলো এখুনি ওকে ছেড়ে দিক।'

মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল জাভালা, ভুরু উঁচু হতে শুরু করেছে, চোখে বিস্ময়। 'কি যেন বললে তুমি?'

'বললাম, তোমার ওই মোটা হাতিটাকে বলো মেয়েটাকে যেন ছেড়ে দেয়।' নিজের স্কী মাস্ক খুলে ফেলল রানা।

কামরার ভেতর উপস্থিত প্রত্যেক কোবরা চিনতে পারল রানা জাল লোক, সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকে অস্ত্র তাক করল তারা।

'তুমি!' বিস্মিত জাভালা হাঁ হয়ে গেছে। 'স্টপ!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কেউ গুলি করবে না। অন্তত এখুনি নয়।'

আপাতত নিজের ব্যথা ও ভোগান্তি ভুলে স্তম্ভিত বিস্ময়ে রানাকে দেখছে তৃষা। 'না! না!' ফুঁপিয়ে উঠল হঠাৎ, মাথাটা এদিক ওদিক নাড়ছে। 'এখানে আসা আপনার একদম উচিত হয়নি!'

'এরপর তোমাকে মরতে হবে, জাভালা,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা, 'ও যদি মেয়েটিকে না ছাড়ে।'

জাভালার চেহারায় সকৌতুক হাসি ফুটল। 'আরে, তাই? তো কে আমাকে খুন করতে যাচ্ছে? তুমি?'

'যে-কোন মুহূর্তে একটা সোয়াট টীম পৌঁছে যাবে। পালাবার পথ একটাই–রাস্তা। তোমরা ফাঁদে আটকা পড়েছ।'

'মাফ করবে, মিস্টার রানা, যদি আমি তোমার কথা বিশ্বাস করে না থাকি।' তারপর হাতির উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল জাভালা। 'শ্রদ্ধেয়া লেডিকে তাঁর পায়ের ওপর দাঁড়াতে দাও, গুজম্যান।' আবার রানার দিকে মনোযোগী হলো। 'তুমি বোধহয় আমার একজন লোককে খুন করেছ।'

'না,' বলল রানা। 'অজ্ঞান করে সিকিউরিটি সেন্টারে ফেলে রেখেছি, তারপর তার এই ড্রেস ধার নিয়েছি।'

'তোমার সঙ্গে আমার একটা হিসাব বাকি আছে, মিস্টার রানা। অস্বীকার করো?'

'জিজ্ঞেস করছ, তাই বলা, তা না হলে নিজের প্রশংসা করার লোক আমি নই। সত্যি কথা বলতে কি, বেশ কয়েকটা সোনার মেডেল পাওনা হয়েছে আমার। একের পর এক তোমার প্ল্যানগুলো যেভাবে নষ্ট করে দিলাম।'

'কেউ তোমাকে বলেনি, তুমি মারা যাচ্ছ? তোমার মৃত্যু হবে ধীরে ধীরে। ও, ইয়েস! খুব কষ্ট পেয়ে মরবে তুমি।'

এটাই আসল কথা, রানা শোনার অপেক্ষায় ছিল। ওকে দ্রুত খুন করার কোন ইচ্ছে জাভালার নেই। তার মত লোকেরা মানুষ খুন করে আনন্দ পায়, বিশেষ করে যে লোক ব্যক্তিগত শত্রু হয়ে ওঠে। তাদের জন্যে এটা হলো সুদে-আসলে পাওনা মেটানোর সময়। রানা নিজের অনিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। মনিটরে এখানকার ছবি দেখে কি ভাবছে মুরল্যান্ড? সম্ভব হলে রানা তাকে জিজ্ঞেস করত, কি হে, সোয়াট টীম এত দেরি করছে কেন? কতক্ষণে পৌঁছাবে তারা? রানা জানে জাভালার কাছ থেকে খুব বেশি সময় আদায় করা সম্ভব হবে না। চেহারায় সরল একটা ভাব ফুটিয়ে জানতে চাইল ও, 'জানি তোমাদের পার্টিতে বাধা দিয়েছি, কিন্তু আর কিছুতে বাধা দিইনি তো?'

রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ওর ওজন নেয়ার চেষ্টা করল জাভালা। 'মিস তৃষা আর মিস্টার ফাহিমের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছিল। বিষয় ছিল ডক্টর সিরাজুল ইসলামের বিজ্ঞান চর্চা।'

'সেই পুরানো রুটিন–তেলের ফর্মুলা খুঁজে বের করো,' ত্যক্ত-বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল রানা। 'তুমি কোথাকার বুদ্ধু, হে? দেখে-শুনে মনে হচ্ছে রাজ্য জুড়ে সবাই জানে ফর্মুলাটা কি, শুধু তুমি আর ফ্যালকনে তোমার বন্ধুরা ছাড়া।'

জাভালার চোখ দুটো সামান্য একটু চওড়া হলো। 'তুমি দেখছি অনেক খবরই রাখো।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কোথাও ঢাকঢোল বাজলে সেটা শুনে অর্থ বের করাই আমার কাজ।'

'নুমার প্রজেক্ট ডিরেক্টর, এটা তোমার কাভার,' বলল জাভালা। 'তুমি আমেরিকার বন্ধু নও।'

'আমার আরও একটা কাজ আছে। খবর রাখা, কে কোথায় বেশি বাড়ল। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে আমাকে পাঠানো হয় কেটে ছোট করার জন্যে।'

'তুমি একজন স্পাই।'

'কখনও অস্বীকার করি না।'

ডক্টর ফাহিমের দিকে সরে গেছে তৃষা। ভদ্রলোকের মুখ থেকে ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে, টেপটা খুলে নিয়েছে সে। এই মুহূর্তে ওড়না দিয়ে নাক-মুখের রক্ত মুছে দিচ্ছে। ডক্টর ফাহিম মুখ তুলে ভোঁতা দৃষ্টিতে তাকালেন তৃষার দিকে, বিড় বিড় করে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

হাতিটা সরে এসে পজিশন নিয়েছে রানার পিছনে। জাভালার কাছ থেকে একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষায় আছে সে, পাওয়া মাত্র দু'হাতে ধরে হ্যাঁচকা মোচড় দিয়ে ভেঙে দেবে রানার ঘাড়টা।

'কোবরার ড্রেস পরে থাকায় তুমি হয়তো আমাদের জন্যে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেবে,' রানাকে বলল জাভালা। তারপর তৃষার দিকে ফিরল সে। 'এবার, মিস তৃষা। হয় তুমি এখুনি আমাকে অয়েল ফর্মুলা সহ বাকি সবগুলো আবিষ্কারের ফর্মুলা দেবে, নয়তো আমি দশ পর্যন্ত গোণার পর এই লোকের হাঁটুতে গুলি করব। হাঁটুর পর কনুইয়ে, কনুইয়ের পর দুই কানের পাতায়।'

হঠাৎ চমকে উঠে ফ্যাল ফ্যাল করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল তৃষা। হিসেব করেই হুমকিটা দিয়েছে জাভালা। তৃষা বুঝতে পারল, জাভালা মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না। ফাহিম চাচা আর রানা, চোখের সামনে দু'জনকে জখম হতে বা খুন হতে দেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অকস্মাৎ ভেঙে পড়ল সে। 'ফর্মুলা যা থাকার কথা সব আপনি বাবার ল্যাবরেটরিতে পাবেন।'

'ল্যাবরেটরির কোথায়?' তীক্ষ্ণ হলো জাভালার কণ্ঠস্বর। 'সার্চ করে আমরা পাইনি কেন?'

জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছে তৃষা, দ্রুত বাধা দিল রানা। 'বলো না। আমরা সবাই মরি মরব, তবু সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ফ্যালকনকে দেব না।'

'এনাফ!' ঘরে যেন বোমা ফাটাল জাভালা। চোখের পলকে শোল্ডারহোলস্টার থেকে একটা অটোমেটিক বের করে রানার বাঁ হাঁটুতে তাক করল। 'দেখা যাচ্ছে মিস তৃষাকে জানানো দরকার যে আমি সিরিয়াস।'

পিছন থেকে ঘুরে রানার সামনে চলে এল হাতি গুজম্যান। 'সার, আমি সন্দেহ করছি এই লোকটা আল কায়েদার সদস্য। এর ওপর আমাকে কাজ করার সুযোগ দিলে সেটাকে আমি একটা সম্মান বলে মনে করব। শালা টেররিস্ট হয়ে আমাকে বলে কিনা মোটকু, হাতি...'

সহকারীর দিকে দু'সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে হাসল জাভালা। 'আমারই ভুল। তোমার কথা বলাবার ক্ষমতাকে অবহেলা করা উচিত নয়। ওকে আমি তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম।'

হাতের রাইফেল একটা চেয়ারের গায়ে ঠেক দিয়ে রাখছে গুজম্যান। কামরার সবাই লক্ষ করল, চেহারা থেকে ভয়ের ভাব লুকাবার চেষ্টা করে রানা সফল হচ্ছে না। সেজন্যেই বিস্ময়ের ধাক্কা আরও জোরে অনুভব করল তারা। নিজেদের

লোকজনের কাছে অস্ত্র রয়েছে, তাই গুজম্যান কোন বিপদ আশঙ্কা করছে না, রাইফেলটা চেয়ারে ঠেক দিয়ে রাখার জন্যে রানার দিকে পিছন ফিরল সে। ঠিক তখনি রানা পরিণত হলো ছেড়ে দেয়া একটা স্প্রিঙে। ওর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে ঘুরল গুজম্যান, সঙ্গে সঙ্গে রানার ভাঁজ করা হাঁটু যেন তার উরুসন্ধিতে গেঁথে গেল। গুজম্যান যত শক্তিশালীই হোক, এরকম একটা মার খাওয়ার পর তার পক্ষে আর লড়াই করা সম্ভব নয়। কিন্তু হাঁটুর গুঁতোটা ঠিক যেখানে লাগার কথা সেখানে লাগেনি, স্পর্শকাতর অংশটাকে বাদ দিয়ে মূল ধাক্কাটা লেগেছে উরুর শেষ প্রান্তে।

বিস্মিত গুজম্যান ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে কুঁজো হয়ে গেল, তবে তা মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সিধে হলো সে, বিশাল দুই হাত এক করে সামনে এগিয়ে এসে ধাক্কা মারল রানার বুকে, একই সঙ্গে তার নাক দিয়ে বিস্ফোরিত হলো গরম নিঃশ্বাস। ছিটকে একটা টেবিলে পড়ল রানা, হড়কে পার হলো টেবিলের পুরোটা দৈর্ঘ্য, তারপর আলুর ভারী বস্তার মত খসে পড়ল কার্পেটে। এত জোরাল ধাক্কা আগে কখনও খায়নি ও। কিছুই ভাঙেনি, চামড়ায় একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি, অথচ সারা শরীরে শক্তি বলতে কিছুই যেন অবশিষ্ট নেই, বাতাসের অভাবে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে। আড়ষ্ট একটা ভঙ্গিতে হাঁটুর ওপর সিধে হচ্ছে ও, বড় করে শ্বাস টেনে ফুসফুসের চাহিদা মেটাচ্ছে। এভাবে মার খেলে ওর পরবর্তী গন্তব্য হতে যাচ্ছে মর্গ। অথচ জানে নিজের এই হাত-পা দিয়ে দৈত্যটাকে কাবু করা সম্ভব নয়, এমনকি শুধু প্রতিরোধ করতে হলেও ড্রেনেজ পাইপের মত মোটা পেশী দরকার। একটা অস্ত্র পেতে হবে ওকে, যে-কোন একটা অস্ত্র। সিধে হয়ে হাতের কাছে যেটা পেল সেটাই তুলে নিল রানা। ছোট একটা কফি টেবিল। টেবিলটার কাঠের সারফেস কড়াৎ করে গুজম্যানের মাথায় ভাঙল। হাতির খুলি নিশ্চয়ই লোহা দিয়ে তৈরি। চোখেতে মনে হলো দৃষ্টি নেই, একটু টলছে। রানার ধারণা হলো, গুজম্যান পড়ে যাবে। লাফিয়ে জাভালার হাতের অটোমেটিক ছিনিয়ে নেবে, নিজেকে সেজন্যে তৈরি রাখছে ও। কিন্তু মাথা ঝাঁকিয়ে ধকলটা ঝেড়ে ফেলল গুজম্যান, ফিরে পাওয়া দৃষ্টিতে ঘৃণা নিয়ে তাকাল রানার দিকে, নতুন উদ্যমে আবার হামলা শুরু করল।

রানা লড়ছে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। এবং হারছে ও। বক্সিং জগতে একটা সত্যকথন প্রচলিত আছে যে ছোট আকৃতির কোন লোক কখনোই বড় আকৃতির কোন লোকের সঙ্গে জিততে পারে না। অন্তত বিধি-বিধান মেনে চলতে হলে। ছুঁড়ে মারার মত কিছু একটা পাবার জন্যে উন্মত্ত হয়ে খুঁজছে রানা। দেয়াল ঘেঁষা টেবিল থেকে সিরামিকের তৈরি একটা ল্যাম্প তুলল, ছুঁড়ে মারল দু'হাতের সাহায্যে। প্যাটন ট্যাংকে লেগে ছিটকে পড়া পাথরের মত গুজম্যানের কাঁধে লেগে ফিরে এল ল্যাম্পটা। এরপর একটা টেলিফোন ছুঁড়ল রানা, সেটার পিছু নিল একটা ফ্লাওয়ার ভাস, ভাসের পিছু নিল এক কেজি ওজনের একটা টেবিল ক্লক। বলতে হয়, বেশ কিছু টেনিস বল ছুঁড়ছে রানা, কারণ ওর নিক্ষিপ্ত প্রতিটি জিনিস লক্ষ্যভেদে সফল হলেও গুজম্যানের অতিকায় শরীরের কোনই ক্ষতি হয়নি।

লোকটার ঠাণ্ডা দৃষ্টি দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, রানার সঙ্গে খেলাটা তার একঘেয়ে লাগছে। কামরার আরেক মাথা থেকে খেপা ষাঁড়ের ভঙ্গি নিয়ে ছুটে এল

সে। তবে এখনও রানা যথেষ্ট ক্ষিপ্র, এক পাশে সরে গিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেনটাকে জায়গা ছেড়ে দিতে পারল, সেটা যাতে সরাসরি একটা পিয়ানোয় ধাক্কা খায়। ছুটে কাছে চলে এল ও, পিয়ানো টুলটা ধরে মাথার ওপর তুলল, কায়দা মত পেয়ে গুজম্যানের মুখে মারতে যাচ্ছে। কিন্তু বিধি বাম!

তৃষা দু'হাত দিয়ে জাভালার গলা চেপে ধরেছে। তাকে এমন এক অনায়াস ঝাপটায় নিজের গা থেকে ছাড়াল জাভালা, সে যেন কাপড়ের তৈরি একটা পুতুল। পরমুহূর্তে তার হাতের পিস্তল রানার মাথার পিছনের খুলিতে নেমে এল সবেগে। আঘাতটা ওকে অজ্ঞান করল না, তবে সারা শরীরে ব্যথার সমস্ত উৎসমুখ যেন খুলে দিল। ওর হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে কার্পেটে নামল, আপাতত চোখে প্রায় কিছুই দেখছে না। ধীরে ধীরে কমছে ব্যথা, সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলোর ভোঁতা ভাব কেটে যাচ্ছে। অস্পষ্টভাবে তৃষার চিৎকার কানে এল। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হতে দেখল জাভালা তাকে ঠেকিয়ে রাখছে–একটা হাত ধরে এমন মোচড়াচ্ছে, ভাঙতে আর বোধহয় এক মিলিমিটার বাকি। গুজম্যানের সঙ্গে একতরফা লড়াই হচ্ছিল রানার, জাভালা সেটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল, এই সময় তৃষা তার হাত থেকে অটোমেটিকটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে।

হঠাৎ রানা একটা ঝাঁকি অনুভব করল। তারপর দেখল টান দিয়ে ওকে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়েছে গুজম্যান। পিছন থেকে রানার বুক দু'হাত দিয়ে জড়াল সে, হাত দুটো পরস্পরকে শক্ত করে ধরল, তারপর শুরু করল চাপ দিতে। এ যেন মস্ত এক অজগরের প্যাঁচ, পিষে মেরে ফেলছে রানাকে। চাপটা সরাসরি ফুসফুসে লাগছে, ফলে ভেতরে বাতাস বলতে কিছু থাকছে না। রানার খোলা মুখ হাঁ হয়ে আছে, কিন্তু একটু হাঁপাতে পর্যন্ত পারছে না। চোখের সামনে অন্ধকার ভাবটা ফিরে আসছে আবার। আর কখনও দিনের আলো দেখতে পাবে কি পাবে না, এ নিয়ে ওর মনে কোন ভুল ধারণা নেই। অনুভব করল পাঁজরের হাড় যে-কোন মুহূর্তে ভাঙবে। হাল ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুকে মেনে নেয়ার অবস্থা থেকে রানার দূরত্ব মাত্র দু'সেকেন্ড, এই সময় হঠাৎ চাপ কমে গেল, বুকের ওপর থেকে নেমে গেল হাত দুটো।

রানা আসলে স্বপ্ন দেখছে, অন্তত ওর নিজের অভিজ্ঞতা সেরকমই হলো। কামরার ভেতর দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় সমান মুরল্যান্ড ঢুকল বীরদর্পে, ঢুকেই পিছন থেকে জাভালার কিডনি বরাবর প্রচণ্ড এক ঘুসি। জাভালার শরীর দু'ভাঁজ হয়ে গেল, হাতের পিস্তল ও তৃষার কব্জি ছেড়ে দিল সে।

বাকি কোবরারা পাথরের মূর্তি, সবার অস্ত্র এখন মুরল্যান্ডের দিকে তাক করা, জাভালার নির্দেশ পেলেই ট্রিগার টেনে দেবে।

মুহূর্তের জন্যে সমীহ ভরা দৃষ্টিতেই মুরল্যান্ডকে দেখল গুজম্যান। কিন্তু তারপর যখন লক্ষ করল যে আগন্তুকের কাছে কোন অস্ত্র তো নেই-ই, তার তুলনায় অন্তত এক ফুট খাটোও সে, সঙ্গে সঙ্গে চেহারায় তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে বলল, 'ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন।'

কথাটা বলার মুহূর্তেই রানাকে ছেড়ে দিল গুজম্যান। কার্পেটের ওপর একটা স্তূপের মত পড়ল রানা। গুজম্যান দু'পা এগোল, প্রায় ছোঁ দিয়ে মেঝে থেকে

তুলে নিল মুরল্যান্ডকে, নিজের বুকে ফেলে কঠিন আলিঙ্গনে জড়াল-মুরল্যান্ডের পা দুটো শূন্যে ঝুলছে। প্রতিপক্ষের সামনে টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে নেই গুজম্যান. পরস্পরের মুখোমুখি তারা, তাকিয়ে আছে চোখে চোখে, ব্যবধান কয়েক ইঞ্চির বেশি নয়। গুজম্যানের ঠোঁট ভাঁজ হয়ে মুখের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে, এ হলো তার শয়তানি হাসির নমুনা; কিন্তু মুরল্যান্ডের চেহারা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, ভয়ের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব নেই সেখানে।

গুজম্যান যখন জড়িয়ে ধরছে, বুদ্ধি করে হাত দুটো ওপরে তুলে নিয়েছিল মুরল্যান্ড। এখনও তার হাত দুটো সিলিঙের দিকে খাড়া হয়ে আছে। তোলা এই হাত দুটো গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে চাপ দিয়ে মুরল্যান্ডের প্রাণবায়ু বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল গুজম্যান। নিজের বিপুল শক্তির প্রতিটি আউন্স কাজে লাগাচ্ছে সে।

রানা এখনও প্রচণ্ড ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে, আচ্ছন্ন ভাবটাও কাটিয়ে উঠতে পারছে না। তাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে ক্রল করছে ও। ওর নিঃশ্বাস পড়ছে কাঁপা কাঁপা, খুলি আর বুকের চামড়া বহু জায়গায় ছিঁড়ে যাওয়ায় হু-হু করে জ্বালা করছে।

মেঝে থেকে প্রকাণ্ড একটা ব্যাঙের মত লাফ দিল তৃষা, গুজম্যানের পিঠে বসে দু'হাত দিয়ে তার চোখ-মুখ খামচে ধরল, মাথাটা ঘন ঘন ঝাঁকাচ্ছে। অনায়াসে তাকে ছুঁড়ে ফেলল গুজম্যান, সে যেন শো উইন্ডোর নিষ্প্রাণ একটা ম্যানিকিন। শূন্যে নিক্ষিপ্ত তৃষা ধপাস করে পড়ল একটা সোফায়, তা না হলে খুলি সহ ক'টা হাড় ভাঙত কে জানে। গুজম্যান আবার মুরল্যান্ডকে পিষতে শুরু করল।

তবে মুরল্যান্ডের কোন সাহায্য দরকার নেই। খাড়া করা হাত দুটো নামিয়ে গুজম্যানের গলায় আঙুল জড়াল সে। দানবটা হঠাৎ উপলব্ধি করল, তার প্রতিপক্ষ নয়, সে-ই মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে। মুখের তাচ্ছিল্য ভরা কদর্য হাসি বদলে গেল, নগ্ন আতংকে বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা, কারণ তার ফুসফুস থেকে বাতাস চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। উন্মাদের মত হয়ে উঠল তার আচরণ। একবার মুরল্যান্ডের বুকে দমাদম ঘুসি মারছে, পরমুহূর্তে গলা ছাড়াবার চেষ্টা করছে তার আঙুলগুলো। কিন্তু মুরল্যান্ড মায়া-মমতাহীন পাষাণ। ঢিল দেয়ার কোন লক্ষণই তার মধ্যে দেখা গেল না। ভূতে পাওয়া মানুষের মত কামরার চারিদিকে ছুটোছুটি শুরু করল গুজম্যান, মুরল্যান্ড বিরতিহীন ঝুলে থাকল একটা বুলডগের মত।

রোমহর্ষক একটা গোঙানির আওয়াজ বেরুল গুজম্যানের নাক দিয়ে, পরমুহূর্তে নিস্তেজ হয়ে গেল শরীরটা। গোড়া কাটা বৃক্ষের মত দড়াম করে পড়ল সে, বুকে বসে আছে মুরল্যান্ড।

ঠিক সেই মুহূর্তে শেরিফ-এর এক ঝাঁক পেট্রল কার আর সোয়াট ভ্যান কাঁকর ছড়ানো ড্রাইভওয়েতে এসে থামল। হাতে ভারী অস্ত্র, ইউনিফর্ম পরা পুলিস বাড়ির চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। জানালা দিয়ে হেলিকপ্টার এঞ্জিন ও রোটরের শব্দও ভেসে এল।

'পিছনের পথ ধরো!' নিজের লোকদের উদ্দেশে চিৎকার করছে জাভালা। কোমরের কাছে সালোয়ার আর কামিজ খামচে ধরল সে, তৃষাকে টানতে টানতে কামরা থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে।

'তুমি ওর ক্ষতি করো,' পিছন থেকে বলল রানা, গলার স্বর যেন ঠাণ্ডা পাথর 'আমি তোমাকে নিজের হাতে দুনিয়া থেকে বিদায় করব।'

রানা পরিষ্কার বুঝল, ওর হুমকিতে ভয় পায়নি জাভালা। তবে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার পর হিসেব করছে, অস্থির একজন বন্দিনী তার পালাবার পথে কতটা বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।

'ঘাবড়াচ্ছ কেন?' বলে তৃষাকে কামরার ভেতর, রানার দিকে ছুঁড়ে দিল জাভালা। 'আপাতত এ তোমার কাছেই থাক। মানে, যতদিন না আবার আমাদের দেখা হয়। বলে গেলাম, শিগ্‌গির আবার দেখা হবে।'

রানা পিছু নেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু দৌড় প্রতিযোগিতায় কিছু করার অবস্থা ওর নেই, কিছুক্ষণ পরই হোঁচট খেতে শুরু করল, তারপর থেমে হেলান দিল একটা গাছের গায়ে। চোখ থেকে ঝাপসা ভাব আর ব্যথা দূর হতে লিভিং রুমে ফিরে এল ও।

ডক্টর ফাহিমের বাঁধন খুলে দিচ্ছে মুরল্যান্ড। তরল অ্যান্টিসেপটিকে ভেজানো তুলো দিয়ে ভদ্রলোকের মুখের ক্ষতগুলো পরিষ্কার করে দিচ্ছে তৃষা।

মেঝেতে পড়ে থাকা গুজম্যানের দিকে তাকাল রানা। 'ওর কি অবস্থা?'

মাথা নাড়ল মুরল্যান্ড। 'এখনও মরেনি। বাঁচলেই বোধহয় ভাল হয়। পুলিশ আর এফবিআই হয়তো মুখ খোলাতে পারবে।'

'ঠিক সময় মতই পৌঁছেছিলে। ধন্যবাদ।' রানার ঠোঁটে টান টান হাসি।

ওর দিকে চোখ তুলে কাঁধ ঝাঁকাল মুরল্যান্ড। 'তোমার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ার আগেই আমি রওনা দিই, কিন্তু গোলাবাড়ির সামনে দাঁড়ানো গার্ডটাকে কাবু করার জন্যে একবার থামতে হয় আমাকে।'

'ওই সময় তুমি না পৌঁছালে একজন বন্ধু হারাতে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার হস্তক্ষেপ একঘেয়ে হয়ে উঠছে।'

যে-কোন আলোচনায় শেষ যে কথাটা মুরল্যান্ড বলবে, তার কোন জবাব হয় না। এগিয়ে এসে ডক্টর ফাহিমকে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা। 'খুব কি অসুস্থবোধ করছেন?'

অভয় দিয়ে হাসতে চেষ্টা করলেন ডক্টর ফাহিম। 'অসুস্থ, হ্যাঁ, তবে কয়েকটা স্টিচ পড়লে দ্রুত সেরে উঠব। আপনারা এসে পড়ায় প্রাণে বেঁচে গেছি, এটাই হলো বড় কথা।'

রানা একটা হাত ধরতে তৃষার মুখে একটু হাসি ফুটল। 'আপনি সত্যি খুব শক্ত মেয়ে।'

'সে কি পালিয়েছে?'

'কে, জাভালা?'

'হ্যাঁ?'

'বোধহয়, যদি না শেরিফের ডেপুটিরা ধাওয়া করে তাকে ধরে থাকে।'

'তাকে ধরা অত সহজ নয়,' চোখে অস্বস্তি নিয়ে বলল তৃষা। 'ওরা তাকে খুঁজেই পাবে না। দেখবেন, লোকটা আবার ফিরে আসবে। ফ্যালকনে ওর বস বাবার ফর্মুলাগুলো না পাওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।'

আট

পড়ন্ত বিকেলে গুজম্যান আর তার দু'জন সঙ্গীর জ্ঞান ফিরে এল। হ্যান্ড কাফ পরিয়ে পেট্রল কারে তোলা হলো তাদের, শেরিফ-এর ডিপার্টমেন্টে নিয়ে গিয়ে তাদের নামে ডক্টর সিরাজুল ইসলামের সিকিউরিটি গার্ডদের খুন করার অভিযোগ দায়ের করা হবে।

শেরিফের হোমিসাইড ইনভেস্টিগেটরদেরকে একটা লিখিত জবানবন্দি দিলেন ডক্টর ফাহিম ও তৃষা, পরে রানা ও মুরল্যান্ডও। গার্ডদের লাশগুলো স্টর্ম সেলার থেকে উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

তৃষার কথাই সত্যি প্রমাণিত হলো, ধাওয়া করেও কাকাস জাভালাকে ধরতে পারেনি শেরিফের ডেপুটিরা। খুনী লোকটার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে হাডসন নদীর ওপর পাহাড়ের উঁচু মাথায় চলে এল রানা। এখানে একটা রশি দেখতে পেল ওরা, নদীর দিকে নেমে গেছে।

'তারমানে ওদের জন্যে একটা বোট অপেক্ষা করছিল,' মন্তব্য করল মুরল্যান্ড।

নদীর ওপারে সবুজ পাহাড় আর বনভূমির দিকে তাকাল রানা। 'এই জাভালা লোকটা প্রতিটি দিক কাভার না করে কোন অপারেশনে নামে না। এমন ধূর্ত লোক আমি খুব কমই দেখেছি। চিন্তা করে দেখো, কি সব ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে দিব্যি পালিয়ে গেছে, গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।'

মুরল্যান্ড হেসে ফেলল। 'আমাদের হিরো কিন্তু তুমি।' তারপর জানতে চাইল, 'তোমার কি মনে হয়, ইন্টারোগেট করার সময় কোবরা তিনটে মুখ খুলবে?'

'মুখ খুললেও বিশেষ কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'আমি যত দূর জানতে পেরেছি, কোবরা ক্লাব নামে ওদের অর্গানাইজেশন একটা সেল-কে ইউনিট ধরে কাজ করে, সেল বা ইউনিটগুলো পরস্পর সম্পর্কে অজ্ঞ। শুধু সেল কমান্ডাররা তাদের লীডার হিসেবে জাভালাকে চেনে। তাদের কাছে চেইন অভ কমান্ড জাভালা পর্যন্ত এসে থেমে গেছে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, কেউ ওরা জানে না যে ওদের সত্যিকার বস্ ফ্যালকনের করপরেট অফিসে বসে আছে।'

'মূল অপরাধীদের বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষী না দিলে তাদের তাহলে বিচার হবে কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'কেস করে, প্রমাণ সংগ্রহ করে–মানে, আইনের সাহায্যে তাদের বিচার করা সম্ভব নয়। সরকারী উকিলরা নিরেট কোন প্রমাণই দাখিল করতে পারবে না। ওদেরকে শাস্তি দিতে হবে অন্যভাবে।'

'চলুন, বাড়ি ফিরি,' রানার একটা হাত ধরল তৃষা। 'আপনাদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।'

'আপনি আমারও একটা হাত ধরুন,' বলে তৃষার সামনে নিজের একটা হাত বাড়িয়ে দিল মুরল্যান্ড। 'তা না হলে আমার আয়ু কমে যাবে।'

'আয়ু কমে যাবে–কেন?' তৃষা অবাক।

'আপনার মত আশ্চর্য সুন্দর কোন মেয়ে কারও হাত ধরলে তার আয়ু বাড়ে, তাই!'

তিনজনই ওরা হেসে উঠে বাড়ির পথ ধরল।

কফি আর বিস্কিট খেয়ে তৃষার নেতৃত্বে কিচেনে ঢুকল ওরা ডিনার তৈরি করতে। মাছ, মাংস ও শাকসব্জি কাটা-বাছার কাজ শেষ হতে মুরল্যান্ডকে নিয়ে লিভিং রুমে ফিরে এল রানা, দু'জন মিলে সমস্ত ফার্নিচার আগের জায়গায় ঠিকঠাক মত বসাল–হাতে এক গ্লাস মার্টিনি নিয়ে ডক্টর ফাহিম দেখিয়ে দিলেন কোনটা কোথায় ছিল।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকতে সবাই এসে বসল নতুন করে সাজানো লিভিং রুমে, সবার হাতে কফির কাপ। তৃষার দিকে তাকাল রানা। 'জাভালাকে তুমি বললে, তোমার বাবার ফর্মুলা ল্যাবরেটরিতে লুকানো আছে।'

ওদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে লোকচক্ষুর আড়ালে, শুধু ওরা দু'জন যখন একবার কিছুক্ষণের জন্যে কিচেনে ছিল।

তৃষা ডক্টর ফাহিমের দিকে তাকাল, যেন অনুমতির আশায়। মৃদু হেসে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'বাবার ফর্মুলাটা আছে একটা ফাইল ফোল্ডারে, দরজার পিছনে লুকানো একটা প্যানেলে সেটা ফিট করে।'

কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়ে কাপটা নামিয়ে নিল মুরল্যান্ড। 'উনি আমাকে অন্তত ঠিকই বোকা বানাতেন। একটা দরজার ভেতর কখনোই আমি দেখতাম না।'

'ডক্টর ইসলাম জ্ঞানী মানুষ ছিলেন।'

'আর ডক্টর ফাহিম হলেন সাহসী পুরুষ,' সশ্রদ্ধচিত্তে বলল মুরল্যান্ড। 'এই বয়সে অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন, কিন্তু জাভালাকে কিছুই বলেননি।'

মাথা নেড়ে ডক্টর ফাহিম বললেন, 'বিশ্বাস করুন, ওই সময় মিস্টার রানা হাজির না হলে আমি ঠিকই বলে দিতাম ফর্মুলাটা কোথায় আছে। কারণ তা না হলে তৃষার ওপর টরচার বন্ধ করা যেত না।'

'ফাহিম চাচা, রানাকে তুমি মিস্টার না বললেও পারো,' বলল তৃষা। 'আমার মনে হয় ওকে তোমার আপনি না বলে তুমিই বলা উচিত।'

'তুই বলছিস?'

'বাংলা ভাষার এই তুমি আর আপনি রহস্য আমিও বুঝি,' তাড়াতাড়ি বলল মুরল্যান্ড। 'মিস্টার ফাহিম, আপনি আমাকেও তুমি বলবেন, প্লীজ।'

হেসে ফেললেন ডক্টর ফাহিম। 'আচ্ছা, বেশ।'

তৃষা আবার সিরিয়াস হয়ে উঠল। 'আমার ভয় লাগছে, ওরা না আবার ফিরে আসে। আজ রাতেই যে আসবে না, তার কি নিশ্চয়তা?'

'না, আজ রাতে আসবে না,' তাকে অভয় দিয়ে বলল রানা। 'আরেক দল

লোককে জড়ো করতে সময় লাগবে জাভালার। দু'চারদিনের মধ্যে তার আসার সম্ভাবনা নেই।'

'আসুক বা না আসুক,' ডক্টর ফাহিম বললেন, 'আমরা সম্ভাব্য সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করব। আমি মনে করি এই বাড়িতে তৃষার থাকা উচিত হবে না। ওকে অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আমি তোমার আর মুরল্যান্ডের সঙ্গে ওয়াশিংটনে চলে যেতে পারি,' বলল তৃষা, চোখে দুষ্টামির ঝিলিক। 'তোমার কেয়ারে আমি নিরাপদ থাকব।'

একটু বিব্রত দেখাল রানাকে। 'কিন্তু আমি তো এখনও নিশ্চিত নই যে আমরা ওয়াশিংটনেই ফিরছি।' কফির কাপটা খালি করে টেবিলে নামিয়ে রাখল ও। 'তোমার বাবার ল্যাবরেটরিটা দেখাবে, প্লীজ।'

'দেখার খুব বেশি কিছু নেই,' বললেন ডক্টর ফাহিম, পথ দেখিয়ে সবাইকে গোলাবাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

গোলাবাড়ির ভেতর যে ঘরটায় ওরা ঢুকল সেখানে তিনটে কাউন্টারে নানা রকম অ্যাপারেটাস সাজানো রয়েছে। এ-সব বেশিরভাগ কেমিস্ট্রি ল্যাবেই থাকে।

'আহামরি কিছু নয়,' বললেন ডক্টর ফাহিম। 'তবে এখানেই আমরা স্লীক সিক্সটিসিক্স-এর ফর্মুলা আবিষ্কার করি, আর তারপর সেটাকে ডেভল্প্ করি।'

কামরাটার চারদিকে হাঁটাহাঁটি করছে রানা। 'আমি ঠিক এরকম কিছু আশা করিনি।'

ডক্টর ফাহিম অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে রানাকে দেখছেন। 'তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'ডক্টর ইসলাম তাঁর ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিনের ডিজাইন এখানে এসে করেছিলেন, এ সম্ভব নয়,' দৃঢ় স্বরে বলল রানা।

'কেন তুমি এ-কথা বলছ?' সাবধানে জানতে চাইলেন ডক্টর ফাহিম।

'এটা স্রেফ একটা কেমিস্ট্রি ল্যাব, তার বেশি কিছু নয়। অথচ ডক্টর ইসলাম এঞ্জিনিয়ারিঙে ছিলেন দুর্লভ এক প্রতিভা। আমি কোন ড্রাফটিং টেবিল দেখছি না, দেখছি না থ্রী-ডাইমেনশন্যাল কমপোনেন্ট ডিসপ্লে করার জন্যে প্রোগ্রাম করা কোন কম্পিউটার। ওয়ার্কিং মডেল তৈরির ফ্যাসিলিটি ও মেশিনারিও তো নেই। আমি দুঃখিত, তবে এটা সেই জায়গা নয় যেখানে একটা উর্বর মস্তিষ্ক তার উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে প্রপালশান টেকনোলজিতে বিরাট অবদান রেখেছে।' থেমে পালা করে তৃষা ও ডক্টর ফাহিমের দিকে তাকাল রানা। দু'জনেই চোখ নামিয়ে দাগবহুল কাঠের মেঝের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'আমি যেটা বুঝতে পারছি না, আপনারা আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন কেন?'

'তৃষা বা আমি, কেউই আমরা কিছু লুকাচ্ছি না, রানা,' ভারী গলায় বললেন ডক্টর ফাহিম। আসল কথা হলো, আমরা কেউই জানি না সিরাজ কোথায় বসে তাঁর গবেষণা সম্পন্ন করেছিলেন। একজন মানুষ আর একজন বন্ধু হিসেবে তিনি ছিলেন আদর্শ, কিন্তু সব কিছু গোপন করে রাখার যে প্রচেষ্টা তাঁর মধ্যে আমরা দেখেছি সেটাকে ফ্যানাটিকাল বলা ছাড়া কোন উপায় নেই। কাউকে কিছু না বলে হটাৎ গায়েব হয়ে যেতেন সিরাজ, কখনও দু'চারদিন আবার কখনও দু'চার হপ্তা

পর ফিরে আসতেন। আমরা বুঝতে পারতাম গোপন কোন ল্যাবরেটরি আছে তাঁর, সেখানে গবেষণা করতে যান। কিন্তু সেই ল্যাবরেটরি কোথায় তা আমাদেরকে কোনদিন তিনি জানাননি। তৃষা আর আমি বেশ কয়েকবার তাঁর পিছু নিই, কিন্তু প্রতিবারই টের পেয়ে যান তিনি, আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যান। অনেকটা ভোজবাজির মত এই আছে তো এই নেই।'

'তারমানে আপনারা নিশ্চিত যে তাঁর গোপন ল্যাবটা এই খামারবাড়ির কোথাও নেই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন ডক্টর ফাহিম। 'আপনাকে আমরা কোন ধারণাই দিতে পারব না। এই ফার্ম থেকে বেরিয়ে যাবার পর অদৃশ্য হবার ঘটনা যেমন ঘটেছে, তেমনি এই ফার্ম থেকেও গায়েব হয়ে যেতে দেখা গেছে তাঁকে। তবে এমনও হতে পারে যে তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা জানতে পারিনি, তাই ধরে নিয়েছি তিনি ফার্মের ভেতর থেকে গায়েব হয়ে গেছেন।'

'আপনারা তাঁকে এ বিষয়ে কিছু বলেননি?'

'একবার?' জবাব দিচ্ছে তৃষা। 'যতবারই প্রসঙ্গটা তুলতে গেছি, আমাদেরকে থামিয়ে দিয়ে বলেছেন, "তোমাদের না জানাই ভাল। শুধু জেনে রাখো আমার কিছু আবিষ্কার বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির জগতে বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছে"।'

ডক্টর ফাহিম বললেন, 'ফার্মের সম্ভাব্য সব জায়গায় তল্লাশী চালিয়ে দেখেছি আমরা, কিন্তু তাঁর গোপন ল্যাব সম্পর্কে কোন ক্লুই আমরা পাইনি।'

'মারা যাবার আগে তিনি কি নিয়ে গবেষণা করছিলেন?'

মাথা নাড়লেন ডক্টর ফাহিম। 'আমার কোন ধারণা নেই।'

'আপনি ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু,' বলল মুরল্যান্ড। 'এটা অদ্ভুত শোনায় না যে আপনাকে বিশ্বাস করে কিছুই তিনি বলতেন না?'

'সিরাজকে চিনতে হবে তোমাদের। তিনি ছিলেন দু'জন মানুষ। এই এখন অ্যাবসেন্টমাইন্ডেড, অথচ আদর-স্নেহের উৎস প্রিয় বাবা ও অকপট প্রাণের বন্ধু; পরমুহূর্তেই পাগলাটে মাস্টার এঞ্জিনিয়ার, যিনি কাউকে বিশ্বাস করেন না, এমনকি সবচেয়ে যারা ঘনিষ্ঠ তাদেরকেও নয়।'

'ঠিক কেমন মানুষ ছিলেন ডক্টর ইসলাম?' অবাক হয়ে ভাবছে রানা, সেই ভাবনাটাই উচ্চারণ করছে ওদের সামনে। 'তিনি কি মদ খেতেন? পার্টিতে যেতেন? ছুটি নিতেন? ব্যক্তিগত কোন দুর্বলতা ছিল তাঁর? বিচিত্র কোন শখ?'

তৃষা ও ডক্টর ফাহিম দু'জন একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

'মানে?'

'একটা ছাড়া তোমার সব প্রশ্নের জবাব—না,' বললেন ডক্টর ফাহিম।

'অবসর সময়টা বাবা লাইব্রেরিতে কাটাতেন। বই পড়ার সাংঘাতিক নেশা ছিল, আর নেশা ছিল ভাইকিংদের সম্পর্কে তথ্য পেলে তা নোট করে রাখা। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান জলদস্যুদের সম্পর্কে তথ্য আছে, এমন কিছু প্রাচীন শিলাও তিনি কোত্থেকে যেন যোগাড় করেছিলেন। আমাদের মূল বাড়ির সামনে যে পাথরের পিলারগুলো রয়েছে, ওগুলোও ওই আমলের, মানে ভাইকিংদের সময়কার ওগুলোয় খোদাই করা লিপিও আছে। আর বই পড়ার নেশাটা ছিল বিজ্ঞান চর্চার

সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন। কারণ বাবাকে আমি সবসময় সাহিত্যই পড়তে দেখতাম...'

সেই কাগজটার কথা মনে পড়ে গেল রানার; তিন বছর আগের ঘটনা, হেলিকপ্টার নিয়ে টেক্সাস থেকে নিরুদ্দেশ হবার সময় পাইলটের হাতে যে কাগজটা খুঁজে দিয়ে গিয়েছিলেন ডক্টর সিরাজুল ইসলাম। তাতে রবি ঠাকুরের সঞ্চয়িতা থেকে নেয়া 'বসুন্ধরা' কবিতাটির উদ্ধৃতি ছিল। সাহিত্যের প্রতি তাঁর যে আকর্ষণ ছিল, এটা একটা প্রমাণ বটে। তা না হলে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার হরফগুলোকে নিজের পাঠানো মেসেজের কোড ভাঙার কী বা চাবি হিসেবে ব্যবহার করার কথা তিনি ভাবতেন না ল্যাবরেটরির চারদিকে চোখ বুলিয়ে রানা বলল, 'কিন্তু উনি যে বইয়ের পোকা ছিলেন, তার তো কোন লক্ষণ এখানে দেখছি না।'

আবার হেসে উঠল তৃষা। 'আমরা এখনও তোমাকে বাবার লাইব্রেরি দেখাইনি।'

'আমি দেখতে চাই।'

'বাড়ির বাইরে ওটা একটা আলাদা দালান, নদীর কাছাকাছি। বাবা ওটা আজ প্রায় বিশ বছর আগে বানিয়েছিলেন। ওটা ছিল বাড়ির ভেতর বাবার আলাদা একটা জগৎ, অবসর সময়টা একা ওখানে কাটাতেন।'

রানা দেখে বিস্মিত হলো যে পুরো দালানটাই নিরেট, গম্ভীরদর্শন পাথরের তৈরি। ছাদেও স্লেট পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। একটা চাবি দিয়ে মোটা ওক কাঠের দরজাটা খুললেন ডক্টর ফাহিম।

লাইব্রেরির ভেতরটা রানার কল্পনার সঙ্গে মিলে গেল। মেহগনি কাঠের সারি সারি বুকশেলফ আর প্যানেল ফিট করা দেয়াল মার্জিত রুচি আর সৌন্দর্যবোধের পরিচয় বহন করছে। অ্যান্টিকস চেয়ার আর কাউচগুলো লেদারে মোড়া। ডেস্কটা, ওপরে এখনও রিসার্চ পেপার ছড়িয়ে রয়েছে, রোজউড-এর তৈরি।

বুকশেলফগুলোর সামনে দিয়ে হাঁটছে রানা, প্রতিটি মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঁচু। চাকা লাগানো অ্যালুমিনিয়ামের মই আছে, ওপর থেকে বই নামাতে কোন অসুবিধে নেই। একদিকের দেয়ালে বুকশেলফ অনুপস্থিত, তার বদলে বাংলাদেশের বিশাল এক মানচিত্র সাঁটা, পুরো দেয়াল জুড়েই। রানা দেখল ম্যাপটা ছাপা নয়, হাতে আঁকা। মানচিত্রের নিচে বাংলাদেশের জাতীয়সঙ্গীতের পুরোটা লেখা হয়েছে।

'রানা, এদিকে এসো!' একটু উত্তেজিত গলায় ডাকল মুরল্যান্ড। রানার মত সে-ও ঘুরে ঘুরে এটা-সেটা দেখছিল, একটা শেলফে কয়েকটা নোটবুক চোখে পড়ায় হাতে তুলে নেয়। রানা কাছে আসতে তারই একটা ধরিয়ে দিল রানার হাতে। 'খুলে দেখো।'

খোলার আগে নোটবুকের কাভারটা ভাল করে দেখল রানা। কাভারে ডক্টর সিরাজুল ইসলামের নাম লেখা রয়েছে। তারপর লেখা হয়েছে–'ভাইকিংস নোটস্'। খুলল রানা। আর খুলেই অবাক হয়ে গেল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নোটবুকের প্রতিটি পাতা খালি। কোথাও কিছু লেখা নেই।

এরকম প্রতিটি নোটবুক।

'আশ্চর্য! এর মানে কি?' বলল তৃষা, ইতিমধ্যে ডক্টর ফাহিমের সঙ্গে সে-ও ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আমিও তো কিছু বুঝতে পারছি না,' বললেন ডক্টর ফাহিম।

'কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে,' বলল তৃষা। 'শিলালিপির অর্থ বের করে ওগুলোয় টুকে রাখতে দেখেছি বাবাকে।'

'অবশ্যই দেখেছ,' বলল রানা। 'তবে এই নোটবুকগুলোয় ন । এগুলোর একটাকে দেখেও মনে হচ্ছে না যে আসল পাতা সরিয়ে তার জায়গায় খালি পাতা আটকানো হয়েছে। এর মানে হলো, তোমার বাবা অরিজিন্যাল নোটবুকগুলো অন্য কোথাও সরিয়ে রেখে গেছেন।'

'কোন সন্দেহ নেই, রানা, তোমার নিখোঁজ ল্যাবরেটরিতে ধুলো জমছে,' বলল মুরল্যান্ড।

তৃষার অপরূপ মুখশ্রী বিস্ময়ে লালচে হয়ে উঠল। 'কিন্তু বাবা এরকম একটা কাজ কেন করবেন? তোমরা বলতে চাইছ আমার বাবাকে আমি চিনতাম না? তাঁর মধ্যে কখনও এতটুকু লোভ বা অসততা দেখিনি আমি...'

'পাগল নাকি!' মুরল্যান্ডের চেহারা দেখে মনে হলো কেউ যেন তার পা মাড়িয়ে দিয়েছে। 'আমরা কখন তাঁকে অসৎ বা লোভী বললাম!'

ডক্টর ফাহিম নিচু গলায় রানাকে বললেন, 'সিরাজ যদি তাঁর নোটবুকগুলো কোথাও লুকিয়ে রেখে গিয়ে থাকেন, নিশ্চয়ই তাঁর পিছনে সঙ্গত কোন কারণও ছিল।'

তৃষার মনমরা ভাব দেখে রানা বলল, 'অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে। আজ আমরা কিছুরই সমাধান করতে পারব না। চলো সবাই ফিরে যাই, কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে নতুন করে ভাবা যাবে।'

সবাই ওরা ভীষণ ক্লান্ত, কেউ দ্বিমত পোষণ করল না। তবে রানার মাথায় অন্য বুদ্ধি। লাইব্রেরি ছেড়ে সবার শেষে বেরুল ও। ডক্টর ফাহিমের হাতে চাবির গোছাটা তুলে দেয়ার আগে দরজায় তালা লাগানোর ভান করল। পরে, সবাই যখন যে-যার কামরায় ঘুমিয়ে পড়েছে, চুপিসারে লাইব্রেরিতে ফিরে এল আবার, ভেতরে ঢুকল তালা না দেয়া দরজা ঠেলে।

আলো জ্বেলে কাজ শুরু করল রানা, প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান শিলালিপি সম্পর্কে ডক্টর সিরাজুল ইসলামের রিসার্চ ম্যাটিরিয়ালের ভেতর তল্লাশী চালাচ্ছে। ধীরে ধীরে একটা ট্রেইল ও একটা কাহিনী স্পষ্ট হতে শুরু করল।

ভোর চারটের দিকে যা খুঁজছিল পেয়ে গেল রানা। অবশ্য এখনও অনেক উত্তর ফাঁকি দিচ্ছে ওকে। তবে কাদা সরে গিয়ে তলাটা দেখতে দেয়ার মত পরিষ্কার হয়েছে পানি। খুশি ও তৃপ্ত, নিজের ঘরে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

সকালে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে সবাইকে অবাক করে দিল মুরল্যান্ড। একটু বেলা হতে, লাল চোখ নিয়ে ক্লান্ত রানা প্রথমে সরাসরি রাহাত খানের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলল। বাংলাদেশে এখন রাত দশটা, বসকে বাড়িতেই পেল রানা। ও যখন কথা বলছে, সৌজন্যের খাতিরেই লিভিং রুম ছেড়ে চলে গেল তৃষা, তার পিছু

নিয়ে মুরল্যান্ডও। ডক্টর ফাহিম নিজের কামরায় তাঁর গবেষণার কিছু কাগজ-পত্র গুছাতে ব্যস্ত, নিউ ইয়র্ক সিটি সায়ান্স ইউনিভার্সিটিতে আজ তাঁকে লেকচার দিতে যেতে হবে।

এরপর রানা নুমা চীফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে ফোন করে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিল। অ্যাডমিরাল অবশ্য ওকে একটু হতাশই করলেন। ফ্যালকন করপরেশনকে নিয়ে তদন্ত শুরু হলেও, ভাল-মন্দ কোন রিপোর্টই তিনি পাননি এখনও। কথা প্রসঙ্গে বললেন–রানা ডক্টর সিরাজুল ইসলামের লেদার কেসে চুপি চুপি কে কিভাবে তেল ভরে দিয়ে গেছে, এই ধাঁধার সমাধান করতে না পেরে ল্যারি কিং বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। কথাটা শুনে রানাও কম বিস্মিত হলো না, তবে ধরতে পারল না চালাকিটা কে করছে।

ল্যাবে কিছু কাজ আছে, ডক্টর ফাহিমকে সাহায্য করতে গেল মুরল্যান্ড। তৃষাকে নিয়ে লাইব্রেরিতে চলে এল রানা। ডেস্কের ওপর বই ও কাগজ-পত্রের স্তূপ দেখে ভুরু কোঁচকাল তৃষা। 'দেখা যাচ্ছে এবাড়িতে জিন-টিনের উপদ্রব শুরু হয়েছে।'

রানা হাসছে না। 'বিশ্বাস করো, সত্যি জিন নয়।'

'এখন আমি বুঝতে পারছি ঘুম থেকে ওঠার পর চোখ অমন লাল লাগছিল কেন।' হাসছে তৃষা। এগিয়ে এসে রানার গালে হালকা করে একটু ঠোঁট বুলাল। 'কাল রাতে তুমি বাবার লাইব্রেরিতে না এসে আমার কাছে গেলে খুশি হতাম।'

রানা বলতে যাচ্ছিল, 'আগে কাজ, তারপর–' তবে সময়মত নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'মনটা হাজার মাইল দূরে থাকলে আমি ঠিক প্রেম করতে পারি না।'

'দূরে মানে সম্ভবত অতীতে বোঝাতে চাইছ,' বলল তৃষা, ঝুঁকে খোলা ভাইকিং বইগুলো দেখছে। 'তুমি কি খুঁজছ বলো তো? প্রাচীন জলদস্যু সম্পর্কে তোমার এই আগ্রহের কারণ কি?'

'তোমার বাবার আগ্রহের কারণটা বুঝতে চেষ্টা করা।'

'সেক্ষেত্রে সবচেয়ে আগে আমার সঙ্গে আলাপ করা উচিত ছিল তোমার,' বলল তৃষা, কৌতুকে চকচক করছে চোখ দুটো। 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম।'

'বেশ, করো সাহায্য।'

'উঁহুঁ। আগে বলো কাগজ-পত্র ঘেঁটে তুমি কি জানতে পারলে।'

'তার আগে আমার ধারণাটা ব্যাখ্যা করি,' বলল রানা। 'ডক্টর ইসলামের মত একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী বিনা কারণে, শুধু শখের বশে, প্রাচীন ভাইকিং শিলালিপি খুঁজে বেড়িয়েছেন, এ বিশ্বাস্য নয়। আমার বিশ্বাস, এর সঙ্গে তাঁর আবিষ্কারগুলোর কোন না কোন সম্পর্ক আছে।'

'আছেই তো,' বলল তৃষা। 'প্রশ্ন হলো, তুমি কি সেই সম্পর্কটা ধরতে পেরেছ?'

ডেস্ক থেকে একটা বই তুলল রানা। বইটার নাম–'মেসেজ ফ্রম দা এনশেন্ট ভাইকিংস', লেখিকার নাম মার্লিন কাইজার। 'এই ভদ্রমহিলা জুল ভার্ন, তাঁর গল্পের চরিত্র, কাহিনীতে ব্যবহার করা ডুবোজাহাজ, ঐতিহাসিক তথ্য, বিস্ময়কর

সব গুজব ইত্যাদি সম্পর্কেও গবেষণা করেছেন দীর্ঘ এক যুগ ধরে।'

'তো?'

'এই লেখিকা তাঁর একটা বই তোমার বাবাকে উৎসর্গ করেছেন। বইটা জুল ভার্ন সম্পর্কে লেখা। উৎসর্গ করতে গিয়ে লিখেছেন–"নটিলাসের অস্তিত্ব আছে, এই বিশ্বাস আমার ভেতর যিনি সংক্রমিত করেছেন সেই ডক্টর সিরাজুল ইসলামকে"।

'তো?' আবার সেই একই প্রশ্ন তৃষার।

'গোটা ব্যাপারটা শুধু দুর্বোধ্য নয়, অবিশ্বাস্য হয়ে উঠছে, তাই না?' বিখ্যাত গল্পের একটা উপকরণ নটিলাস, সেটার অস্তিত্ব থাকে কি করে? শুধু যে এই একটা ব্যাপার, তা-ও নয়। লেখিকা তাঁর অন্য একটা বইতে লিখেছেন, আমেরিকার হাডসন নদীতে নাকি এমন একটা বিশাল গুহা আছে, যার সঙ্গে টোয়েনটি থাউজেন্ড লীগস আন্ডার দা সী-তে বর্ণনা করা গুহার প্রায় হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়।'

'কিন্তু অনেক খুঁজেও সেই গুহা বা গহ্বরের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি', বলল তৃষা।

'আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে কেউ সেটা কোনদিন খুঁজে পাবে না। অর্থাৎ একটা ম্যাপ দরকার। গুহাটায় ঢোকার রাস্তা সম্ভবত পানির তলা দিয়ে। এবং আমার বিশ্বাস, এই বাড়ির নিচেই কোথাও তোমার বাবার ল্যাবরেটরি আছে, আর সেটা ওই গুহার ভেতর না হয়ে যায় না। ডক্টর ইসলামের গায়েব হয়ে যাবার রহস্য হলো, এই খামারবাড়ি থেকেই ওখানে যেতে পারতেন তিনি।' মাথার চুলে আঙুল চালাল রানা। 'এ তো গেল গুহা আর ল্যাবরেটরি প্রসঙ্গ। ডক্টর ইসলামকে লেখা মার্লিন কাইজারের কয়েকটা চিঠি পড়ে আমার ধারণা হয়েছে...নাহ্, থাক–ব্যাপারটা হাস্যকর শোনাবে।'

'তোমার ধারণা হয়েছে, বাবা তাঁর ম্যাগনিটো-হাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিনের আইডিয়াটা পান জুল ভার্নের বই পড়ে, এই তো?' রানা মাথা ঝাঁকাতে হাসল তৃষা। 'এর মধ্যে কিছুই হাস্যকর নেই। একটা ডায়েরীতে বাবা নিজেই কথাটা লিখে রেখে গেছেন।'

'কোথায় সেই ডায়েরী?' জানতে চাইল রানা।

'বছর কয়েক আগে এই বাড়িতে পরপর দু'বার ডাকাতি হয়েছিল, অনেক দামী জিনিসের সঙ্গে প্রচুর কাগজ-পত্রও খোয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে ওই ডায়েরীটাও ছিল। তবে তাতে কি লেখা ছিল সব আমার মনে আছে।' হঠাৎ একটু চিন্তিত, একটু অন্যমনস্ক দেখাল তৃষাকে। 'যদিও অন্তত একটা কথার মানে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'কি কথা?'

'লাইনগুলো স্পষ্ট মনে আছে আমার–"জন্মভূমির ঋণ শোধ করার জন্যে অমূল্য সম্পদের একটা ভাণ্ডার রেখে যাব আমি"। এই অমূল্য সম্পদের ভাণ্ডার বলতে বাবা ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিলেন, কোনদিনই আমার তা জানার সুযোগ হয়নি।'

রানা প্রস্তাব দিল, 'দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে দেখলে হয় না?'

'কি রকম?'

'জলদস্যুদের স্বভাবই ছিল লুঠ করা সম্পদ কোথাও লুকিয়ে রাখা। শিলালিপির অর্থ বের করে ডক্টর ইসলাম হয়তো এরকম কোন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিলেন।'

'অসম্ভব নয়,' বলল তৃষা। 'কিন্তু সে-সব যদি জন্মভূমিকে দিয়ে যাবারই ইচ্ছে ছিল কোথায় আছে তা আমাদেরকে বলে যাননি কেন? বা কোথাও লিখে রেখে যাননি কেন?'

'তিনি জানিয়ে গেছেন, তৃষা,' বলল রানা। 'ঢাকায় সব মিলিয়ে পঁচিশ পাতা ই-মেইল পাঠিয়েছিলেন। ওই ই-মেইলের সতেরো নম্বর পাতার শেষ প্যারার কোড ভাঙতে পারলে তাঁর আবিষ্কৃত কিছু যন্ত্র বানাবার টাকা বাংলাদেশ পেয়ে যাবে, নিজের হাতে এ-কথা লিখে রেখে গেছেন তিনি।'

তৃষা হাঁ হয়ে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'তাহলে সব ফেলে ওই গুপ্তধনের পিছনে ছুটতে হয় আমাদের!'

'তার কোন দরকার নেই,' বলল রানা, হাসছে। 'বাংলাদেশের সরকারী সাইফার বিশেষজ্ঞরা ওই সতেরো নম্বর পাতার কোড ভাঙার চেষ্টা করছেন। টাকা বা গুপ্তধনের কোন সূত্র পাওয়া গেলে আমার বস্ আমাকে জানাতে দেরি করবেন না।'

'এখন তাহলে আমাদের কাজ কি?'

'আমার কাজ ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে ফ্যালকনের বিরুদ্ধে লবিং শুরু করা। ওখানে আমার বন্ধু-বান্ধব আছে, তাদের সাহায্যে চেষ্টা করব কংগ্রেসকে দিয়ে একটা কমিটি গঠন করাতে। ফ্যালকন আর তার মালিক লীফ হেরকুলের কীর্তিকলাপ তদন্ত করে দেখবে ওই কমিটি।'

'কিন্তু আমি? আমার কি হবে?'

তৃষাকে ধরে ধীরে ধীরে কাছে টেনে নিল রানা। কোন রকম বাধা না পাওয়ায় তার রাঙা ঠোঁট জোড়ায় একটা চুমো খেলো। 'তুমিও আমাদের সঙ্গে থাকছ। নিরাপত্তার কথা ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাকে একা কোথাও থাকতে দেয়া যাবে না। অন্তত যত দিন না এই সমস্যার সমাধান হয়।'

ল্যাংলি এয়ারফিল্ডে নুমা জেট ল্যান্ড করার পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বান্ধবী কংগ্রেস সদস্য মিস লরেলি ভ্যান্সকে দেখতে পেল রানা। পুরো নাম লরেলি ভ্যান্স থাপা। লরেলি কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যা, দেখতে ডানাকাটা পরী বললেই হয়। তার জন্ম নেপালে, বাবা নেপালি-আমেরিকান।

'হাই, দেয়ার, সেইলর!' সুন্দর ভুরু জোড়া নাচিয়ে, আবেগঘন রিনিঝিনি সুরে বলল লরেলি, রানার একটা হাত ধরে নিজের দিকে টানল, তবে প্লেনের দোরগোড়ায় তৃষাকে দেখে চুমো খাওয়ার ঝোঁকটা দমন করতে হলো তার। 'আমার পরদেশী বাবু এবার অনেক দিন পর ফিরেছে।'

প্লেন থেকে নামার সময় রানা ও লরেলিকে দেখেই তৃষা বুঝে নিল, ওদের

জিততে পারি ততদিন ফুটন্ত তেলে জানটা ভাজা ভাজা হতে থাকবে।'

'তাহলে তো তোমাকে বিড়ম্বনায় ফেলা আমাদের উচিত হচ্ছে না,' চেহারায় কাঁচুমাচু একটা ভাব ফুটিয়ে ম্লান সুরে বলল রানা। 'তুমি গাড়ি থামাও, লরেলি, আমরা বরং এখানেই নেমে যাই।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির স্পীড কমে এল, তারপর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল মার্সিডিজ। লরেলি শুকনো গলায় বলল, 'সত্যি আমি দুঃখিত, রানা।'

'হোয়াট ইজ দিস? কি ঘটছে এখানে?' রানা হতভম্ব। 'আমি তো স্রেফ কৌতুক করছিলাম, অথচ তুমি সত্যি সত্যি আমাদেরকে রাস্তার মাঝখানে নামিয়ে দিচ্ছ?'

'আউট!' লরেলির গলা তীক্ষ্ণ।

ভয়ে ভয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল তৃষা, সরাসরি মুরল্যান্ডের দিকে। চোখে প্রশ্ন, হঠাৎ কি হলো?

মুরল্যান্ড তাকে অভয় দিয়ে বলল, 'তুমি চুপচাপ বসে ওদের নাটক উপভোগ করো, তৃষা। কিছু না, ওরা স্রেফ খুনসুটি করছে। এ অতি পুরাতন ভাব, শুধু প্রকাশটা নতুন।'

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে লরেলি বলল, 'তোমার দ্বারা আমি বিড়ম্বিত হই বা হতে পারি, এই চিন্তা মাথায় কেন এল তার জবাব চাই আমি। বাড়িতে চলো, বোঝাপড়াটা সেখানেই হবে।'

'তৃষা আর মুরল্যান্ড সাক্ষী,' বলল রানা, 'এ-ধরনের কোন কথা আমি বলিনি।'

'বলেছ, বলেছ!' ওরা দু'জন প্রায় একইসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

'ষড়যন্ত্রটা টের পাচ্ছ, লরেলি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওরা দু'জন আমাদের সম্পর্কটায় চিড় ধরাতে চাইছে। তুমি ভেবে দেখতে পারো ওদেরকে নামিয়ে দেবে কিনা।'

শুরু করল লরেলি, যোগ দিল মুরল্যান্ড ও তৃষা, তারপর রানাও ওদের সঙ্গে হেসে উঠল।

লরেলির বাড়িতে গেস্ট রুমের কোন অভাব নেই, যে-যার কামরার উদ্দেশে রওনা হবার আগে রানা সবাইকে জানিয়ে দিল বিশ্রাম নেয়ার পর শাওয়ার সেরে তৈরি হতে কেউ যেন এক ঘণ্টার বেশি সময় না নেয়, কারণ ডিনারের জন্যে টেলিফোনে টেবিল রিজার্ভ করে রাখবে ও।

নিজের কামরায় ঢুকে প্রথমেই অ্যাডমিরাল হ্যামিল্টনকে ফোন করল রানা। তারপর শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল ক্যাজুয়াল স্ল্যাকস আর হাতে বোনা সুতি শার্ট পরল, শার্টের ওপর চড়াল লাইট ফ্যাবরিক স্পোর্ট কোট।

ঠিক এক ঘণ্টা পর গাঢ় সবুজ মার্সিডিজটায় আবার এসে বসল রানা, মুরল্যান্ডের সপ্রশংস দৃষ্টির জবাবে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। মুরল্যান্ড একই পরিচ্ছদ ব্যবহার করছে, শুধু সন্ধ্যাটা তার একটু বেশি গরম লাগায় কোটটা ঝুলিয়ে রেখেছে সীটে।

'সব ঠিক?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'অ্যাডমিরাল ছোট্ট একটা পার্টির ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সাবধানের মার নেই ভেবে।'

'তুমি সশস্ত্র?'

জ্যাকেট একটু সরাল রানা, ওয়ালথার সহ শোল্ডার হোলস্টার দেখা গেল ভেতরে। 'তুমি?'

শরীরটা বাঁকা করে বগলের নিচে, হাতের উল্টোপিঠে আটকানো ফরটি-ক্যালিবার অটোমেটিক দেখিয়ে দিল মুরল্যান্ড। 'আমরা বোধহয় একটু বেশি সতর্কতা অবলম্বন করছি।'

ধাপ বেয়ে গাড়ি বারান্দায় নেমে আসতে দেখা গেল লরেলিকে। সুতি মক টার্টেলনেক পরেছে, দু'পাশ চেরা; গাউনটা ঝুলন্ত নিভাঁজ পর্দার মত, নেমেছে প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত। সব মিলিয়ে দারুণ আকর্ষণীয় লাগছে তাকে। তৃষা এল গলায় জড়ানো প্রজাপতির বহুরঙা ডানার মত ওড়না উড়িয়ে, ফুলপ্যান্টের সঙ্গে পাঞ্জাবি পরেছে, পাঞ্জাবির ওপর এমব্রয়ডারি করা জ্যাকেট। অত্যন্ত তাজা আর প্রাণবন্ত লাগছে তাকে।

ওরা দু'জন সামনের সীটে বসতেই রানা বলল, 'টেলিগ্রাফ রোড ধরে ছোট্ট শহর রোজ হিল-এ, লরেলি। ওয়েলকাম ইন নামে ওখানে একটা রেস্তোরাঁ আছে। এলাকার সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য বজায় রাখে ওরা, পরিবেশন করে বাড়িতে রান্না করা ডিশ। শুনলাম অল্প একটু ঝালও দেয়।'

'আমার কাছে শোনো। দোপিঁয়াজি, সরষে ইলিশ, সালাদ আর দোলমায় ওরা ধনে আর পুদিনা পাতাও ব্যবহার করে।'

'আমার জিভে পানি,' প্রায় কাতরে উঠল তৃষা।

টুকটাক গল্প করতে করতে যাচ্ছে ওরা। কেউ কারও অতীত অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু বলছে না, এমন কি ফ্যালকন বা হেরকুল প্রসঙ্গও উঠল না। মেয়েরা আলাপ করছে বেড়াতে বেরিয়ে কোথায় যাওয়া হয়েছে বা হয়নি। রানা ও মুরল্যান্ড চুপচাপ বসে আছে, তবে সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওভারটেক করা যানবাহন আর সামনের রাস্তা। যে-কোন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি বা বিপদের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি ওরা।

গরমের দিনে সূর্য অনেক দেরি করে ডোবে, ওদের ডিনার খাবার পরও দিনের আলো ফুরাবে না। ওয়েলকাম ইন-এর পার্কিং লটে থামল মার্সিডিজ। রানার নির্দেশে গাড়ি থেকে নেমে তৃষাকে নিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে এগোচ্ছে লরেলি, গাড়ির চাবি রানার হাতে দিয়ে এসেছে।

রানা ও মুরল্যান্ড ওখানে দাঁড়িয়ে পার্কিং এরিয়ার চারদিকে চোখ বুলাল কিছুক্ষণ। সন্দেহ জাগে এমন কোন তৎপরতা চোখে পড়ল না।

রানা সামনে, মুরল্যান্ড পিছনে, এভাবে রেস্তোরাঁর ভেতর ঢুকল ওরা। সতেরোশো বাহাত্তর সালে স্টেজ কোচ শপ ছিল, সেটাকেই আধুনিক রেস্তোরাঁয় রূপান্তর করা হয়েছে। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল মেয়েরা। ডাকতে হলো না, পুরুষরা হাজির হয়েছে দেখে মেট্রো ডুটেল অর্থাৎ হেড ওয়েটার ছুটে এল। পথ দেখিয়ে ওদেরকে একটা উঠানে বের করে আনল সে, বসল বিশাল এক ওক

গাছের নিচে ফেলা সুন্দর একটা টেবিলে।

'আমরা যা অর্ডার দিতে যাচ্ছি,' বলল রানা, 'তার সঙ্গে ককটেল বা ওয়াইন, কিছুই চলে না।' আসলে নিজেরা তো খাবেই না, মুরল্যান্ড আর লরেলিকেও নেশা করতে দিতে চাইছে না ও। যদি কিছু ঘটেই, ওদের সাহায্য দরকার হবে ওর।

বসার পর অবশ্য রানা ও মুরল্যান্ড দু'জনেই শান্ত বোধ করছে। সময় বয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছন্দে। পাগল করা এমন সব কৌতুক শোনাচ্ছে মুরল্যান্ড, খানিক পরই দেখা গেল প্রবল হাসিতে পড়ে যাবার উপক্রম হওয়ায় যে যার চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরেছে। রানার ঠোঁটে ভদ্রতাসূচক মৃদু হাসি, প্রতিটি জোক অন্তত পঞ্চাশবার করে শুনেছে। উঠানের প্রতিটি পাঁচিল আর অন্যান্য ডাইনারদের টিভির সিকিউরিটি ক্যামেরার মত নিজের চোখ দিয়ে স্ক্যান করল ও–এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে। তবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কিছু দেখতে পেল না।

বারবিকিউ করা মাটন ও চিকেন, আধভাঙা যবের সঙ্গে শ্রিম্প আর কাঁকড়া, বাঁধাকপির সালাদ, সবশেষে ভেজিটেবল সুপ-এর অর্ডার দেয়া হলো, ডিনারের লাস্ট কোর্স অর্থাৎ ডিজার্ট হিসেবে কী লাইম পাই খাচ্ছে ওরা, এই সময় প্রথমবারের মত রানার পেশীতে টান পড়ল। লোকটার সব কিছু লাল, যেন মূর্তিমান একটা ডেঞ্জার সিগন্যাল। মুখ একটুও ভেজা নয় অথচ রক্তাক্ত দেখাচ্ছে, এতই লাল। চুলে মেহেদি লাগানো। তার দু'পাশে পাথুরে দেয়ালের মত চওড়া দুজন বডিগার্ড, নিজেরাই যেন সচল সাইনবোর্ড, তাতে লেখা 'সশস্ত্র খুনী।' মনিবকে সঙ্গে নিয়ে ওদের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে তারা দু'জন।

আগন্তুক দামী একটা সুট পরে আছে, রঙটা ব্রাউন, নাম করা কোন দর্জি কেটেছে। টাই লাল-সাদা ডোরা। ব্রিটেনে তৈরি জুতো জোড়া লালচে। কয়েকটা টেবিলের মাঝখান দিয়ে হেঁটে আসার সময় তার নীল-সাদা চোখের দৃষ্টি রানার ওপর গেঁথে গেল। লোকটার হাঁটার মধ্যে স্টাইল আছে, তবে তারচেয়ে বেশি আছে দম্ভ, ভাবটা যেন দুনিয়ার অর্ধেকটাই তার।

রানার মাথার ভেতর একটা অ্যালার্ম বেজে উঠল। জুতোর ডগা দিয়ে মুরল্যান্ডের উরুতে খোঁচা মারল ও। চমকে উঠল না, এমনকি একটু নড়লও না, তবে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক ও প্রস্তুত হয়ে গেল লম্বা-চওড়ায় প্রায় সমান ওর ইটালিয়ান বন্ধু।

আগন্তুক সোজা ওদের টেবিলের সামনে এসে থামল। ওখানে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে পালা করে প্রত্যেকের মুখ খুঁটিয়ে দেখছে সে। তার দৃষ্টি বার বার ফিরে এল রানার ওপর। 'আমাদের পরিচয় হয়নি, মিস্টার রানা, তবে আমার নাম লীফ গডফ্রে হেরকুল।'

ওদের মধ্যে একা শুধু লরেলি চেনে সিনেটর হেরকুলকে, বাকি সবাই শুধু নাম শুনেছে। লরেলির কোন প্রতিক্রিয়া নেই। সে হাসছে না, আবার গম্ভীরও নয়। তবে একটু ঠাণ্ডা ও ভাবলেশহীন। এই লোকের সঙ্গে তার একটা বিরোধ আছে, তবে সেটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়। আগের কমিটিতে লরেলি তাকে অপ্রীতিকর অনেক প্রশ্ন করেছিল, অপ্রাসঙ্গিক ও ব্যক্তিগত বলে সেগুলো এড়িয়ে গিয়েছিল হেরকুল। কিন্তু নতুন কমিটির চেয়ারপারসন হবার পর হেরকুলের বিরুদ্ধে তৈরি

করা সমস্ত ফাইল লরেলির হাতে চলে আসছে। তার ওপর, নুমার কাছ থেকে ওর অপরাধের আরও তথ্য-প্রমাণ পাবে সে। অর্থাৎ হেরকুল জানে তাকে লরেলির হাতে নাস্তানাবুদ হতে হবে।

কিংবদন্তীর সেই হিংস্র দানবটাকে রক্ত মাংসের রূপ নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একেকজনের একেকরকম প্রতিক্রিয়া হলো। জোরে শ্বাস টেনে সেটা আটকে রাখল তৃষা, চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। মুরল্যান্ড ভাল করে তার দিকে তাকালই না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে দুই বডিগার্ডের প্রতিটি নড়াচড়া। পেটের ভেতরটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগলেও, চোখে পরখ করার ধারাল দৃষ্টি ধরে রাখল রানা। যে লোক বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতায় মজা পায়, তাকে দেখে অসুস্থবোধ করাটাই স্বাভাবিক। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াবার কোন লক্ষণই রানার মধ্যে দেখা গেল না।

মেয়েদের উদ্দেশে কথা বলবার সময় খানদানী ঢঙে প্রায় কুর্নিশ করল সে। 'মিস তৃষা ইসলাম, কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলি, এখানে তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা আমার জন্যে একটা আনন্দময় অভিজ্ঞতা।' আবার সে রানা ও মুরল্যান্ডের দিকে ফিরল। 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমরা চরম গোয়ার্তুমি করেছ। তোমাদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ আমার কোম্পানিকে নিদারুণ হতাশায় ভুগিয়েছে।'

'তুমি নির্লজ্জ লোভী এক সোশিওপ্যাথ, তোমার এই পরিচয়টাই সবার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ছে, এ খবর রাখো কি?' তিক্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল রানা।

দু'জন বডিগার্ড একযোগে সামনে বাড়ল, তবে ইঙ্গিতে তাদেরকে পিছু হটতে বলল হেরকুল। 'আমি আশা করেছিলাম, সবাই লাভবান হব এমন একটা সমঝোতার ভিত্তিতে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পাওয়া যাবে,' বলল সে, চোখে মুখে রাগ বা শত্রুতার চিহ্নমাত্র নেই।

এরকম বিপজ্জনক লোক খুব কম দেখা যায়, ভাবল রানা। স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে অপমান গায়ে মাখে না। সাপ বা কেঁচোর মত পিচ্ছিল। 'আমাদের অভিন্ন কোন স্বার্থ আমি অন্তত দেখছি না। তুমি টাকা কামাবার জন্যে মানুষ মারো। মহিলা ও শিশুদের খুন করতেও তোমার হাত কাঁপে না। তোমার সঙ্গে আবার আমাদের আলাপ কি? যদি ভেবে থাকো আমাদেরকে কিনে নিয়ে একের পর এক অপরাধ করে যাবে, ভুলে যাও।'

'তা যাতে না ঘটে, আমরা সেটাই দেখব,' বলল লরেলি।

'আমরা যে ওকে বাঁশ দেয়ার তালে আছি, ও জানে না,' বডিগার্ডদের উদ্দেশে হাসিমুখে বলল মুরল্যান্ড—সে যেন ওদের বন্ধু, আর হেরকুল এখানে অনুপস্থিত। 'তবে তার আগে বাঁশে তেল মাখিয়ে নেব।'

'আচ্ছা এমন কি হতে পারে যে আমার ক্ষমতা সম্পর্কে তোমরা পুরোপুরি অবহিত নও?' রানার সঙ্গেই কথা বলছে হেরকুল, ভান করল মুরল্যান্ড আর লরেলির কথা শুনতে পায়নি।

'নিজেকে যদি তুমি আমেরিকান অপরাধ প্রবণতার দৃষ্টান্ত বলে মনে করো, তাহলে কারও কিছু বলবার নেই,' বলল লরেলি। 'কিন্তু মনে রেখো, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করলে প্রেসিডেন্টকেও ছাড়া হবে না, তুমি তো কোন ছার।

কংগ্রেসের ওই কমিটিই তোমার প্রতিটি ক্ষতিকর প্ল্যানে বাদ সাধতে যাচ্ছে, দেখে নিয়ো তুমি। কাল সকালেই ওয়াটার লিলি আর এমারেল্ড মার্লিন স্যাবটাজে তোমার ভূমিকা সম্পর্কে তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেব আমি।'

হাসি হাসি মুখ করে লরেলির দিকে তাকাল হেরকুল। 'তুমি কি মনে করো সেটা উচিত হবে? আমার মনে হয় ঝোঁকের বশে আবোলতাবোল বকছ। মুড়ি মুড়কি এক দর করে ফেলো না। আমার ব্যাপারটা একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখতে হবে, কারণ আমি জানি যে-কোন রাজনীতিকের ক্যারিয়ার কলংক ছড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়া যায়, বিশেষ করে সে যদি মেয়ে হয়। তাছাড়া, অ্যাক্সিডেন্ট তো আছেই।'

ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল লরেলি, পিছন দিকে উড়ে গেল চেয়ারটা। 'তুমি আমাকে হুমকি দিচ্ছ!' রাগে হিস হিস করে উঠল সে।

হেরকুল পিছাবে না, হাসিটাও ধরে রাখল মুখে। 'দূর, না, কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলি–আমি তো শুধু বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা তুলে ধরছি। তোমরা যদি ফ্যালকনকে ধ্বংস করার জন্যে যুদ্ধে নামো, তাহলে তো তার পরিণতির জন্যেও তৈরি থাকতে হবে, তাই না?'

খেপে গিয়ে লরেলি আরও কিছু বলতে যাবে, তার হাত ধরে মৃদু চাপ দিল রানা। ইতোমধ্যে চেয়ারটা তুলে দিয়ে গেছে একজন ওয়েটার। সেটায় বসে লরেলি থুথু ছিটাবার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল, 'তুমি একটা উন্মাদ।'

'আসলে ঠিক উল্টোটা, পুরোপুরি সুস্থ আমি। সব সময়, প্রতি মুহূর্তে জানি কোথায় আমার অবস্থান। বিশ্বাস করো, মিস লরেলি, ওরকম দু'চারটে কমিটিকে আমি কোন পাত্তাই দিই না। ক্যাপিটল-এ প্রায় সবাই আমার বন্ধু। যারা এখনও বন্ধু নয় তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে মাত্র ঘণ্টা কয়েক সময় লাগবে আমার।'

'জানি, ঘুষ আর ব্ল্যাকমেইল তোমার অস্ত্র,' মন্তব্য করল রানা।

লরেলির দু'চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে যেন। 'হ্যাঁ। কিন্তু যখন জানা যাবে কাদেরকে ঘুষ দিয়েছ, কি ছিল তার পরিমাণ, এক হাজার এক ধরনের ক্রিমিনাল চার্জের মুখোমুখি হতে হবে তোমাকে।'

শান্তশিষ্ট হেরকুল ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'আমি তা মনে করি না।'

'হেরকুলের সঙ্গে আমি একমত,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'কাঠগড়ায় কোনদিন-ই তাকে দাঁড়াতে হবে না।'

'যতটা ভেবেছিলাম তুমি দেখছি তারচেয়ে অনেক বেশি খবর রাখো,' বলল হেরকুল।

'না,' রানা নিজের কথার জের টেনে বলে যাচ্ছে, ঠোঁটে ক্ষীণ বিদ্রূপাত্মক হাসি, 'আদালতে তোমার কোন অপরাধের বিচার হবে না। কারণ প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া চলে যে তার আগেই তুমি মারা যাবে। বিশ্বাস করো, হেরকুল, তোমার মরাটা অত্যন্ত জরুরী একটা প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। তোমার আর তোমার ভাড়াটে কোবরাদের।'

'তুমি দেখছি অনেক গোপন খবরও রাখো!'

'তোমার বিচার হবে না, এ-কথা সত্যি, হেরকুল। কিন্তু যারা আইনের

বাইরে থেকে কাজ করে তাদের কাছে তুমি খুব কঠিন কোন টার্গেট নও। তোমার কোবরার চেয়েও ভয়ংকর, একটা গ্রুপ গঠন করা হয়েছে–তাদের কাজ তোমার ব্যবস্থা করা। এখন থেকে তোমাকেই কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাতে হবে।'

'নিজের অবস্থা সম্পর্কে জানার সুযোগ হলো, সেজন্যে আমি খুশি,' বলল হেরকুল। 'আমি চলে যাচ্ছি, তবে আমার বন্ধুরা এখানে থাকবে।'

'ও কি বলতে চাইছে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল তৃষা।

'বলতে চাইছে, লিমুজিন নিয়ে হাইওয়ের পাশের কোন রেস্তোরাঁয় চলে গেলে নিশ্ছিদ্র একটা অ্যালিবাই তৈরি হবে ওর, তখন ওর বডিগার্ডরা আমাদেরকে গুলি করে কেটে পড়বে।'

'এখানে? এত সব লোকের সামনে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড। 'তা-ও কোন মুখোশ না পরে? ধ্যাত্, তোমার নাটুকেপনার একটা সীমা থাকা দরকার।'

হেরকুলের যেন নতুন করে চোখ খুলছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, তার জীবনে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। কিন্তু এই লোকগুলো তার প্রত্যাশা অনুসারে আচরণ করছে না। এরা দেখা যাচ্ছে মৃত্যুকে ভয় পায় না।

'শত্রুর চেহারা আমাদের দেখা হয়ে গেছে,' বলল রানা, আগের মতই শান্ত। 'এখন সে মাথা হেঁট করে চলে যেতে পারে, বিশেষ করে এখনও যখন হাঁটার মত দুটো পা তার আছে। একটু পরে হয়তো দেরি হয়ে যাবে।'

'তুমি বলতে চাইছ পা দুটো ওর বডিগার্ডদের বহন করতে হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

তার কথার জবাব না দিয়ে রানা বলে যাচ্ছে, 'সে যদি তৃষা বা এই টেবিলের অন্য কাউকে গুলি করার কথা ভেবে থাকে, আমি ভুলে যেতে বলছি।'

সারা শরীর রাগে জ্বলে গেলেও বাইরের চেহারা একদম শান্ত রাখল হেরকুল। 'যদিও তোমাদের হস্তক্ষেপ আমার পছন্দ হয়নি, তবু মিস্টার মুরল্যান্ড আর তোমাকে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সমীহ করতে ইচ্ছে হয়েছে আমার। কিন্তু এখন দেখছি দু'জনেই তোমরা গর্দভ।'

'ও ঠিক কি বলতে চাইছে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড। 'বলছে, আমি ওর নিতম্বে কষে একটা লাথি মারলে ও খুশি হয়?'

হেরকুলের এ বিশ্বাস হলো না। হঠাৎ তার চোখ সাপের চোখ হয়ে গেল। মাথা ঘুরিয়ে অন্যান্য টেবিলের ডাইনারদের দিকে তাকাল সে। উঠানের এক কোণে ফেলা টেবিলের দিকে বা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন লোকের প্রতি কারও কোন মনোযোগ নেই। হেরকুল মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের বডিগার্ডদের নির্দেশ দিল, তারপর ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। 'গুড-বাই, লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন। খুবই দুঃখজনক যে তোমাদের ভবিষ্যৎ এত ছোট।'

'পালাবার আগে একটা কথা,' পিছন থেকে তাড়াতাড়ি বলল রানা, 'সঙ্গীদের সঙ্গে করে নিয়ে যাও, তা না হলে ওরা অ্যামবুলেন্স করে পৌঁছে দিতে বলবে।'

ঘুরে রানার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল হেরকুল। তার লোক দু'জন এক পা করে সামনে বেড়ে কোটের ভেতর হাত গলাচ্ছে। যেন রিহার্সেল দেয়া আছে, রানা

ও মুরল্যান্ড একযোগে টেবিলের তলা থেকে নিজেদের অস্ত্র দুটো বের করল। ওগুলো ওদের কোলের ওপর পড়ে ছিল, ন্যাপকিনের নিচে।

'গুড-বাই, ব্রাদার হেরকুল,' নিচু গলায় বলল মুরল্যান্ড, মুখে টান টান হাসি। 'পরের বার...' বাকিটা বাতাসে মিলিয়ে গেল।

আততায়ী দু'জন চোখে অস্বস্তি নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। তাদের খুব করার প্ল্যানটা এরকম ছিল না। বলা হয়েছিল প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকবে। কিন্তু ঘটছে ঠিক উল্টোটা। যে-কোন বোকাও এখন বুঝতে পারবে যে তারা যদি অস্ত্র বের করতে যায়, এখানেই লাশ হয়ে পড়ে থাকতে হবে।

'তোমাদের গর্দভ বলবার জন্যে আমি ক্ষমা চাই,' বলল হেরকুল, হাত দুটো দু'পাশে মেলে কাঁধ ঝাঁকাল। 'দেখা যাচ্ছে যন্ত্রপাতি নিয়ে একেবারে তৈরি হয়েই এসেছ।'

'আমরা বয়স্কাউটে ছিলাম,' বলল রানা। 'তৈরি থাকাটা আমাদের অভ্যাস।' চেয়ারে ঘুরে বসে হেরকুলের দিকে পিছন ফিরল ও, হাতের ফর্ক ডোবাল নিজের কী লাইম পাই-তে। 'আশা করি আবার যখন আমাদের দেখা হবে, তোমাকে আমি টেবিলে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পাব–প্রাণঘাতী ইঞ্জেকশন দেয়া হচ্ছে।'

'পরে আবার বোলো না যে সাবধান করা হয়নি!' রাগে কাঁপছে হেরকুল, সেটা আড়াল করার জন্যেই দ্রুত ঘুরে হাঁটা ধরল।

উঠান পেরিয়ে, রেস্তোরাঁর ভেতর দিয়ে পার্কিং লটে চলে এল হেরকুল। একটা কালো মার্সিডিজ লিমুজিনে উঠল সে। তার ভাড়াটে দুই হাতিয়ার কয়েকটা গাড়িকে পাশ কাটিয়ে এসে চড়ে বসল একটা লিংকন নেভিগেটরে। শুরু হলো তাদের অপেক্ষার পালা।

ঝুঁকে রানার হাত স্পর্শ করল লরেলি। 'তুমি এত শান্ত থাকো কি করে? ওর কথা শুনে আমার গায়ের চামড়া কুঁকড়ে যাচ্ছিল।'

'এই লোক বদ্ধ একটা উন্মাদ,' ফিসফিস করে বলল তৃষা, চোখে ভয়।

'কোন প্রয়োজন পড়েনি অথচ নিজের চেহারাটা আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে গেল হেরকুল,' বলল রানা। 'কেন?'

উঠানে ঢোকার পথটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে লরেলি; সে যেন আশা করবে হেরকুলের লোক দু'জন আবার ফিরে আসবে। 'জটিল প্রশ্ন। সে যে পজিশনের লোক, তার তো তোমাদের সঙ্গে বসতে চাওয়ার কোন দরকার পড়ে না।'

'হয়তো স্রেফ কৌতূহলবশত এসেছিল,' বলল মুরল্যান্ড। 'নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিল কারা তার প্ল্যানগুলো একের পর এক নষ্ট করে দিচ্ছে।'

'কী লাইম পাই দারুণ মজা,' প্রশংসা করল রানা।

'আমার গলা দিয়ে এখন আর কিছু নামবে না,' বিড় বিড় করল তৃষা।

'ভাল খাবার ফেলে রাখতে নেই,' বলে তৃষার কী লাইম পাই টেনে নিল মুরল্যান্ড।

কফি শেষ করার পর বিল মেটাল রানা। এরপর একটা চেয়ারে দাঁড়িয়ে, পাঁচিলের ওপর দিয়ে পার্কিং লটে উঁকি মারল মুরল্যান্ড, মাথাটা আইভি লতার আড়ালে

থাকল। 'দুই ভাড়াটে সৈনিক প্রকাণ্ড একটা লিংকন নেভিগেটরে বসে রয়েছে।'

'আমাদের পুলিস ডাকা উচিত।' লরেলি রেগে উঠল।

রানার মুক্তো ঝরানো হাসিতে কোন শব্দ নেই। 'কি করতে হবে তা আগেই ঠিক করা আছে।' কোটের পকেট থেকে একটা সেল ফোন বের করে কয়েকটা বোতামে চাপ দিল ও, মাত্র চারটে শব্দ উচ্চারণ করে অফ করল সেটা। লরেলি ও তৃষার দিকে ফিরে হাসল একটু। 'তোমরা মেয়েরা বেরুবার মুখে অপেক্ষা করবে, মুরল্যান্ড যাবে গাড়ি আনতে।'

রানার আঙুল থেকে প্রায় ছোঁ দিয়ে রিঙসহ গাড়ির চাবিটা কেড়ে নিল লরেলি। 'মুরল্যান্ড উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মুখে পড়ে যেতে পারে। গাড়িটা আমার আনতে যাওয়াই উচিত হবে। অসহায় একটা মেয়েকে ওরা গুলি করবে না।'

প্রতিবাদ করতে গিয়ে রানা ভাবল, লরেলির কথায় যুক্তি আছে। হেরকুলের লোকগুলো খুনী বটে, তবে গ্রাম্য গবেট নয়। একা একটা মেয়েকে গুলি করবে না, সাইটে তারা চারজনকেই পেতে চাইবে। মাথা ঝাঁকাল ও। 'ঠিক আছে, কিন্তু গাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে মাথা নিচু করে এগোবে। আমাদের গাড়ির ঠিক উল্টোদিকের প্রান্তে রয়েছে ওরা। তুমি ইগনিশন কী ঘোরাবার আগে নেভিগেটর রওনা হলে আমরা এক ছুটে পৌঁছে যাব।'

রানা ও লরেলি একসঙ্গে অনেকবার দৌড়েছে। রানা যদি চিতার মত ক্ষিপ্র হয় তো লরেলির পায়ে আছে হরিণের মত দ্রুতগতি। একশো গজের স্প্রিন্টে দু'ফিটের বেশি ব্যবধানে রানা কখনও তাকে হারাতে পারেনি। মাথা নিচু করে ছুটল সে, কালো অন্ধকারে আরও কালো একটা ছায়ার মত, সবুজ মার্সিডিজের কাছে পৌঁছে গেল এক মিনিটেরও কম সময়ে। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে স্টার্ট দিল এঞ্জিন, অ্যাকসেলারেটারে একটু বেশি চাপ দেয়া হয়ে গেল, ছড়ানো কাঁকরের ওপর টায়ারগুলো ঘোরাচ্ছে। খানিক দূর হড়কে এসে রেস্তোরাঁর সামনে থামল মার্সিডিজ, লরেলি ছিটকে চলে এল প্যাসেঞ্জার সাইডের সীটে; ওই একই সময় বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকল রানা, তৃষা আর মুরল্যান্ডকে পিছনে নিয়ে।

পেডাল মেঝের সঙ্গে চেপে ধরল রানা। মৃদু একটা ঝাঁকি দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে দ্রুতবেগে ছুটল মার্সিডিজ। দেখতে দেখতে ফাঁকা রাস্তায় স্পীড উঠল ঘণ্টায় আশি মাইল।

রাস্তাটা সরল। রেস্তোরাঁ থেকে ওরা বেরুবার পরপরই প্রকাণ্ড নেভিগেটর পিছু নিয়েছে, কালো পেইন্ট এইমাত্র জ্বলে ওঠা লাইটপোস্টের আলোয় চকচক করছে। অন্ধকার রাস্তায় এখন শুধু ওই চকচকে ভাবটাই দেখতে পাচ্ছে রানা। হেডলাইট নিভিয়ে দ্রুত কাছে চলে আসছে নেভিগেটর।

রাস্তা প্রায় ফাঁকা, উল্টোদিকে মাত্র দুটো গাড়িকে যেতে দেখল ওরা। ঠিক কাঁধের পাশে ঘন ঝোপ আর গাছপালা কালো ও অশুভ লাগছে। আতংকে পাগল না হলে গাড়ি থামিয়ে ওখানে কেউ লুকাবার কথা ভাববে না। এক কি দু'বার চোখ ঘুরিয়ে লরেলিকে দেখল রানা। ড্যাশবোর্ডের আলো লাগায় তার চোখ দুটো মনে

হলো দ্যুতি ছড়িয়ে জ্বলছে, ঠোঁট দুটো ভারি সুন্দর বঙ্কিম একটা রেখা তৈরি করে হাসির নিঃশব্দ ঝর্ণা হয়ে উঠেছে। এই ধাওয়ার রোমাঞ্চ ও বিপদ, দুটোই উপভোগ করছে সে। রানার সঙ্গে এখানেই তার সবচেয়ে বড় মিল। রাজনীতিতে আছে, একজন কর্তব্যপরায়ণ নারী, অথচ মনে-প্রাণে নির্ভেজাল অ্যাডভেঞ্চারার। শুধু প্রকৃতির সঙ্গে নয়, প্রয়োজনে সমাজ আর মানুষের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।

নেভিগেটর দ্রুত কাছে চলে আসছে। রেস্তোরাঁ থেকে সাত মাইল এগিয়েছে ওরা, মার্সিডিজের একশো গজ পিছনে চলে এসেছে শত্রুরা। নেভিগেটর প্রায় অদৃশ্যই বলা যায়, শুধু উল্টোদিক থেকে আসা গাড়ির আলোয় মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে–ওগুলোর হেডলাইট ঘন ঘন জ্বলে-নিভে ড্রাইভারকে সতর্ক করে বলতে চাইছে আলো না জ্বেলে গাড়ি চালাচ্ছ তুমি।

'সবাই মেঝেতে নেমে যাও,' বলল রানা। 'এখন যে-কোন মুহূর্তে পাশে চলে আসবে ওরা।'

মেয়েরা নেমে গেল মেঝেতে। মুরল্যান্ড শুধু মাথা নিচু করল, তার অটোমেটিক রিয়ার উইন্ডোর কিনারা ছুঁয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল, লক্ষ্যস্থির করল এগিয়ে আসা নেভিগেটরের দিকে। সামনে একটা বাঁক, তাসত্ত্বেও স্পীড আরও বাড়িয়ে দিল রানা। গতি বাড়ল নেভিগেটরেরও, ড্রাইভারের খেয়াল নেই উল্টোদিক থেকে আসা গাড়ির পথ আটকে নিজেদের বিপদ ডেকে আনছে, কিংবা হয়তো স্রেফ গ্রাহ্য করছে না। ত্রিশ সেকেন্ড পর বাঁক নিতে শুরু করল রানা। টায়ারগুলো প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল, রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে হড়কাল কিছুটা।

বাঁক ঘোরার পর সরল রাস্তায় পৌঁছেই আয়নায় চোখ রেখে পিছন দিকে তাকাল রানা, দেখল একজোড়া বিরাট শেভি অ্যাভালাঞ্চ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল সরাসরি দ্রুতগতি নেভিগেটরের সামনে। অ্যাভালাঞ্চ দুটোর এরকম প্রায় ভৌতিক বা অলৌকিক আবির্ভাব, ওগুলোর কার্গো বক্সে ফিট করা মেশিন গান, মেশিন গানের পিছনে হেলমেট পরা গোলন্দাজ, সবই অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক।

জান বাঁচানো ফরজ, বন বন করে হুইল ঘরিয়ে নেভিগেটরের ড্রাইভার ব্রেকেও চাপ দিল। একবার হড়কাতে শুরু করায় আর কে থামায় ওটাকে। রাস্তার পাশে ঘাস মোড়া উঁচু মাটিতে লেগে শূন্যে উঠল গাড়ি, নিচে পড়ার পর তিনটে ডিগবাজি খেলো, ধুলো আর পাতার মেঘ সৃষ্টি করে হারিয়ে গেল ঘন ঝোপের আড়ালে। পরনে কমব্যাট ক্যামাফ্লাজ লাইট গিয়ার, অ্যাভালাঞ্চ দুটো থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল সশস্ত্র লোকজন, ছুটে এসে উল্টে থাকা নেভিগেটরকে ঘিরে ফেলল।

স্পীড কমিয়ে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলে নামিয়ে আনল রানা। 'রিল্যাক্স,' বলল ও। 'বিপদ কেটে গেছে।'

'ঘটলটা কি?' জানতে চাইল লরেলি, পিছনের জানালা দিয়ে অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ফোনে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তারা হেরকুলের ভাড়াটে সৈনিকদের মনোরঞ্জনের আয়োজন করেছে।'

'ঠিক হয়েছে,' মন্তব্য করল তৃষা। 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর!'

তার বলার ভঙ্গিতে হেসে উঠল সবাই।

লরেলি বলল, 'অ্যাডমিরালের সঙ্গে কথা বলব আমি, রানা। নেভিগেটরে যারা আছে তাদেরকে আমার সাক্ষী হিসেবে দরকার হতে পারে।'

'তোমার আগেই অ্যাডমিরালকে এ বিষয়ে যা বলবার বলে রেখেছি আমি,' জানাল রানা। 'ওদেরকে পুলিসের বিশেষ হেফাজতে রাখা হবে।'

নয়

দামী ফোর-হুইল-ড্রাইভ জীপ আর রোলসরয়েসে চড়ে এল ওরা। প্রাইভেট রোড ধরে একটা মোটর শোভাযাত্রার মত পৌঁছাল টোহোনো লেকের ধারে গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি বাড়িটার সামনে। বোতাম টিপে ইলেকট্রনিক লক খোলা হলো। মেইন হল রুমটা বিখ্যাত সব মার্কিন শিল্পীদের আঁকা ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে, ভেতরে এত জায়গা যে তিন সেট সোফা আর এক ডজন আরাম কেদারা ফেলার পরও প্রচুর জায়গা খালি পড়ে আছে। কিন্তু এখানে তারা থামল না। সবাই নেমে এল বাড়ির নিচে বড়সড় বেইযমেন্ট রুমে। এস্কেপ টানেল আর এই বেইযমেন্ট রুমকে আলাদা করে রেখেছে পাঁচ টন ওজনের প্রকাণ্ড ইস্পাতের দরজা। টানেলটা দুশো গজ লম্বা, অপর মুখটা জঙ্গলের ভেতর আড়ালে। সেখান থেকে আধ মাইল হেঁটে খোলা মাঠে পৌঁছানো যায়, প্রয়োজনে ওখানে মুহূর্তের নোটিশে হেলিকপ্টার আনানো সম্ভব। সারা বছর বিনা পাহারায় পড়ে থাকে, বাড়ির ভেতর কাজ করে শুধু লুকানো ভিডিও ক্যামেরা। চোর ঢুকলে তার ছবি পৌঁছে যাবে কোবরা ক্লাবে, তারপর তাকে খুঁজে বের করে অপরাধের চেয়ে শতগুণ বেশি শাস্তির ব্যবস্থা করা স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র। আজকের দিনটা অবশ্য একটা বিশেষ দিন, তাই খুব কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাস্তায় সশস্ত্র পাহারা বসেছে, জঙ্গলে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে কোবরা ক্লাবের সদস্যরা।

গোল একটা কনফারেন্স টেবিলে ছ'জন পুরুষ আর দু'জন মহিলা বসল। নবম ব্যক্তি, লীফ গডফ্রে হেরকুল, বসল সবার শেষে। তার আগে সবাইকে একটা করে লেদার মোড়া ফোল্ডার দিল সে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকল, সবার পড়া শেষ হবার অপেক্ষায় আছে। 'সব মুখস্থ করে নিতে হবে। কাল এখান থেকে যাবার আগে সমস্ত কাগজ-পত্র নষ্ট করে ফেলব আমরা।'

ফ্যালকন সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্যে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে এই স্ট্র্যাটিজি প্ল্যানিং সেশন যেন সম্ভাব্য কঠিনতম গোপনীয়তার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। টেবিলটার চারধারে যে-সব পুরুষ ও মহিলারা বসে আছে তারা উত্তর গোলার্ধের বৃহত্তম সব তেল কোম্পানির সিইও–চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার–এবং এখানে মিলিত হয়েছে আগামী কয়েক মাসের জন্যে ব্যবসায়িক কৌশলের ছক তৈরি সবার উদ্দেশ্য নিয়ে। অর্থনীতিবিদ, কমার্স ডিপার্টমেন্টের অফিসার আর ওয়াল

স্ট্রীট জার্নাল-এর রিপোর্টাররা জানে এই তেল কোম্পানিগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু আসল ঘটনা জানে শুধু এখানে আজ যারা উপস্থিত হয়েছে–লোকচক্ষুর অন্তরালে সবাই তারা লীফ হেরকুল আর তার ফ্যালকন করপরেশনের লম্বা বাহুর সঙ্গে বাঁধা। মূল কথা হলো, ব্যবসা করতে হবে একচেটিয়া। আর তা করতে হলে হেরকুলের নেতৃত্বে একটা কর্টেল গঠন করা জরুরী। প্রস্তাবটা তারই ছিল। লাভের অঙ্ক এত বড়, কল্পনাকেও যেন হার মানাতে চায়, কাজেই এই ক'জন রাজি হয়। তারপর থেকে চলছে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দেয়ার কাজ। একটা কোম্পানিকে কতভাবে ডোবানো যায়, এদের চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। ফ্যালকনের সঙ্গে জোট বেঁধে এই অয়েল টাইকুনরা বেআইনী বা অবৈধ উপায়ে ব্যবসা করে একেকজন কয়েক বিলিয়ন ডলার কামিয়েছে, অথচ ক্রিমিনাল বিজনেস ডিলিং-এর অভিযোগে কারুরই জেলে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। ওরা বিপদে পড়তে পারে শুধু একভাবে, নিজেদের কেউ একজন যদি জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে কার্টেলের দুষ্কর্ম সম্পর্কে অবহিত করে এবং তথ্য-প্রমাণ যোগান দেয়। কিন্তু যে লোক জোট ত্যাগ করবে তাকে শুধু নীতি আর নিজের কথা ভাবলে চলবে না, নিজের স্ত্রী-সন্তান ও আপনজনদের কথাও ভাবতে হবে। তারা একের পর এক দ্রুত নিখোঁজ হয়ে যাবে। কেউ কেউ হবে মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার। এ-সব পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারপর আর কার সাহস হবে বিদ্রোহ করবার? না, একবার যেহেতু নাম লেখানো হয়ে গেছে, এই দুষ্টচক্র থেকে বেরুবার আর কোন উপায় খোলা নেই।

'সংক্ষেপে ব্যাপারটা হলো, কার্টেল সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে,' সবার পড়া শেষ হতে শুরু করল হেরকুল, 'যেহেতু বুশ প্রশাসন ইরাকে হামলা চালাবেই, এই সুযোগে আমরা তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নেব। কথাতেই আছে, যুদ্ধে সব চলে। যেহেতু সবাই আমাদের সঙ্গে একমত হয়ে তেলের দাম বাড়াতে রাজি হবে না, সেইহেতু বাধ্য হয়ে ওদের রিফাইনারিতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে, মাঝসাগরে ডুবিয়ে দেয়া হবে ক্রুড অয়েল ভর্তি সুপারট্যাংকার।'

সাবেক আর্মি জেনারেল, সাপ্লাই সোর্স কোম্পানির প্রধান, ওয়েদারম্যান বলল, 'ইরাক যুদ্ধ থেকে আরও কোনভাবে আমরা লাভবান হতে পারি কিনা, সেটাও ভেবে দেখতে হবে।'

'খুব ভাল করে ভেবে দেখা হয়েছে,' জবাব দিল হেরকুল। 'কিন্তু ইরাকের তেলে যে-ই হাত দিতে যাক, তার হাত পুড়ে যাবে। প্রশাসনের যারা মাথা তারা প্রায় সবাই হয় ব্যবসায়ী, নয়তো বড় কোন কোম্পানির উপদেষ্টা। যুদ্ধটা বাধানোই হচ্ছে নিজেদের পকেট আরও ভারী করার জন্যে। ওখানে নাক গলাতে গেলে শুধু নাক কাটা যাবে না, মাথাও কাটা পড়বে।'

'তাহলে এটা মেনে নিতে হচ্ছে যে আমরাও কাউকে ভয় পাই?' জানতে চাইল টেক্সাসের তেল সম্রাট মাইকেল রক মুলার।

'আমরা জিতি। আমরা বিজয়ী হই,' হেরকুলের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে কার্টেল-এর চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চেরি অ্যান বলল। 'ব্যবসাতে লাভ করাটাই মুখ্য বিষয়, আমরা লাভ করি।'

হেসে উঠে হেরকুল বলল, 'কিন্তু তুমি শুধু আবেগময় বক্তৃতা দিলে তো চলবে না। তথ্য প্রমাণ সহ এমন কিছু দেখাও যাতে আমরা বুঝতে পারি যে সত্যি আমাদের ব্যাংকে কিছু জমবে।'

চেরি অ্যান একটা রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ দিল। ওপর থেকে নিচে নামল একটা বড়সড় মনিটর। তাতে ফুটে উঠল আলাস্কা ও কানাডা সহ যুক্তরাষ্ট্রের আটচল্লিশটা রাজ্যের ম্যাপ। দেশ ও দেশের সীমানা ছাড়িয়ে এক ঝাঁক কালো রেখা তেলখনি থেকে রিফাইনারি, রিফাইনারি থেকে বড় শহর পর্যন্ত বিস্তৃত।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন, এই হলো আমাদের অয়েল ট্র্যান্সপোর্টেশন সিস্টেম,' বলল হেরকুল। 'সাঁইত্রিশ হাজার মাইল আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপলাইন। শেষ লাইনটা নাথানস করবেটের নেব্রাস্কা, ক্যানসাস আর ডাকোটার তেলখনিকে ছুঁয়ে আসতে সময় লাগবে খুব বেশি হলে এক মাস।'

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে পপুলার অয়েল কোম্পানির মালিক নাথান করবেট। 'সব মিলিয়ে এই সতেরোটা তেলখনি আমরা কিনেছিলাম কূপ খুঁড়ে কোন তেল পাওয়া যায়নি, এই রিপোর্ট পাবার পর। এক্সপার্টদের আমরা খুশি করে দিয়েছিলাম, কাজেই উল্টো রিপোর্ট দিয়েছে তারা। কূপ ও এলাকা পরিত্যক্ত ঘোষণার পর ওগুলো নামমাত্র মূল্যে নব্বুই বছরের জন্যে লীজ নিই আমরা। তেল নেই বলার পর তেল পাওয়া গেলে হৈ-চৈ পড়ে যাবে, তদন্ত শুরু হবে, কাজেই এই ঝামেলার মধ্যে আমরা গেলামই না। মিস্টার হেরকুলের বুদ্ধি ধার করে আপনারা যা করেছেন, আমরাও তাই করেছি–আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপলাইন তৈরি করে ফ্যালকনের মেইন পাইপ লাইনের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দিয়েছি।'

কানাডার সবচেয়ে বড় তেলখনি আলাস্কান অয়েল-এর মালিক ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া চেয়ারে নড়েচড়ে বসে হেরকুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'সহজ হিসাবটা হলো, খনি থেকে যত বেশি তেল তোলা হবে দাম ততই পড়ে যাবে। অথচ আমার ধারণা হয়েছে, দাম আমরা বাড়াতে চাইছি। ব্যাপারটা পরস্পর বিরোধী হয়ে যাচ্ছে না?' পাঁচ বছর আগে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সবার শেষে গোপন কার্টেলে ঢুকেছিলেন তিনি, এখন মনে মনে পস্তাচ্ছেন।

'যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে আরেকটা অয়েল কার্টেল মাথাচাড়া দিতে যাচ্ছে,' জবাব দিল হেরকুল, 'সেটা আমরা হতে দিতে পারি না। ওটাকে ধ্বংস করার জন্যে আমরা আমাদের দেশীয় উৎপাদন পাঁচশো গুণ পর্যন্ত বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দাম কমবে? কিভাবে? মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর নির্ভর করে টিকে আছে উত্তর আমেরিকা, সেই তেলই তো মহাদেশের কোন বন্দরে পৌঁছাবে না।'

'মানে?'

'আমি কি স্যাবটাজের কথা বলার সময় উল্লেখ করিনি যে মাঝ সাগরে ক্রুড অয়েল ভর্তি সুপারট্যাংকার ডুবিয়ে দেয়া হবে?' নাটকীয় ভঙ্গিতে পাল্টা প্রশ্ন করল হেরকুল।

সবাই বিস্মিত ও মুগ্ধ হলো। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা তেলের প্রবাহ আপাতত বন্ধ করে দিয়ে নিজেদের উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করবে

কার্টেল, একই সঙ্গে নিজেদের ইচ্ছেমত তেলের দর বাড়িয়ে তুলে দেবে আকাশে।

'আপনার এই বুদ্ধিটা, এই যে আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপলাইন, এটা একটা যুগান্তকারী আইডিয়া!' অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করল রক মুলার।

'নতুন ধরনের এক্সকাভেশন পাইপলাইন মেশিনারি ডেভলপ করেছে ফ্যালকনের এঞ্জিনিয়াররা,' ডাহা মিথ্যে কথা বলছে হেরকুল, কারণ এই পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিলেন ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম। 'যার ফলে আমাদের কনস্ট্রাকশন ক্রুরা প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় দশ মাইল পাইপ বসাতে পারে। সব জায়গায় সম্ভব হয়নি, তবে প্রায় ত্রিশ হাজার মাইল পাইপ বসানো হয়েছে রেললাইনের পাশে। ফলে পাইপলাইনের নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামানোর দরকার পড়ছে না।'

'মাটির ওপর পাইপলাইন বসালে লাখ লাখ জমি ও বাড়ির মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হত, আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে বেরিয়ে যেত কয়েক বিলিয়ন ডলার,' চেরি অ্যান বলল।

'তবে মার্কিন বা কানাডা সরকার আন্ডারগ্রাউন্ড এই পাইপলাইন অনুমোদন করবে বলে মনে হয় না,' বললেন ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া। 'আমরা ধরা না পড়ে কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছি, এটা একটা মিরাকলই বলতে হবে।'

'আমরা আমাদের ট্রেইল নিখুঁতভাবে মুছেছি,' বলল হেরকুল। 'জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে আমাদের লোক আছে, সে জানিয়েছে তাদের কোন কর্মকর্তা বা এফবিআই-এর কোন এজেন্ট এ-ব্যাপারে প্রশ্ন তুললে সেটা ধামাচাপা দেয়ার ব্যবস্থা করা তার জন্যে কোন সমস্যা নয়। এর আগে যে দুটো ফাইল তৈরি করা হয়েছিল সেগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

ওয়েদারম্যান খুক করে কেশে হেরকুলের দিকে তাকাল। 'আমি যতদূর জানি, আপনার ও আপনার ফ্যালকনের অ্যাকটিভিটি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যে মিস লরেলি ভ্যান্স থাপাকে চেয়ারপারসন করে কংগ্রেস একটা কমিটি গঠন করেছে।'

'করুক। আরও এক ডজন তদন্ত কমিটি গঠন করুক,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল হেরকুল। 'মিস লরেলির অনুসন্ধান প্রসব করবে মস্ত একটা ঘোড়ার ডিম।'

'আপনি এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া। 'আমি শুনেছি, মিস লরেলি সাংঘাতিক সাহসী মেয়ে, তিনি এমনকি ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমর্থন আদায় করার সময় আপনাদের প্রেসিডেন্ট বুশকেও যুদ্ধোন্মাদ বলতে ভয় পাননি।'

হেরকুল ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকাল। 'ওদিকটা সামলানো হবে।'

'যেভাবে সামলেছেন ওয়াটার লিলি আর এমারেল্ড মার্লিনকে?' বিদ্রূপাত্মক সুরে প্রশ্ন করল রক মুলার।

'ফলাফলটাই প্রমাণ করে পদ্ধতিটা ঠিক ছিল নাকি বেঠিক,' বলল হেরকুল। 'আমাদের লক্ষ্য ছিল ডক্টর ইসলামের আবিষ্কৃত এঞ্জিন কোন কাজের জিনিস নয়, সংশ্লিষ্ট সবার মনে এই ভয়টা ঢোকানো। শালা বুড়োটা অন্তত গোটা ত্রিশেক শিপ বিল্ডার কোম্পানিকে নিজের আবিষ্কার করা এঞ্জিনের ডিজাইন দিয়ে গেছে। আমার

কাছে খবর এসেছে দু'দুটো দুর্ঘটনার পর আর কেউ ওই ডিজাইনে জাহাজ করছে না।

'তবে আমরা আমেরিকায় ওই ডিজাইনের পেটেন্ট করাব, জাহাজও তৈরি করব। বুড়োটা মারা যাওয়ায় তার সুপার অয়েলের ফর্মুলা পেতে আর মাত্র কয়েক দিন লাগবে আমাদের। একদিকে হাজার হাজার এঞ্জিন বিক্রি করব, আরেক দিকে সম্ভাব্য সব দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করব প্রচলিত ফুয়েল-এর মার্কেট।'

'আপনি কি কথা দিতে পারবেন, নুমার তরফ থেকে আর কোন নাক গলানোর ঘটনা ঘটবে না?' জানতে চাইল রক মুলার।

'ওটা ছিল কাকতালীয় একটা ব্যাপার। আমাদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে বাধা দেয়ার কোন অধিকার ওদের নেই।'

'ওদের সার্ভে ভেসেল আর ক্রুদের হাইজ্যাক করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি,' মাথা নেড়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন কানাডিয়ান ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া।

'পরিস্থিতিটা অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। তবে সেটা ইতিহাস। কোন ট্রেইল ফ্যালকনের দিকে আসছে না।'

'মাঝ সাগরে তেল ভর্তি ট্যাংকার ডুবিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা আরও খোলসা করুন। মিলিয়ন মিলিয়ন গ্যালন অয়েল স্পিল পরিবেশের কি পরিমাণ ক্ষতি করবে সেটাও আমাদের জানা দরকার।'

'কানাডা ও আমেরিকার পরিবেশে কোন রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না,' জোর গলায় প্রতিশ্রুতি দিল হেরকুল। 'বেশিরভাগ ট্যাংকার ডুববে তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর কাছাকাছি পানিতে। কিছু ট্যাংকারকে পাঠিয়ে দেয়া হবে এশিয়ার দিকে, ধরুন, বঙ্গোপসাগরে। ওখানে যদি বড় একটা সুপারট্যাংকার ডুবিয়ে দেয়া যায়, অন্তত এক বছর লাগবে ছড়ানো তেল পরিষ্কার করতে।'

'কিন্তু এত থাকতে বঙ্গোপসাগরকে দূষিত করার কি দরকার পড়ল?'

'কেউ আপনাকে চড় মারলে আপনি তাকে আপনার অপর গালটা বাড়িয়ে দেবেন, আমরা কি যীশুর এই বাণীতে বিশ্বাসী? শোনা যাচ্ছে নুমার প্রজেক্ট ডিরেক্টর, আসলে এটা কাভার, সত্যি কথাটা হলো মাসুদ রানা বাংলাদেশের একজন স্পাই। কেউ এক আঙুল দেখালে তাকে দু'আঙুল দেখানোটাই তো আমাদের নিয়ম।'

'নিজেদের মার্কেট পজিশন আর মনোপলি ধরে রাখার জন্যে আমরা তাহলে খোদ শয়তানের কাছে আমাদের আত্মা বিক্রি করে দিচ্ছি?'

'মনোপলি শব্দটা বড় বিস্বাদ, মাই ডিয়ার লেডি,' বলল হেরকুল। 'আমি ব্যাপারটাকে মার্কেট ট্রাস্ট বলতে পছন্দ করি।'

'পরিবেশ দূষণের কারণে কত পশু-পাখি মারা যাবে, ভাবলেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি।' দু'হাতে মুখ ঢাকলেন ডেইলিয়া।

'এটা বিবেক আর মানবতাকে প্রশ্রয় দেয়ার সময় নয়,' তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বলল হেরকুল। 'আমরা একটা অর্থনৈতিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি। এই যুদ্ধে জেনারেল, অ্যাডমিরাল, ট্যাংক, সাবমেরিন, নিউক্লিয়ার বোমা ইত্যাদির হয়তো দরকার নেই, তবে জিততে হলে তেলের অফুরন্ত চাহিদা মেটাতে হবে।

তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি দুনিয়ার মানুষকে আমরা বলতে পারব কি ফুয়েল তাদেরকে কিনতে হবে, কখন কিনতে হবে, কত দামে কিনতে হবে। দুনিয়ার যেখানে যত তেল আর গ্যাসখনি আছে, সবগুলোর মালিক হবে আমাদের কার্টেল। তারপর এক সময় আমাদের সম্মিলিত মেধা ও প্রচেষ্টা গভর্নমেন্টাল রাষ্ট্রকে করপরেট রাষ্ট্রে পরিণত করবে। গোটা বিশ্ব শাসন করব আমরা। করবই। কাজেই, ডিয়ার ডেইলিয়া, এখন দুর্বল হয়ে পড়ার সময় নয়।'

'রাজনীতিকবিহীন একটা বিশ্ব,' রক মুলার বিড়বিড় করছে, কপালে চিন্তার রেখা। 'এমন সুদিন কি সত্যি আসবে!'

'তবে তেলের দাম বাড়ানোর জন্যে বড় ধরনের একটা অয়েল স্পিল-এর ঘটনা সত্যি ঘটানো দরকার,' বলল নাথান করবেট।

শেয়ালের মত ধূর্ত হাসি ফুটল হেরকুলের ঠোঁটে। 'আমি তোমার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছি, করবেট। আজ থেকে পাঁচ-সাতদিনের মধ্যে সে-ধরনের একটা দুর্ঘটনা সত্যি ঘটতে যাচ্ছে।'

'আরেকটা ট্যাংকার স্পিল?'

'তারচেয়েও ভয়ংকর।'

'তারচেয়ে ভয়ংকর আর কি হতে পারে?' রক মুলার নিরীহ ভঙ্গিতে জানতে চাইল।

'একটা স্পিলই, তবে তার সঙ্গে কয়েকশো টন বিস্ফোরকও ফাটানো হবে,' বলল হেরকুল।

'উপকূল থেকে দূরে, মাঝ সাগরে?'

মাথা নাড়ল হেরকুল। 'অত্যন্ত ব্যস্ত একটা বন্দরে। যে বন্দর একটা দেশের সিংহভাগ আমদানি-রপ্তানি সামাল দেয়।'

'ও মাই গড!' বিড়বিড় করলেন ডেইলিয়া, চেহারা হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল। 'বহু জাহাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। অসংখ্য মানুষ মারা পড়বে।'

'আমাদের হিসাবে সব মিলিয়ে সত্তরটা জাহাজ পুড়ে যাবে আর সাড়ে চার হাজার লোক সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে। এই আগুন বন্দর ছাড়িয়ে চট্টগ্রাম শহর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে।' চেরি অ্যান হাসছে।

'কিছু কি আসে যায়?' ঠাণ্ডা সুরে প্রশ্ন করল হেরকুল। 'যুদ্ধে এরচেয়ে কত বেশি মানুষ মারা যায় কিন্তু বিনিময়ে কিছুই অর্জিত হয় না। এই ঘটনাটা একাধিক কারণে ঘটানো হবে, সবগুলো আপনাদের না জানলেও চলে। একটা কারণ তো আগেই বলেছি, তেলের দাম বাড়াতে হলে অয়েল স্পিল-এর প্রয়োজন আছে। আরেকটা কারণ, সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে সতর্ক করে দেয়া, আমাদের সঙ্গে লাগতে এলে কি পরিণতি হয় দেখো। আমার ধারণা, আজকের মত যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। কাল সকালে আবার শুরু করা যাবে।'

আমেরিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী অয়েল মোগলরা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল, হেরকুলের পিছু নিয়ে চলে এল ডাইনিং রুমে। এখানে সবার জন্যে ককটেল অপেক্ষা করছে।

একা শুধু ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া কনফারেন্স টেবিলে বসে থাকলেন। মোটকথা

তাঁর বিবেক সায় দিচ্ছে না। হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে খুন করা হবে? শত শত কোটি ডলারের জাহাজ আর কার্গো পুড়িয়ে ফেলা হবে? বলছে, এমন ব্যবস্থা করা হবে যাতে লোক গিজগিজে একটা শহরেও আগুনটা পৌঁছায়। এ কিভাবে সমর্থন করবেন তিনি। ওখানে বসে জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক সিদ্ধান্তটা নিলেন ডেইলিয়া । ভাবলেন, এতে যদি তাঁকে প্রাণ দিতে হয়, সেটাকে তিনি তাঁর সারা জীবন ধরে পাপ করবার প্রায়শ্চিত্ত বলেই মনে করবেন।

লীফ হেরকুলের বিশাল এক্সিকিউটিভ বোয়িং ৭২৭ রানওয়ের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, একটা ম্যাগাজিন হাতে মনিবের জন্যে অপেক্ষা করছে পাইলট। অলস চোখ জোড়া তুলতেই দেখতে পেল আলাস্কান অয়েল-এর জেটটা রানওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করেছে। আকাশে সাদা সাদা টুকরো মেঘ ছড়িয়ে আছে, ওগুলোর নিচে পৌঁছে একটা বাঁক নিল জেটটা, তারপর রওনা হলো দক্ষিণ দিকে।

অদ্ভুত, ভাবল হেরকুলের পাইলট। সে ভেবেছিল প্লেনটা উত্তর দিকে ঘুরে আলাস্কার দিকে রওনা হবে। ম্যাগাজিন রেখে ককপিট থেকে মেইন কেবিনে চলে এল সে, দাঁড়াল লম্বা করা পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসা এক লোকের সামনে। লোকটার চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল-এর পাতায়।

'এক্সকিউজ মি, সার,' বলল পাইলট, 'ভাবলাম আপনার বোধহয় জানা দরকার যে আলাস্কান অয়েল-এর জেটটা উত্তরে না গিয়ে উড়ে গেল দক্ষিণে, ওয়াশিংটনের দিকে।'

কাকাস জাভালা পত্রিকা এক পাশে রেখে দিয়ে ঠোঁট মুড়ে হাসল। 'চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্যে ধন্যবাদ। দারুণ এক ইন্টারেস্টিং খবর দিলে এইমাত্র।'

দশ

কংগ্রেস সদস্যা লরেলির বাড়িতে অকস্মাৎ প্রবল উত্তেজনা ও আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। কি ব্যাপার? না, সরাসরি বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে ই-মেইল এসেছে, তাতে বলা হলো, রবি ঠাকুরের বসুন্ধরা কবিতাটির বিশেষ একটা অংশের হরফগুলোকে কী হিসেবে ব্যবহার করে ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের পাঠানো সাংকেতিক মেসেজের সতেরো নম্বর পাতার শেষ প্যারার কোড ভাঙা সম্ভব হয়েছে।

চ্যাটে বসে এরপর রানা ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বিসিআইএ-র চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদকে প্রশ্ন করল, 'এর তাৎপর্য কি?'

সোহেলের উত্তর, নিশ্চয় ঝাঁঝালই হবে, 'শালা সারারাত রামায়ণ পড়ে বলে কিনা সীতা কার বাপ!'

'মানে? কি বলতে চাইছিস?' কোনমতে রাগ চেপে প্রশ্ন করল রানা।

'ডক্টর ইসলামের কোডেড মেসেজ বস্ তোকে দেখাননি?' জানতে চাইল

সোহেল। 'সরল ভাষায় লেখা চিঠিটার সারমর্মও তো তোর না জানার কথা নয়। সতেরো নম্বর পাতার শেষ প্যারার কোড ভাঙতে পারলে লাভ হবে শুধু এই যে বাকি চব্বিশ পাতার কোড ভাঙা সহজ হয়ে যাবে মাত্র, তাতেও সময় লাগবে বিশ বছরের কম নয়। এ-সবই তুই জানিস, অথচ তারপরও বোকার মত জিজ্ঞেস করছিস–এর তাৎপর্য কি?'

'কত্তো বড় গর্দভ!!!' টাইপ করল রানা।

'???' মনিটরে শুধু তিনটে প্রশ্নবোধক চিহ্ন পাঠাল সোহেল।

'আমি জানি বাকি সাড়ে চব্বিশ পাতায় ডক্টর ইসলামের যুগান্তকারী কিছু আবিষ্কারের ফর্মুলা আছে,' সোহেলকে বলল রানা। 'বিশ বছরের মধ্যে কোড ভাঙার পর ফুর্মলাগুলো পড়া যাবে। কিন্তু সতেরো নম্বর পাতার শেষ প্যারায় ফর্মুলার কোড ভাঙার পদ্ধতিই শুধু বলা হয়নি রে, মাথামোটা। ফুর্মলা ধরে যন্ত্রপাতি বানাতে বিপুল টাকা লাগবে। ডক্টর ইসলাম ব্যক্তিগতভাবে আমাকে লেখা এক চিঠিতে বলেছিলেন, সেই টাকা পাবার উপায়ও তিনি ওই সতেরো নম্বর পাতার শেষ প্যারায় জানিয়েছেন। তোর ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এবার নিশ্চয়ই ঢুকেছে যে আমি জানতে চাইছি জলদস্যুদের রেখে যাওয়া বিপুল ধন-সম্পদের বিশাল ভাণ্ডারটা কোথায়?'

'জলদস্যুদের রেখে যাওয়া বিপুল ধন-সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার!' রিপিট করল সোহেল। 'দোস্ত, এ-সব তুই কি বলছিস? ডক্টর ইসলাম তো ঠিক এই ভাষাই ব্যবহার করছেন!'

'যাহ্!'

'খোদার কসম!'

'কোথায় রে সব? কোড ভাঙার পর সাইফাররা কোনও মানচিত্র এঁকে দিতে পারবেন?' কৌতূহলে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে রানা।

'সাইফার এক্সপার্টদের মানচিত্র আঁকার প্রয়োজন নেই,' জানাল সোহেল। 'ডক্টর ইসলাম নিজেই হরফ ব্যবহার করে একটা ম্যাপ রেখে গেছেন। আমি বলি তুই লিখে বা প্রিন্ট করে নে। রেডি?'

'রেডি,' এক মিনিট পর টাইপ করল রানা।

'শুরু করছি–এ ও বি রেখা হাডসন নদীর ওপর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত–,' হঠাৎ মেসেজ আসা বন্ধ হয়ে গেল। একটু পর সোহেল টাইপ করল, 'ইন্টারনেটে এ-সব জানানো উচিত হচ্ছে না। ম্যাপটা তোর কাছে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' সাবধানের মার নেই ভেবে বলল রানা। 'তবে একটু আভাস দে, ঠিক কি পরিমাণ...'

'তুই আমি দু'জনেই তো বললাম–জলদস্যুদের রেখে যাওয়া বিপুল ধনসম্পদের বিশাল ভাণ্ডার। ডক্টর ইসলাম এই গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন সাংকেতিক ভাষায় লেখা ভাইকিংদের দিক নির্দেশনার অর্থ উদ্ধার করে। এবার যাই, রে।'

'থাম না, এত ব্যস্ততা কিসের?'

'না, তেমন ব্যস্ততার কিছু নেই,' টাইপ করল সোহেল। 'এখানে আমার কাজ তো শুধু একটাই–বসের সঙ্গে বসে ষড়যন্ত্র পাকানো এরপর তোকে কোন নরকে পাঠানো যায়।'

'কিন্তু তুই কি এই খবরটা জানিস যে নরকে যারা আসে তারা সবাই বড়িয়া আকালমন্দ, আগুনটাগুন নিভিয়ে নরকটাকেই স্বর্গ বানিয়ে ফেলে? আমার কপালে তো প্রায় প্রতিবারই একটা করে অপ্সরাও জুটে যায়।'

'কি নাম, রে? তৃষা, না?'

'হায়-আফসোস কর, দোস্ত, হায়–আফসোস কর। নরকে না থাকায় কি থেকে বঞ্চিত হচ্ছিস তা যদি জানতিস...' কমপিউটর অফ করে দিল রানা।

সব কথা শোনার পর আমেরিকান কালচারে বেড়ে ওঠা তৃষা ইসলাম সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব করল, এত বড় একটা খবর শোনার পর সেলিব্রেইট না করাটা হবে তৃষ্ণার্ত আত্মাকে বঞ্চিত করা। বাড়িতে এই মুহূর্তে লরেলি না থাকলেও তৃষার ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে কোথায় কি রাখা হয়, আত্মার পিপাসা মেটানোর আয়োজন করার জন্যে ছুটল সে।

রানা ও মুরল্যান্ড, দুই বন্ধু বসল গুপ্তধন সংক্রান্ত আমেরিকান আইন নিয়ে আলোচনায়। নিজ দেশে মার্কিন সরকার ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারে বিশ্বাসী, তাই কেউ কোন প্রাচীন গুপ্তধন খুঁজে পেলে সরকার বিশ পার্সেন্ট নিয়ে বাকি আশি পার্সেন্ট দাবিদারকে দিয়ে দেয়। তবে রাজ্যভেদে এই আইনের রকমফের আছে। মুরল্যান্ড জানাল, দেন-দরবার করা হলে রানা গুপ্তধনের শতকরা নব্বই ভাগও দেশে নিয়ে যেতে পারবে।

এই সময় মুরল্যান্ডের পকেটে সেল ফোন বেজে উঠল। ফোনটা বের করে কানে ঠেকাল সে। 'মুরল্যান্ড।' এক মুহূর্তের বিরতি। 'দিচ্ছি, অ্যাডমিরাল, ও এখানেই আছে।' ফোনটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'মিস্টার হ্যামিলটন।'

'রানা, অ্যাডমিরাল,' বলল রানা। এরপর তিন মিনিট নীরব হয়ে থাকল ও, হু-হ্যাঁ পর্যন্ত করল না। তারপর বলল, 'ইয়েস, অ্যাডমিরাল। আমরা এখুনি রওনা হচ্ছি।' ফোনটা মুরল্যান্ডকে ফিরিয়ে দিল ও। 'অ্যাডমিরাল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদেরকে ওয়াশিংটনে পৌঁছাতে বলছেন।'

'কোন সমস্যা?'

'আমার মনে হলো ইমার্জেন্সি।'

দোরগোড়ায় আগেই এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে ট্রে, তৃষা জানতে চাইল, 'কি নিয়ে তা বলেননি?'

'হেরকুল মনে হচ্ছে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে পাগলা কুকুর হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের নাকি কল্পনার অতীত একটা ক্ষতি করতে যাচ্ছে সে।'

তৃষার হাত থেকে ট্রেটা পড়ে গেল।

লরেলির মনে হলো বুনো একটা ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে মরুভূমির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। কোর্ট থেকে রিট ইস্যু করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে ফ্যালকন করপরেশনের সব ক'জন ডিরেক্টরকে কংগ্রেশন্যাল ইনভেস্টিগেটিভ

কমিটির সামনে হাজির হতে হবে, কিন্তু তারা কেউ আসেনি; তাদের বদলে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছে করপরেট অ্যাটর্নিদের একটা বাহিনীকে, যারা একের পর এক অপ্রাসঙ্গিক আইনগত প্রশ্ন তুলে তদন্তের কাজে অবিরাম ব্যাঘাত সৃষ্টি করে যাচ্ছে। সন্ধ্যার খানিক আগে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে অধিবেশন আবার কাল বসবে বলে কামরা থেকে লোকগুলোকে বের করে দিল লরেলি।

তাকে সান্ত্বনা জানাতে এলেন কংগ্রেসম্যান কার্লো পজিট্রন, নর্থ ডাকোটা থেকে নির্বাচিত ডেমোক্রাট। 'এত সহজে ভেঙে পোড়ো না, লরেলি। আর উত্তেজিত হলে তোমারই ক্ষতি...'

'এ-কথা বলতে পারবে না যে তুমি কোন উপকারে এসেছ আজ,' লরেলির গলায় যথেষ্ট ঝাঁঝ। 'ওরা যা বলে গেল তুমি সবকিছুতেই শুধু হ্যাঁ-হ্যাঁ করে গেলে, অথচ খুব ভাল করেই জানো যে ওদের প্রতিটি কথা হয় পুরোপুরি মিথ্যে, নয়তো সত্যকে চাপা দেয়ার জন্যে নয়কে ছয় বলে চালানোর অপচেষ্টা।'

'কিন্তু তুমি অস্বীকার করতে পারবে না, যে-সব ব্যবসার কথা ওরা স্বীকার করছে সেগুলো সবই বৈধ। যতক্ষণ না তুমি প্রমাণ করতে পারছ ওরা ক্রিমিনাল অ্যাকটিভিটির সঙ্গে জড়িত...'

'ওরা বলতে তুমি কাদের কথা বোঝাতে চাইছ, পজিট্রন?' জিজ্ঞেস করল লরেলি। 'কমিটির সামনে লীফ হেরকুলকে দেখতে চাই আমি, তার ডিরেক্টরদের সহ। অ্যাটর্নিদের কাল আমি এই কামরায় ঢুকতে দেব কিনা ভাবছি। ওদেরকে ভাড়া করা হয়েছে শুধু পানি ঘোলা করার জন্যে।'

'আমি নিশ্চিত, মিস্টার হেরকুল তাঁর সময় মত ঠিকই কমিটির সামনে আসবেন,' বললেন পজিট্রন। 'দেখো, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগবে তোমার। অত্যন্ত বিবেচক একজন মানুষ তিনি।'

কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল লরেলি। 'পজিট্রন, তোমার বিবেচক লোকটি সেদিন আমার ডিনারে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। তাকে আমার স্রেফ একটা বিষাক্ত ও ঘৃণ্য পোকা বলে মনে হয়েছে।'

'হেরকুলের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে? পজিট্রনকে বিস্মিত দেখাল।

'তদন্ত বন্ধ না করলে সে আমাকে খুন করবে বলে হুমকি দিয়েছে।'

'এ আমি কি করে বিশ্বাস করি!'

'বিশ্বাস করো, পজিট্রন,' জোর দিয়ে বলল লরেলি। 'আর শোনো, ফ্যালকনের সঙ্গে কোনভাবে জড়িয়ো না। এরই মধ্যে যদি জড়িয়ে গিয়ে থাকো, ছিঁড়ে সরিয়ে আনো নিজেকে। তোমাকে আমি একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিচ্ছি, ফ্যালকন আর হেরকুলকে ডোবানো হবে। হেরকুলকে আমরা ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাব।' পজিট্রন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কঠিন সুরে লরেলি বলল, 'কিছু বলতে এসো না, পজিট্রন, তোমার জন্যে সেটাই ভাল হবে।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল, ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে খট্ খট্ শব্দ তুলে বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং লেভেলে এসে নিজের গাড়িতে উঠল লরেলি। পাশের জানালার কাঁচটা নামাল সে, শান্ত হবার জন্যে চুপচাপ বসে এক মিনিট সময় দিচ্ছে নিজেকে। এই সময় ছায়া থেকে গাড়ির দিকে একটা নারীমূর্তিকে এগিয়ে

আসতে দেখল সে। 'কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলি। এভাবে বিরক্ত করায় সত্যি আমি খুব দুঃখিত, কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলাটা অত্যন্ত জরুরী।'

'কে আপনি?'

'আমার নাম ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া। আমি আলাস্কান অয়েল কোম্পানির চেয়ারপারসন।'

ডেইলিয়ার পোশাক-পরিচ্ছদ খুঁটিয়ে দেখল লরেলি, শুধু ডেনিম স্ল্যাকস আর হালকা নীল সুতি সোয়েটার পরে আছে। চোখ দুটোয় আন্তরিকতা দেখতে পেল লরেলি। 'সঙ্গে আইডি আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আছে।'

কার্ড দেখে দরজা খুলে দিল লরেলি। ডেইলিয়া বসার পর দ্রুত গাড়ি ছেড়ে দিল সে। 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'আপনি ফ্যালকন এমপায়ারকে নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছেন, তাই আপনাকেই আমার দরকার,' বললেন ডেইলিয়া। 'সব কথা জানাবার আগে প্রথমেই বলে নিই, এই মুহূর্ত থেকে আমার জীবন চরম বিপদের মধ্যে পড়ে গেল। ব্যবসা ও সম্পত্তি, সবই হয়তো হারাতে হবে আমাকে। কিন্তু তারপরও স্বেচ্ছায় আমি লীফ হেরকুলের ভয়ংকর সব প্ল্যান ফাঁস করে দিতে চাই।'

লরেলির শরীরে অ্যাড্রেনালিন পাম্প হচ্ছে। 'আপনি দুর্দান্ত সাহসী। কিন্তু সত্যি কি তার ক্রিমিনাল অ্যাকটিভিটি সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'জানি পাঁচ বছর ধরে, তার নেতৃত্বে গঠিত কার্টেলে যোগ দেয়ার পর থেকেই।'

'কার্টেল?' লরেলি উপলব্ধি করল দৈবক্রমে ফ্যালকন আর হেরকুলের বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণের একটা ভাণ্ডার পেয়ে গেছে সে।

'হ্যাঁ, কার্টেল। হেরকুল কয়েকটা কোম্পানিকে এক করে দেশের সমস্ত তেল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়ার প্ল্যান করেছে।'

'ওহ, গড!' লরেলি একটা ধাক্কা খেলো। 'কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব?'

'ঘুষ দিয়ে তেল থাকা সত্ত্বেও এক্সপার্টদের দিয়ে বলিয়ে নেয়া হচ্ছে তেল নেই, এরকম কয়েকশো তেল কূপ লীজ নেয়া হয়েছে। পাইপ বসানো হয়েছে মাটির তলা দিয়ে...'

'এ-সব কি বলছেন আপনি!' লরেলির মাথা ঘুরছে।

'হেরকুলকে আপনি চেনেন না, তাই অবাক হচ্ছেন। সে একজন মাস মার্ডারার...'

'একেবারে চিনি না, তা ঠিক নয়। ওয়াটার লিলি আর এমারেল্ড মার্লিনকে ডুবিয়েছে লোকটা।'

এবার ডেইলিয়াকে বিস্মিত দেখাল। 'এ-সব তার কাণ্ড, আপনি জানেন?'

'আপনি যখন নিজের প্রাণ ও ব্যবসার ওপর ঝুঁকি নিয়ে এত কথা বলছেন, আমারও আপনাকে সব বলা দরকার। নুমার সাহায্য নিয়ে এফবিআই তদন্ত চালিয়ে প্রমাণ পেয়েছে ওই ঘটনা দুটো অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না। ঘটনাগুলো ঘটানো হয় বিজ্ঞানী ডক্টর সিরাজুল ইসলামের আবিষ্কার করা ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক

এঞ্জিনের দুর্নাম রটাবার জন্যে। হেরকুল অনেক কারণেই এই এঞ্জিন অন্য কাউকে তৈরি করতে দিতে চাইছে না। একটা হলো, ডক্টর ইসলাম এই এঞ্জিনের জন্যে একটা বৈপ্লবিক সুপার অয়েল ফর্মুলা আবিষ্কার করেছেন, ফলে প্রায় কোন ফ্রিকশান ছাড়াই এঞ্জিন স্টার্ট নেয় ও সচল থাকতে পারে। এই এঞ্জিন ও তেল বাজারে সহজলভ্য হলে প্রচলিত তেলখনি আর রিফাইনারিগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে।'

'সরকারী ইনভেস্টিগেটররা এত কিছু জানেন!' ডেইলিয়া বিস্মিত।

'হ্যাঁ, আমরা সবই জানি। আমরা জানি, এটা এখন হেরকুল না জানলেই হয়।'

হাত দিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করলেন ডেইলিয়া। 'সে জানে, মিস লরেলি।'

লরেলির চোখে সন্দেহ। 'কিভাবে জানবে? অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে ইনভেস্টিগেশন চালানো হয়েছে।'

'হাতে রাখলে লাভ হবে, ওয়াশিংটনের এমন প্রতিটি লোককে কেনার জন্যে পাঁচ বিলিয়নেরও বেশি ডলার ব্যয় করেছে হেরকুল। একশোরও বেশি সিনেটর আর কংগ্রেসম্যান তার পকেটে, সঙ্গে আরও আছে সরকারী প্রতিটি দফতরের কর্মকর্তারা।'

লরেলি হতবাক হয়ে বসে থাকল। গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরছে শুধু কোথাও পৌঁছাতে চাইছে না। 'আপনি তাদের নাম বলতে পারবেন?'

হাতব্যাগ খুলে একটা কমপিউটর ডিস্ক বের করে লরেলির কোলের ওপর ফেললেন ডেইলিয়া। 'সব এটার মধ্যে পাবেন। দুশো এগারোটা নাম। কে কত টাকা কবে পেয়েছে, তা বলতে পারব না। চেরি অ্যান সীল করা একটা ফাইল পাঠিয়েছিল আমার কাছে ভুল করে...'

'চেরি অ্যান?'

'কার্টেলের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। সব কপি করার পর সীলটা আবার নতুন করে লাগিয়ে ফাইলটা ফেরত পাঠাই আমি। সে জানত না যে কার্টেল থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ খুঁজছিলাম আমি, তাই কিছু সন্দেহ করেনি।'

'আপনি দু'একজনের নাম বলতে পারেন।'

'দু'দলের রাজনীতিকরাই আছেন। হোয়াইট হাউসের তিনজন কর্মকর্তা।'

'কার্লো পজিট্রন?'

মাথা ঝাঁকালেন ডেইলিয়া। 'তালিকায় আছেন তিনি।'

'প্রেসিডেন্ট?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে মাথা নাড়লেন ডেইলিয়া। 'আমি যতদূর জানি হেরকুলের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব নেই। আপনাদের প্রেসিডেন্ট পারফেক্ট নন, তবে এ তিনি ভালই বোঝেন যে হেরকুল একটা পচা ফল, কাছাকাছি হলে তাঁর গায়ের পচন ধরবে।'

একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে ডিনার খেলো ওরা। তারপর ডেইলিয়াকে নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে চলে এল লরেলি, সরকারী কাজে ওয়াশিংটনে এলে এখানেই

থাকে সে, ড্রয়িং রুমে বসে রাত তিনটে পর্যন্ত কথা বলল ওরা। চট্টগ্রাম বন্দরে সুপারট্যাংকার পাঠাবে হেরকুল, সেই ট্যাংকার বিস্ফোরিত হয়ে তেল ছড়াবে উপকূলে, একইসঙ্গে আগুনের স্রোত হয়ে আঘাত করবে বন্দরে–এ-সব শুনে শিউরে উঠল লরেলি। কমপিউটরে ডিস্কটা ঢুকিয়ে সমস্ত তথ্যের প্রিন্ট-আউট বের করল সে। কাগজের স্তূপ একটা মোটা বইয়ের আকৃতি নিল। এরপর দু'জন মিলে ডিস্কটা ওরা লুকিয়ে রেখে এল বাথ রুমে, সিলিঙের পাশে গোপন একটা খোপে–কেউ বলে না দিলে বোঝার উপায় নেই ওখানে একটা খোপ আছে।

বেড রুমে ফিরে এসে ডেইলিয়াকে লরেলি বলল, 'আজ রাতটাই শুধু আপনি আমার সঙ্গে থাকলেন। লুকিয়ে থাকার জন্যে নিরাপদ একটা জায়গা কাল থেকে দরকার হবে আপনার। কারণ যখনই হেরকুল টের পাবে যে আপনি বাঁশিতে ফুঁ দিতে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে চুপ করাবার সিদ্ধান্ত নেবে সে।'

'চুপ- হত্যার ভাল একটা প্রতিশব্দ।'

'মেয়ে বলে ওরা আপনাকে রেহাই দেবে না,' বলল লরেলি। 'ডক্টর ইসলামের মেয়ে তৃষাকে ওরা ছাড়েনি। অয়েল ফর্মুলার জন্যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে তার ওপর।'

'মেয়েটা, তৃষা, হেরে গেল? ফর্মুলাটা বলে দিল ওদের?'

'না। হেরকুলের কোবরারা কিছুই ওর কাছ থেকে আদায় করতে পারেনি, তার আগেই ওকে উদ্ধার করা হয়।'

'সম্ভব হলে এই মেয়েটার সঙ্গে আমি পরিচিত হতে চাই।'

'ও আপাতত আমার বাড়িতেই আছে, কিন্তু সেদিন ডিনারে হেরকুল আমাদেরকে একসঙ্গে দেখার পর আমার বাড়িও এখন আর ওর জন্যে নিরাপদ বলে মনে করছি না। ওকেও কোথাও সরিয়ে ফেলতে হবে।'

'আমি শুধু একটা ওভারনাইট ব্যাগ নিয়ে এসেছি। কিছু কসমেটিক্স, জুয়েলারি আর একজোড়া অতিরিক্ত আন্ডারঅয়্যার ছাড়া আর কিছু নেই।'

ডেইলিয়ার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল লরেলি। 'আমাদের একই সাইজ। ওয়ার্ড্রোব খুলে যা খুশি ব্যবহার করতে পারেন আপনি।'

'এই নোংরা ঝামেলা শেষ হলে আমার চেয়ে সুখী কেউ হবে না।'

'তার আগে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা আর কংগ্রেশন্যাল ইনভেস্টিগেটিং কমিটির সামনে সাক্ষী দিতে হবে আপনাকে, পারবেন তো?'

'পারব জানি বলেই তো আপনার কাছে আমার আসা।'

ডেইলিয়ার কাঁধটা এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল লরেলি। 'কথাটা আমি আবার বলব। আপনি সত্যি দুর্দান্ত সাহসী।'

'অ্যামবিশনের চেয়ে শুভ বুদ্ধিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি, এরকম ঘটনা খুব কম ঘটেছে আমার জীবনে,' ধীরে ধীরে বললেন ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া। 'এটা তার মধ্যে

'আমি আপনার সৎ সাহসের প্রশংসা করি,' আন্তরিক সুরে বলল লরেলি।

'কাল থেকে আপনি আমাকে কোথায় লুকিয়ে রাখবেন?'

'সরকারের এত লোক যখন হেরকুলের পকেটে ঢুকে গেছে, কোন সরকারী সেফ হাউস আপনার জন্যে নিরাপদ হবে বলে মনে করি না।' হঠাৎ লরেলিকে আপন মনে হাসতে দেখা গেল। 'আমার এক বন্ধু আছে, একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, তিনি আপনাকে তাঁর একটা সেফ হাউসে অনায়াসে লুকিয়ে রাখতে পারবেন।'

'আপনার এই বন্ধুকে বিশ্বাস করা যায় তো?'

এবার সশব্দে হেসে উঠল লরেলি। 'ভাই, গ্রীক দার্শনিক ডায়োজেনেস আজও যদি একজন সৎ মানুষের খোঁজে ঘুরে বেড়াতেন, সম্ভবত মাসুদ রানার দরজায় এসে শেষ হত তাঁর অভিযান।'

এগারো

তৃষাকে রানা এজেন্সির একটা সেফ হাউসে পৌঁছে দিয়ে মুরল্যান্ডকে নিয়ে নুমা হেডকোয়ার্টারে চলে এল রানা। ডেকে পাঠিয়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, কিন্তু এলিভেটরে ঢোকার মুখে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল নুমার কমপিউটর জাদুকর নিগ্রো ল্যারি কিং। প্রচণ্ড উত্তেজনায় অস্থির দেখাল তাকে। দ্রুত হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, 'ঠিক সময় মত এসেছ, রানা। পরবর্তী জাদুটা এখনই ঘটবে।' রানা ও মুরল্যান্ডকে একরকম ধাক্কা দিয়ে এলিভেটরে তুলল সে।

'জাদু?'

আবার হাতঘড়ি দেখল কিং। 'কোন কথা নয়। আমার কমপিউটর রুমে চলো, সব নিজেদের চোখেই দেখতে পাবে।'

'অন্তত একটা ধারণা দাও,' বলল মুরল্যান্ড। 'তুমি এত উত্তেজিত হয়ে আছ কেন?'

হাতঘড়ি দেখল কিং। জবাব দিল না।

রানা ও মুরল্যান্ড নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করল।

এলিভেটর থেকে নেমে ওদেরকে নিয়ে নিজের রাজ্যে ঢুকল ল্যারি কিং। ওদেরকে বসতে বলে নিজেও একটা কমপিউটরের সামনে বসল। দ্রুত কয়েকটা বোতামে চাপ দিল সে। দু'গজ দূরে একটা কনসোল রয়েছে, তার ঠিক সামনে একটা চেম্বারের ভেতর আবির্ভূত হলো থ্রী ডাইমেনশনাল আকৃতি নিয়ে আকর্ষণীয়া এক রমণী। কিং তার নাম দিয়েছে ভীনাস, সে পরে আছে ওয়ান-পীস বেইদিং সুট।

'আমাকে ডেকেছ,' বলল ভীনাস।

'হ্যাঁ, কিন্তু এখুনি তোমার সঙ্গে কোন আলাপ নেই আমার,' বলল কিং, রানা ও মুরল্যান্ডের দিকে তাকাবার আগে আরেকবার হাতঘড়ি দেখল। 'আর দু'মিনিট পর, বলে একটা দেরাজ খুলে ডক্টর সিরাজুল ইসলামের লেদার কেসটা বের করল।

'দু'মিনিট পর কি?'

'প্রতি আটচল্লিশ ঘণ্টা পর পর, দুপুর ঠিক একটা পনেরো মিনিটে, এই কেসটা জাদুর কেস হয়ে ওঠে।'

'ওটা তেলে ভরে যায়,' ইতস্তত একটা ভাব নিয়ে বলল রানা।

'একদম কারেক্ট।' কেসটা খুলে একজন জাদুকরের ভঙ্গিতে সেটার ওপর হাতটাকে বারকয়েক ঢেউ-এর আকৃতিতে খেলালো কিং, ওদের দেখতে দিল কেসটা সত্যি খালি কিনা, তারপর ঢাকনি বন্ধ করে ল্যাচগুলো লাগিয়ে দিল। 'এবার অপেক্ষার পালা,' বলে হাতঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটায় চোখ রেখে বসে থাকল। নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হতে মুখ তুলল সে, বলল, 'পুরানো সেই প্রচলিত উক্তি উল্টো করে বলছি আমি: এই নেই, এই আছে।' অত্যন্ত সাবধানে ল্যাচগুলো খুলল সে, তারপর ঢাকনিটা তুলল। ওপরের কিনারা থেকে এক ইঞ্চি বাদ দিয়ে কেসটা তেলে ভরে উঠেছে।

'আমি জানি এটা তোমার কোন চালাকি নয়,' বলল রানা, 'কারণ রিসার্চ শিপ সী রবিনে তৃষা আমাকে কেসটা দেয়ার পর থেকে ববি আর আমার বেলায়ও এই ঘটনা ঘটেছে।'

'না আমাদের নয়,' বলল কিং। 'কিন্তু কারও না কারও চালাকি তো বটেই। আমি এর কোন সমাধানই খুঁজে পাচ্ছি না। তেলটা আসছে কিভাবে?'

'এটা কোন চালাকিও নয়, এর মধ্যে দৃষ্টিভ্রমের কোন ব্যাপারও নেই,' বলল রানা। 'আমরা সত্য এবং বাস্তব একটা ঘটনাই চাক্ষুষ করছি।' তেলের ভেতর একটা আঙুল ডোবাল ও, দু'আঙুলে ঘষে পরীক্ষা করল। 'আমি দেখতে পাচ্ছি বলে জানি আমার আঙুলে তেল রয়েছে, তা না হলে কোন স্পর্শ পাচ্ছি না। আমার ধারণা, এটাই ডক্টর সিরাজুল ইসলামের সুপার অয়েল।'

'বিলিয়ন ডলার প্রশ্ন হলো: তেলটা আসছে কোত্থেকে?'

'ভীনাসকে তুমি এ বিষয়ে কিছু জানিয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রানা, ডেস্কের উল্টোদিকে চেম্বারের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা হলোগ্র্যাফিক ফিগার-এর দিকে তাকাল একবার।

'দুঃখিত, রানা,' ভীনাসের কণ্ঠ মিষ্টি। 'তোমার মত আমিও অথৈ সাগরে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। তবে মাথায় কিছু আইডিয়া আছে, কিং আজ রাতে বাড়ি ফেরার আগে আমার সুইচ অফ না করলে সেগুলো নেড়েচেড়ে দেখতাম কোন সমাধান পাই কিনা।'

'সুইচ আমি অফ করব না, তবে তোমাকেও কথা দিতে হবে যে কোন অবস্থাতেই কনফিডেনশিয়াল বা প্রাইভেট সাইটে ঢুকবে না তুমি।'

'কথা দিলাম লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকার চেষ্টা করব,' শব্দগুলো ঠিক আছে, কিন্তু পরিবেশন করা হলো ষড়যন্ত্র পাকানোর সুরে।

ব্যাপারটাকে কিং হালকাভাবে নিতে রাজি নয়। ভীনাস তাকে এর আগে বিপদে ফেলেছে, নিষিদ্ধ সাইটে শুধু শুধু ঢুঁ মেরে। সুইচ টিপে ভীনাসকে গায়েব করে দিল সে। তার কাণ্ড দেখে হেসে উঠল রানা।

মুরল্যান্ডকে নিয়ে নুমা চীফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের চেম্বারে ঢুকে একটু

থমকাল রানা। লরেলিকে দেখল, অচেনা এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে নিচু গলায় আলাপ করছে। ডেস্কের পিছনে বসে আছেন অ্যাডমিরাল, চেয়ারের কিনারার সরে এসে দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোককে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছেন। রানা ও মুরল্যান্ডকে দেখে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিতে খালি দুটো চেয়ার দেখালেন, তারপর পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'ইনি পল ট্রাউট, জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট। ট্রাউট, ও মাসুদ রানা, নুমার একজন প্রজেক্ট ডিরেক্টর। আর মুরল্যান্ডকে তো তুমি চেনোই।' রানা ও পল ট্রাউট হ্যান্ডশেক করল। অ্যাডমিরাল এরপর লরেলির পাশে বসা ভদ্রমহিলার দিকে তাকালেন। 'ইনি ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া, কানাডার সবচেয়ে বড় তেল কোম্পানি আলাস্কান অয়েল এর মালিক। মিস ডেইলিয়া, ও মাসুদ রানা।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন ডেইলিয়া। 'আপনার সম্পর্কে অনেক কথা মিস লরেলির মুখে শুনলাম, পরিচিত হতে পেরে সত্যিই গর্ব অনুভব করছি...'

'ওকে নিয়ে কেউ গর্ব করুক, এটা একদমই চায় না ও,' নিজের হাতটা ডেইলিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল মুরল্যান্ড। 'লরেলি আমার সম্পর্কে কিছু যদি বলে না থাকে, সময় দিলে আমি নিজেই সব শোনাব আপনাকে–শুধু গর্ব না, আপনি আমাকে নিয়ে অহংকার করলেও তাতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না।'

সবাই হেসে উঠল, শুধু অ্যাডমিরাল বাদে। 'আমরা অত্যন্ত বিপদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি,' গম্ভীর সুরে বললেন তিনি। 'এবং সময়ের এত অভাব যে ভূমিকা বাদ দিতে হচ্ছে। প্রথমে আমরা মিস ডেইলিয়ার কি বলবার আছে শুনব। প্লীজ, মিস ডেইলিয়া।'

পরবর্তী দু'ঘণ্টা ধরে মার্কিন তেল নিয়ে হেরকুলের ভয়ংকর সব ষড়যন্ত্রের বিশদ বর্ণনা দিলেন ডেইলিয়া।

তিনি থামতে চেম্বারের ভেতর গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল, সেটা ভাঙলেন জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের পল ট্রাউট। 'আপনি নিশ্চিত, এতক্ষণ যা বললেন সত্যি?'

'প্রতিটি শব্দ,' দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন ডেইলিয়া।

ট্রাউট অ্যাডমিরালের দিকে তাকালেন। 'দেরি না করে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের সব কথা জানানো দরকার। প্রেসিডেন্টকে, কংগ্রেস লীডারদের, আমার বসকে...'

মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'কাউকে জানাবার কথা ভুলে যাও, পল।' তার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিলেন–হেরকুল যাদেরকে ঘুষ দিয়ে কিনে রেখেছে তাদের নামের তালিকা। 'এটা হলো কারণ। এই কারণে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। এই কাগজে যাদের নাম দেখছ তারা সবাই টাকা খেয়ে হেরকুলের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে।'

'অসম্ভব,' বললেন ট্রাউট, তালিকায় চোখ বুলাবার সময় চোখ জোড়া অবিশ্বাসে ছানাবড়া হয়ে উঠল। 'সরকারী আর বেসরকারী কয়েক হাজার উকিলের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে মামলার নামে যুদ্ধ চলবে...'

'তাতেও কোন লাভ হবে না,' বললেন ডেইলিয়া। 'যে বিদেশী কোম্পানি ঘুষ দিয়েছে, তার মালিক অন্য কোম্পানি। সেই অন্য কোম্পানির মালিক ফ্যালকন।

টাকা যারা নিয়েছে তারাও নিজেদের বিদেশী অ্যাকাউন্টে নিয়েছে। জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট কোনদিনই এ-সব অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবে না।'

'জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট যদি কিছু না-ই করতে পারবে তাহলে আমাকে ডেকে এ-সব জানাবার তাৎপর্য কি? তাছাড়া, এত থাকতে আমাকেই বা কেন ডাকা হয়েছে? প্রশ্ন করলেন পল ট্রাউট, পদ মর্যাদায় জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের তিন নম্বরে আছেন।

'এর উত্তর পানির মত সহজ–তালিকায় তোমার নাম নেই,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'কিন্তু তোমার বসদের নাম রয়েছে। আমি তোমার বউ আর তোমাকে বহু বছর ধরে চিনি, জানি তুমি একজন সম্মানী মানুষ, টাকার লোভে কারও কাছে বিক্রি হবে না।'

'নিশ্চয় আপনাকেও প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল,' বলল লরেলি।

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে স্মরণ করার চেষ্টা করলেন ট্রাউট। 'বছর দুই আগে। আমি আমার ককার স্প্যানিয়ালকে নিয়ে বাড়ির কাছে হাঁটছি, এই সময় অচেনা এক মহিলা-হ্যাঁ, মহিলাই–আমার পাশে এসে এক সঙ্গে হাঁটতে লাগল, কথা বলল যেচে পড়ে।'

ডেইলিয়া হাসলেন। 'ছাই ও সোনালি রঙের চুল, নীল চোখ, কমবেশি পাঁচ ফুট নয়, একশো ত্রিশ পাউন্ড। অত্যন্ত আকর্ষণীয়া।'

'আপনার বর্ণনা হুবহু মিলে গেল।'

'ওর নাম চেরি অ্যান। হেরকুলের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর।'

'সে তোমাকে সরাসরি টাকা সাধল?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'না, ওরকম কুৎসিত কিছু নয়,' জবাব দিলেন ট্রাউট। 'যতদূর মনে পড়ছে, মহিলা আভাস-ইঙ্গিতে কথা বলছিল। লটারিতে বিরাট অঙ্কের টাকা পেলে কি করব আমি? চাকরিতে আমি সন্তুষ্ট কিনা, যে মেধা ও শ্রম দিচ্ছি তার বিনিময়ে যা পাচ্ছি তা যথেষ্ট কি? ওয়াশিংটন ছাড়া অন্য কোথাও থাকার সুযোগ পেলে, জায়গাটা কোথায় হবে? বোঝা গেল, পরীক্ষায় আমি ফেল মেরেছি। রাস্তার মোড়ে আমাকে ছেড়ে বিদায় নিল সে–কোত্থেকে একটা গাড়ি এসে থামল, সেটায় উঠে চলে গেল। তারপর জীবনে কখনও আর দেখিনি তাকে।'

'যাই হোক, নির্ভর করা যায় এমন লোক একমাত্র তোমাকে পেয়েছি আমরা,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তুমি যদি সাহায্য করো...'

'কিভাবে সাহায্য করব?' ভুরু নাচালেন ট্রাউট। 'অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে গিয়ে বলব ঘুষ খাওয়ার অপরাধে আপনাকে আমি গ্রেফতার করছি? এ কি সম্ভব?'

'এ ধরনের কিছু করলে হেরকুলের কোবরারা বারো ঘণ্টার মধ্যে রাস্তায় আপনার লাশ ফেলে দেবে,' বলল লরেলি।

'এই নাও আরেকটা তালিকা,' ট্রাউটের দিকে আরও একটা কাগজ বাড়িয়ে দিলেন নুমা চীফ। 'এতে আছে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের সৎ অফিসারদের নাম, অনেক গবেষণা করে তৈরি করা হয়েছে। পল, এদের সাহায্য নিয়ে হেরকুলের বিরুদ্ধে এয়ারটাইট একটা কেস দাঁড় করাতে হবে তোমাকে। এরা এমন সব মানুষ, কারও হুমকিতে টলবার পাত্র নন।'

'এদিক থেকে আমি, কংগ্রেশন্যাল কমিটির তরফ থেকে, সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করব,' প্রতিশ্রুতি দিল লরেলি।

পল ট্রাউট চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে সবার সঙ্গে করমর্দন করলেন। 'আমাকে এখন থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। আমার ওপর আস্থা রাখার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল। বিদায়, জেন্টেলমেন।'

পল ট্রাউট চলে যাবার পর রিভলভিং চেয়ারে নড়েচড়ে বসে সরাসরি রানার দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'তোমার আর মুরল্যান্ডের জন্যে এয়ারপোর্টে নুমায় একটা জেট প্লেন অপেক্ষা করছে, রানা। ওই জেট ব্যাংকক ইউ.এস.এয়ারফোর্স বেসে পৌঁছে দেবে তোমাদের। ওখানে নুমার একটা হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে, তোমাদেরকে নামিয়ে দেবে বঙ্গোপসাগরে।'

'বঙ্গোপসাগরের কোথায়?'

'কেন, তোমরা জানো না? সী রবিন তো এখনও বঙ্গোসাগরের সেই জায়গাতেই তেল খনির উৎসমুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওখানেই ফিরে যাচ্ছ তোমরা। ওখানে পুরানো ও ছোট একটা সাবমেরিনও পৌঁছাচ্ছে, তাতে তোমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। ওটার নাম বেইবি বাব্‌ল্‌।'

'দুঃখিত, অ্যাডমিরাল,' বলল রানা। 'তেলখনি পরে খুঁজে পেলেও চলবে, প্রথমে আমি আমাদের সমুদ্র বন্দরটাকে রক্ষা করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখব। টেলিফোনে আপনিই না বললেন হেরকুল 'ব্রাইট ব্লু' নামে একটা সুপারট্যাংকার পাঠাচ্ছে চট্টগ্রামে? প্রচুর জ্বালানি তেল আর বিস্ফোরক আছে ওটায়?'

অ্যাডমিরাল বললেন, 'ওই বিপদটা ছোটখাট কোন ব্যাপার নয়, রানা, প্রায় একটা যুদ্ধের মত। তোমার বসের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপ হয়েছে। উনিই বললেন, আমিও তাঁকে সমর্থন করলাম–কাজটা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর, তারাই চট্টগ্রাম বন্দরকে রক্ষা করবে।'

স্বভাবতই রানার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। অ্যাসাইনমেন্ট থেকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে ওকে। তবে যেহেতু বিসিআই চীফ রাহাত খানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, এ নিয়ে কোন তর্কও চলে না। 'সেক্ষেত্রে মুরল্যান্ড যেতে চায় যাক, সে বিজ্ঞানী মানুষ, কিন্তু বঙ্গোপসাগরে আমার কাজ কি? আমার বরং এখানে থাকা উচিত, ওয়াশিংটনে, তা না হলে হেরকুলের বুকে পা রাখবে কে?' শব্দ চয়নের ধরন দেখেই বোঝা গেল রানার মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে।

নুমা চীফ মাথা নাড়লেন। 'তোমার বস্‌ বাংলাদেশের নৌ-বাহিনীকে সতর্ক করে দিলেও, চাইছেন তুমিও যেন কাছে পিঠে কোথাও থাকো। তুমি তো জানোই, সী রবিনে টেলি-কনফারেন্স অনুষ্ঠানের ফ্যাসিলিটিজ আছে, যখন খুশি মনিটরে আমাদের তিনজনকে লাইভ পাবে তুমি–লরেলি, তোমার বস্‌ ও আমাকে।'

বসের ওপর রানার অভিমান একটু কমল, তবে চেহারা সেই আগের মতই, নির্লিপ্ত। 'বস্‌ কিছু বলেছেন, কেন আমার চট্টগ্রামের কাছাকাছি থাকা দরকার?'

'আমার বন্ধু বটে, কিন্তু তোমার পিতার মত, আমার চেয়ে তুমিই তাঁকে বেশি চেনো,' হাসি চেপে বললেন অ্যাডমিরাল। 'সব কথা কি খুলে বলেন কখনও?'

রানা কথা না বলে চুপ করে থাকল।

মুরল্যান্ড বলল, 'জেনারেল রাহাত খান কি জানেন এই মুহূর্তে সুপারট্যাংকার ব্রাইট ব্লু কোথায় রয়েছে?'

ডেস্ক থেকে রিমোট তুলে নিয়ে কমপিউটর অন করলেন অ্যাডমিরাল। মনিটরে একটা মানচিত্র ফুটে উঠল, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপকূল রেখা চিনতে পারল ওরা। করাচি বন্দরের কাছে একটা বিন্দু ঘন ঘন জ্বলছে-নিভছে, ওটাই সুপারট্যাংকার ব্রাইট ব্লু। 'এখনও কমবেশি দু'হাজার সাতশো মাইল দূরে ওটা।'

'হাতে এখনও পাঁচ দিন সময় আছে,' বলল রানা।

'আমি আর রানা মাঝসাগরে ওটায় উঠতে চেষ্টা করলে সমস্যা কি?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড। 'নুমার হেলিকপ্টার আর জাহাজ কাছেপিঠে পাহারায় থাকলে?'

'সমস্যা হলো, আন্তর্জাতিক জলসীমায় তুমি ইচ্ছে করলেই কোন জাহাজে চড়তে পারো না। জাহাজটার মালিক কুয়েতের একজন আমীর, কোম্পানির নাম আল আমিন শিপিং লাইন,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ওটা বাংলাদেশের জন্যে ক্রুড অয়েল নিয়ে চিটাগং পোর্টে পৌঁছাবে। ওই ট্যাংকার কখন কিভাবে দখল করবে হেরকুলের মার্সেনারিরা, কি পরিমাণ বিস্ফোরক তোলা হয়েছে বা হবে, এ-সব কিছুই আমাদের জানা নেই। সাগরে থাকতেই ওটার ওপর চড়া হবে, তবে আন্তর্জাতিক জলসীমায় নয়, বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করার পর। প্ল্যানের খুঁটিনাটি সব জানতে পারবে সী রবিনে পৌঁছে তোমার বসের সঙ্গে কথা বললে।'

'আই সারেন্ডার,' হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল মুরল্যান্ড। 'হেরকুলকে কেড়ে নিয়েছে লরেলি, জাভালাকে ছিনিয়ে নিলেন মিস্টার রাহাত খান। আমরা চলে যাচ্ছি সী রবিন থেকে বঙ্গোপসাগরে ডুব দিতে, ফলে তৃষাকে নিয়ে আমরা জলদস্যুদের লুকানো ট্রেজার খুঁজতেও যেতে পারছি না। লাইফ ইজ সো ডাল।'

'এই ট্রেজারের ব্যাপারটা আসলে কি?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

গোটা ব্যাপারটা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করল মুরল্যান্ড। সব শুনে অ্যাডমিরাল রানাকে বললেন, 'অবশ্যই তোমরা ওই ট্রেজার খুঁজে বের করবে, তবে তা এখন নয়-হেরকুল আর তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটার পর। কারণটা নিশ্চয়ই তোমাকে খুলে বলতে হবে না?'

'ওই ট্রেজার যেখানে আছে সেখানেই পাওয়া যাবে ডক্টর সিরাজুল ইসলামের যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলোর ফর্মুলা। আমাদের ট্রেইল ধরে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসা হেরকুল সেখানে পৌঁছাতে পারবে না।'

'রাইট।' মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। 'হাতে সময় খুব বেশি নেই। আমি চাই তোমরা এখুনি রওনা হয়ে যাও।'

রানা ও মুরল্যান্ড চেয়ার ছাড়ছে, লরেলি বলল, 'রানা, আমার একটা অনুরোধ।'

'হ্যাঁ, বলো।' রানা একটু বিস্মিত।

আমি রানা এজেন্সির যে-কোন একটা সেফ হাউসে মিস ডেইলিয়াকে দিন

কয়েক রাখতে চাই। সম্ভব?'

'কেন সম্ভব নয়!' এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'তবে তৃষাকে যেখানে রেখে এলাম সেখানে এত তাড়াতাড়ি যাওয়া ঠিক হবে না। মিস ডেইলিয়া, চলুন, আপনাকে আমাদের অন্য একটা সেফ হাউসে পৌঁছে দিই।' মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল ও। 'তুমি অন্য একটা গাড়ি নিয়ে ফলো করবে আমাদের। পিছনে কেউ লাগলে সেল ফোনে জানাবে। ওকে?'

'ওকে।'

ওয়াশিংটনে ফ্যালকন-এর অফিস বিশাল এক ম্যানশান-এ, উনিশশো দশ সালে এক ধনী সিনেটরের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল। বেথেসডা-র এক প্রান্তে, লতা গাছ ঢাকা ইঁটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দশ একর জায়গার ভেতর সুরম্য একটা বসতবাটি, সেটাকেই অফিসে পরিণত করা হয়েছে। চারটে ফ্লোরের বিলাসবহুল ওই স্যুইটগুলোয় করপরেট অ্যাটর্নি, পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট, হাইলেভেল লবিইস্ট এবং প্রভাবশালী সাবেক সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানরা বসে, তাদের সবার একটাই উদ্দেশ্য মার্কিন সরকারকে যতটা পারা যায় হেরকুলের মুঠোর ভেতর নিয়ে আসা।

রাত গভীর, একটা বাজে, ইলেকট্রিক ঠিকাদার কোম্পানির ছাপ মারা ভ্যানটা গেটে এসে থামল। কিছু ফিসফাস হলো, খুলে গেল গেট, ভেতরে ঢুকল ভ্যান। সিকিউরিটি খুব কড়া। গেটে রাইফেল ও পিস্তল নিয়ে দু'জন গার্ড রয়েছে, আরও দু'জন শিকারি কুকুর নিয়ে গোটা বাড়ির চারধারে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

ভ্যান থামল ফ্রন্ট ডোর-এর সামনে, গাড়ি-বারান্দায় দীর্ঘদেহী এক কালো লোক ধাপ বেয়ে উঠছে, দু'হাতে ধরা ফ্লুরোসেন্ট লাইট টিউব-এর একটা বাক্স। গার্ড রিসেপশন ডেস্কে থেমে খাতায় সই করতে হলো তাকে, তারপর এলিভেটরে চড়ে উঠে এল পাঁচতলায়। এলিভেটর থেকে নামল কাঠের মেঝেতে ফেলা হাতে বোনা পারসী কার্পেটে। হলওয়ের শেষ মাথার বড়সড় অফিসটায় এই মুহূর্তে কোন সেক্রেটারি নেই, ঘণ্টাখানেক হলো চলে গেছে তারা। তাদের টেবিল দুটোকে পাশ কাটিয়ে খোলা দরজা দিয়ে মূল অফিস চেম্বারে ঢুকল সে।

প্রকাণ্ড লেদার এক্সিকিউটিভ চেয়ারে প্রায় ডুবে রয়েছে লীফ গডফ্রে হেরকুল, বাংলাদেশে গ্যাসপ্রাপ্তির ওপর জিওলজিস্টদের তৈরি একটা বিশেষ রিপোর্ট পড়ছে গভীর মনোযোগের সঙ্গে। ইলেকট্রিশিয়ান অফিসে ঢুকতেও চোখ তুলে তাকাল না। ডেস্কের সামনে একটা চেয়ারে বসল লোকটা–শিরদাঁড়া খাড়া, মাথা উঁচু। এতক্ষণে ঘাড় বাঁকিয়ে সরাসরি কাকাস জাভালার চোখে চোখ রাখল হেরকুল।

'আপনার সন্দেহ কি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল জাভালা।

মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি, হেরকুল বলল, 'হ্যাঁ, অসচেতন মাছ টোপ গিলেছে।

'জানতে পারি, কে সে?'

'আলাস্কান অয়েল-এর ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া। মীটিঙে বসে যখন শুনল অয়েল স্পিল-এর ঘটনা ঘটবে, বিস্ফোরক ফাটিয়ে উড়িয়ে দেয়া হবে চট্টগ্রাম বন্দর, অমনি আঁতকে উঠল সে। তারপর নানা বিষয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এ-সব দেখেই সন্দেহ হয় আমার।'

'তা মহিলা কি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছে?'

'আমি প্রায় নিশ্চিত, বলেছে। তার প্লেন আলাস্কায় ফিরে যায়নি, গেছে ওয়াশিংটনের দিকে।'

'রাজধানীতে স্বাধীন একটা কামান বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।'

মাথা নাড়ল হেরকুল। 'তার কাছে কোন ডকুমেন্ট বা প্রমাণ নেই। শুধু তার মুখের কথা। কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। হঠাৎ সৎ সেজে দল ত্যাগ করায় আমাদের যে কত বড় উপকার করল তা সে কল্পনাও করতে পারবে না।'

'কিন্তু এই মহিলা যদি কংগ্রেশন্যাল কমিটির সামনে সাক্ষী দেয়?'

'কি করে দেবে? তাকে কেউ ইন্টারোগেট করার আগেই তুমি যদি নিজের দায়িত্ব পালন করো? ভাল কথা, আমি অ্যাক্সিডেন্ট চাই না।'

'গুম খুন?'

মাথা ঝাঁকাল হেরকুল। 'কিংবা সুইসাইড।'

'সরকার কি তাকে কোন সেফ হাউসে লুকিয়ে রেখেছে?'

'জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের লোকজন বলছে, ডেইলিয়ার কোন হদিসই তাঁরা বের করতে পারছে না।'

'আপনার কোন ধারণা আছে কোথায় তাকে পাওয়া যাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল হেরকুল। 'এই মুহূর্তে নেই। মনে হচ্ছে সে এখন প্রাইভেট কোন পার্টির সঙ্গে লুকিয়ে আছে।'

'তাহলে তো তাকে খুঁজে বের করা সহজ হবে না।'

'আমি ঠিকই তার খোঁজ পাইয়ে দেব তোমাকে,' দৃঢ় স্বরে বলল হেরকুল। 'তাকে চারিদিকে খুঁজছে আমার প্রায় দেড়শো লোক। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। পালিয়ে সে যাবে কোথায়।'

'কমটির সামনে সাক্ষী দেয়ার তারিখটা জানা গেছে?' জিজ্ঞেস করল জাভালা। 'তাকে ডাকা হবে কবে?'

'যতদূর খবর পাচ্ছি, আগামী তিন দিন নয়।'

জাভালাকে কিছুটা শান্ত ও সন্তুষ্ট দেখাল।

'আমি ধরে নিচ্ছি অপারেশনটার জন্যে তোমার প্রস্তুতি শেষ,' বলল হেরকুল। 'কোন অপ্রত্যাশিত সমস্যা যেন দেখা না দেয়। এবার কোন ত্রুটি আমি মানব না।'

'আমিও কোন ত্রুটি বা অন্য কিছু আশা করছি না। আপনার স্কীমটা তো ব্রিলিয়ান্ট। খুঁটিনাটি সমস্ত দিকে কড়া নজর রেখে অপারেশনের প্ল্যানটা তৈরি করা হয়েছে। ব্যর্থ হবার কোন আশঙ্কা দেখছি না।'

'তোমার কোবরা ক্লাবের সদস্যরা ট্যাংকারে উঠেছে?'

'আমি ছাড়া বাকি সবাই উঠেছে। আমি জেট প্লেন নিয়ে শ্রীলঙ্কার তামিল টাইগারদের একটা এয়ারস্ট্রিপে নামব, ওখান থেকে কপ্টার নিয়ে যাব ট্যাংকারে-টার্গেট থেকে এক-দেড়শো মাইল দূরে থাকতে।' হাতঘড়ি দেখল জাভালা। 'প্রস্তুতি চূড়ান্ত করার জন্যে আমাকে এখন তাহলে যেতে হয়।'

'ওদের নৌ বা সামরিক বাহিনী ট্যাংকারটাকে থামিয়ে দিতে পারবে না তো?'

জানতে চাইল হেরকুল।

'চেষ্টা করে দেখতে পারে। চোদ্দপুরুষের নাম পর্যন্ত ভুলে যাবে।'

দু'জনে একযোগে দাঁড়াল ওরা। দু'পা এগিয়ে এসে জাভালার কাঁধে একটা হাত রাখল হেরকুল। 'এটাকে তুমি আমার ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বলতে পারো কাকাস। শুধু এই এক মাসুদ রানাই সম্ভবত আমার ক্ষতি করতে পেরেছে, আমার কয়েকটা পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছে, এবং মুখের সামনে আমাকে চরম অপমান করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। অনেক চিন্তা করে এই টার্গেট ঠিক করেছি আমি।'

'সত্যি কথা বলতে কি, এই টার্গেট দেয়ায় আমি খুব আশ্চর্য হয়েছি।'

'কোথায় মারলে সবচেয়ে বেশি লাগবে, এটা জানার জন্যে রীতিমত গবেষণা করতে হয়েছে আমাকে, কাকাস। গবেষণা থেকে বেরিয়ে এল এই লোক সবচেয়ে বেশি ভালবাসে নিজের দেশকে। এরপর খোঁজ নিলাম বাংলাদেশের গর্ব বলতে কি আছে, যা আবার খুব দামীও, গড়ে তুলতে যুগ যুগ সময় লেগেছে? যেটা ধ্বংস করে দিলে বহুমুখী বিপদে পড়বে দেশটা? যে দেশটাকে ভালবাসে আমার পরম শত্রু? খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার হেরকুল, আমার একটা কৌতূহল মিটল। ওদিকে যখন আগুন জ্বলবে আপনি এদিকে তখন কি করবেন?'

শব্দহীন ধারাল হাসি ফুটল হেরকুলের ঠোঁটে। 'কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলির কমিটিতে সাক্ষী দিতে যাব।'

'আপনার কি মনে হয়? বাংলাদেশে আপনি হামলা চালাতে যাচ্ছেন, এ-খবর সে জানে?'

'ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া জানে, কাজেই লরেলি আর রানার না জানার কথা নয়, বলল হেরকুল, জানালা দিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে। 'তবে ওদের জন্যে একটা চমক অপেক্ষা করছে, তাই না?'

বারো

বঙ্গোপসাগরের সারফেস ঝাঁক-ঝাঁক অগুনতি ঢেউ হয়ে ছুটে চলেছে বিরতিহীন। ঢেউগুলো তেমন উঁচু নয়, চূড়ায় ফেনার সাদা মুকুট নেই, তবে মাথাগুলো সাপের ফণার মত বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে। গোটা সাগরে অদ্ভুত এক নীরবতা। ঢেউগুলোকে ঠিক ছোঁয়নি, একটু ওপরে ঝুলে আছে হালকা কুয়াশা–সচল পানির শব্দকে অস্পষ্ট করে তুলছে, পশ্চিম আকাশে নিভতে শুরু করা তারাগুলোকে ঢেকে রেখেছে। পুবে চট্টগ্রাম বন্দর, ওদিকে আকাশ একটু আলোকিত দেখাচ্ছে।

ভোর হবার এক ঘণ্টা আগে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর কাটার 'বাংলার মুখ' ফুল স্পীডে ছুটে এসে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে একশো মাইল দূরে অতিকায় সুপারট্যাংকার 'ব্রাইট ব্লু'কে ইন্টারসেপ্ট করল। বিমান বাহিনীর দুটো হেলিকপ্টার প্রকাণ্ড জাহাজটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। ওগুলোর সঙ্গে নৌ-বাহিনীর একটা

কপ্টারও আছে, তাতে রয়েছে ক্যাপটেন সমুদ্র গুপ্তের সঙ্গে ত্রিশজনের একটা কমান্ডো টীম। নৌ-বাহিনীর একটা পেট্রল বোটও রয়েছে পানিতে, সুপারট্যাংকারের স্টার্ন অনুসরণ করছে। বোটে রয়েছে কমান্ডার মাহফুজ আর তার স্ট্রাইক টীম, নির্দেশ পেলেই মইয়ের সঙ্গে সংযুক্ত গ্র্যাপলিং হুক ছুঁড়ে দেবে ট্যাংকারের বিশাল ডেকে।

কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী, যিনি বোর্ডিং অপারেশনের দায়িত্বে রয়েছেন, চোখের সঙ্গে আরও একটু চেপে ধরলেন তাঁর শক্তিশালী বিনকিউলার। 'হ্যাঁ, বড় কাকে বলে! এ-মাথা থেকে ও-মাথার মাঝখানে পাঁচটা ফুটবল মাঠ এঁটে যাবে, তারপরও ফাঁকা থাকবে কিছুটা।'

'ওটা আসলে আলট্রা, আলট্রা লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ার,' সায় দিয়ে বললেন ওটার কমান্ডার, ক্যাপটেন মিনহাজ। নৌ-বাহিনীতে বিশ বছর ধরে কাজ করছেন দক্ষতার সাথে। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরে উদ্ধার অভিযান, অবৈধ কার্গোসহ জাহাজ আটক, চোরাচালানীদের পিছু ধাওয়া ইত্যাদি ঝুঁকিবহুল কাজে তাঁর রয়েছে এক যুগেরও বেশি অভিজ্ঞতা। 'তাও তো, সার, ওটার আশি ভাগ ডুবে আছে পানির তলায়। হিসেবে বলে, এই আকারের একটা সুপারট্যাংকার ছয় লাখ টন তেল বহন করতে পারে।'

'ওই তেল বিস্ফোরিত হবার সময় ওটার দশ মাইলের মধ্যেও কেউ থাকতে চাইবে না।'

'পোর্টের চেয়ে এখানে, এই খোলা সাগরে বিস্ফোরিত হলেই বরং ভাল।'

'স্পীড এরকম কমিয়ে আনার মানে কি? ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, বন্দরে পৌঁছে নোঙর ফেলার খুব একটা ইচ্ছে নেই ক্যাপটেনের,' শান্ত গলায় কথা বলছেন কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী। 'বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত যত আলো আছে সব জ্বেলে রেখেছে। যেন নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করতে চাইছে।' চোখ থেকে বিনকিউলার নামালেন। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত না?'

এখনও তাকিয়ে আছেন, ক্যাপটেন মিনহাজ দেখলেন ট্যাংকারের কুক এক বালতি আবর্জনা ফেলল সাগরে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড খোলকে পাশ কাটিয়ে একঝাঁক গাংচিল পানিতে নামল গোত্তা খেয়ে। 'ব্যাপারটা আমারও ভাল ঠেকছে না, সার,' বললেন তিনি।

রেডিওম্যানের দিকে তাকালেন ইলিয়াস চৌধুরী। হাতে একটা পোর্টেবল রেডিও নিয়ে পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, ব্রিজ স্পীকারের সঙ্গে প্লাগ-এর সাহায্যে সংযুক্ত। 'হেলিকপ্টারগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করো, জিজ্ঞেস করো ওরা কোন বিপজ্জনক তৎপরতা দেখতে পাচ্ছে কিনা।'

নির্দেশ পালন করল রেডিওম্যান। উত্তরের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। তারপর স্পীকার থেকে ভেসে এল আওয়াজটা। 'কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী, সার, বাজপাখি-১ থেকে আমি লেফটেন্যান্ট নাসির বলছি। একবার একজন ক্রুকে পাইপ ফিটিং চেক করতে দেখলাম, আরেকবার দেখলাম কুককে- ব্যস,এইটুকু। গোটা ডেক খালি, সার।'

'হুইল হাউস?' জিজ্ঞেস করলেন ইলিয়াস চৌধুরী।

মেসেজটা রিলে করা হলো, জবাব পেতেও সময় লাগল না। 'ব্রিজ উইং খালি। ব্রিজ উইন্ডশীল্ডের ভেতর যতটুকু দেখতে পাচ্ছি, ওয়াচে রয়েছে মাত্র দু'জন অফিসার।'

'তোমার অবজারভেশন ক্যাপটেন সমুদ্র গুপ্ত আর কমান্ডার মাহফুজকে জানাও। তারপর বলো, আমি যখন ট্যাংকারকে ডাকব ওরা যেন স্ট্যান্ডবাই থাকে।'

'ট্যাংকারে পনেরোজন অফিসার আর ত্রিশজন ক্রু আছে,' ক্যাপটেন মিনহাজ জানালেন, মনিটরে চোখ রেখে কমপিউটর ডাটার ওপর চোখ বুলাচ্ছেন। মালিক কুয়েতী হলেও, ট্যাংকারটা ভারতে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। বিদেশী পতাকাবাহী কোন জাহাজে যথাযোগ্য অনুমতি না নিয়ে উঠলে তার পরিণতি কিন্তু কখনোই ভাল হয় না। এরকম ঘটনার পর কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হতেও দেখা গেছে। এ-ও এক ধরনের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ।'

'সেটা ঢাকার সমস্যা। এখানে আমরা কঠিন নির্দেশ পেয়ে কাজ করছি, যে-কোনভাবে ট্যাংকারে চড়তে বলা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, আমরা কমান্ড ছাড়া আর কিছু বুঝি না।'

'সুযোগটা তোমাকে দিলাম, মিনহাজ।'

রেডিওম্যানের হাত থেকে ট্র্যান্সমিটারটা নিলেন ক্যাপটেন মিনহাজ। 'ব্রাইট ব্লুর ক্যাপটেনকে বলছি,' ইংরেজিতে মেসেজ পাঠালেন তিনি। 'এটা বাংলাদেশ নেভির কাটার বাংলার মুখ। আমি ক্যাপটেন বলছি। আপনারা যাচ্ছেন কোথায়?'

সুপারট্যাংকারের ক্যাপটেন, জাহাজ বাংলাদেশ উপকূলের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ায় এই মুহূর্তে হুইল হাউসে রয়েছেন, উত্তর দিলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। 'ক্যাপটেন এনরিকো ভ্যালুজ বলছি। আমাদের গন্তব্য চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙ্গর।'

'উপকূলের এত কাছে এসে এছাড়া আর বলবেই বা কি!' বিড়বিড় করলেন ইলিয়াস চৌধুরী। 'থামার নির্দেশ দাও।'

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপটেন মিনহাজ। 'ক্যাপটেন ভ্যালুজ, আমি ক্যাপটেন মিনহাজ বলছি। দয়া করে আপনার জাহাজ দাঁড় করান, যাতে একটা ইন্সপেকশন টীম উঠতে পারে।'

'তার কি কোন প্রয়োজন আছে?' জিজ্ঞেস করলেন ভ্যালুজ। 'কোম্পানির টাকা ও সময়ই শুধু খরচ হবে, কার্গো খালাস করার শেডিউলও আমরা ঠিক রাখতে পারব না।'

'দয়া করে নির্দেশ মানুন,' জবাবে বললেন ক্যাপটেন মিনহাজ, গলায় কর্তৃত্বের সুর।

'পানিতে বড় বেশি ডুবে আছে,' মন্তব্য করলেন ইলিয়াস চৌধুরী। 'ট্যাংকগুলো নির্ঘাত কানায় কানায় ভর্তি।'

নির্দেশ মানবেন কি মানবেন না, ক্যাপটেন এনরিকো ভ্যালুজ কিছুই জানালেন না, তবে এক মিনিট পর বাংলার মুখ থেকে কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী আর ক্যাপটেন মিনহাজ দেখলেন ট্যাংকারের পিছনে পানির আলোড়ন কমে আসছে। দু'জনেরই জানা আছে যে এত বড় একটা জাহাজ পুরোপুরি থামাব

আগে আরও অন্তত এক মাইল এগোবে।

কমান্ডার মাহফুজ আর ক্যাপটেন সমুদ্র গুপ্তকে বলো যার যার অ্যাসল্ট টীম নিয়ে ট্যাংকারে চড়ুক।'

ক্যাপটেন মিনহাজ কমোডরের দিকে তাকালেন। 'আপনি চান না বাংলার মুখ থেকে আমরা কাউকে পাঠাই?'

'রেজিস্ট্যান্স ঠেকাতে আমাদের চেয়ে ভাল ইকুইপমেন্ট আছে ওদের কাছে।'

মিনহাজ একই নির্দেশ দু'বার উচ্চারণ করলেন। নৌ-বাহিনীর হেলিকপ্টারকে নাক নিচু করে সুপারট্যাংকারের সুপারস্ট্রাকচারকে পাশ কাটাতে দেখলেন ওঁরা। ধীরে ধীরে পাশ কাটাল রেডার মাস্ট আর ফানেলকে। এরপর ত্রিশজনের কমান্ডো ইউনিটকে নিয়ে ডেকের ওপর শূন্যে এক মিনিট স্থির হয়ে ভেসে থাকল ওটা, ক্যাপটেন সমুদ্র গুপ্ত আভাস পেতে চাইছেন ট্যাংকারের ডেকে বৈরী কোন তৎপরতা আছে কিনা। যখন ধারণা হলো যে বিশাল আপার ডেক পুরোটাই খালি, ইঙ্গিতে পাইলটকে দেখিয়ে দিলেন কোথায় ল্যান্ড করতে হবে। সুপারস্ট্রাকচারের সামনে খোলা একটা ডেক এরিয়ায়।

নৌ-বাহিনীর পেট্রল বোট কমান্ডার মাহফুজের নির্দেশে সুপারট্যাংকার ব্রাইট ব্লুর খোলের গা ঘেঁষে থামতে চেষ্টা করছে। নিউম্যাটিক গান থেকে ছোঁড়া হলো গ্রাপলিং হুক, বুলওয়ার্কে আটকাল সেগুলো। স্ট্রাইক টীম মই বেয়ে দ্রুত উঠে গেল, ছড়িয়ে পড়ল ডেকে, এগোচ্ছে মেইন সুপারস্ট্রাকচারের দিকে, হাতে বাগিয়ে ধরা অস্ত্র। হতচকিত একজন ক্রু ছাড়া আশপাশে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই।

কমান্ডার মাহফুজের অধীনস্থ স্ট্রাইক টীমের কয়েকজন সদস্য স্ট্যান্ডে দাঁড় করানো বেশ কিছু সাইকেল দেখতে পেয়ে কাজে লাগাল সেগুলো, বিশাল ডেক আর অয়েল ট্যাংক টানেলে ঘুরে ঘুরে বিস্ফোরকের খোঁজে তল্লাশী চালাচ্ছে। ক্যাপটেন সমুদ্র গুপ্ত তাঁর লোকজনকে দু'ভাগ করে নিলেন, একদলকে পাঠালেন নিচের এঞ্জিন রুমে, আরেক দলকে সঙ্গে নিয়ে স্টার্ন সুপারস্ট্রাকচারের ভেতর নিয়ে রওনা হলেন, পথে যে-ক'জন ক্রুকে দেখতে পেলেন আটকালেন, গন্তব্য হুইল হাউস। ব্রিজে ঢুকছেন, ক্যাপটেন এনরিকো ভ্যালুজ ঝড় তুলে এগিয়ে এলেন তাঁর দিকে, চোখে-মুখে ক্ষোভ ও তিরস্কার।

'এ-সবের মানে কি?' ব্যাখ্যা চাইলেন তিনি। 'আপনারা তো দেখছি অনুমতি নেয়ার ধার ধারছেন না।'

সমুদ্র গুপ্ত তাঁর কথায় কান না দিয়ে পোর্টেবল রেডিওতে কথা বলছেন। কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী। আমরা স্ট্রাইক টীম। ক্রু কোয়ার্টার ও হুইল হাউস এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে।'

'কমান্ডার মাহফুজ?' খোঁজ নিচ্ছেন কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী। 'কমান্ডো ইউনিট সম্পর্কে রিপোর্ট করুন।'

'আমাদের এখনও অনেকটা জায়গা কাভার করা বাকি,' জবাব দিলেন ক্যাপটেন মাহফুজ। 'তবে ট্যাংক এরিয়া দেখা শেষ, ওদিকে কোন বিস্ফোরক

পাওয়া যায়নি।'

ক্যাপটেন মিনহাজের দিকে তাকালেন ইলিয়াস চৌধুরী। 'আমি যাচ্ছি।'

বাংলার মুখ থেকে একটা বোট নামানো হলো। কমোডারকে নিয়ে বোট ট্যাংকারের যেখানে পৌঁছাল, সমুদ্র গুপ্তের নির্দেশে তাঁর লোকেরা আগে থেকেই সেখানে একটা মই ঝুলিয়ে রেখেছে। ডেকে উঠলেন কমোডর। তারপর পাঁচ প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছালেন ব্রিজে। এখানে রাগে লাল ও বেলুনের মত ফুলে ওঠা ব্রাইট ব্লুর ক্যাপটেন এনরিকো ভ্যালুজের মুখোমুখি হলেন তিনি। নৌ-বাহিনীর একজন অফিসারকে দেখে বিস্ময়ের মাত্রা আরও এক ডিগ্রি বাড়ল তাঁর।

'আমি এ-সবের ব্যাখ্যা দাবি করি! এখানে আসলে ঘটছেটা কি?' হাত নেড়ে চিৎকার করলেন তিনি।

'আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি এই জাহাজ বিস্ফোরক বহন করছে,' বললেন ইলিয়াস চৌধুরী। 'খবরটা সত্যি কিনা যাচাই করার জন্যে তল্লাশী চালাচ্ছি আমরা।'

'বিস্ফোরক!' বিস্ফোরিত হলেন ভ্যালুজ। 'আপনি পাগল হয়েছেন? এটা একটা অয়েল ট্যাংকার। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান আছে এমন কোন লোক এই জাহাজে বিস্ফোরক তুলবে না, এমন কি দেশলাইয়ের একটা কাঠি পর্যন্ত নয়।'

'সেটাই আমরা নিশ্চিত হতে চাইছি,' ইলিয়াস চৌধুরী শান্তভাবে জবাব দিলেন।

'আপনার বিশ্বস্ত সূত্র ভুয়া। এই রিপোর্ট আপনারা কোত্থেকে পেয়েছেন?'

'ফ্যালকন অয়েল-এর হাই লেভেল কর্মকর্তার কাছ থেকে।'

'ওহ্, গড?' নিজের ঝাঁকড়া চুলে আঙুল চালালেন ক্যাপটেন ভ্যালুজ। ফ্যালকন অয়েল-এর সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক? ব্রাইট ব্লু আল আমিন শিপিং লাইনের একটা জাহাজ, মালিক একজন কুয়েতী আমীর। ভদ্রলোকের বড় ছেলে বলিউডের এক নায়িকাকে বিয়ে করছেন, মুম্বাইতেই বসবাস করছেন, তাই আমীর তাঁর ছেলের নামে এই ট্যাংকার কিনে ভারতে রেজিস্ট্রি করিয়েছেন। বাংলাদেশ সহ বহু দেশের রিফাইনারির জন্যে ক্রুড অয়েল নিয়ে আসছি আমরা আজ প্রায় এক যুগ ধরে।'

'এ-যাত্রায় কার অর্ডারে তেল নিয়ে আসছেন আপনি?'

'কেউ অর্ডার দেয়নি, এটা বাংলাদেশ সরকারকে দেয়া কুয়েত সরকারের উপহার।'

তেল ও খনিজ মন্ত্রণালয় থেকে যে-সব তথ্য পাওয়া গেছে তার সঙ্গে ক্যাপটেন ভ্যালুজের কথাবার্তার কোন অমিল নেই।

'কমান্ডো ইউনিট রিপোর্টিং,' কমোডরের রেডিও থেকে ক্যাপটেন সমুদ্র গুপ্তের গলা ভেসে এল।

'কমোডর চৌধুরী। শুনছি।'

'আমরা এঞ্জিন রুম বা স্টার্ন সুপারস্ট্রাকচারে কোন ধরনের এক্সপ্লোসিভ বা এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস খুঁজে পাইনি।'

'ঠিক আছে,' বললেন কমোডর। 'কমান্ডার মাহফুজকে একটু সাহায্য করুন

আপনারা। তাঁকে আরও অনেকটা জায়গা কাভার করতে হবে।'

এক ঘণ্টা পার হলো। খাঁচায় বন্দী বাঘের মত রাগে ফুঁসছেন ক্যাপটেন ভ্যালুজ, সারাক্ষণ পায়চারি করছেন ব্রিজে, জানেন জাহাজ প্রতি মিনিট দেরির জন্যে হাজার হাজার ডলার বেশি খরচ করতে হবে তাঁর কোম্পানিকে।

বাংলার মুখ থেকে ক্যাপটেন মিনহাজও চলে এলেন ট্যাংকারে। 'ধৈর্য ধরতে পারলাম না, সার,' ব্রিজে ঢুকে বললেন তিনি, হাসছেন। 'দেখতে এলাম তল্লাশী কেমন চলছে।'

'ভাল নয়,' ম্লান সুরে বললেন কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী। 'এখন পর্যন্ত কোন বিস্ফোরক বা ডিটোনেশন ডিভাইস পাওয়া যায়নি। ক্যাপটেন আর ক্রুদের দেখে মনে হচ্ছে না তারা কোন সুইসাইড মিশন নিয়ে এসেছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, কেউ আমাদেরকে বোকা বানিয়েছে।'

বিশ মিনিট পর কমান্ডার মাহফুজ রিপোর্ট করলেন। 'ব্রাইট ব্লু নিষ্কলঙ্ক, সার। সুপারট্যাংকারের কোথাও আমরা বিস্ফোরক পাইনি।'

ক্যাপটেন ভ্যালুজের দিকে তাকালেন কমোডর, পায়চারি থামিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন কে কি বলে শোনার জন্যে। 'দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে সত্যি দুঃখিত, ক্যাপটেন,' বললেন তিনি। 'আমরা এখন ফিরে যাব।'

'নিশ্চিত থাকুন, ভারত সরকারের মাধ্যমে আমার কোম্পানি অবশ্যই এ-ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানাবে,' রাগ ঝাড়তে কসুর করলেন না ল্যাটিন আমেরিকান ক্যাপটেন। 'এভাবে আমার জাহাজে উঠে তল্লাশী চালাবার কোন আইনসঙ্গত অধিকার আপনাদের ছিল না।'

কমোডর বললেন, 'সত্যিই দুঃখিত।'

কিন্তু কমোডর ইলিয়াস জানেন না যে চট্টগ্রাম বন্দরকে সত্যি সত্যি ধ্বংস করে দেয়ার প্ল্যান করা হয়েছে। আর ক্যাপটেন ভ্যালুজেরও কোন ধারণা নেই যে সেই ধ্বংসের বীজ এই সুপারট্যাংকারে করে বন্দরে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

তেরো

বাংলাদেশ নেভির কাটার বাংলার মুখ আর সুপারট্যাংকার ব্রাইট ব্লুর কাছ থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে রয়েছে নুমার রিসার্চ অ্যান্ড সার্ভে শিপ সী রবিন। রাত তিনটের দিকে কমিউনিকেশন রুমে এসে বসেছে রানা, ঢাকা ও ওয়াশিংটনের সঙ্গে টেলিকনফারেন্সের আয়োজন প্রয়োজন মত অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের ভাগ্যে কি আছে বোঝার চেষ্টা করছে।

ওর সামনে মনিটরের ছাপান্ন ইঞ্চি স্ক্রীন, অর্ধেকটায় নুমা হেডকোয়ার্টার, বাকিটুকুতে বিসিআই হেডকোয়ার্টার। বিসিআই অংশের একপাশে সোহেলকে দেখা যাচ্ছে, কমিউনিকেশন সেন্টারে বসে কমোডর ইলিয়াস চৌধুরীর পাঠানো মেসেজ রিসিভ করছে। আরেক পাশে ওদের বস মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত

রাহাত খানের খালি রিভলভিং চেয়ারটা দেখা যাচ্ছে। টিভি স্ক্রীনের নুমা অংশের পুরোটাতেই অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের চেম্বার দেখা যাচ্ছে, রাহাত খানের কক্ষ তাঁর রিভলভিং চেয়ারটাও খালি।

দু'কাপ কফি নিয়ে কমিউনিকেশন রুমে ঢুকল মুরল্যান্ড। 'কি খবর?'

'সার্চ শুরু হয়েছে মাত্র আধ ঘণ্টা আগে,' ট্রে থেকে একটা কাপ তুলে নিয়ে বলল রানা, হাতঘড়িতে চোখ রেখে দেখল সকাল সাড়ে ছ'টা বাজে। 'রিপোর্ট আসতে আরও সময় লাগবে।'

রিপোর্ট এল আরও প্রায় এক ঘণ্টা পর, শুরু হলো সোহেলের নাটকীয় ঘোষণার মধ্যে দিয়ে। 'রানা, বস্ আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলো।' টিভি স্ক্রীনের বিসিআই অংশ থেকে গায়েব হয়ে গেল সে, সবটুকু জুড়ে এখন রাহাত খানের চেম্বার দেখা যাচ্ছে।

দরজা খুলে চেম্বারে ঢুকলেন বিসিআই চীফ। ভাঁজ একটু নষ্ট, তবে এখনও অফিসের কাপড়চোপড়ই পরে আছেন তিনি, অর্থাৎ সারারাত জেগে অফিস করেছেন। হাতে পাইপ, তবে তা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না; চিন্তার ভারে নুয়ে আছে মাথা; চোখে-মুখে তো বটেই, নড়াচড়ার মধ্যেও ক্লান্ত একটা ভাব। হঠাৎ বসকে এভাবে দেখে গভীর মমতায় ভিজে উঠল রানার মনটা, এই অনুভূতি ওর নিজের কাছে প্রায় অপরিচিত। বসকে চিরকাল শ্রদ্ধা ও সমীহ করে এসেছে ও। ভয় যেটুকু পেয়েছে বা পায়, অপ্রীতিকর কোন উৎস থেকে নয়, সেটাও শ্রদ্ধা ও সমীহেরই কারণে আসে। কিন্তু এই মুহূর্তে ও-সব কিছু নয়, রানা অক্লান্তপ্রাণ এক দেশপ্রেমিক প্রৌঢ়কে দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ল। বসের ব্যক্তিগত ওর জানা আছে, মরুভূমি ছাড়া কিছু নয়। বিয়ে করেননি, কাজেই সংসার ও সন্তান নেই। নিঃসঙ্গ একজন মানুষ, রক্ত-মাংসের একটা কমপিউটর, যার কাজ সারাক্ষণ দেশের নিরাপত্তা নিয়ে মাথা ঘামানো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, শেষ পর্যন্ত ওর জীবনটাও বসের কার্বন কপি হবে না তো?

'হেরকুল আমাদের বোকা বানিয়েছে!'

রাহাত খান এখনও ডেস্ক ঘুরে নিজের চেয়ারে বসেননি। টিভি স্ক্রীনের বাকি অর্ধেকে ইতোমধ্যে হাজির হয়েছেন নুমা চীফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, চেয়ারে বসে এই কথা দিয়ে তিনি কনফারেন্সের সূচনা করলেন।

'কি বললেন, অ্যাডমিরাল?' রানা হকচকিয়ে গেছে।

'ব্রাইট ব্লুতে তল্লাশী চালিয়ে কোন কিছুই পাওয়া যায়নি—না বিস্ফোরক, না ডিটোনেটিং ডিভাইস,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তোমাদের কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী রিপোর্ট করেছেন সুপারট্যাংকারের ক্যাপটেন ও ক্রুদের রেকর্ড চেক করে দেখা হয়েছে, তারা সবাই সৎ ও নিরীহ মানুষ, কারও বিরুদ্ধে কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই।'

রানা গম্ভীর। 'এর মানে?'

জবাব দিলেন ঢাকা থেকে রাহাত খান, 'হয় আমাদেরকে বোকা বানানো হয়েছে, নয়তো ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া দুঃস্বপ্ন দেখে ভাবছেন ওটা স্বপ্ন ছিল না।'

'মহিলার কথা আমি বিশ্বাস করি, সার,' বলল রানা। 'বোধহয় বোকাই

বানানো হয়েছে।'

'কেন বোকা বানানো হবে? কার কি লাভ তাতে?' রাহাত খানের প্রশ্ন।

জবাব দেয়ার আগে চিন্তিত দেখাল রানাকে। 'হেরকুল একটা চতুর শেয়াল, ধূর্ত। এটারই বেশি সম্ভাবনা যে ডেইলিয়াকে মিথ্যে একটা গল্প শুনিয়েছে সে, তখনই বুঝে ফেলেছিল দলত্যাগ করে কর্তৃপক্ষকে সব বলে দেবেন উনি। আমার কাছে, যে ঘটনা ঘটাবে বলেছে সেটা সে ঘটাবে না। তবে তার বদলে নিশ্চয়ই অন্য একটা কিছু করতে যাচ্ছে।'

রাহাত খান বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে আমরা দ্বিমত পোষণ করছি না। কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোনদিকে?'

'কোনদিকে যাচ্ছি, এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যে আমি নুমার ল্যারি কিং-এর উপর আস্থা রাখতে চাই,' বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল, আপনি কি তাকে ও বলবেন, প্লীজ?'

অ্যাডমিরাল নিঃশব্দে কনসোলের একটা বোতামে চাপ দিলেন। 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

নুমা হেডকোয়ার্টার। নিজের কমপিউটর জগতে বসে শত শত বিদেশী ব্যাংক আকাউন্টের হিসাব পরখ করছে ল্যারি কিং। এগুলো সব কমপিউটরাইজড্ সুইফট কোড ভেঙে বিভিন্ন বিদেশী ব্যাংকের ওয়েবসাইটে ঢুকে সংগ্রহ করেছে সব তথ্য। সব মিলিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় এক হাজার কর্মকর্তাকে বেআইনী লেনদেন ও ঘুষ দিয়েছে ফ্যালকন করপরেশন। মোট টাকার পরিমাণ এককথায় অবিশ্বাস্য।

'এই টোটাল সম্পর্কে তুমি পুরোপুরি নিশ্চিত, ভীনাস?' জিজ্ঞেস করল কিং, কি বলবে, ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। 'শুনলে লোকে না আমাকে পাগল মনে করে।'

ভীনাসের হলোগ্র্যাফিক কাঠামো শ্রাগ করল। 'আমি আমার সাধ্যমত করেছি। আরও প্রায় পঞ্চাশটার মত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুঁজে পাচ্ছি না। প্রশ্নটা উঠছে কেন? বিষয়টা তোমাকে অবাক করছে?'

'একুশ বিলিয়ন হয়তো ঠিক আছে। কিন্তু দুশো একুশ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার তোমার কাছে খুব বড় কিছু একটা না হলেও, আমার মত দারিদ্র্য-পীড়িত দেশের কমপিউটর টেক-এর কাছে সাতশো রাজার ধন।'

'তোমাকে কোন অবস্থাতেই দারিদ্র্য-পীড়িত বলা যায় না।'

চুপ! চুপ!' হঠাৎ কনসোলের দিকে চোখ পড়তে নড়েচড়ে বসল কিং। এখনি কনফারেন্সে দিতে হচ্ছে আমাকে।'

সী রবিন। রনার চোখ টিভির স্ক্রীনে। স্ক্রীনের নুমা অংশে এখন অ্যাডমিরাল আর ভীনাস সহ ল্যারি কিংকেও দেখা যাচ্ছে।

'হ্যালো, মিস্টার রাহাত খান, সার–হাউ ডু ইউ ডু?' আন্তরিক বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল কিং, সে জানে রানার বন্ধু হবার সূত্রে বিসিআই চীফ তাকেও খুব স্নেহ করেন।

'হাউ ডু ইউ ডু। তোমার টকটকা আর লীলা কেমন আছে?'

টকটকা আর লীলা কিং-এর ছেলেমেয়ে। 'জ্বী, ওরা ভাল আছে।' কিং অবাক হয়ে গেছে। বিসিআই চীফ ওর ছেলেমেয়ে সম্পর্কে জানেন?

'কিং,' প্রথম সুযোগেই কাজের কথা পাড়ল রানা। 'আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নতুন একটা প্রোব লঞ্চ করো তোমরা–তুমি আর ভীনাস।'

জবাব দেয়ার আগে পালা করে নিজের স্ক্রীনে ফুটে ওঠা চেহারাগুলো ভাল করে দেখল কিং, সবাই খুব গম্ভীর। 'কি খুঁজতে বলছ?'

'বাংলাদেশের দিকে আসছে এমন প্রতিটি পণ্যবাহী জাহাজ সম্পর্কে বিশদ জানতে চেষ্টা করো–যেগুলো এখন থেকে শুরু করে পরবর্তী দশ ঘণ্টার মধ্যে চট্টগ্রাম বা মংলা পোর্টে ভিড়বে। বিশেষ মনোযোগ দেবে যে-সব জাহাজে তেল আছে।'

ভীনাসের দিকে তাকাল কিং। 'শুনলে তো?'

ভীনাসের মুখে ঠোঁট বাঁকানো দুষ্ট হাসি। 'ষাট সেকেন্ডের মধ্যে ফিরব।'

'এত তাড়াতাড়ি?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, ভীনাসের ক্যারিশমা দেখে প্রতিবার মুগ্ধ হন তিনি।

'আজ পর্যন্ত ও কখনও আমাকে হতাশ করেনি,' বলল কিং, মুখে সবজান্তার হাসি।

ভীনাস বহুরঙা আলোক বিন্দু হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যেতে কিং তার সর্বশেষ প্রোব-এর রেজাল্ট জানাল নুমা চীফকে। 'রিপোর্টটা এখনও কমপ্লিট নয়, অ্যাডমিরাল। তবে বলা যায় শতকরা পঁচানব্বই ভাগ কাজই শেষ।' ইঙ্গিতে কাগজের স্তূপটা দেখাল সে। 'এই প্রিন্ট-আউটে আপনি ঘুষ গ্রহীতার নাম, বিদেশী ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নম্বর, কোথায় কত টাকা জমা আছে, হেরকুল ও ফ্যালকনের কোন বিদেশী ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাগুলো তাদের কাছে গেছে ইত্যাদি সমস্ত তথ্য পাবেন।' কয়েকটা বোতামে চাপ দিতে তার কমপিউটর স্ক্রীনে মোট টাকার অঙ্কটা ফুটে উঠল।

সেটা দেখে চোখ কপালে তুললেন অ্যাডমিরাল। 'তাহলে আর আশ্চর্য হবার কিছু নেই, সরকারী কর্মকর্তারা হেরকুলের পকেটেই তো থাকবে। সে যে টাকা ঘুষ দিয়েছে, নুমার একশো বছরের বাজেটেও এত টাকা খরচ হবে না।'

কিং রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের নেভি ব্রাইট ব্লুকে সার্চ করে কিছু পায়নি?'

'ব্রাইট ব্লুতে তেল আছে ঠিকই,' বলল রানা। 'তবে না, কোন বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি।' হঠাৎ ভুরু কোঁচকাল রানা, মুখ তুলে রাহাত খানের ইমেজকে লক্ষ করে বলল, 'সার, আমরা কি জানতে পেরেছি, ব্রাইট ব্লুতে কি পরিমাণ তেল আছে?'

'হ্যাঁ, পাঁচ লাখ টন।'

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। পাঁচ লাখ টন বলছে, আরও বেশিও হতে পারে। আচ্ছা ধরা যাক পাঁচ লাখ টনই। এত বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল যদি বাংলাদেশের উপকূল এলাকায় ছেড়ে দেয়া হয়, তারপর সেই তেলে যদি ফেলা

হয় জ্বলন্ত একটা দেশলাইয়ের কাঠি? চট্টগ্রাম বন্দর থাকবে?

রানার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। ছবিতে দেখেও ল্যারি কিং আন্দাজ করতে পারল রানার মস্তিষ্কে কি চলছে। কমপিউটরের বোতাম টিপে ঘুষ খাওয়া লোকজনের তালিকাটায় আরেকবার চোখ বুলাতে শুরু করল। এক পাকিস্তানী মৌলবাদী সংগঠনকে ফ্যালকন চাঁদার নামে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। সেই সংগঠনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে মিয়ানমারের রাজধানী ইয়ানগনে। ওই অ্যাকাউন্ট থেকে বাংলাদেশী এক লোককে কিছু টাকা দেয়া হয়েছে। সেই লোকের নামটাই খুঁজছে কিং। রানা বা রাহাত খান হয়তো চিনতে পারতেন, বলতে পারতেন কোনও ফ্যানাটিকাল সংগঠনের সঙ্গে ওই লোকের সম্পর্ক আছে কিনা। 'পেয়েছি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে। 'বোরহানউদ্দিন রাখাইন, উদ্বাস্তু রাখাইনদের নেতা। তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে বাংলাদেশী মুদ্রায় পাঁচ কোটি ত্রিশ লাখ টাকা।' এক সেকেন্ড থামল সে, তারপর রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'এটা মাত্র গত হপ্তার ঘটনা।'

বোরহান রাখাইনের বিরুদ্ধে আর্মস স্মাগলিঙের অভিযোগও আছে,' বলল রানা, তাকিয়ে আছে বসের দিকে। 'সার, ডুবুরি নামিয়ে ব্রাইট ব্লুর গায়ে লিমেপট মাইন ফিট করা পানির মত সহজ একটা কাজ। হাতে রিমোট থাকলে দূর থেকেও ফাটাতে পারবে বোরহান রাখাইন।'

রানার কথা শেষ হয়নি, ইন্টারকমে সোহেলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন রাহাত খান নিচু গলায়। বিসিআই হেডকোয়ার্টারের কমিউনিকেশন রুম থেকে সোহেল কাল বিলম্ব না করে যোগাযোগ করল বাংলাদেশ নেভির কাটার বাংলার মুখ-এর সঙ্গে। কমোডর ইলিয়াস মেসেজ অ্যাকনলেজ করলেন, তারপর জানালেন-সার্চ করে ব্রাইট ব্লুতে কিছু পাওয়া না গেলেও, সুপারট্যাংকারকে অনুসরণ করে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙ্গরে পৌঁছেছেন তিনি। তাদের সঙ্গে নৌ-বাহিনীর ডুবুরি আছে, তারা ব্রাইট ব্লুর খোল পরীক্ষা করার জন্যে এখুনি সাগরে নামছে।

কিংকে রানা বলল, 'তবে ব্রাইট ব্লু হেরকুলের একমাত্র হাতিয়ার না-ও হতে পারে। দেখা যাক ভীনাস কি নিয়ে আসে।'

ছোট্ট স্টেজে আবার দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবে পরিণত হলো ভীনাস। তাকে দেখে সবাই চুপ করে গেছে। 'আমি বোধহয় তোমাদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারব।'

রাহাত খান সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের বন্দরে তেল নিয়ে আসছে, এমন সবগুলো জাহাজ চেক করেছ তুমি?'

'আসলে কাগজে-কলমে দেখা যাচ্ছে কোন তেলবাহী জাহাজ আজ বা আগামী কাল বাংলাদেশের কোন বন্দরে ভিড়বে না,' জবাব দিচ্ছে ভীনাস। 'কিন্তু বঙ্গোপসাগরের দিকে আসছে এমন জাহাজের অভাব নেই, কোনটা পশ্চিমবঙ্গের কোন বন্দরে ভিড়বে, কোনটা ইয়াঙ্গুনের দিকে চলে যাবে। এ-সব জাহাজের একটাও তেলবাহী নয়।'

'এটা খুবই স্বস্তিকর একটা খবর,' অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বললেন। 'রাহাত।' বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। 'তুমি তোমাদের নেভিকে বলো

ব্রাইট ব্লুর খোল ভাল করে পাহারা দিক। বোরহান রাখাইনের ডুবুরিদের ধরতে পারলে আশা করা যায় বিপদ কেটে যাবে।'

'কিন্তু আমার সব কথা তো এখনও শেষ হয়নি,' নারীসুলভ অভিমানী সুরে বলল ভীনাস।

কিং শিরদাঁড়া খাড়া করল। 'কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো।'

'সবার প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা রেখেই জানতে চাইছি, আপনারা কি অন্য কোন ধরনের ভেসেলের প্রতি আগ্রহী?'

'অন্য ধরনের ভেসেল মানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি আসলে নিজেই মাথা ঘামাচ্ছিলাম। হিসেব করে দেখলাম একটা ইউইউএলসিসি অর্থাৎ আলট্রা, আলট্রা লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ার-এর চেয়ে একটা এলএনজি অনেক বেশি ক্ষতি করতে পারে।'

রানার মনে হলো ওকে যেন কেউ ঘুসি মেরেছে। 'ঠিক! লিকুইডিফাইড ন্যাচারাল গ্যাস ট্যাংকার!'

'চল্লিশের দশকে জাপানে একটা বিস্ফোরিত হয়েছিল প্রায় হিরোশিমা অ্যাটম বোমার শক্তি নিয়ে,' ওদেরকে জ্ঞানদান করল ভীনাস। 'মানুষ মারা গিয়েছিল প্রায় হাজারখানেক। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছিল গাছপালার। একটা নয়, এক সঙ্গে কয়েকটা দাবাগ্নি শুরু হয়, ছড়িয়ে পড়ে কয়েকশো মাইল জুড়ে।'

এবার রীতিমত ঝাঁকি খেলো রানা। 'সুন্দরবন!'

ল্যারি কিং রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে ভীনাসের উদ্দেশে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'কোত্থেকে আসছে? নাম কি? কোথায় ভেড়ার কথা? এ-সব কোন তথ্যই পাওনি?'

ভাব দেখে মনে হলো ত্রিমাত্রিক কাঠামোটা ঠোঁট ফোলাচ্ছে। 'তোমার দেখছি আমার ট্যালেন্ট সম্পর্কে কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, প্রয়োজনীয় সব তথ্যই আমি যোগাড় করেছি।'

'বলে ফেলো!'

'ওটার নাম ম্যারাবু মার্ভেল। ওই কুয়েত থেকেই আসছে। গন্তব্য ভারতের মুম্বাই, কিন্তু আমদানিকারকের বিশেষ অনুরোধে পশ্চিমবঙ্গের কোন বন্দরে পৌঁছানোর কথা ওটার। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান যদিও একটা ব্রিটিশ কোম্পানি, কিন্তু এই কোম্পানির বেশিরভাগ শেয়ার-এর মালিক ফ্যালকন করপরেশন।'

'পশ্চিমবঙ্গের বন্দরে কখন ওটা নোঙর ফেলবে?' রাহাত খান জানতে চাইলেন। একসঙ্গে দুটো কাজ করছেন তিনি– টেলিকনফারেন্সে আছেন, আবার ইন্টারকমে সোহেলের সঙ্গেও কথা বলছেন।

'নোঙর ফেলেনি, ফেলবেও না,' বলল ভীনাস। 'ভারতের ওই অঞ্চলের সবগুলো বন্দরের কমপিউটর চেক করেছি আমি, তাতে দেখা যাচ্ছে ম্যারাবু মার্ভেল ভারতের কোন বন্দরে ভেড়ার অনুমতি চায়নি। প্রতিটি বন্দর কর্তৃপক্ষ অত বড় সুপারট্যাংকারকে নোঙর ফেলার অনুমতি দেবে না বলেও জানিয়েছে।'

ওয়াশিংটন, ঢাকা ও বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত সবাই ওরা মুহূর্তের জন্যে নির্বাক পাথর হয়ে থাকল। তারপর নিস্তব্ধতা ভেঙে রাহাত খান জানতে চাইলেন, 'এখন সেটা কোথায়? কি স্পীডে, কোথায় আসছে?'

ভীনাস মিষ্টি করে হাসল, সম্ভবত কারও কোন উদ্বেগ বা উত্তেজনা তাকে বিশেষ স্পর্শ করছে না। 'মিস্টার খান, সার, আমি কোন কাজ অসমাপ্ত রাখি না। স্পীড এবং কোর্স বিশ্লেষণ করে দেখলাম, ম্যারাবু মার্ভেল আপনাদের মংলা বন্দরে পৌছাবে সাতটায়।'

'সকাল, না রাত সাতটায়?'

'সকাল সাতটায়।'

'কিন্তু মংলা একটা নদী বন্দর, কোন সুপারট্যাংকার কিভাবে ওখানে পৌছাবে!'

রানা থামতে রাহাত খান শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে জানালেন, 'তাছাড়া আমরা যে তথ্য পাচ্ছি তাতে দেখা যাচ্ছে জেফোর্ড পয়েন্ট, হিরণ পয়েন্ট, পশুর নদী, কুঙ্গা নদী বা বাংরা নদীতে বিদেশী কোন জাহাজই নেই। আর সকাল সাতটায় পৌঁছানোর কথা থাকলে, সে সময় তো অনেক আগেই পার হয়ে গেছে।' হাতঘড়ি দেখলেন তিনি। 'এখন বাজে সাড়ে আটটা।'

'এই টাইমটেবিলে একটা কিন্তু আছে,' জানাল ভীনাস। 'জেনারেটরে সমস্যা দেখা দেয়ায় ম্যারাবু মার্ভেল মাঝ সাগরে থামতে বাধ্য হয়েছিল। মেরামতের পর আবার রওনা হয়েছে, তবে পশুর নদীতে ঢুকবে সাত ঘণ্টা দেরি করে।'

'তুমি জানছ কিভাবে ম্যারাবু মার্ভেল পশুর নদীতে ঢুকবে?' জিজ্ঞেস করল রানা, ভীনাসের দেয়া তথ্য মেনে নিতে পারছে না।

'আমি ম্যারাবু মার্ভেলের কমপিউটরে দু'মিনিটের জন্যে ঢুকতে পেরেছিলাম, সেখান থেকে জেনেছি। নদীর গভীরতা, প্রশস্ততা, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি ডাটা কমপিউটরকে দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে নদী ধরে কতদূর যাওয়া সম্ভব। সুন্দরবনের সম্পর্কেও প্রচুর তথ্য রয়েছে ওদের কমপিউটরে। সব মিলিয়ে কত গাছ, কতটুকু জায়গার ভেতর; আগুন লাগলে তা ছড়াবার পথে খাল ও নালাগুলো কতটুকু বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে: সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের একটা অংশ এবং বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ, সেটা নিঃশেষে পুড়ে গেলে ইকোনমিক্যাল ও সাইকোলজিক্যাল কি প্রতিক্রিয়া হবে ইত্যাদি। ওরা জানে মংলায় পঁয়ত্রিশটা জাহাজ ভিড়তে পারে। মংলা অ্যাঙ্করে এক দিকে নয়, দু'দিকেই মালামাল বোঝাই ও খালাস করা হয়। বন্দরে ক্রেন রয়েছে পঞ্চাশটা, জেটি রয়েছে ত্রিশটা, কন্টেইনার ইয়ার্ড তিনটে।'

বসকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছে রানা, 'ব্রাইট ব্লুর তেলে আগুন ধরিয়ে চট্টগ্রাম পোর্ট, আর ম্যারাবু মার্ভেলের তরল গ্যাসে আগুন ধরিয়ে মংলা বন্দর ও সুন্দরবন ধ্বংস করতে চাইছে ওরা।'

টেবিলে ঘুসি মেরে রাহাত খান বললেন, 'মার্কিনিরা পেয়েছেটা কি! ওদের প্রেসিডেন্ট সারা দুনিয়ার জনমতকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইরাকে হামলা চালাতে যাচ্ছে। একজন সিনেটর আমাদের বিজ্ঞানীর ফর্মুলা মেরে দিয়ে একচেটিয়া ব্যবসা করতে চেয়েছিল, আমরা বাধা দেয়ায় সে-ও বাংলাদেশে হামলা চালাচ্ছে।

ক্ষমতার এমন দম্ভ ইতিহাস আগে কখনও বোধহয় দেখেনি।'

টেলি কনফারেন্সের পরিবেশ হঠাৎ করেই পাথরের মত ভারী আর আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করলেন অ্যাডমিরাল। তারপর বললেন, 'কেউ বলবে না তোমার এই ক্ষোভ ও অভিযোগ অযৌক্তিক। আমরা বেশিরভাগ আমেরিকান, বর্তমান নেতৃত্বকে নিয়ে ভয়ানক দুশ্চিন্তায় আছি...'

'আপনাদের হাতে সময় কিন্তু খুব কম,' মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বলল ভীনাস।

'ম্যারাবু মার্ভেল দেখতে কেমন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

জাহাজটার ইমেজ বড় একটা মনিটরে দেখাল ভীনাস। জাহাজটাকে মনে হলো সায়ান্স-ফিকশন কমিক বুক থেকে তুলে আনা হয়েছে। খোল-এর রেখাগুলো একটা অয়েল ট্যাংকারের মতই, এঞ্জিন ও সুপারস্ট্রাকচার পিছন দিকে, তবে মিলটা এখানেই শেষ। চওড়া ও ফাঁকা মেইন ডেকের বদলে হুবহু একই আকার ও আকৃতির অতিকায় আটটা গম্বুজসদৃশ ট্যাংক পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট ব্যবধানে খোল থেকে মাথা তুলেছে।

জাহাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছে ভীনাস। 'ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এলএনজি ট্যাংকার। এক হাজার আটশো ষাট ফুট লম্বা, তিনশো ষাট ফুট চওড়া। মাত্র আটজন অফিসার আর পনেরো জন ক্রু ওটা চালায়। লোকবল এত কম লাগার কারণ, জাহাজটা প্রায় পুরোই অটমেটেড। ওটার ক্রস-কমপাউন্ড, ডাবল-রিডাকশন গিয়ার টারবাইন এঞ্জিনগুলো ষাট হাজার শাফট হর্সপাওয়ার যোগান দেয় জোড়া প্রপেলারের প্রতিটিতে।'

'এবং তুমি বলছ ওটা নদী পথ ধরে মংলা বন্দর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল কিং।

'নদীটা যেহেতু সাগরের মুখ থেকে প্রায় সরল পথ ধরে এগিয়েছে, কোন বাঁক নিতে হবে না, সেইহেতু ম্যারাবু মার্ভেল ঠিকই বন্দর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে,' জবাব দিল ভীনাস। 'আরও ব্যাপার আছে। অয়েল ট্যাংকারের চেয়ে এলএনজি ট্যাংকার পানির নিচে কম ডোবে, গ্যাস ও তেলের ওজনে তারতম্য থাকায়। কাজেই নদীর গভীরতা কোন বাধা হবে না। তবে মংলা বন্দর পর্যন্ত যেতেই হবে ম্যারাবু মার্ভেলকে, এমন কোন কথা নেই। ওটার উদ্দেশ্য যদি সুন্দরবনে আগুন লাগানো হয়, সাগরসঙ্গম থেকে বিশ বা ত্রিশ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকলেই চলবে।'

'কি পরিমাণ গ্যাস বহন করছে ওটা?' জানতে চাইল রানা, ব্রিজের জানালা দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'পঁচাত্তর লাখ সত্তর হাজার তিনশো তেত্রিশ কিউবিক ফুট।'

'ভেরি ব্যাড,' বিড়বিড় করল কিং।

'আর গ্যাস?' বঙ্গোপসাগর থেকে মুরল্যান্ড জানতে চাইল। 'কি গ্যাস?'

'প্রোপেইন।'

'ওহ্, গড, আরও খারাপ!' প্রায় গুঙিয়ে উঠল কিং।

'অগ্নিকুণ্ডটা নারকীয় হয়ে উঠতে পারে,' ব্যাখ্যা করল ভীনাস। 'অ্যারিজোনার কিং ম্যান-এ একবার একটা রেলরোড ট্যাংকার বিস্ফোরিত হয়েছিল, সত্তর দশকে। ওটায় আট হাজার গ্যালন প্রোপেইন ছিল, অগ্নিকুণ্ডটার বিস্তার ছিল একমাইলের আটভাগের এক ভাগ পর্যন্ত। সে হিসেবে ম্যারাবু মার্ভেলের গ্যাস কয়েক মাইল ব্যাসের একটা ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ড তৈরি করবে।'

'রাহাত!' অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বললেন। 'যে-কোন মূল্যে ওই ট্যাংকারকে থামাতে হবে। এবার যেন আমাদের কোথাও ভুল না হয়।'

রানা চিন্তিত সুরে বলল, 'ব্রাইট ব্লুর ক্রুরা আমাদের লোকজনকে উঠতে বাধা দেয়নি, কিন্তু এরা দেবে।'

'এরা বাধা দেবে, কারণ ক্রু হিসেবে ম্যারাবুতে নিশ্চয়ই কোবরা ক্লাবের মার্সেনারিরা আছে,' রানার সঙ্গে একমত হয়ে বলল মুরল্যান্ড। 'এবং আমি বাজি ধরে বলতে পারি, মার্সেনারিদের নেতৃত্বে আছে সেই পিশাচটা–কাকাস জাভালা। এ-ধরনের একটা অপারেশনে হেরকুল অবশ্যই অ্যামেচারদের পাঠাবে না।'

রাহাত খান হাতঘড়ি দেখলেন। 'আমাদের হাতে আর ঘণ্টা পাঁচেক সময় আছে। নেভিকে এরইমধ্যে সতর্ক করে দিয়েছি আমি। মংলা থেকে নৌ-বাহিনীর একটা গানবোট রওনা হয়েছে–শিবসা পয়েন্টে পৌঁছে অপেক্ষা করবে ওরা। পাটনি চরের কাছে নেভির একটা বোট আগে থেকেই আছে। রানা...'

মাঝখান থেকে নুমা চীফ বললেন, 'সী রবিনে হেলিকপ্টার আছে। রানা, মুরল্যান্ডকে নিয়ে রওনা হয়ে যাও তুমি।'

'কোথায়?' যেন সকৌতুকেই জিজ্ঞেস করল ভীনাস।

'কেন, সুন্দরবনে,' জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল।

'ওখানে গিয়ে কি করবে ওরা?' আবার জানতে চাইল ভীনাস।

এবার রানাই উত্তর দিল, 'ম্যারাবু মার্ভেলকে ঠেকাব, ওটা যাতে সুন্দরবনের কোন ক্ষতি করতে না পারে।'

'সেটাই তো জানতে চাইছি, কাজটা তোমরা কিভাবে করতে চাও?'

তথ্যের বিশাল ভাণ্ডার, রানা টের পাচ্ছে ভীনাস কোন পরামর্শ দিয়ে উপকার করতে তো চাইছেই, একই সঙ্গে নিজের কৃতিত্ব দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটাও চেপে রাখতে পারছে না। ভীনাসের পরামর্শটা কি হবে, তা-ও আন্দাজ করতে পারছে রানা। কৌতুক করার ইচ্ছে ওর মনেও জাগল। ও শুধু বলল, 'বেইবি বাব্‌ল্‌।'

ঠোঁট প্রসারিত করে বহুরঙা নারীমূর্তি কটাক্ষ হানল। সে-ও মাত্র একটা শব্দ উচ্চারণ করল। 'টর্পেডো!'

চোদ্দ

লিকুইডিফাইড ন্যাচারাল গ্যাস ট্যাংকার ম্যারাবু মার্ভেল আকার-আকৃতিতে এমনই কিম্ভূতকিমাকার, দেখে কারও বিশ্বাস হবে না যে জাহাজটা সমুদ্র পাড়ি দিতে পারে। খোলের ওপরের অর্ধেক থেকে উঠে এসে উল্টো করা নারকেলের মালা বা গম্বুজের আকৃতি পেয়েছে একেকটা ট্যাংক, প্রতিটির আকার তিনতলা বাড়ির মত, সংখ্যায় সব মিলিয়ে আটটা। জাহাজাটা ইঁট রঙা। পানিতে ভাসমান এমন কুৎসিত জলযান খুব কমই দেখা যায়।

ম্যারাবু মার্ভেল এখন শুধু একটা জলযান নয়, ওটা ভাসমান একটা বোমাও, যে বোমা কয়েক হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ, বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশবিশেষ সুন্দরবনকে পুড়িয়ে ফাঁকা ও ন্যাড়া একটা মাঠে পরিণত করবে। কত অসংখ্য গ্রাম ও জনপদ যে পুড়ে ছারখার হবে তার ইয়ত্তা নেই। পৃথিবীর বুক থেকে নিঃশেষে মুছে যাবে রয়েলবেঙ্গল টাইগার। হাজার হাজার হরিণ ও কুমির সহ অসংখ্য প্রজাতির বন্যপ্রাণী পালাবার কোন পথ খুঁজে পাবে না।

ব্রোঞ্জের জোড়া প্রপেলার ঘুরছে, ঘণ্টায় পঁচিশ নট গতিতে ছুটে চলেছে ম্যারাবু মার্ভেল। এক ঝাঁক গাঙচিল এসে চক্কর দিচ্ছিল, কিন্তু চেহারা-সুরতের মধ্যে অশুভ কিছু একটা টের পেয়ে কোন শব্দ করেনি তারা, উড়ে আরেক দিকে চলে গেছে।

ম্যারাবু মার্ভেলের ট্যাংকের আশপাশে বা ওগুলোর মাথায় তৈরি লম্বা রানওয়েতে কোন ক্রুকে দেখা যাচ্ছে না। তারা সবাই আসলে লোকচক্ষুর আড়ালে যে যার-কাজে ব্যস্ত। চারজন রয়েছে হুইল হাউসে, কন্ট্রোল-এর দায়িত্বে। পাঁচজনকে পাওয়া যাবে এঞ্জিন রুমে। ক্রুদের বাকি ছ'জন পোর্টেবল মিসাইল নিয়ে তৈরি হচ্ছে; ওই মিসাইল নেভির যে-কোন জাহাজকে ডুবিয়ে দিতে পারবে। কোবরা ক্লাবের এই মার্সেনারিরা খুব ভাল করেই জানে, যতই কৌশল করা হোক বা গোপনীয়তা রক্ষা করা হোক, বঙ্গোপসাগরে তাদের উপস্থিতি ফাঁস হতে বাধ্য। কাজেই তারা প্রতিরোধও আশা করছে। আসুক হামলা, সেজন্যে তারা চিন্তিত নয়। গানবোট বা ফাইটার জেট প্লেনও এই মিসাইল দিয়ে ফেলে দিতে পারবে তারা।

স্টারবোর্ড ব্রিজ উইং-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে কাকাস জাভালা, রেলিঙে হেলান দিয়ে কালো মেঘের দ্রুত বিস্তার চাক্ষুষ করছে। স্বভাবতই মন খুব খারাপ তার। এ কেমন কথা যে মনিবের হুকুমে সুইসাইড মিশন নিয়ে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আগুন জ্বালাতে এসে দেখতে হচ্ছে আকাশে জল ভরা পোয়াতি মেঘ? যে আগুন নিভে যাবে, তা জ্বালিয়ে লাভ কি!

তারপর আপনমনে হাসল জাভালা। এমনও হতে পারে যে প্রথমে বৃষ্টি

নামবে না। প্রথমে শুরু হবে একটা ঝড়। সেই ঝড় আগুনটাকে এমন খেপিয়ে তুলবে আর বিরাট এলাকায় ছড়িয়ে দেবে যে বৃষ্টির পানি কোনমতেই সেটাকে নেভাতে পারবে না।

ব্রিজে ফিরে এসে বুকে হাত বাঁধল জাভালা, তাকিয়ে আছে চার্টে নিজের তৈরি কোর্সের দিকে। পাটনি চরকে ডানে রেখে সুন্দরবনে ঢুকবে সে, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার মাঝখান দিয়ে। জাহাজের কমপিউটরে কেউ একজন ঢুকেছিল, এটা বুঝতে পেরে আগের কোর্স বাদ দিতে হয়েছে তাকে। হিরণ পয়েন্ট বা কুঙ্গা নদীর দিকে যাচ্ছেই না ম্যারাবু মার্ভেল।

মুখ তুলে তাকাল আরেক নিগ্রো, হ্যাংলা শেরম্যান, জাভালার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। 'এই কোর্স ধরে গেলে মোহনা থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে বাধা পেতে পারি আমরা,' বলল সে। 'কারণ নদী ওখানে তেমন চওড়া নয়।'

'ত্রিশ কিলোমিটারও কি কম হলো?' চোখে বিনকিউলার তুলে বনভূমির দিকে তাকাল জাভালা। 'তার বেশি ভেতরে ঢোকার দরকার কি? আগুনটা ওখানে লাগিয়ে পিছিয়ে আসতে শুরু করব আমরা–আসার সময়ই গ্যাস ছাড়ব, ফলে গোটা জঙ্গলই পুড়তে শুরু করবে।'

'আপনি বলছিলেন এক ঢিলে দুটো পাখি মারতে চান।'

'আসলে এক ঢিলে আমি তিনটে পাখি মারতে পারব বলে আশা করছি।'

'কি রকম, সার?' শেরম্যান সশ্রদ্ধ কণ্ঠে জানতে চাইল।

'বোরহান মিয়া টাকা যখন খেয়েছে, ফ্রগম্যান পাঠিয়ে সুপারট্যাংকার ব্রাইট ব্লু ঠিকই উড়িয়ে দেবে সে। এটা হলো একটা পাখি। দু'নম্বর পাখি সুন্দরবন ও আশেপাশের জনবসতি। তিন নম্বরটার নাম মাসুদ রানা।

'মাসুদ রানা! সার, তাকে আপনি পাচ্ছেন কোথায়?'

'তাকে যদি আমি চিনে থাকি, সাগর মন্থন করে হলেও এখানে আমাকে খুঁজে নেবে সে।' জাভালা হাসছে। 'আর তাকে আমি নিজের হাতে খুন করার অপেক্ষায় থাকব।'

নৌ-বাহিনীর কাটার বাংলার মুখ সকাল ন'টায় চট্টগ্রাম পোর্টের বহির্নোঙ্গরে ভিড়ল সুপারট্যাংকার ব্রাইট ব্লুর পিছু নিয়ে। পিছনে থাকলেও, সামনে উপস্থিত নৌ-বাহিনীর একটা জাহাজের সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখছেন কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী। ব্রাইট ব্লু নোঙর ফেলতে যা দেরি, নৌ-বাহিনীর ওয়েটসুট পরা ডুবুরিরা পিঠে অক্সিজেন-বটল আর পায়ে ফ্লিপার নিয়ে চুপিসারে নেমে পড়ল পানিতে। তাদের উদ্দেশ্য, সুপারট্যাংকারের খোল পাহারা দেয়া। সঙ্গে হার্পুন সহ অন্যান্য অস্ত্র আছে, স্যাবটাজের চেষ্টা হলে প্রতিহত করবে। এই সময় নৌ-বাহিনীর ঢাকা হেডকোয়ার্টার থেকে খবর এল, হিরণ পয়েন্ট দিয়ে ঢুকে আরেকটা সুপারট্যাংকার মংলা বন্দরের দিকে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, নৌ-বাহিনীর একটা হেলিকপ্টার নিয়ে তিনি যেন পাটনি চরের উদ্দেশে এখুনি রওনা হয়ে যান; ওখানে নৌ-বাহিনীর কাটার 'বাংলার সম্মান'-কে নিয়ে ক্যাপটেন কিবরিয়া অপেক্ষা করছেন।

দেরি না করে নৌ-বাহিনীর একটা হেলিকপ্টারকে মই ফেলার নির্দেশ দিলেন কমোডর, ওগুলো অনেক আগে থেকেই সারাক্ষণ মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছিল। বারোজনের একটা কমান্ডো টীমকে নিয়ে পাটনি চরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল হেলিকপ্টার, তাদের নেতৃত্বে রয়েছেন ক্যাপটেন জাফর সিকদার।

এক ঘণ্টাও লাগল না, নৌ-বাহিনীর কাটার বাংলার সম্মানকে খুঁজে বের করে ফেলল ওরা। রশির মই বেয়ে কাটারের ডেকে নামল টীম, সবার শেষে কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী। কিন্তু ওরা রওনা হলো কুঙ্গা নদীর মোহনা লক্ষ্য করে–ম্যারাবু মার্ভেল যে নদী পথ দিয়ে সুন্দরবনে ঢুকতে চাইছে তার উল্টো দিক ওটা।

অস্ট্রেলিয়া থেকে রওনা হয়ে বঙ্গোপসাগরে আগেই পৌঁছেছে নুমার পুরানো সাবমেরিন বেইবি বাব্‌ল্‌। উপগ্রহের মাধ্যমে জরুরী নির্দেশ পেয়ে কমান্ডার ডেভিড রামস্‌ সারফেসে উঠে অপেক্ষা করছিল। সী রবিন থেকে কপ্টার নিয়ে ঘণ্টাখানেক উত্তর পশ্চিমে এগোবার পর নুমার পাইলট জেফারসন দেখতে পেল ওটাকে।

'কে বলবে সাবমেরিন, দেখে তো মনে হচ্ছে লাকশারি বোট,' মন্তব্য করল রানা।

'এগারোজন প্যাসেঞ্জার আরাম-আয়েশের সঙ্গে থাকতে পারবে,' রানার পাশের সীট থেকে বলল মুরল্যান্ড। 'ওশান ডাইভার সিরিজের বোট, ম্যাসাচুসেটস-এর মেরিডিয়ান শিপইয়ার্ডে তৈরি। চারশো টন পানি সরায়, বারোশো ফুট গভীরে কাজ করতে পারে। রেঞ্জ মাত্র দুশো নটিকেল মাইল, কিন্তু নুমার এঞ্জিনিয়াররা বিশেষ ধরনের পাওয়ার জেনারেটর ব্যবহার করায় প্রতি দুশো মাইলে একবার এক ঘণ্টার জন্যে থেমে তিন হাজার মাইল পাড়ি দিতে পারে ওটা।'

বেইবি বাব্‌ল্‌-এর ডেকে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল কমান্ডার ডেভিড রামস্‌। মই তুলে নিয়েছে পাইলট জেফারসন, ভারী কিছু কার্গো নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে দু'জন ক্রু। এই কার্গো কুয়াকাটা থেকে সংগ্রহ করেছে ওরা।

'এসো, পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল মুরল্যান্ড। 'মাসুদ রানা, নুমার একজন প্রজেক্ট ডিরেক্টর, আমার বন্ধু।'

রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল ডেভিড রামস্‌। 'হ্যালো, মিস্টার রানা।'

'হ্যালো,' বলল রানা, তারপরই কাজের কথা পাড়ল। 'আপনার চীফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কাছ থেকে যথার্থ নির্দেশ পেয়েছেন তো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'বস্‌ বললেন, "বেইবি বাব্‌ল্‌কে রানার হাতে তুলে দেবে"।'

'গুড।' রানা খুশি, অ্যাডমিরালের প্রতি কৃতজ্ঞও। 'এটাকে আমরা একটা টর্পেডো বোট হিসেবে ব্যবহার করব।'

রামস্‌ রানার দিকে এমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল, ওর এক কান দিয়ে যেন ঘিলু গড়িয়ে পড়ছে। 'টর্পেডো বোট!' নিজের কানেই বিকৃত শোনাল গলাটা। 'আপনি একটা জাহাজকে ডুবিয়ে দেয়ার প্ল্যান করছেন? কি জাহাজ সেটা?'

'সেটা একটা লিকুইড ন্যাচারাল গ্যাস ট্যাংকার।'

এবার রামস্ কল্পনা করল, রানার অপর কান দিয়েও হলুদ পদার্থ গড়াচ্ছে। 'কেন?'

'কারণ ওই ট্যাংকারটা আমার দেশটা জ্বালিয়ে দিতে চাইছে,' রানার সোজা-সাপ্টা জবাব।

'কিন্তু বেইবি বাব্‌ল্-এ যেহেতু কোন টর্পেডো টিউব নেই, তার বদলে কি ব্যবহার করতে চান আপনি?'

হেলিকপ্টার থেকে নামানো জিনিসগুলোর দিকে তাকাল রানা। 'অপেক্ষা করুন। নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন। আসুন, আপনিও আমাদের সঙ্গে হাত লাগান কাজে, প্লীজ।'

বিশ মিনিট পর তিনজন মিলে লম্বা একটা পাইপ ফিট করল, স্পার হিসেবে কাজ করবে ওটা, বোটের বো থেকে সামনের দিকে ত্রিশ ফুট বেরিয়ে আছে। আরও দুটো পাইপ ফিট করা হলো উঁচু কেবিনের নিচে ডেক বরাবর। সময় নষ্ট না করে কমান্ডার রামস্ সুপারচার্জড ডিজেল এঞ্জিনগুলো স্টার্ট দিল। মুরল্যান্ড এখনও বো-তে ব্যস্ত, দুটো অতিরিক্ত স্পার-এর শেষ প্রান্তে ম্যাগনেটিক এক্সপ্লোসিভ ক্যানিস্টার জোড়া লাগাচ্ছে। প্রথম স্পার-এ এরই মধ্যে একশো পাউন্ড প্লাস্টিক আন্ডারওয়াটার চার্জ ফিট করা হয়েছে, একটা ডিটোনেটরের শেষ প্রান্তে।

রওনা হবার পর রামস্‌কে রানা জিজ্ঞেস করল, 'এটার টপ স্পীড কত?'

'সারফেসে পঁয়তাল্লিশ নট। পানির তলায় পঁচিশ।'

'ডোবার পর ম্যাক্সিমাম স্পীড দরকার হবে আমাদের,' বলল রানা। 'ম্যারাবু মার্ভেলের টপ স্পীডও পঁচিশ নট।'

এই সময় নুমার হেলিকপ্টার পাইলট একটা মেসেজ পাঠাল। সাবমেরিন বেইবি বাব্‌ল্ ও বাংলার সম্মান, দুটো জলযানই রিসিভ করল সেই মেসেজ। তাতে বলা হলো, 'সুপারট্যাংকার ম্যারাবু মার্ভেল পাটনি চরকে ডানে রেখে সুন্দরবনে ঢুকবে বলে মনে হচ্ছে...'

হ্যাঁ, মেসেজটা অসমাপ্ত। কারণটা আন্দাজ করা কঠিন কিছু নয়। রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে নুমার হেলিকপ্টারকে পোর্টেবল মিসাইল ছুঁড়ে সাগরে ফেলে দিয়েছে লীফ গডফ্রে হেরকুলের মার্সেনারিরা।

প্রাণ দিয়ে ওদেরকে সতর্ক করে দিয়ে গেল নুমার পাইলট। বাংলার সম্মানকে নিয়ে ঘুরলেন কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী, পাটনি চরকে বামে রেখে সুন্দরবনে ঢুকছেন আশা করছেন ম্যারাবু মার্ভেলের সামনে পৌঁছে বাধা দেয়া এখনও তাদের পক্ষে সম্ভব।

পাটনি চরকে বাঁয়ে রেখে কিছুদূর যাবার পরই কমোডরের বিনকিউলারে ধরা পড়ল মোহনা থেকে এতক্ষণে প্রকাণ্ড ম্যারাবু মার্ভেল নদীর ভেতর ঢুকছে। সঙ্গে সঙ্গে এলএনজি ট্যাংকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তিনি। 'আমরা বাংলাদেশ নেভি।

অনুগ্রহ করে এখুনি থামুন, এবং ইন্সপেকশন টীমকে রিসিভ করার প্রস্তুতি নিন।'

সাড়া না পাওয়ায় কাটার-এর ব্রিজে উত্তেজনা বাড়তে শুরু করল। আবার মেসেজ পাঠালেন ইলিয়াস চৌধুরী। তারপর আবার। কিন্তু না, কোন জবাব নেই। ম্যারাবু মার্ভেল স্পীড না কমিয়ে সুন্দরবনের ভেতরে ঢুকে পড়ছে। ব্রিজে উপস্থিত ক্রু ও ক্যাপটেন কমোডরের দিকে তাকিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে কখন তিনি অ্যাটাক করার নির্দেশ দেন।

তারপর অকস্মাৎ শান্ত একটা কণ্ঠস্বর ব্রিজের সবাইকে চমকে দিল। 'বাংলাদেশ নেভি, আমি ম্যারাবু মার্ভেলের মাস্টার। এই জাহাজকে থামাবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আপনাকে সৎ পরামর্শ দিয়ে বলা হচ্ছে, আমার জাহাজের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা হলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।'

সমস্ত অনিশ্চয়তা আর দ্বিধা কেটে গেল। আর কোন সন্দেহ নেই। দুঃস্বপ্ন নয়, এ বিভীষিকা বাস্তব সত্য। কমোডর ইলিয়াস ট্যাংকারের মাস্টারকে আলাপের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে পারেন, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন সুবিধে তিনি পাবেন বলে মনে হয় না। নৌ-বাহিনীর হেলিকপ্টারগুলো কিছুক্ষণ আগে পৌঁছেছে, পাইলটদের নির্দেশ দিলেন–স্ট্রাইক ও কমান্ডো টীমকে ট্যাংকগুলোর সামনের খোলা ডেকে নামাও। একই সঙ্গে বাংলার সম্মানের কামানগুলোয় গোলন্দাজ দাঁড় করালেন তিনি, তারপর ক্যাপটেন জাফর শিকদারকে নির্দেশ দিলেন, 'ম্যারাবু মার্ভেলের পাশে পৌঁছানোর চেষ্টা করুন।'

চোখে বিনকিউলার, দূর থেকে কিম্ভূতকিমাকার ট্যাংকারটার দিকে তাকিয়ে আছেন কমোডর। আল্লাহকে ধন্যবাদ যে সাগরের মুখ শান্ত, ডেকে নামতে হেলিকপ্টারগুলোর কোন সমস্যা হবে না।

লম্বা একটা রেডার-অ্যান্ড-ওয়াচ মাস্ট দাঁড়িয়ে আছে ট্যাংকারের বো-র আপার টিপ্ আর প্রথম গ্যাস ট্যাংকের মাঝখানে। প্রথম হেলিকপ্টারের পাইলট ল্যান্ড করার অবাধ ফাঁকা জায়গা দেখতে পেয়ে খুশি মনে এগোল সেদিকে, বো থেকে মাত্র বিশ ফুট ওপর দিয়ে।

চোখে বিনকিউলার, মিসাইলটাকে দেখতে পেয়ে দম আটকালেন কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী। প্রথম ট্যাংকের ওপর থেকে ছোঁড়া হলো মিসাইলটা। বারুদ ভর্তি একটা কৌটার মত ফেটে গেল হেলিকপ্টার। বিস্ফোরিত ফুয়েল ট্যাংকের আগুন গোটা কাঠামোকে গ্রাস করল চোখের পলকে। শূন্যে ভেসে থাকল দুই কি তিন সেকেন্ড, তারপরই পতন শুরু হলো। পানিতে পড়ার পর কমলা শিখা অদৃশ্য হলো। ভাঙাচোরা অসংখ্য টুকরো ভাসছে পানিতে, দেখে এখন আর বোঝার উপায় নেই যে এই একটু আগে ওগুলো একটা হেলিকপ্টারের অংশ ছিল। না, আবর্জনার মধ্যে কোন মানুষ নড়ছে না। জানা কথা কেউ তারা বেঁচে নেই।

ম্যারাবু মার্ভেল বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারের ওপর দিয়ে ছুটে যাবার সময় আপনমনে হাসছে কাকাস জাভালা। কয়েকজন লোক মারা গেছে, সেজন্যে এতটুকু অনুতপ্ত নয় সে। জন্ম-মৃত্যু ঈশ্বরের হাতে, ভাবল সে; তাছাড়া, আমাকে দিয়ে তিনিই তো এ-সব করিয়ে নিচ্ছেন। বিনকিউলারে চোখ রেখে নৌ-বাহিনীর কাটার-এ

দিকে তাকাতে আরও হাসি পেল তার। ওই কামান দিয়ে ট্যাংকারের কোন ক্ষতিই ওরা করতে পারবে না। তবে এখন ট্যাংকগুলোয় গোলা লাগলে সমস্যা হতে পারে। মার্সেনারিদের নির্দেশ দেয়া দরকার, বাংলার সম্মানকে নদীর মুখেই ডুবিয়ে দাও।

কিন্তু তার আগেই কমোডর চৌধুরীর নির্দেশে গর্জে উঠল বাংলাদেশ নেভির কাটারের কামান। ছিটকে ডেকে পড়ে গেল জাভালা। ব্রিজের ভেতর এক ঝাঁক মেশিন গানের বুলেটও ঢুকেছে, খেপা মৌমাছির মত ছুটোছুটি করে জানালার সমস্ত কাঁচ আর কন্ট্রোল কনসোল ভেঙে চুরমার করে ফেলল। হেলমে দাঁড়ানো মার্সেনারি সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। তার সহকারী গুরুতর আহত, ডেকে পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

দেয়াল ধরে সিধে হলো জাভালা। নেভির কাটার এক মাইল সামনে, ডিম্বাকৃতি একটা দ্বীপকে পাশ কাটাচ্ছে। ব্রিজ কাউন্টার থেকে ছোঁ দিয়ে রেডিওটা তুলে নিল সে। 'লঞ্চ সারফেস টু সারফেস মিসাইল! কুইক!'

পর পর দুটো মিসাইল ছুটে গেল। দুটোই লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ। নেভির কাটার ডুবে যাচ্ছে।

'রিপোর্ট ড্যামেজ!' নির্দেশ দিল জাভালা।

'পোর্ট জেনারেটর অচল হয়ে পড়েছে,' জবাব দিল চীফ এঞ্জিনিয়ার। 'তবে এঞ্জিনে কোন শেল লাগেনি। দু'জন লোক মারা গেছে। জেনারেটর ধ্বংস হয়েছে টোয়েনটি-ফাইভ মিলিমিটার রাউন্ড লাগায়।'

জাভালা খেয়াল করল, ট্যাংকার একদিকে একটু কাত হয়ে পড়েছে। 'ব্রিজ কন্ট্রোল ভেঙে গেছে, ট্যাংকারকে ওখান থেকেই চালাও তোমরা। থ্রী-ফাইভ-ফাইভ ফোর্সে ফিরিয়ে আনো, তা না হলে সামনের দ্বীপে ধাক্কা খাব আমরা।'

'ইয়েস, সার!'

জাভালা এরপর মার্সেনারিদের নির্দেশ দিল, 'ফায়ার সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল! কপ্টারটাকে ফেলে দাও!'

'চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা আটজন পোয়াতির মত লাগছে লিকুইড ন্যাচারাল গ্যাস ক্যারিয়ারকে,' মন্তব্য করল ডেভিড রামস্। কনসোল হেলম্-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, ম্যারাবু মার্ভেলের দিকে দ্রুত এগোচ্ছে।

'দুটো হেলিকপ্টার আর একটা কাটারকে বাতিল লোহায় পরিণত করেছে মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যে,' বলল মুরল্যান্ড, চোখ ঘুরিয়ে ভাসমান আবর্জনা দেখছে। ম্যারাবু মার্ভেল যতটা না কুৎসিত, তারচেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক।'

'এখন আমরা ছাড়া ওটাকে আর থামাবার কেউ নেই,' বলল রানা, চোখে বিনকিউলার সেঁটে তাকিয়ে আছে এক মাইল দূরের ছোট্ট একটা দ্বীপের দিকে। দ্রুতগতিতে ওই দ্বীপটার দিকেই এগোচ্ছে ম্যারাবু মার্ভেল। 'আমার ধারণা, ওই দ্বীপটাকে পাশ কাটাবার পর জাভালার আর সামনে এগোবার দরকার নেই। বিশ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে আগুন জ্বালতে পারলে সেটা চারদিকে না ছড়াবার কোন কারণ দেখি না।'

মুরল্যান্ড বলল, 'আমরা মাত্র একবার চেষ্টা করার সুযোগ পাব। ব্যর্থ হলে আবার ঘুরে ওটার দিকে এগোনো যাবে না। ট্যাংকারের স্পীড খুব বেশি। আমরা সারফেসে উঠে ওটাকে পাশ কাটাব, তারপর আবার ডুব দিয়ে দ্বিতীয়বার আঘাত করার জন্যে ফিরে আসব, এ সম্ভব নয়। তার আগেই দ্বীপটাকে পিছনে ফেলে অনেকটা এগিয়ে যাবে ওরা।'

তার দিকে ফিরে নিঃশব্দ হাসি দিয়ে মুক্তো ঝরাল রানা। 'সেক্ষেত্রে, এসো, প্রথমবারই সফল হই।'

তারপর ওদের দু'জনেরই মনে হলো বোট ও ট্যাংকারের মধ্যবর্তী দূরত্ব কমিয়ে আনতে সারাটা জীবন লেগে যাচ্ছে। এক সময় যখন এলএনজি ট্যাংকারের স্টারবোর্ড বো থেকে দুশো গজ দূরে চলে এল বেইবি বাব্‌ল্‌, ডেভিস রামস্‌ আস্তে করে থ্রটল টেনে নিয়ে ব্যালাস্ট ট্যাংক পাম্পের সুইচ অন করল। পরমুহূর্তে যেন কোন দানবের একটা হাত বেইবি বাব্‌ল্‌কে পানির নিচে টেনে নিল। ডুব দেয়া মাত্র স্পীড আবার বাড়িয়ে দিল রামস্‌। টপ স্পীডে ছুটল সাবমেরিন। এখন থেকে ভুল করবার কোন অবকাশ নেই।

রামসের সঙ্গে ব্রিজেই থাকল মুরল্যান্ড, মেইন কেবিন হয়ে বো-র কাছে চলে এল রানা, বিরাট ভিউইং পোর্ট দিয়ে বাইরেটা দেখবে। আরাম করে একটা সুইড কাউচে বসল ও, আর্মরেস্ট থেকে তুলে নিল একটা ফোন সেট। 'আমরা সংযুক্ত?' জিজ্ঞেস করল।

'স্পীকারে তোমাকে পাচ্ছি,' জানাল মুরল্যান্ড।

রামস্‌ আওড়াল, 'ওয়ান হানড্রেড ফিফটি ইয়ার্ডস। অ্যান্ড ক্রোজিং।'

'দৃষ্টিসীমা চল্লিশ ফুটেরও কম,' রিপোর্ট করল রানা। 'রেডারে কড়া নজর রাখো।'

'কমপিউটরে ট্যাংকারের একটা ইমেজ পাচ্ছি আমরা,' ব্রিজ থেকে জানাল মুরল্যান্ড। 'খোলের কোন অংশে আঘাতটা লাগল, তোমাকে আমরা জানাব।'

তিন মিনিট নয়, যেন তিনটে বছর কাটল।

'দূরত্ব একশো গজ,' রানাকে রিপোর্ট করল রামস্‌। 'সারফেসের ওপর ট্যাংকারের ছায়া দেখতে পাচ্ছি।'

ঘোলা পানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। প্রায় এক মিনিটের মাথায় সাদা ফেনা, আর তারপরই ফেনার ভেতর ম্যারাবু মার্ভেলের খোল দেখতে পেল। মাত্র ত্রিশ ফুট দূরে ও দশ ফুট ওপরে ট্যাংকারের প্লেটও ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠল। 'পেয়েছি ওটাকে!' তীক্ষ্ণ গলায় বলল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে জোড়া প্রপেলারকে উল্টো দিকে ঘোরাল রামস্‌, ম্যারাবু মার্ভেলের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটার আগেই গতি হারাল বেইবি বাব্‌ল্‌।

'বোট আরও দশ ফুট নামান, রামস্‌।'

'দশ ফুট নামাই,' স্বগতোক্তি করল রামস্‌, বেইবি বাব্‌ল্‌কে নামিয়ে আনল ম্যারাবু মার্ভেলের স্টারবোর্ড সাইডের সরাসরি নিচে। প্রপেলারের তৈরি কম্পন যেন দূরবর্তী পালস্‌, তবে একটু পরই সেটা মেশিন থেকে বেরিয়ে আসা বিকট গর্জনের মত বাজতে লাগল কানে। কিছু একটা ধরা পড়ল রানার চোখে, খোলের

তলায় ফুটে আছে বিরাট একটা বস্তু, জাহাজের তলির কাছে। কিন্তু তারপর জিনিসটা দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে গেল।

রামসের চোখ দুটোর বর্ধিত অংশ রানা। প্রকাণ্ড ব্রোঞ্জ প্রপেলারগুলো দৃষ্টিপথে চলে এলে একমাত্র ও-ই সিকি সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে জানাতে পারবে। প্রকাণ্ড ট্যাংকারের গতি ওর দৃষ্টিপথকে ঝাপসা করে তুলছে। কার্পেটে শুলো রানা, ভিউইং পোর্ট থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে চোখ, চোখের চারধার কুঁচকে সবুজাভ পানির ভেতর ম্যাগনেটিক এক্সপ্লোসিভ চার্জ খুঁজছে স্পার-এর শেষ মাথায়-স্পারটা বেইবি বাব্‌ল্‌-এর বো থেকে সামনের দিকে লম্বা হয়ে আছে। কিন্তু দেখতে পেল না, অস্থির পানিতে ঝাপসা হয়ে আছে।

'আপনি রেডি, রামস্‌?'

'ইয়েস!' আটকে রাখা দম ছাড়ল রামস্‌।

'বো-তে আপনি স্টারবোর্ড প্রপ দেখতে পাবেন আমি দেখতে পাবার তিন সেকেন্ড পর।'

অপেক্ষা। রানার হাতের গিঁট সাদা হয়ে গেল, মুঠোর ভেতর ফোনের রিসিভার ভেঙে না গেলেই হয়। তারপর সবুজাভ পর্দা ফাঁক হলো একরাশ সাদা বুদ্বুদ বিস্ফোরিত হওয়ায়। 'এখন!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

রামস্‌ বজ্রাঘাতের মত ক্ষিপ্র, থ্রটলগুলো সামনে ঠেলে দিল। বোটের সামনের দিকে একটা সংঘর্ষজনিত ধাক্কা অনুভব করল সে। থ্রটল টেনে আনল সঙ্গে সঙ্গে, প্রার্থনা করছে যেন দেরি করে না ফেলে।

অসহায় এবং অরক্ষিত, রানা শুধু তাকিয়ে দেখতে পারে; খোলের স্টীল প্লেটে ম্যাগনেটিক চার্জ আঘাত করল, সেঁটে থাকল এক মুহূর্ত, তারপর বিচ্ছিন্ন হলো রামস্‌ রিভার্সে ফুল স্পীড দিতে। প্রকাণ্ড প্রপেলার খুলে এল নিয়ন্ত্রণবিহীন একটা উইন্ডমিলের মত, সাগর ঘেঁষা নদীর পানিকে চকমকে ফেনায় পরিণত করছে।

বিরাট আকারের ব্লেড বা পাতগুলো ছুটে আসতে দেখে আঁতকে উঠল ওরা। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ওগুলোকে এড়াবার সাধ্য বেইবি বাব্‌লের নেই। সংঘর্ষ ঘটলে ভেঙে সহস্র টুকরো হয়ে যাবে বোট। ওরা পরিণত হবে ব্লেন্ডারে মিহি করা মাংসে। তবে একেবারে শেষ পলকে গর্জে উঠল বেইবি বাব্‌লের ডিজেল এঞ্জিন, ওটার নিজস্ব প্রপেলারগুলো ভয়ানক উন্মত্ততার সঙ্গে বিদ্যুৎবেগে পানি কাটতে শুরু করল। লাফ দিয়ে পিছাল সাবমেরিন। একই সঙ্গে এলএনজি ট্যাংকারের পঞ্চাশ-ফুট-ডায়ামিটার প্রপেলার চোখের পলকে বো ভিউ পোর্টকে পাশ কাটাল মাত্র দু'ফুট জায়গা ছেড়ে, সাবমেরিনকে কাঁপিয়ে দিল-ঘূর্ণিঝড়ে পড়া একটা গাছের মত।

ত্রিশ সেকেন্ড পর সোজা হলো বেইবি বাব্‌ল্‌। 'এখনই সময়, ববি,' ফোনে বলল রানা।

'তোমার ধারণা আমরা নিরাপদ দূরত্বে সরে এসেছি?'

'তোমাদের এই বোট এক হাজার ফুট নিচের ওয়াটার প্রেশার সহ্য করতে পারলে একশো গজ দূরের একটা বিস্ফোরণও সহ্য করতে পারবে।'

কালো রিমোট কন্ট্রোলটা দু'হাতে ধরে আছে মুরল্যান্ড। খুদে একটা লিভারে চাপ দিল সে। ভোঁতা অথচ জোরালো একটা আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজটাকে অনুসরণ করে এল প্রেশার ওয়েভ, সেটা বিশ ফুট উঁচু ঢেউ ও স্রোতের আকৃতি নিয়ে আঘাত করল সাবমেরিনকে। তারপর ধীরে ধীরে শান্ত হলো পানি।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ডেক লেভেলের ওপর মাথা তুলল রানা। 'বোট সারফেসে তুলুন, রামস্, দেখি কাজের কাজ কিছু করা গেছে কিনা।' মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল। 'সারফেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা চার্জ ফাটিয়ে দেবে তুমি।'

পনেরো

জাভালার মনে হলো, কেউ তার সঙ্গে কৌতুক করছে। ম্যারাবু মার্ভেলের গভীরে বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনেছে সে, ঝাঁকিটাও অনুভব করেছে, অথচ তারপরও এতটুকু উদ্বিগ্ন নয়–কারণ, বিশ মাইলের মধ্যে কোন ভেসেল বা এয়ারক্রাফট তার ওপর হামলা করার সাহস পাবে না। তারপর, জাহাজ যখন অনির্ধারিত বাঁক নিতে শুরু করল, এঞ্জিন রুমের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কোর্সে ফেরো, ইডিয়েট! দেখছ না আমরা ঘুরে যাচ্ছি?'

'কিসের আওয়াজ বলতে পারব না,' এঞ্জিন রুম থেকে জবাব ভেসে এল, 'তবে ওই আওয়াজটার পর আমরা আমাদের স্টারবোর্ড প্রপেলার হারিয়েছি।' চীফ এঞ্জিনিয়ার ভয়ানক উদ্বিগ্ন। 'আমি পোর্ট এঞ্জিন বন্ধ করার আগেই ওটার প্রপেলার জাহাজকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।'

'রাডার-এর সাহায্যে বিকল্প ব্যবস্থা করো।'

'সম্ভব নয়। তার আগে পোর্ট রাডারে কিছু একটা আটকেছে, পুরোপুরি জ্যাম, জাহাজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার জন্যে ওটাও কম দায়ী নয়।'

'তুমি এ-সব আমাকে কি শোনাচ্ছ?' খেঁকিয়ে উঠল জাভালা, এই প্রথম অস্থিরতা অনুভব করছে সে।

'সার, এ আমাদেরকে মেনে নিতে হবে,' ভয়ে ভয়ে হলেও, চীফ এঞ্জিনিয়ার স্পষ্ট স্বরেই কথা বলছে, 'হয় আমাদেরকে এভাবে লাটিমের মত ঘুরতে হবে, নয়তো পুরোপুরি থেমে স্রোতের সঙ্গে ভেসে যেতে হবে। এটাই সত্যি কথা, নিজেদের ইচ্ছায় কোথাও আমরা যেতে পারব না।'

এটাই পথের শেষ, অথচ পরাজয় মেনে নিতে রাজি নয় জাভালা। 'এত কাছে এসে হার মানব? ওই দ্বীপটাকে পাশ কাটাতে পারলে সুন্দরবনের হৃদয়ে পৌঁছে যাব আমরা। তারপর আগুন ধরাতে কেউ আমাদেরকে বাধা দিতে পারবে না। নদী ওখানে সরু, আগুনের কুণ্ড দুই তীরকেই নাগালের মধ্যে পেয়ে যাবে। এখানে, এই চওড়া নদীর একধারে আগুন ধরানো আর না ধরানো একই কথা। মানভূমিও এদিকে তেমন ঘন নয়।'

'সার, আপনি আমার কথা ভাল করে শুনছেন না। স্টারবোর্ড রাডার পোর্টের দিকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বেঁকে জ্যাম হয়ে গেছে, আর আমার স্টারবোর্ড প্রপেলার অকেজো হয়ে গেছে শ্যাফট ভেঙে যাওয়ায়। আমার ধারণা, এই গ্যাস ক্যান থেকে যত তাড়াতাড়ি নেমে যেতে পারব, আমাদের নিরাপত্তার জন্যে সেটা ততই ভাল হবে।'

জাভালা উপলব্ধি করল চীফ এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। পানির ওপর চোখ বুলাল সে। পিছনে ওটা একটা প্রাইভেট ইয়ট না? বোটটা দেখতে অদ্ভুত তো। দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে, এই সময় তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করল তার। যে ইয়টটাকে অদ্ভুত দর্শন বলে মনে হচ্ছিল, চোখের পলকে পানির নিচে ডুব দিল সেটা।

বেইবি বাব্‌ল্ পানির তলায় এমনভাবে ছুটছে, ওটা যেন একটা মাছ। রামস্ ভারি খুশি, কেননা তার ধারণা হয়েছে সাধের বোটটার হয়তো সত্যি কোন ক্ষতি হবে না। রেডার স্ক্রীনের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের সাহায্যে এগোচ্ছে সোজা ম্যারাবু মার্ভেলকে লক্ষ্য করে। 'আঘাতটা কোথায় লাগাতে চান?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'এঞ্জিন রুমের নিচে, স্টার্নের পোর্টসাইডে–ওই ট্যাংকগুলোর নিচের খোলে কোন বিস্ফোরণ ঘটাতে চাই না। বেশি সামনের দিকে বিস্ফোরণ ঘটলে গোটা জাহাজ বিস্ফোরিত হবে। তার রেজাল্ট কল্পনা করতে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। আটটা অগ্নিকুণ্ড চার দিকে ছুটবে দু'মাইল পর্যন্ত, যাবার পথে জলপ্রপাতের মত ঢেলে দিয়ে যাবে জ্বলন্ত তরল গ্যাস। শুধু সুন্দর বন নয়, কয়েকশো গ্রাম, কয়েক লক্ষ একর ধান খেত পুড়িয়ে আগুন কোথায় গিয়ে নিভবে একমাত্র আল্লাহই তা বলতে পারবেন।'

'আর আমাদের তৃতীয় ও শেষ চার্জটা?'

'একই এরিয়ায়, তবে স্টারবোর্ড সাইডে। আমরা যদি স্টার্নে বড় একটা গর্ত তৈরি করতে পারি, খুব তাড়াতাড়ি ডুবে যাবে ম্যারাবু মার্ভেল। আগুন থেকে সুন্দরবনকে রক্ষা করার এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়, ওটাকে ডুবিয়ে দেয়া।'

'মিসাইল আসছে!' চিৎকার করে জানাল রামস্। ভাগ্য ভাল, সাবমেরিনে লাগল না। জলমগ্ন কন্ট্রোল কেবিনকে এক হাত দূরে রেখে পাশ কাটাল, বিস্ফোরিত হলো একশো ফুটেরও কম দূরত্বে পানির সঙ্গে সংঘর্ষে।

'বুঝে ফেলেছে আমরাই ওদের বোট ভেঙেছি, তাই ক্ষেপে গিয়ে আন্ডারওয়াটার মিসাইল ছুঁড়ছে,' ভারী গলায় বলল মুরল্যান্ড। 'ঢিল মারলে পাটকেল তো খেতেই হবে।'

'কিন্তু ওদের পাটকেল এখনও আমাদেরকে লাগেনি,' বলল রানা। 'তাছাড়া, ট্যাংকারটাকে দেখে মনে হচ্ছে পানিতে একটা প্রকাণ্ড লাশ ভাসছে।'

'জাহাজটার রক্তখেকো ইঁদুরগুলো যদি পালাতে শুরু করে থাকে,' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড, 'ওদেরকে আমি পানিতে বোট নামাতে দেখছি না কেন?'

আবার অবজার্ভেশন ভিউ পোর্টের সামনে চলে এল রানা। ওর ধারণা কোবরা ক্লাবের সদস্যরা নিশ্চয়ই পালাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রশ্ন হলো কিভাবে পালাবে, কোথায় পালাবে? বোট না নামানোর তাৎপর্য কি? সাঁতার কেটে তীরে উঠবে, বাঘের পেটে যাবে বলে?

আবার ম্যারাবু মার্ভেলের খোল ভিউপোর্ট ঢেকে দিল। 'দেখতে পাচ্ছি, রামস্!'

এঞ্জিন রিভার্স করে গতি কমাল রামস্, অবিশ্বাস্য দক্ষতার সঙ্গে ম্যারাবু মার্ভেলের পাশে নিয়ে এল বেইবি বাব্‌লকে। তারপর স্পীড আবার বাড়িয়ে স্টার্ন সেকশনের পাশে চলে এল, যেখানে এঞ্জিন রুম মেশিনারি রাখা হয়।

কন্ট্রোল কেবিনে রয়েছে ববি মুরল্যান্ড, কমপিউটরাইজড আন্ডারওয়াটার রেডার সিস্টেম পরীক্ষা করছে গভীর মনোযোগের সঙ্গে। ধীরে ধীরে একটা হাত তুলল সে, তারপর নাড়ল সেটা। 'ত্রিশ ফুট পাশে চলে আসছে।'

রামস্ বেইবি বাব্‌লকে ঘোরাল। স্পার-এর শেষ মাথায় আটকানো চার্জ সরাসরি তাক করা হলো উল্টোদিকের অরক্ষিত এঞ্জিন রুমে। ম্যাগনেটিক চার্জ আঘাত করল খোলে। পরমুহূর্তে লাকশারি সাব দ্রুত পিছিয়ে এল। নিরাপদ দূরত্বে সরে আসার পর দাঁত থেকে নিঃশব্দে সাদা দ্যুতি ছড়াল মুরল্যান্ড। 'গুডবাই, টা-টা।' ডেটোনেটর সুইচে চাপ দিল সে। আরেকটা ভোঁতা আওয়াজ ভেসে এল কানে। প্রায় একই সঙ্গে বেইবি বাব্‌লকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল প্রেশার ওয়েভের ধাক্কা।

'হাইলি অ্যাডভান্সড এক্সপ্লোসিভ,' বলল রানা। 'যে গর্তটা তৈরি হয়েছে বলে ধারণা করছি, টর্পেডো ছুঁড়েও অত বড় গর্ত তৈরি করা যায় না।'

'ববি, তুমি আর আমি ভিজলে কোন সমস্যা আছে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রানা।

'কিসের সমস্যা!' আকাশ থেকে পড়ার ভান করল মুরল্যান্ড।

দ্রুত ওয়েট সুট পরল ওরা। ডাইভ গিয়ারে সজ্জিত হতে তিন মিনিটের বেশি লাগল না। সেফটি এস্কেপ চেম্বার হয়ে পানিতে বেরিয়ে এল দু'জন। স্পার-এর মাথায় আরেকটা চার্জ ফিট করে ফিরে আসতে ওদের সময় লাগল মাত্র সাত মিনিট। এয়ারলকের ভেতর ঢুকেছে ওরা, অমনি শেষ আঘাতটা হানার জন্যে বেইবি বাব্‌লকে নিয়ে ম্যারাবু মার্ভেলের দিকে ছুটল রামস্।

কন্ট্রোল কেবিনে ফিরে এল মুরল্যান্ড ও রানা। ইতিমধ্যে ট্যাংকারের খোলে চার্জ আটকে বেইবি বাব্‌লকে পিছিয়ে আনতে শুরু করেছে রামস্।

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল মুরল্যান্ড। রামস্ বলামাত্র রিমোট কন্ট্রোলের খুদে লিভারে চাপ দিল সে। চার্জ বিস্ফোরিত হলো, ম্যারাবু মার্ভেলে তৈরি হলো আরেকটা গর্ত।

'হাতের কাজ দেখার জন্যে সারফেসে একবার উঠব নাকি?' রানাকে জিজ্ঞেস করল রামস্।

'এখুনি নয়। তার আগে আমার একটা কাজ আছে।'

পায়ের তলায় হুইল হাউসের ডেক ঝাঁকি খেলো, দ্বিতীয় চার্জের বিস্ফোরণে ট্যাংকারের গায়ে তৈরি হলো আরেকটা গর্ত। জাভালার মনে হলো ঠিক তার

পায়ের তলায় বিস্ফোরণটা ঘটেছে। স্টার্ন সুপারস্ট্রাকচার থরথর করে কেঁপে উঠল। জাভালা দেখতে পাচ্ছে না, তবে কাছে ও দূরের যে-সব জেলেরা নৌকা নিয়ে এলাকা ছেড়ে পালাতে পারেনি তারা দেখল কিম্ভূতকিমাকার ট্যাংকারের বো ধীরে ধীরে পানি ছেড়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছে।

জাভালা ভেবেছিল বিস্ফোরণের ফলে যতই ক্ষতি হোক, ট্যাংকার অচল হয়ে পড়বে না, দ্বীপটাকে পাশ কাটিয়ে আরও দশ কিলোমিটার এগিয়ে নদীর সরু অংশে ঠিকই পৌঁছাতে পারবে তারা। শুধু ওখানে আগুন ধরালেই কাজ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই; কাজেই সময়ের আগে এবং জায়গামত না পৌঁছে গোণা-গুণতি কয়েকটা গাছে আগুন লাগিয়ে শত্রুর চোখে হাস্যাস্পদ আর মনিবের চোখে ঘৃণ্য অদক্ষ প্রমাণিত হতে রাজি নয় সে।

কিন্তু পরবর্তী বিস্ফোরণটা তার চিন্তা-ভাবনা এলোমেলো করে দিল। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে ম্যারাবু মার্ভেলের ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে গেল। ট্যাংকারটা দুশো ফুট পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে।

এঞ্জিনের আওয়াজ আগেই থেমে গেছে। ব্রিজে, ক্যাপটেনের চেয়ারে বসে মুখ ও হাত থেকে রক্ত মুছছে জাভালা, উইন্ডশীল্ডের ভাঙা কাঁচের টুকরো এসে চামড়া কেটে দিয়ে গেছে। তার ধারণা, এঞ্জিন রুম থেকে ওরা কেউ পালাতে পারেনি। দুটো গর্ত থেকে টন-কে-টন পানি ঢুকছে ভেতরে, পালাবার সময়ই পায়নি তারা।

দাঁড়াল জাভালা। এক হাতে কপালের ক্ষতটায় তোয়ালে চেপে ধরে আছে, অপর হাতটা বাড়িয়ে একটা কেবিনেটের দরজা খুলল। প্যানেল ভর্তি সুইচগুলোর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল সে। তারপর হাত লম্বা করে টাইমার সেট করল বিশ মিনিটে। মাথাটা ঠিক মত কাজ করছে না, ভেবে দেখল না অতিকায় ট্যাংকগুলোর প্রোপেইন বিস্ফোরিত হবার আগেই ম্যারাবু মার্ভেল পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে। বিশ মিনিট খুব কম সময় নয়।

জাহাজের বাইরের দিকের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল শেরম্যান, জাভালার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। তার সারা শরীরে দশ-বারোটা ক্ষত থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

'এলিভেটরে চড়োনি?' জিজ্ঞেস করল জাভালা, জানে উত্তরটা কি হবে।

'ওটা চলছে না,' শেরম্যান হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। 'দশটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হলো আমাকে।'

'তোমার উচিত ছিল সরাসরি এস্কেপ সাব-এ চলে যাওয়া।'

'আপনাকে ছাড়া কোথাও আমি যাব না।'

'তোমার এই বিশ্বস্ততার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

'আপনি চার্জ সেট করেছেন?'

'বিশ মিনিট পর সবগুলো এক সঙ্গে ফাটবে।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে শেরম্যান বলল, 'একমাত্র ভাগ্যই বলতে পারে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পারব কিনা।'

অকস্মাৎ কেঁপে উঠল জাহাজ। পিছন দিকে কাত হয়ে পড়ল বেশ কিছুটা।

'লোকজন সব পালাতে পেরেছে?' জিজ্ঞেস করল জাভালা।

'আমার ধারণা, যারা পেরেছে তারা এতক্ষণ সাব-এ পৌঁছে গেছে। তবে মারা গেছে বেশ কয়েকজন। সার, আমাদের কিন্তু দেরি করা উচিত হচ্ছে না।'

'হ্যাঁ, চলো।'

এস্কেপ সাব-এর খোলা হ্যাচে পৌঁছাল ওরা হাঁটু সমান পানি ভেঙে। ট্যাংকারের স্টার্ন দ্রুত ডুবে যাচ্ছে।

হ্যাচ গলে মেইন প্যাসেঞ্জার কেবিনে সবার শেষে নামল জাভালা। চীফ এঞ্জিনিয়ারকে দেখা গেল ওখানে, মুখোমুখি সীটে বসে রয়েছে আরও দু'জন। জাভালা ধরে নিল তার টীমের বাকি সবাই মারা গেছে।

চীফ এঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে কন্ট্রোল ককপিটে ঢুকল জাভালা। পাশাপাশি বসল ওরা। ব্যাটারির সুইচ অন করা হলো।

ওদের মাথার ওপর থেকে ম্যারাবু মার্ভেলের কর্কশ ধাতব গোঙানি ভেসে আসছে, বো শূন্যে উঠছে বলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে গোটা কাঠামো। আর মাত্র কয়েক মিনিট, তারপরই গোত্তা খেয়ে নদীর গভীরে নেমে যাবে ট্যাংকার।

প্রপালশান মোটর চালু করতে যাবে জাভালা, বুদ্বুদ আকৃতির উইন্ডশীল্ডের বাইরে চোখ পড়তে ঘোলা জলের ভেতর দিয়ে অদ্ভুত আকৃতির একটা জলযানকে এগিয়ে আসতে দেখল সে। প্রথমে ভাবল কোন লঞ্চ বা ছোট স্টীমার হবে, যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে ডুবে যাচ্ছে। তারপরই অদ্ভুতদর্শন ইয়টটার কথা মনে পড়ে গেল তার, যেটাকে সে পানির নিচে ডুব দিতে দেখেছিল। জলযানটা যত কাছে আসছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে লম্বা ধাতব স্পার, বো থেকে বেরিয়ে আছে। অকস্মাৎ রহস্যময় বোটটার উদ্দেশ্য জাভালার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

ছুটে এসে আঘাত করল বেইবি বাব্‌ল-এর স্পার। এলএনজি ট্যাংকারের খোল আর এস্কেপ সাব যেখানে জোড়া লেগে এক হয়ে আছে, ঠিক সেখানে, ওই জোড়া লাগানোর মেকানিজমে লাগল আঘাতটা। রিলিজ পিনগুলো জ্যাম করে দিয়েছে। জাভালার মুখ আড়ষ্ট হয়ে গেল, যেন প্লাস্টার করা একটা ডেথ মাস্ক। উন্মত্তের মত রিলিজ মেকানিজমের হাতল ঘোরাবার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু তার ভাগ্যের চাকা থেমে গেছে, আর ঘুরবে না।

চীফ এঞ্জিনিয়ার চিৎকার করছে, 'আমরা খোল থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি না কেন?' আতংকে বিকৃত হয়ে উঠল গলা। 'তাড়াতাড়ি করুন। তা না হলে জাহাজের নিচে চাপা পড়ে সাব চ্যাপ্টা হয়ে যাবে!'

হাতল ধরে এখনও টানা-হ্যাঁচড়া করছে জাভালা, সবুজাভ ঘোলা পানির দিকে তাকাতে অদ্ভুতদর্শন জলযানটার বিরাট ভিউ পোর্টে একজন লোককে বসে থাকতে দেখল সে। চেহারাটা চিনতে না পারার কোন কারণ নেই। সেই কালো চুল, বড় আকৃতির চোখে হিম দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে নির্মম এক চিলতে হাসির রেখা। 'রানা!' হাঁপিয়ে উঠল সে। পরমুহূর্তে সাবকে তলায় নিয়ে দ্রুতবেগে নামতে শুরু করল ট্যাংকার। জাভালার চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল বেইবি বাব্‌ল, মাসুদ রানা, পৃথিবীর সৌন্দর্য, আলো ও বাতাস, তার পরিচিত গোটা জগৎ–চিরকালের জন্যে।

নদীর নিচে শুধু চ্যাপ্টা নয়, পলিমাটির অনেক গভীরে কবর হয়ে গেল তার। কবরের ঢাকনি হিসেবে থাকল আট গম্বুজ বিশিষ্ট ম্যারাবু মার্ভেল।

ষোলো

এ নিয়ে পরপর তিন দিন কংগ্রেশন্যাল কমিটির শুনানি চলছে। অন্যান্য দিনের মত আজও সকাল থেকে জেরা করা হচ্ছে লীফ গডফ্রে হেরকুলকে, মাঝখানে লাঞ্চের জন্যে এক ঘণ্টা বিরতি ছিল, এখন বাজে রাত ন'টা। সব মিলিয়ে আট ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়েছে দুনিয়ার অন্যতম ধনী রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীকে।

হেরকুল একা নয়, তার সঙ্গে অ্যাটর্নিদের একটা বাহিনীও উপস্থিত। কিন্তু কমিটির চেয়ারপারসন তাদেরকে প্রায় কোন কথাই বলতে দিচ্ছে না। তার যুক্তি হলো, প্রতিষ্ঠান হিসেবে ফ্যালকন করপরেশন আর ব্যক্তি হিসেবে সিনেটর হেরকুলের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ সহ গুরুতর অসংখ্য অপরাধের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে কমিটির কাছে, সেগুলো সম্পর্কে যা কিছু বলবার একমাত্র সিনেটর হেরকুলকেই বলতে হবে, অন্য কারও আইনী ম্যারপ্যাচের কথা কমিটি শুনতে আগ্রহী নয়।

কি কি অকাট্য প্রমাণ?

প্রথম প্রমাণ: ফ্যালকন হেডকোয়ার্টারের কমপিউটরে হানা দিয়ে নুমার কমপিউটর জাদুকর ল্যারি কিং যুক্তরাষ্ট্রের আটচল্লিশটা রাজ্যের একটা ম্যাপ পেয়েছে, সেই ম্যাপে দেখা যাচ্ছে এক ঝাঁক কালো রেখা দেশ ও বিদেশের তেলখনি থেকে রিফাইনারি, রিফাইনারি থেকে বড় বড় শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। এটা হলো হেরকুল ও ফ্যালকনের নেতৃত্বে গঠিত একটা কার্টেলের অয়েল ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম। এই তেলখনিগুলো বেশিরভাগ তেলশূন্য, ঘুষ দিয়ে এ-ধরনের রিপোর্ট আদায় করা হয় এক্সপার্টদের কাছ থেকে, তারপর সেগুলো কিনে নিয়ে মাটির তলায় পাইপ লাইন বসিয়ে রিফাইনারিতে ক্রুড অয়েল নিয়ে যাওয়া হয়।

দ্বিতীয় প্রমাণ: একটা কমপিউটর ডিস্ক, যাতে আছে হেরকুল ও ফ্যালকনের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহীতা রাজনীতিক ও সরকারী কর্মকর্তাদের নামের তালিকা।

তৃতীয় প্রমাণ: ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে তাড়া খেয়ে পালায় পাকিস্তানে, কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাকে গ্রেফতার করে তুলে দিয়েছে সিআইএ-র হাতে। নাম বোরহানউদ্দিন রাখাইন। বোরহান স্বীকার করেছে, চট্টগ্রামের বহির্নোঙ্গরে নোঙর ফেলা সুপারট্যাংকার ব্রাইট ব্লুর খোলে লিমপেট মাইন ফিট করতে গিয়ে নৌ-বাহিনীর ফ্রগম্যানদের হাতে যে পাঁচজন ডুবুরি ধরা পড়েছে তারা তারই দলের, রাখাইন সম্প্রদায়ের লোক। এক প্রশ্নের উত্তরে বোরহান জানিয়েছে, ফ্যালকন করপরেশনের সম্পর্ক আছে এরকম একটা ভারতীয় কোম্পানির কাছ থেকে আগেও সে প্রচুর টাকা পেয়েছে। এবারকার এই কাজটার জন্যে তাকে দেয়া হয়েছে পাঁচ কোটি টাকা।

শুনানি চলাকালে বাংলাদেশে হেরকুলের ডান হাত কাকাস জাভালা আর তার

মার্সেনারিরা কি কাণ্ড করেছে, তারও বিস্তারিত একটা রিপোর্ট পড়ে শোনানো হলো।

কাকাস জাভালা মারা গেছে, সুন্দরবন অক্ষত আছে, এ-খবর শুনে চেয়ার থেকে পড়ে যাবার অবস্থা হলো হেরকুলের। অ্যাটর্নিরা হৈ-চৈ তুলে দাবি জানাল, উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আজকের মত শুনানি এখানে শেষ করা হোক।

লরেলি রাজি হলো, তবে শর্ত দিল, 'কিন্তু কাল সকালে আমরা ন'টা থেকে বসব, এক ঘণ্টা আগে। এবং কাল সিনেটর হেরকুল চুপ করে থাকলে নিজের ক্ষতি ডেকে আনবেন–সেটা একশো বছরের জেলও হতে পারে।'

পরদিন সকালে বেড রুমে লীফ গডফ্রে হেরকুলের লাশ পাওয়া গেল। এফবিআই এক্সপার্টরা লাশ পরীক্ষা করে জানাল, 'আত্মহত্যা। কপালে, ক্ষতের পাশে প্রচুর গান পাউডার রয়েছে।'

নুমা বিল্ডিঙে ঢুকে এবার সরাসরি অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের চেম্বারে চলে এল রানা ও মুরল্যান্ড, আশপাশে কোথাও ল্যারি কিংকে দেখতে পেল না। নুমা চীফ তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফকে নিয়ে ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। ঘন ঘন পাইপে টান দিচ্ছিলেন, সেটা নামিয়ে চেয়ার ছেড়ে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়লেন, করমর্দনের জন্যে বাড়িয়ে দিলেন হাতটা। 'গ্রেট জব, রিয়েলি আ গ্রেট জব,' পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। রানার হাতটা বারবার ঝাঁকাচ্ছেন। 'আইডিয়াটা সত্যি ব্রিলিয়ান্ট–একটা স্পারের মাথায় আন্ডারওয়াটার এক্সপ্লোসিভ ভর্তি ম্যাগনেটিক ক্যানিস্টার। জাহাজটার অর্ধেক স্টার্ন উড়িয়ে দিয়েছে, অথচ প্রোপেইন ট্যাংকগুলোকে বিপদের মধ্যে ফেলেনি।'

'আসলে ভাগ্যগুণে ওটা কাজ করেছে,' নিজের কৃতিত্ব চিরকালই ছোট করে দেখাতে অভ্যস্ত বিনয়ী মাসুদ রানা।

রেডক্লিফও রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। 'নদী পরিষ্কার করতে নিশ্চয়ই খুব ঝামেলা হবে, তাই না, মিস্টার রানা?'

'তা তো একটু হবেই। তবে এ-ও ভেবে দেখতে হবে পরিণতি আরও কত ভয়ংকর হতে পারত।'

'তোমার বসের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে,' অ্যাডমিরাল বললেন। 'কোন স্যালভিজ কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করার দরকার নেই, নুমাই নিজ খরচে কাজটা করে দেবে। ট্যাংকগুলোর মাথা সারফেস থেকে মাত্র ত্রিশ ফুট নিচে। ডাইভারদের জন্যে পাইপ ফিট করা কোন সমস্যা নয়, তারপর পাম্প করে অন্য একটা এলএনজি ট্যাংকারে সব গ্যাস সরিয়ে নিলেই হবে।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার হ্যামিলটন।'

'প্লেন জার্নি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ তোমরা,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ভাইকিংদের গুপ্তধন আর ডক্টর ইসলামের ফর্মুলা খুঁজতে বেরুবার আগে যাও দুটো দিন বিশ্রাম নিয়ে নাও।'

'গুপ্তধন খুঁজতে হবে না, মিস্টার হ্যামিলটন,' বলল রানা। 'ডক্টর ইসলাম ম্যাপ এঁকে বলে দিয়ে গেছেন কোথায় আছে।'

'ভাল কথা,' রেডক্লিফ বললেন, 'কিং বলছিল সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, মিস্টার রানা।'

নুমা হেডকোয়ার্টারের কমপিউটর ফ্লোরে এসে ল্যারি কিংকে ছোট একটা স্টেট রুমে পেল রানা, ডক্টর সিরাজুল ইসলামের লেদার ব্রিফকেসের ভেতর একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। রানাকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকাল সে, হাত তুলে ব্যাগের ভেতরটা ইঙ্গিতে দেখাল। 'একেবারে সময় মত এসেছ, দোস্ত। এখন থেকে ঠিক ত্রিশ সেকেন্ড পর এটায় তেল ভরা শুরু হবার কথা।'

'তারমানে আগের মতই নির্দিষ্ট একটা টাইমটেবল্ ধরে ঘটছে ব্যাপারটা?'

'হ্যাঁ, ঘড়ির কাঁটা ধরে। ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টা পরপর তেলে ভরে উঠতে শুরু করে।'

'কোন ধারণা আছে, ব্যাপারটা সব সময় আটচল্লিশ ঘণ্টা পর পর কেন ঘটছে?'

'এটা নিয়ে কাজ করছে ভীনাস,' বলল কিং, ভারী স্টীলের দরজা বন্ধ করে দিল-এ-ধরনের দুর্ভেদ্য দরজা শুধু ব্যাংক ভল্টে ব্যবহার করা হয়। 'সেজন্যেই তোমাকে আমি স্টেট রুমে ডেকেছি। আগুন লাগলে গুরুত্বপূর্ণ ডাটা নষ্ট হতে পারে, তাই এটার দেয়াল ইস্পাতের তৈরি। রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, সাউন্ড, লাইট–এই দেয়াল ভেদ করে কিছুই ঢুকতে পারবে না।'

'অথচ তারপরও ব্যাগটা তেলে ভরে যাচ্ছে?'

'নিজের চোখেই দেখো।' হাতঘড়ির ওপর চোখ রাখল কিং, আঙুলের গিঁট দিয়ে শেষ কয়েকটা সেকেন্ড গুণছে। 'এবার!' হিস হিস করল সে।

রানার চোখের সামনে ডক্টর ইসলামের লেদার কেস তেলে ভরে উঠছে, যেন অদৃশ্য কোন হাত থেকে ঢালা হচ্ছে জিনিসটা। 'এ কোন ধরনের চালাকি না হয়ে যায় না।' মাথা নাড়ছে রানা।

'ভুল।' ঢাকনি বন্ধ করে দিল মুরল্যান্ড। 'এর মধ্যে কোন চালাকি নেই।'

'কিন্তু...তাহলে কিভাবে?'

'ভীনাস আর আমি অবশেষে উত্তরটা খুঁজে পেয়েছি। ডক্টর ইসলামের এই কেস আসলে একটা রিসিভার।'

'কিছুই বুঝলাম না,' বলল রানা, বিমূঢ়।

ভারী স্টীল ডোর খুলে রানাকে নিয়ে নিজের সফিস্টিকেটেড কমপিউটর সিস্টেমের কাছে ফিরে এল কিং। নিজের স্টেজে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল রূপসী, উদ্ভিন্নযৌবনা শ্রীমতী ভীনাসকে। ওদেরকে দেখে হাসল সে। 'হাই, রানা, আই মিসড্ ইউ।'

হেসে ফেলল রানা। 'আমি ফুল আনতে পারতাম, কিন্তু তুমি তো ধরতে পারবে না।'

'বস্তু বা পদার্থ না থাকাটা হাসির কোন ব্যাপার নয়, এই আমি তোমাকে বলে দিলাম।'

'ভীনাস,' বলল কিং, 'রানাকে শোনাও ডক্টর ইসলামের লেদার কেস সম্পর্কে

আমরা কি জানতে পেরেছি।'

'আমার সার্কিট বোর্ডকে প্রবলেমটা দিতে,' বলল ভীনাস, 'সমাধান পেতে এক ঘণ্টাও লাগেনি।' রানার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল সে, ওর প্রতি যেন তার বিশেষ অনুভূতি আছে। 'কিং তোমাকে বলেছে কেসটা আসলে একটা রিসিভার?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কি ধরনের রিসিভার?'

'কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন।'

রানা ভীনাসের দিকে তাকিয়ে থাকল। 'তা সম্ভব নয়। বর্তমান ফিজিক্সের বাস্তবতায় টেলিপোর্টেশন অসম্ভব।'

'অ্যানালিসিস শুরু করার সময় আমি আর কিং-ও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এটা ফ্যাক্ট, বাস্তব সত্য। এই কেসে যে তেল আসছে সেটা এমন কোন একটা চেম্বারে প্রথমে রাখা হচ্ছে যে চেম্বারে এই তেলের প্রতিটি অ্যাটম ও মলিকিউল গণনা করা হয়। তারপর তেলটাকে বদলে কোয়ান্টাম অবস্থায় নিয়ে গিয়ে রূপান্তর ঘটানো হয় রিসিভিং ইউনিটে–সেন্ডিং চেম্বারের হিসাব অনুসারে অ্যাটম ও মলিকিউলের সংখ্যা ঠিক রেখে। বুঝতেই পারছ, অসম্ভব জটিল একটা পদ্ধতিকে তোমার সামনে জলবৎ তরলং করে পরিবেশন করছি। আমার কাছে এখনও যেটা অবিশ্বাস্য ঠেকছে, নিরেট বাধার ভেতর দিয়ে কিভাবে পাঠানো হচ্ছে তেলটা, তা-ও আলোর গতিতে।'

'জানো তুমি কি বলছ?' জিজ্ঞেস করল রানা, নিজেকে সম্মোহিত মনে হচ্ছে ওর।

'অবশ্যই আমরা জানি,' জবাব দিল ভীনাস। 'এটা অবিশ্বাস্য সায়ান্টিফিক ব্রেকথ্রুর একটা প্রমাণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে এ নিয়ে খুব বড় কিছু আশা না করাটাই ভাল। মানুষকে টেলিপোর্টেশনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে পাঠিয়ে দেয়া কোনকালেই সম্ভব হবে না। এমনকি, এ যদি সম্ভব হয় যে একজন মানুষকে এক হাজার মাইল দূরে পাঠিয়ে দেয়া গেল এবং এক হাজার মাইল দূর থেকে তাকে গ্রহণও করা গেল, তারপর অ্যাটম ও মলিকিউল একত্রিত করে আবার রি-ক্রিয়েট করলাম তাকে, তাহলেও সমস্যা দেখা দেবে–তার মন ও মাথায় গাঁথা স্মৃতি ও তথ্য তো টেলিপোর্টেড হবে না, যা সে সারা জীবন ধরে সঞ্চয় করেছে। রিসিভিং চেম্বার থেকে সদ্যোজাত একটা শিশুর ব্রেইন নিয়ে বেরিয়ে আসবে সে। তেল কি? লিকুইড হাইড্রোকার্বন ও অন্যান্য মিনারেল দিয়ে তৈরি। মানুষের তুলনায় তেলের মলিকিউলার-এর গঠন অনেক অনেক কম জটিল।'

একটা চেয়ারে বসে পড়ল রানা, মরিয়া হয়ে টুকরোগুলো জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছে। 'এটা খুবই বিস্ময়কর যে ডক্টর ইসলাম যখন একটা বৈপ্লবিক ডাইনামিক এঞ্জিন তৈরি করছিলেন, প্রায় ওই একই সময়ে কাজ করার মত একটা টেলিপোর্টারও আবিষ্কার করে গেছেন।'

'ওই ভদ্রলোক ছিলেন বিরল একটা প্রতিভা,' বলল ভীনাস। 'এখন দেখো তোমরা তাঁর সেন্ডিং চেম্বারটা খুঁজে পাও কিনা। ওটা পেলে পরীক্ষা করে দেখতাম, তাঁর এই আবিষ্কার কিভাবে মানুষের কাজে লাগানো যায়।'

'ভাইকিং জলদস্যুদের গুপ্তধনের যে ম্যাপ তিনি দিয়ে গেছেন, আমার ধারণা সেখানেই পাওয়া যাবে তাঁর গোপন ব্যক্তিগত ল্যাবরেটরিটাও,' বলল রানা। 'আর ওই ল্যাবেই টেলিপোর্টেশনের সেন্ডিং চেম্বারটা থাকার কথা।'

'ভেরি গুড। পেলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো,' বলল ভীনাস।

'অবশ্যই। আশা করি কালই সব পেয়ে যাব আমরা,' বলল রানা। 'ম্যাপ যখন আছে,খুঁজে বের করতে খুব বেশি সময় লাগবে না।'

ছাব্বিশ ফুট লম্বা নুমার একটা ওঅর্ক বোট নিয়ে রওনা হয়েছে ওরা, হাডসন নদী ধরে উজানের দিকে যাচ্ছে। সেনসর থেকে আসা সিগন্যাল সাইড-স্ক্যান সোনার-এর রেকর্ডিং ইউনিটে পাঠানো হচ্ছে, মুরল্যান্ড তাকিয়ে আছে রঙিন থ্রী ডাইমেনশনাল ডিসপ্লে-র দিকে, তাতে নদীর তলা, জলমগ্ন পাথর, গভীর গহ্বরের মুখ ইত্যাদি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

হাল ধরেছে তৃষা, রানার পরামর্শ অনুসারে খুব সাবধানে চালাচ্ছে ওঅর্ক বোটটাকে। আজ খাকি শর্টস পরেছে সে, শার্টটা নীল সুতি। পিঠে বিশাল একটা বেণী ঝুলছে, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। সব মিলিয়ে ভারি আকর্ষণীয়া লাগছে তাকে, তবে সেটা উপভোগ করার সুযোগ নেই রানার। কারণ ওঅর্ক বোটের বো-র কাছে একটা লন চেয়ারে বসে আছে ও, হাতে কাপ ভর্তি কালো কফি।

নদীর দু'পাশ তৈরি হয়েছে আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা লাভা পাথর দিয়ে। যতদূর দৃষ্টি যায় পাহাড়ী এলাকা। গাছপালা প্রায় নেই বললেই চলে।

'বাবার ফার্ম পড়বে আর দুশো গজ সামনে,' ওদেরকে জানাল তৃষা।

'কোন রিডিং, ববি?' উইন্ডশীল্ড খুলে যেতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'পাথর আর পলি,' সংক্ষেপে জবাব দিল মুরল্যান্ড। 'পলি আর পাথর।'

'পাথরের তৈরি ঢাল-এর খোঁজে চোখ খোলা রাখো।'

'তোমার ধারণা ডক্টর ইসলামের ম্যাপে যে গহ্বর বা গুহার কথা বলা হয়েছে সেটা মাদার নেচার ঢেকে দিয়েছে?'

'আমার ধারণা, কোন মানুষ–ডক্টর ইসলাম নিজে।'

'একশো গজ,' সাবধান করার সুরে বলল তৃষা।

দশ মিনিট পর এক গাদা পাথরের একটা স্তূপ সত্যি সত্যি ফুটে উঠল ডিসপ্লেতে, দেখে মনে হলো পাথরগুলো মানুষের হাতে সাজানো। পাথরের গায়ে অস্পষ্ট বাটালির দাগ। কিন্তু সোনার কোন টানেল বা গুহার লক্ষণ প্রকাশ করছে না। তবে রানা যুক্তি দেখাল, পানির নিচে নিজেদেরকে নেমে দেখতে হবে, কারণ এই জায়গায় ডক্টর ইসলামের স্টাডি-র ঠিক নিচে–অন্তত ম্যাপে সেরকমই দেখা যাচ্ছে।

ওয়েট স্যুট, অক্সিজেন বটল, ওয়েট বেল্ট, দস্তানা, ফিন আর হুড পরে তৈরি হলো ওরা। পানির ওপর পিঠ দিয়ে আছাড় না খেয়ে একটা মই বেয়ে পানির দশ ফুট নিচে নেমে এল- আগে রানা, পিছনে মুরল্যান্ড।

পাথরের স্তূপটা বিশাল, দু'জন দু'দিক থেকে কাজ শুরু করল। আধ ঘণ্টা

পর পর বোটে ফিরে এল ওরা, প্রতিবার একমত হলো যথেষ্ট পাথর সরানো হয়নি। সারাটা দিন এই রকম চলল। দুপুরের দিকে ওরা আবিষ্কার করল, স্তূপটা আসলে প্রায় এক মাইল লম্বা, শ্যাওলায় ঢাকা পড়ে থাকায় প্রথমে বোঝা যায়নি। কোন মানুষ এটা তৈরি করেনি। হতে পারে টানেল থেকে বেরুবার সময় কিছু পাথর সরানো হয়েছিল, পরে আবার তা সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

বেলা দুটোর পর ক্লান্ত হয়ে বোটে ফিরে এসে বসে থাকল মুরল্যান্ড। তৃষাকে বলল, 'কোথাও আমাদের নির্ঘাত ভুল হয়েছে। এত বড় পাথরের স্তূপের তলায় গুহার মুখটা ঢেকে রেখে গেছেন ডক্টর ইসলাম, এ স্রেফ সম্ভব নয়।'

ঠিক এই সময় পানির ওপর মাথা তুলে অক্সিজেন মাস্ক খুলে রানা বলল, 'একটা টানেল পেয়েছি!'

আর কিছু বলতে হলো না। তিন মিনিট পর দেখা গেল রানার পিছু নিয়ে স্রোতের বিরুদ্ধে এগোচ্ছে মুরল্যান্ড ও তৃষা। চারদিকে পাথুরে আবর্জনা, শ্যাওলা জমে পিচ্ছিল হয়ে আছে। টানেলটা সরু। রানা শুধু মুখটা উন্মুক্ত করেছে। ভেতরটা ফাঁকাই ছিল। কতদূর এল, তৃষার কোন ধারণা নেই। হঠাৎ অনুভব করল তার একটা হাত ধরে টান দিচ্ছে রানা। নিজেকে ওর হাতে ছেড়ে দিল সে। কয়েক সেকেন্ড পর রানার সঙ্গে সে-ও পানির ওপর মাথা তুলল।

তিনজনের মাথা একযোগে উঠে এল পানি থেকে। মাউথপীস খুলল ওরা, পিঠ থেকে অক্সিজেন বটল নামাল, হেলমেট খুলল, তারপর চারদিকে চোখ বুলাতে গিয়ে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়ল। এটা অবিশ্বাস্য আকৃতির বিশাল এক গুহা। ওদের মাথার ওপর ছাদটা দুশো ফুট ওপরে। কি আবিষ্কার করেছে পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও হকচকিয়ে গেছে ওরা।

সতেরো

পানি থেকে চার ফুট উঁচু বিশাল একটা কারনিসে কাঠের তৈরি ছয়টা বোট পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হয়েছে দোলনাকৃতির কাঠামোতে আটকে–ছয় জাহাজের একটা মিছিলের মত লাগছে দেখতে। বোটগুলো ওক কাঠের তৈরি, সবচেয়ে বড়টা ষাট ফুট লম্বা। টানেলের পানিতে পড়া রোদের প্রতিফলন সুগঠিত খোলগুলোর গায়ে আলো ফেলে বিচিত্র সব নকশা তৈরি করছে।

'ওগুলো ভাইকিংদের জাহাজ,' বিহ্বল তৃষা ফিসফিস করল। 'কতকাল আগে থেকে এখানে আছে অথচ কেউ জানে না।'

'তোমার বাবা জানতেন,' বলল রানা। 'তিনি প্রাচীন জলদস্যুদের শিলালিপি আর নিকট অতীতের ভাইকিংদের সাংকেতিক ভাষার অর্থ বের করে এই গুহার সন্ধান পেয়েছিলেন। আমরা নদী হয়ে এই গুহায় ঢুকেছি; কিন্তু তিনি ঢুকেছিলেন ওপর থেকে। তবে এই টানেলটার কথাই বলে গেছেন।'

'চলো, ঘুরেফিরে দেখা যাক,' বলল মুরল্যান্ড।

কারনিসে উঠল ওরা। একটা র‍্যাম্প পাওয়া গেল, সবচেয়ে বড় জাহাজটায় উঠে গেছে। গুহার ভেতর আলো খুব কম, তারপরও ফ্লোরবোর্ডে ছড়ানো-ছিটানো জিনিসগুলো চিনতে পারল ওরা। প্রাচীন একটা মমি পাওয়া গেল, কাঠের কফিনে শুয়ে আছে। মমির চারপাশে প্রচুর ফাঁকা জায়গা, ভরা হয়েছে শুধু বহুরঙা কাঁচের টুকরো দিয়ে। ভুলটা একটু পরই ভাঙল ওদের। ওগুলো কাঁচ নয়, অতি মূল্যবান পাথরের স্তূপ। হীরা, চুনি, পান্না, নীলা, গোমেদ থেকে শুরু করে ওদের চেনা সমস্ত পাথর রাশি রাশি স্তূপ হয়ে পড়ে আছে কফিনের ভেতর, ওজন করলে এক মণের বেশি হবে তো কম নয়।

এরকম কফিন ও মমি একটা নয়, এবং সবগুলোতেই রয়েছে বিপুল স্বর্ণালঙ্কার আর মূল্যবান রত্নের স্তূপ। কোন সন্দেহ নেই এরা সবাই এক একজন কুখ্যাত জলদস্যু ছিল। সারা জীবন ধরে দুনিয়ার বিভিন্ন জলসীমায় দস্যুতা করে যা সঞ্চয় করেছে সব সঙ্গে নিয়ে শুয়ে আছে এখানে, যাতে মরণের পরেও তাদেরকে কোন রকম আর্থিক সংকটে পড়তে না হয়।

ছোট ছোট দশটা কফিন পাওয়া গেল, প্রতিটি সোনার তৈরি। মুরল্যান্ড ধারণা করল প্রতিটি কফিনের ওজন হবে দুই মণ। তৃষা বলল, 'এগুলো সম্ভবত বোম্বেটেদের ছেলেদের মমি।'

'এসো বাকি বোটগুলো দেখি।' ওদেরকে নিয়ে বড় জাহাজটা থেকে নেমে এল রানা।

দ্বিতীয় বোটটা পঞ্চাশ ফুট লম্বা। ভেতরে কিছুই পাওয়া গেল না। এক এক করে বাকি চারটে বোটও খালি পেল ওরা। শেষ বোটটা থেকে নেমে আসার সময় দেখা গেল রানা মাথা চুলকাচ্ছে।

'কি হলো, রানা?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'বোটগুলো একদম খালি, এটা ঠিক যেন মিলছে না–মানে, মানাচ্ছে না,' ইতস্তত একটা ভাব নিয়ে বলল রানা।

'পাঁচটা বোটের কোথাও কিছু নেই, নিজের চোখে দেখার পরও এ-কথা বলছ?'

'আচ্ছা আমরা কি বোটগুলোর কার্গো হোল্ড সার্চ করেছি?'

তৃষা ও মুরল্যান্ড দৃষ্টি বিনিময় করল, তারপর একযোগে মাথা নেড়ে বলল, 'না'।

'দেখা উচিত না?'

সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ওরা। কার্গো হোল্ডের হ্যাচের ঢাকনি সরাতে কিছুই দেখা গেল না, কারণ ভেতরটা অন্ধকার। পকেট থেকে লাইটার বের করে প্রথমে ধাপ বেয়ে নিচে নামল মুরল্যান্ড। এক মিনিট পর নিচে থেকে সে বলল, 'হুজুর, সেলাম বারে বার!'

'কি বলছে ও?' তৃষা হতভম্ব। 'বাংলায়?'

'রানাকে সালাম করছি,' নিচে থেকে আবার বলল মুরল্যান্ড। 'ওকে যে আমি চিরকাল ওস্তাদ মানি, সেটা শুধু শুধু না। আর একটু হলে আমরা পাঁচ হাজার মণ সোনা হারাচ্ছিলাম।'

'ও পাগল হয়ে গেছে,' নার্ভাস হেসে বলল রানা। 'এত সোনা কোত্থেকে আসবে!'

সিঁড়ি বেয়ে হোল্ডে নামবে কি, তৃষা আর রানা বলতে গেলে একরকম স্বেচ্ছায় হড়কে নিচে পড়ল।

তারপর রানা উপলব্ধি করল, কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলেনি প্রিয় বন্ধু ববি। ওর হিসেবটা বরং রক্ষণশীলই। অলংকারের স্তূপ নয়, নিরেট সোনার ইঁট, একেকটার ওজন দশ কেজির কম হবে না, হোল্ডের মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত সাজানো। থাক করে রাখা ইঁটের পাহাড়ের ফাঁকে সরু প্যাসেজ, ভেতরে ঢুকে ঘুরেফিরে দেখল ওরা। সোনার ইঁট একটা দেখাও যা, হাজারটা দেখাও তাই, তবু ওদের মন আর চোখের সাধ মিটছে না। একে একে আরও চারটে জাহাজের কার্গো হোল্ডে নেমে পাগলের মত ঘুরে বেড়াল ওরা, এক সঙ্গে এত সোনা দেখে আবেগে আপ্লুত।

জাহাজ থেকে কারনিসে নেমে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। কিছুক্ষণ পর একটা সাইড টানেল থেকে বেরিয়ে এসে মুরল্যান্ড বলল, 'আমি আরেক রহস্যের সমাধান খুঁজে পেয়েছি।'

'আরেক রহস্য?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এখানেই কোথাও যদি ডক্টর ইসলামের গোপন ল্যাব থেকে থাকে, তাঁর ইলেকট্রিক এনার্জির উৎসটা কোথায়, সেটাই আমি পাশের ওই গুহায় খুঁজে পেয়েছি। তিনটে পোর্টেবল জেনারেটিং ইউনিট; যে পরিমাণ ব্যাটারির সঙ্গে কানেকশন দেয়া আছে, ছোট একটা শহরের চাহিদা মেটাতে পারবে।' ডকের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে, ওদিকে মোটা ইলেকট্রিকাল কেবল্ ঝুলে থাকতে দেখা যাচ্ছে, শেষ মাথাটা সবচেয়ে বড় জাহাজটার ভেতর।

'ওই জাহাজের কার্গো হোল্ড কিন্তু দেখা হয়নি!' রুদ্ধশ্বাসে বলল তৃষা। 'আমার ধারণা শুধু ওটাতেই কোন সোনা নেই, তার মানে বাবার গোপন ল্যাবটা বোধহয় ওখানেই।'

রাম্প বেয়ে আবার ওরা বড় জাহাজটায় উঠে এল। হ্যাচের ঢাকনি খুলে রানা বলল, 'লেডিস ফার্স্ট।'

বুকে হাত দুটো বেঁধে তৃষা যেন তার হৃৎপিণ্ডের লাফালাফি কমাতে চাইছে। তার বহুদিনের ইচ্ছে যে জায়গায় বসে বাবা সারা জীবন বিজ্ঞানের সাধনা করে গেছেন নিজের চোখে সেই জায়গাটা একবার দেখা। তারপরও কেন কে জানে তার ভয় ভয় করছে। রানা যেন একটা ভূতের আস্তানায় নামতে বলেছে তাকে। তবে পিছাল না, সাহস করে ধাপ বেয়ে নেমে এল নিচে। ওর পিছু নিয়ে রানাও নামল, দেয়াল হাতড়াতে আলোর সুইচটা পেয়ে গেল।

কার্গো হোল্ডটা ছোট ছোট কমপার্টমেন্টে ভাগ করা। ওরা নেমেছে একটা শোবার ঘরে। বিশ্রাম নেয়ার সব ব্যবস্থাই আছে এখানে। পাশের কমপার্টমেন্টটা আকারে প্রথমটার চেয়ে বড়। এটা একটা ওঅর্কশপ ও কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি। কেমিক্যাল ল্যাব অ্যাপারেটাস যা যা দরকার হয়, সবই সাজানো দেখল ওরা। ওঅর্কশপ অংশে ভারী কিছু মেশিন দেখা গেল, আরও আছে লেদ ও ড্রিল মেশিন। তিন তিনটে কমপিউটর স্টেশন রয়েছে এখানে, এক ঝাঁক প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ। কিছু টেস্ট টিউব মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেছে।

পাশের কামরাটাকে বলা যায় ডক্টর ইসলামের থিঙ্ক ট্যাংক। গাদা গাদা প্ল্যান, ব্লুপ্রিন্ট, ড্রইং ছাড়াও রয়েছে প্রায় একশো নোটবুক। টেবিলে ছড়িয়ে রয়েছে ডজন উজন ডিজাইন।

'চলো বাকি কামরাগুলো দেখি,' তাগাদা দিল রানা। 'আমি দেখতে চাই কোথায় উনি টেলিপোর্টেশন সেন্ডিং চেম্বারটা বানিয়েছিলেন।'

ওয়াটারটাইট বাল্কহেডের ভেতর দিয়ে একটা এয়ার ট্যাংকে ঢুকল ওরা, যে-ধরনের এয়ার ট্যাংক সাধারণত কোন সাবমেরিনে ব্যবহার করা হয়। এই এয়ার ট্যাংক জলদস্যুদের নয়, অন্যান্য জিনিসের মত এটাকেও এখানে আমদানি করেছেন ডক্টর ইসলাম। এই এয়ার ট্যাংকের ভেতরই ডক্টর ইসলাম তাঁর টেলিপোর্টেশন ইন্সট্রুমেন্ট আর ইকুইপমেন্ট রেখে গেছেন। দুটো প্যানেল দেখা গেল, ডায়াল আর সুইচ গিজ গিজ করছে; আর রয়েছে একটা কমপিউটর ডেস্ক ও এনক্লোজড চেম্বার। এই চেম্বারের ভেতরই সেন্ডিং স্টেশন।

চেম্বারের ভেতর, মেঝেতে পঞ্চান্ন গ্যালনের ড্রামটা দেখে রানার চোখে-মুখে আনন্দের অভিব্যক্তি ফুটল, ড্রামের গায়ে লেখা রয়েছে–সুপার স্লিক। ড্রামটার সঙ্গে একটা টাইমিং ডিভাইস আর কয়েক প্রস্থ টিউব জোড়া লাগানো হয়েছে, ওগুলোকে আবার সংযুক্ত করা হয়েছে মেঝেতে বসানো গোলাকার একটা রিসেপ্টকল-এর সঙ্গে। 'এখন আমরা জানি ডক্টর ইসলামের লেদার কেসে কোত্থেকে তেল যাচ্ছে।'

'কিন্তু এটা কি পদ্ধতি? কিভাবে কাজ করছে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'সেটা ব্যাখ্যা করতে হলে আমার চেয়ে যোগ্য কাউকে দরকার হবে।'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এটা সত্যি কাজ করে।'

'দেখে যতই সাধারণ আর নগণ্য বলে মনে হোক,' বলল রানা, 'তুমি এমন একটা সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টের দিকে তাকিয়ে আছ যেটা সমস্ত ট্র্যান্সপোর্টেশন সিস্টেমকে ভবিষ্যতে বদলে দেবে।' এগিয়ে এসে ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের সামনে দাঁড়াল রানা। টাইমিং ডিভাইসে সিকোয়েন্স সেট করা রয়েছে আটচল্লিশ ঘণ্টায়। সেটাকে বদলে দশ ঘণ্টায় সেট করল ও।

'কি করছ?' কৌতূহলী মুরল্যান্ড জানতে চাইল।

'কিং আর তার ভীনাসকে একটা মেসেজ পাঠালাম।' হেসে উঠল রানা।

তারপর ওরা আরেক কমপার্টমেন্টে চলে এল। এখানেই ওদের জন্যে সত্যিকার চমক অপেক্ষা করছিল।

এখানে যত ক্যানভাস আছে, যে-কোন মিউজিয়ামের দশটা রুম অনায়াসে সাজানো যাবে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, টিশান, রাফায়েল, রেমব্র্যান্ডট, ভারমিয়ার, রুবেন্স সহ অন্যান্য আরও ত্রিশজন চিত্রশিল্পীর বিখ্যাত সব শিল্পকর্ম। মোনালিসাকে দেখে হাঁ হয়ে গেল তিনজনই।

'তারমানে কি লোকে যেটাকে এতদিন মোনালিসা বলে জেনে এসেছে সেটা নকল?

'শুধু মোনালিসা নয়। এখানে যত শিল্পকর্ম দেখছি আমরা, এগুলোই আসল'।

এগুলো যদি মিউজিয়ামে থেকে থাকে, বুঝতে হবে সব নকল। ডক্টর ইসলাম সেই কথাই লিখে গেছেন।'

'এগুলো বিক্রি করলে কত দাম পাওয়া যাবে জানো?' মুরল্যান্ড মুখ খুলে বাতাস টানছে।

'আন্দাজ করতে রাজি নই,' বলল রানা। 'নির্ঘাত ভুল করব।' 'নিজেকে আমার আলীবাবা মনে হচ্ছে, দোস্ত।'

রানার বাহু খামচে ধরে তৃষা বলল, 'আমি এরকম কিছু ভুলেও আশা করিনি।'

এক ঘণ্টা পর আবার বিশাল কারনিসে বেরিয়ে এল ওরা। সবাই যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে।

ডক্টর সিরাজুল ইসলামের স্টাডিতে বসে একটা কেমিক্যাল অ্যানালিসিস জার্নাল পড়ছেন ডক্টর ফিরোজ ফাহিম। অকস্মাৎ ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন তিনি। কামরার মাঝখানের কার্পেট মেঝে থেকে ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। এক সময় ওটাকে ছুঁড়ে ফেলা হলো এক পাশে। তারপর একটা ট্র্যাপডোরের ঢাকনি খুলে গেল। নিচে থেকে উঠে এল রানার মাথা। 'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত,' সহাস্যে বলল ও। 'তবে আপনাকে জানাতে এলাম যে ডক্টর ইসলামের গোপন ল্যাব আর ট্রেজার, সবই আমরা খুঁজে পেয়েছি।'

***